১। কায়রোয়ান মসজিদ, লিওয়ান ও সাহান

মুসলিম স্থাপত্য

(মসজিদবিষয়ক)

[জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (শিল্পকলা)-বিষয়ক সর্বাধুনিক চিত্রসম্বলিত পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত গ্রন্থ]

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

২। কায়রোয়ান জামে মসজিদ, দৃশ্য
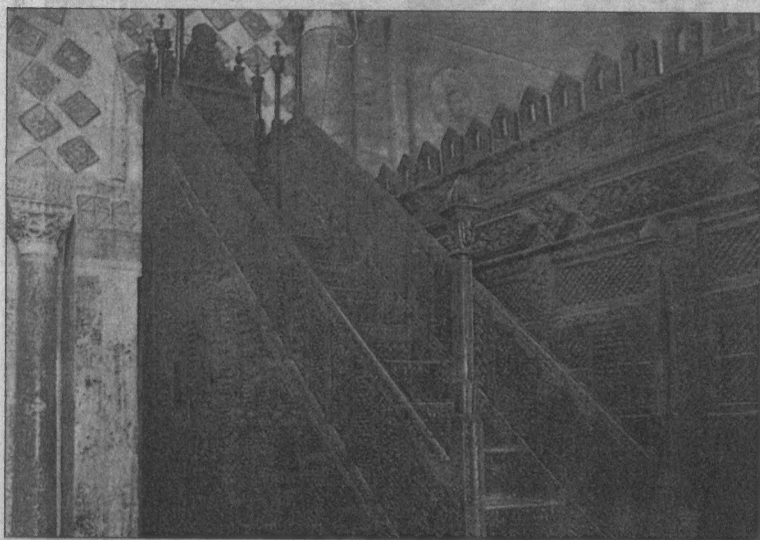
৩। কায়রোয়ান মসজিদ, মিম্বর

দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ ২০০০

প্রকাশক সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী
মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯
প্রাপ্তিস্থান
বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ
৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা-১২
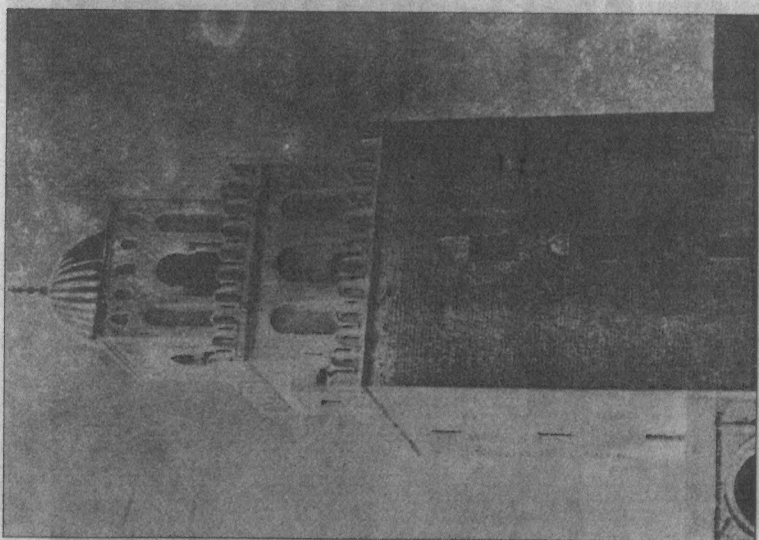
৪। কায়রোয়ান মসজিদ, কেন্দ্রীয় মিহরাব

৫। কায়রোয়ান মসজিদ, মিনার
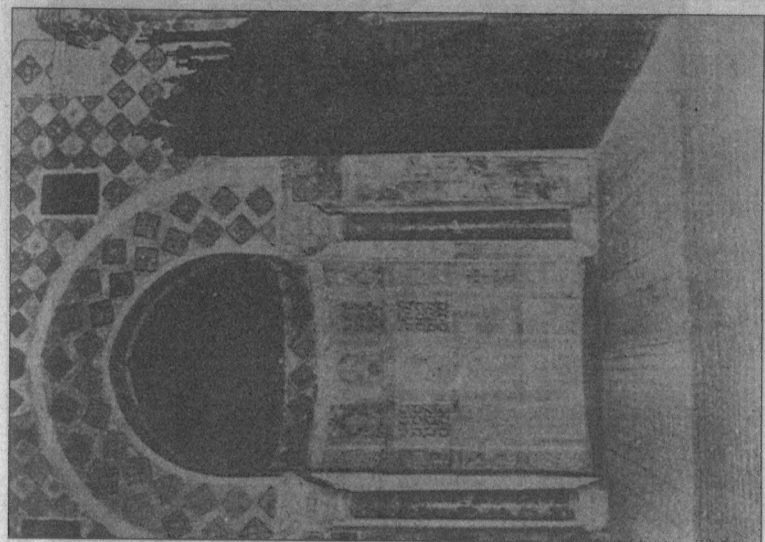
উৎসর্গ

প্রয়াত অধ্যাপক আবু মোহামেদ হাবিবুল্লাহ
ছাত্র ও সহকর্মী হিসেবে যাঁর উৎসাহ ও
অনুপ্রেরণা লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল।
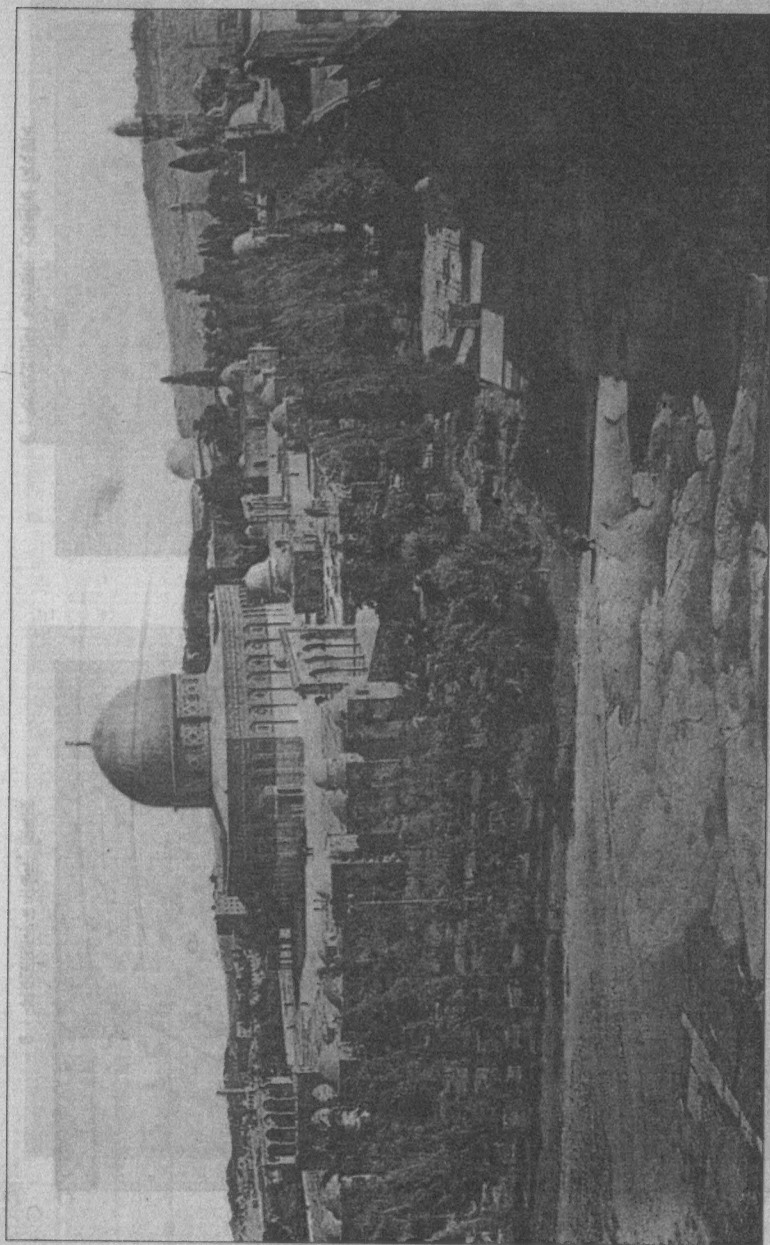
৬। জেরুজালেম, আল-আকসা মসজিদ এবং ডোম-অব-দি-রক
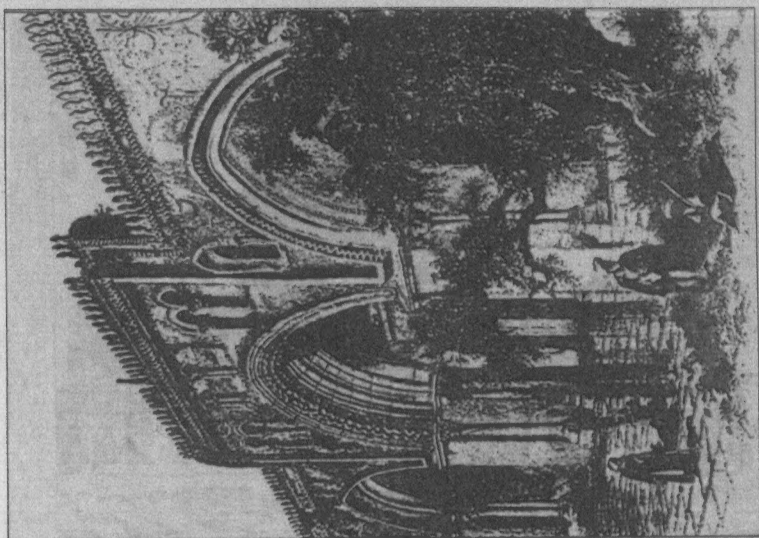
৭। জেরুজালেম, আল-আকসা মসজিদ, সম্মুখভাগ

৮। জেরুজালেম, আল-আকসা মসজিদ, খিলানরাজি

ভূমিকা

মসজিদ কেবলমাত্র একটি প্রার্থনার স্থান নয়; মসজিদ ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রাণকেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। রসূলে খোদার (সাঃ) সময়ে মদীনায় যে প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, পরবর্তীকালের মসজিদসমূহ তারই অনুকরণ। ইসলামী স্থাপত্যকলার বিকাশেও মসজিদের অবদান অনস্বীকার্য। মুসলিম সমাজ ও সভ্যতার সম্প্রসারণে মসজিদের ভূমিকা অপরিসীম। মুসলমানগণ বিজিত অঞ্চলে মসজিদ স্থাপন করে শুধু তাদের অসামান্য শৈল্পিক দক্ষতা ও কৌশলের স্বাক্ষরই রাখে নি, বরং আজও সেগুলো মুসলিম জাতির অসামান্য অবদান হিসেবে কীর্তিত। তাই সুদূর স্পেন থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত যুগে যুগে নির্মিত হয়েছে অসংখ্য মসজিদ।

সপ্তম শতাব্দীতে মদিনায় যে মসজিদুন্ নব্বী প্রতিষ্ঠিত হয় পরবর্তী যুগে বসরা, কুফা, ফুসতাত এবং উমাইয়া আমলে জেরুজালেম, দামেস্ক, কায়রো ও কর্ডোভাতে তা বিস্তার লাভ করে। আব্বাসীয় যুগেও অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে। বাগদাদ, রাক্কা, সামাররা এবং বিশেষ করে পারস্য, মধ্য-এশিয়া এবং ভারত উপমহাদেশের মসজিদ মুসলিম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে পরিগণিত। উল্লেখ্য যে, সামাররার মসজিদটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মসজিদ এবং মসজিদ স্থাপত্যের উন্মেষ এবং ক্রমবিকাশে মুসলিম স্থপতি ও কারিগর বিভিন্ন কৌশল ও রীতি-পদ্ধতির প্রয়োগ করে। এই সমস্ত রীতি-প্রকরণ পরবর্তীকালে ইউরোপীয় গথিক স্থাপত্যে প্রভাব বিস্তার করে। অলঙ্করণে মূর্তিবিহীন নক্‌শা প্রাধান্য লাভ করে ; যেমন– জ্যামিতিক (arabesque), লতা-পাতা এবং বিশেষ করে আরবী-ফারসী শিলালিপি।

বাংলা ভাষায় প্রণীত প্রথম গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম স্থাপত্যের (মসজিদবিষয়ক) ইতিহাসে মসজিদ সম্পর্কিত বহু প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। আশা করা যায় পূর্বের মতো বিদগ্ধ পাঠক এবং স্থাপত্যকলার ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট গ্রন্থটি সমাদৃত হবে।

বর্তমান সর্বাধুনিক সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত তিনটি নতুন অধ্যায়, যথা : ফাতেমী স্থাপত্য, পারস্য স্থাপত্য ও ভারত উপমহাদেশের স্থাপত্য।

৯। জেরুজালেম, কুব্বাতুস সাখরা, বাইরের দৃশ্য

১০। জেরুজালেম, কুব্বাতুস সাখরা, অভ্যন্তরের দৃশ্য

১১। জেরুজালেম, কুব্বাতুস সাখরা, পবিত্র পাথর

১২। জেরুজালেম, কুব্বাতুস সাখরা, মোসাইক

সূচিপত্র

১৩। দামেস্ক, জা'মি মসজিদ, সাহান

১৪। দামেস্ক, জা'মি মসজিদ, লিওয়ান

১৫। দামেস্ক, জা'মি মসজিদ, রিওয়াক

১৬। দামেস্ক, জা'মি মসজিদ, মোসাইক

১৭। বাগদাদ, আল-মনসুরের মসজিদ, মিহরাব

১৮। সামাররা, জা'মি মসজিদ, বাইরের দৃশ্য

১৯। সামাররা, জা'মি মসজিদ, বাইরের প্রাচীর

২০। তিউনিস জা'মি মসজিদ, অভ্যন্তরীণ দৃশ্য

মুসলিম স্থাপত্য

(মসজিদবিষয়ক)
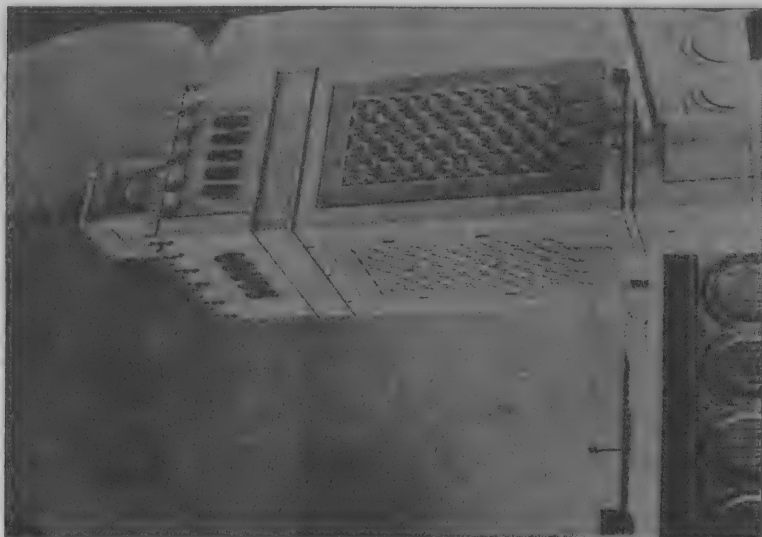
২১। তিউনিস জা'মি মসজিদ, মিনার

২২। তিউনিস, জা'মি মসজিদ গম্বুজ

২৩। কায়রোয়ান, তিন দরওয়াজা বিশিষ্ট মসজিদ

২৪। কায়রো, ইবনে তুলুনের মসজিদ, বাইরের প্রাচীর

১
মসজিদের পটভূমি

১। স্থাপত্য ও তার সংজ্ঞা

স্থাপত্য কি : জন রাসকীন বলেন, 'Architecture is an art for all man to learn, because all are concerned with it'. স্থাপত্য কি–এর সংজ্ঞা নির্ণয় করা দুরূহ কাজ। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্থাপত্য শিল্পকলা এবং বিজ্ঞানের সমন্বয়। স্থাপত্যকে এ কারণেই সকল শিল্পকর্মের উৎস বা "Mother of all arts" বলা হয়েছে। স্থাপত্য বলতে কেবল ইমারতকেই বোঝায় না, কারণ ভূমি পরিকল্পনা ও নির্মাণপ্রক্রিয়া ছাড়াও অসাধারণ ভাস্কর্য, চিত্রকলা এবং বিভিন্ন ধরনের নক্‌শা বোঝায়। যেকোনো ইমারতকে স্থাপত্য শিল্প বলা যাবে না, কারণ ইমারতের কেবলমাত্র ব্যবহারিক (utilitarian) দিক বিচার করলেই শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকর্ম হবে না, ব্যবহারিক দিকের সাথে সাথে থাকতে হবে অনুপম সৌন্দর্য ও সুষমা অর্থাৎ aesthetic beauty। এ দুইয়ের সমন্বয়ে পৃথিবীতে যুগে যুগে সৃষ্টি হয়েছে অত্যুৎকৃষ্ট ইমারত ও স্মৃতিসৌধ।

আদিম যুগে মানুষ যখন গুহায় বাস করত তখন ইমারতের প্রয়োজন ছিল না। মূলত ইমারতের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাক থেকে রক্ষা পাবার জন্য আশ্রয়লাভ। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ যখন গুহায় বাস করত তখন সেটাই ছিল তার বাসস্থান বা আশ্রয়স্থল। কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে মানুষ যখন সমতলে বসবাস শুরু করে তখন প্রথমে কোনো প্রকাণ্ড পাহাড়ের ধারে একটি চালাঘর তুলে বসবাস করতে শুরু করে। কিন্তু ঝড়, বৃষ্টি বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক কারণে খড়, পাতা, কাদা, মাটি, ডাল, কাণ্ড, চামড়া দিয়ে তৈরি ছাদসহ ঘরবাড়ি পড়ে যেতে থাকে। তখন আদিম মানুষ একটি গোলাকার এলাকায় কাণ্ড পুঁতে মাথাগুলো একত্রে বেঁধে দিয়ে যে আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করে তা মোটামুটি মজবুত ছিল। ছাদের সৃষ্টি করা হয় পাতার সঙ্গে কাদামাটি মিশিয়ে। এ ধরনের প্রাথমিক ঘরবাড়িকে "wattle and daub" রীতিতে নির্মিত বলা হয়। এখনও আফ্রিকার বহু দেশে এ ধরনের ঘরবাড়ি দেখা যাবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, স্থায়ী উপকরণ ব্যতিরেকে কোনো ইমারত নির্মিত হলে তা স্থাপত্যের পর্যায়ে পড়বে না। অন্য কথায় ইট, পাথর, মার্বেল প্রভৃতি দিয়ে ইমারত তৈরি করলে তা স্থাপত্যশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে।

স্থাপত্যকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, মানুষের আদি নির্মাণকৌশল ছিল একখণ্ড খাড়া প্রস্তরখণ্ড, যা সম্ভবত স্মৃতিসৌধ হিসেবে গণ্য হত। এ

২৫। কায়রো, ইবন তুলুনের মসজিদ, বাহিরের প্রাচীর

২৬। কায়রো, ইবনে তুলুনের মসজিদ, লিওয়ান

ধরনের খাড়া প্রস্তরখণ্ডকে বলা হয় মেন্‌হির (menhir) (রেখাচিত্র-১)। পরবর্তী পর্যায়ে দুটি খাড়া প্রস্তরখণ্ডের মাথায় লম্বালম্বি অপর একটি প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করলে যে আকার ধারণ করে, তা স্থাপত্যের ভাষায় সর্দল বা post and lintel রীতি (রেখাচিত্র-২)। ব্রিটেনে স্টোনহেঞ্জ (stonehenge) post and lintel রীতির উৎকর্ষের ফলে সম্পন্ন হয়েছে। এই রীতিতে অ্যাসিরীয় ও প্রাচীন মিশরীয় মন্দির ও প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে। এই পদ্ধতির মস্তবড় ক্রটি হচ্ছে যে, নিম্নমুখী চাপ সহ্য করার ক্ষমতা এতে নেই। সর্দলের উপর পরপর কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড সমান্তরালভাবে স্থাপন করলে যে নিম্নমুখী (Downward thrust) চাপ সৃষ্টি করবে, তার ফলেই ইমারত ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। প্রাচীনকালে অমসৃণ দুটি প্রস্তরখণ্ড খাড়াভাবে প্রোথিত করে তার উপরে আর একটি অনুরূপ অমসৃণ ও অসম পাথরের খণ্ড সমান্তরালভাবে স্থাপন করা হত। আশ্রয়ের জন্য ছাদসৃষ্টির এই প্রাচীন প্রচেষ্টাকে বলা হয় ডলমেন (Dolmen)। Post এবং lintel-এর সাহায্যে ইমারত নির্মাণ ক্রটিমুক্ত না হওয়ায় প্রাচীন যুগে স্থপতিগণ লম্বালম্বি অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড পরপর এমনভাবে স্থাপন করতেন, যাতে একটি খিলানের আকৃতি ধারণ করে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে দুটি প্রস্তরখণ্ড কিছু দূরে স্থাপন করা হয় এবং তারপর উপরের দিকে কয়েকটি প্রস্তর সামনের উভয়দিক থেকে বাড়িয়ে শূন্যতা পূরণ করা হয়।
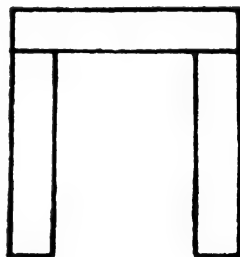
রেখাচিত্র : ১
মেন্‌হির

এভাবে যে খিলান তৈরি করা হয় তাকে কর্বেল (corbel) বলা হয় (রেখাচিত্র-৩)। Corbel বা কৃত্রিম খিলান উদ্ভাবিত হয় অ্যাসিরীয় সভ্যতায়। অ্যাসিরিয়ার প্রখ্যাত সিংহদ্বারে (খ্রিস্টপূর্ব চৌদ্দশত শতাব্দী) এ ধরনের corbel খিলানের দৃষ্টান্ত দেখা যাবে। Corbel খিলান নিম্নমুখী চাপ বহন করতে পারে না। এ কারণে নির্মাণপদ্ধতিতে যে রীতি সর্বাপেক্ষা স্থায়ী এবং গ্রহণযোগ্য তা হচ্ছে Voussoirs অর্থাৎ ভূসুয়ার্স (রেখাচিত্র-৪)। প্রকৃত খিলান নির্মাণে ভূসুয়ার্সের প্রয়োগ একান্তই প্রয়োজন। কর্বেলের সঙ্গে ভূসুয়ার্সের প্রভেদ হচ্ছে এই যে, কর্বেলে টুকরো টুকরো পাথরকে উপরে চাপিয়ে রাখা হয়, কিন্তু ভূসুয়ার্সে নিম্নমুখী চাপ রোধের
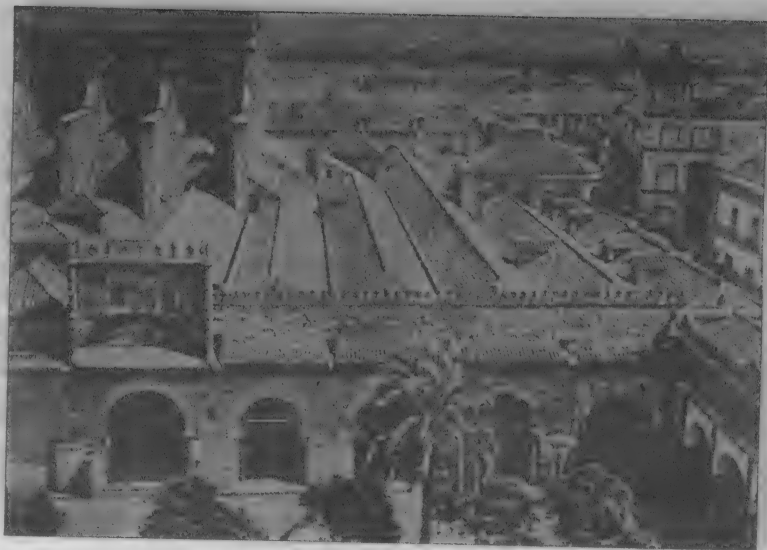
রেখাচিত্র : ২
লিনটেল

২৭। কর্ডোভা জামি মসজিদ, বাইরের দৃশ্য
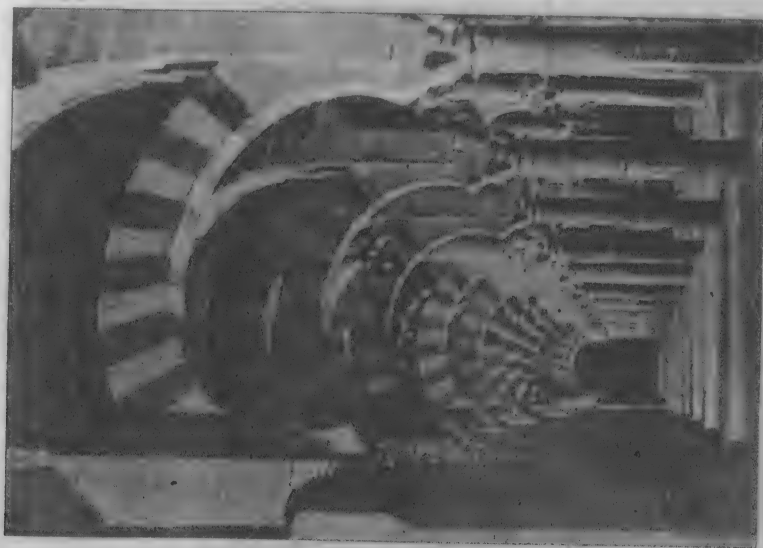
২৮। কর্ডোভা, জামি মসজিদ, খিলানরাজী

(neutralise) জন্য পাথরখণ্ডগুলো পাশাপাশি স্থাপন করা হয়। এর ফলে পাথর-খণ্ডগুলো নিম্নমুখী চাপ না দিয়ে পাশে চাপ দিতে থাকে। ভূসুয়ার্স খিলানের মাথায় যে
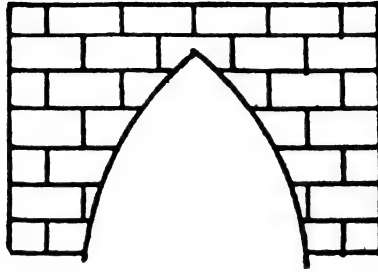
রেখাচিত্র : ৩
কর্বেল বা কৃত্রিম খিলান

পাথর থাকে, তাকে বলে মূল পাথর (keystone)। মূল পাথরের উপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি হলে তৎক্ষণাৎ পার্শ্ববর্তী পাথরে চাপ দিতে থাকে এবং এভাবে চাপটি neutralise হয়ে ইমারতের স্থায়িত্বকে নিশ্চিত করে।
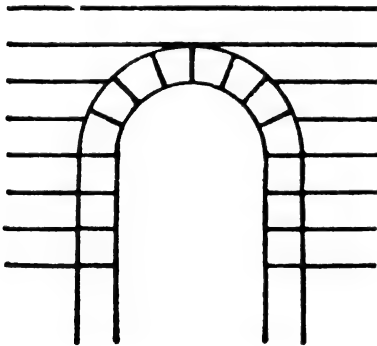
রেখাচিত্র : ৪
ভূসুয়ার্স খিলান

প্রাচীন সভ্যতায় সর্বপ্রথম কোথায় ভূসুয়ার্স ব্যবহৃত হয়েছে, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন, তবে মনে হয় অ্যাসিরীয় ব্যাবিলনে প্রথম এই ধরনের খিলানের প্রয়োগ হয়। ফ্লেচারের মতে, খ্রিস্টপূর্ব ৭২২ সালে স্থাপিত খোরশাবাদের অ্যাসিরীয় প্রাসাদের পয়ঃপ্রণালীতে সর্বপ্রথম কৌণিক খিলান ভূসুয়ার্স পদ্ধতিতে নির্মিত হয়। উল্লেখ্য যে, কৌণিক খিলান মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং কায়রোতে স্থাপিত ইবনে তুলুনের মসজিদে সর্বপ্রথম সার্বজনীনভাবে কৌণিক খিলান ব্যবহৃত হয়।

স্থাপত্যকলার ইতিহাস সভ্যতারই অঙ্গ। বিভিন্ন সভ্যতায় স্থাপত্যশিল্পের প্রকাশ ঘটেছে এবং প্রত্যেক সভ্য জাতি নিজস্ব স্থাপত্যরীতি উদ্ভাবন করেছে। এই রীতির উদ্ভাবনে বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ দেখা যাবে। প্রাচীন ঐতিহ্য, আবহাওয়ার প্রভাব,
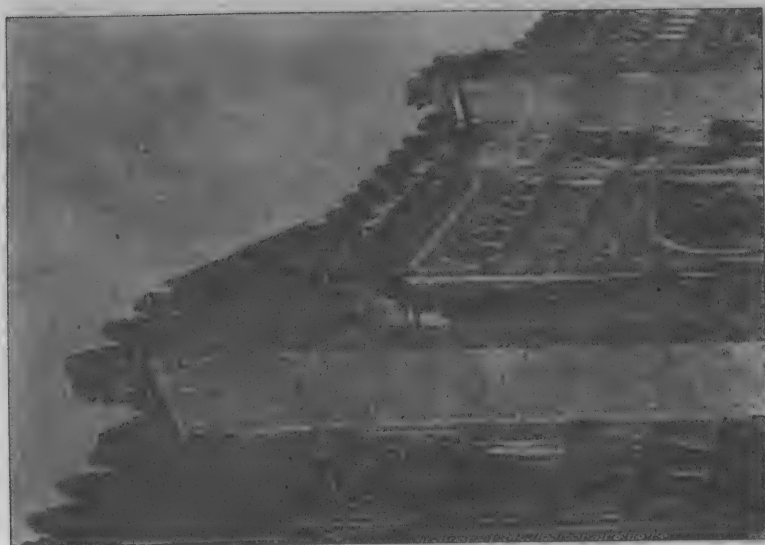
২৯। কর্ডোভা, জা'মি মসজিদ, প্রবেশপথ

৩০। কর্ডোভা, জা'মি মসজিদ, ছাদ

উপকরণের প্রয়োগ এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ সমস্ত কিছু মিলেই সৃষ্টি হয়েছে স্থাপত্যরীতির বিভিন্ন ধারা, যেমন–মিশরীয়, অ্যাসিরীয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রীক, রোমীয়, বায়জানটাইন, মুসলিম ইত্যাদি। এ কারণেই স্থাপত্যকে বলা হয়েছে "The history of man`s cultural development and spiritual aspirations"। জনৈক জার্মান দার্শনিক স্থাপত্যকীর্তিকে বলেছেন 'frozen music'।
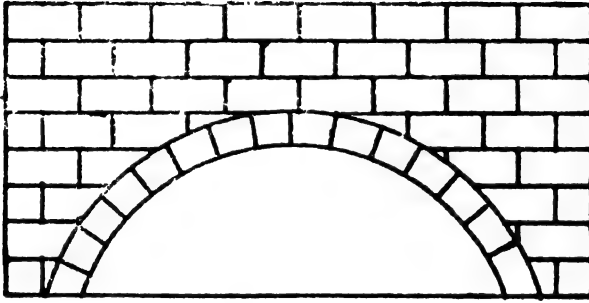
রেখাচিত্র : ৫
অর্ধগোলাকার খিলান

সংজ্ঞা : সঠিকভাবে স্থাপত্যকলাকে উপলব্ধি করতে হলে স্থাপত্যশিল্পের সংজ্ঞাগুলো ভালভাবে জানা প্রয়োজন। স্থাপত্যরীতির প্রধান সূত্রই হচ্ছে খিলান। বৃহত্তম খোলা স্থানকে আবৃত করতে হলে লিনটেল অথবা কর্বেলের সাহায্যে সম্ভবপর নয়। কিন্তু ভূসুয়ার্স পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে খিলান দ্বারা খোলা স্থানে ছাদ দেওয়া হয়। খিলানের আকৃতি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। মোটামুটিভাবে খিলান নিম্নরূপ :
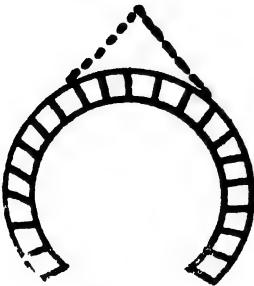
প্রয়োজন ও রুচির তাগিদে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খিলান ব্যবহৃত হয়েছে। খুবই সাধারণ আকৃতি হচ্ছে অর্ধগোলাকার। একটি বিন্দু থেকে অর্ধবৃত্তাকার একটি রেখা দ্বারা অর্ধগোলাকার খিলান সৃষ্টি করা হয় (রেখাচিত্র-৫)। এটরুস্কান (Etruscan) যুগে রোমীয়গণ সর্বপ্রথম খিলানের ব্যবহার শুরু করে এবং আদি খিলান অর্ধবৃত্তাকার।

রেখাচিত্র : ৬
অশ্বনালাকৃতি খিলান

৩১। সেভিল, জামি মসজিদের মিনার বর্তমানে গীর্জার ঘণ্টাঘর।
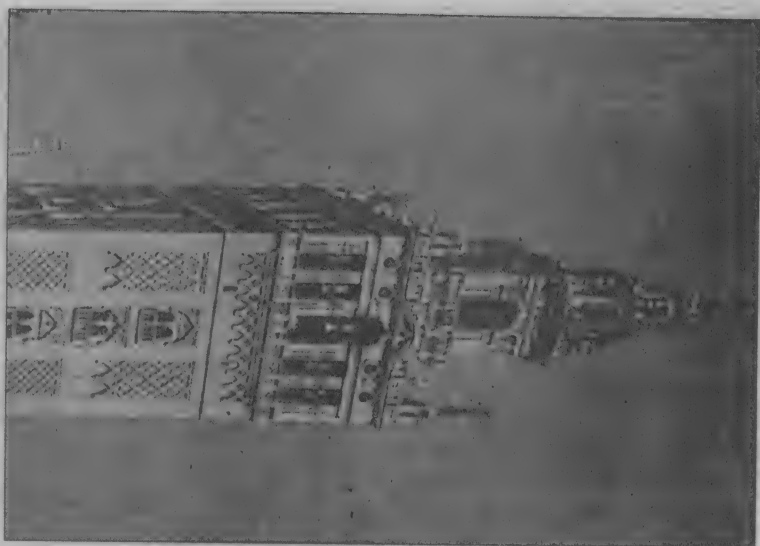
৩২। কায়রোর, আজহার মসজিদের প্রাঙ্গণ ও মিনার

পরবর্তীকালে বায়জানটাইন স্থাপত্যে অর্ধগোলাকার খিলানের প্রয়োগ দেখা যাবে। অর্ধবৃত্তাকার খিলান থেকেই অশ্বনালাকৃতি খিলান সৃষ্টি করা হয়। এ ধরনের খিলানে নিম্নাংশের বক্র রেখাটি অর্ধগোলাকার রেখা অপেক্ষা সামান্য বাড়িয়ে দিয়ে একটি কোণের সৃষ্টি করা হয়। অশ্বনালাকৃতি খিলানের ব্যাস অপেক্ষা খিলান নির্মাণের রেখা সামান্য ছোট হয়ে থাকে। মুসলিম স্থাপত্যের আদিপর্বে, বিশেষ করে দামেস্কের মসজিদে, কায়রোয়ান মসজিদে, সুসার মসজিদে ও কর্ডোভার মসজিদে গোলাকার অশ্বনালাকৃতি খিলান ব্যবহৃত হয়েছে। এই খিলানের অপর একটি ব্যতিক্রম কৌণিক নালাকৃতি। ক্রেসওয়েলের মতে, নিসিবিনে ৩৫৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত মার ইয়াকুবের মঠে গোলাকার অশ্বনালাকৃতি খিলানের প্রয়োগ হয়েছে (রেখাচিত্র-৬)। কৌণিক অশ্বনালাকৃতির খিলান উপরের দিকে সামান্য কোণাকৃতি থাকে (রেখাচিত্র-৭)। এ ধরনের খিলান কায়রোয়ান মসজিদের লিওয়ানের মধ্যবর্তী 'নেভে' এবং তিন দরজাবিশিষ্ট মসজিদের দরজার উপরে দেখা যাবে।
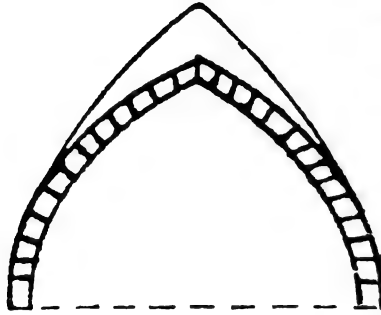
রেখাচিত্র : ৭
কৌণিক অশ্বনালাকৃতি খিলান

খিলানের প্রকারভেদে সর্বাপেক্ষা বহুলপ্রচলিত হচ্ছে কৌণিক খিলান। (রেখাচিত্র-৮)। মুসলিম স্থাপত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং নির্মাণকৌশল হিসেবে স্বীকৃত কৌণিক খিলান মূলত দুটি পৃথক বলয় বা বৃত্ত থেকে দুটি রেখা অঙ্কন করে সৃষ্টি করা হয়। একটি সরলরেখার দুটি প্রান্তবিন্দু থেকে দুটি রেখা যেস্থানে ছেদ করে, সেখান থেকে পার্শ্ববর্তী রেখার সংযোগ করা হয়। ক্রেসওয়েলের মতে, সিরিয়ার হোমস্ শহরের নিকট কাসর আল-ওয়ারদানের প্রাক্-মুসলিম ইমারতে প্রথম কৌণিক খিলান দেখা যায়। পরবর্তীকালে কৌণিক খিলান দামেস্কের মসজিদে, কুসাইর আমরায়, হাম্মাম আস-সারখে, কাসর আলহাইর, উখাইদির, ফুস্তাত, কায়রোয়ান এবং বিশেষ করে কায়রোর ইবনে তুলুন মসজিদে দেখা যাবে। দ্বিবলয় ব্যতীত অনেক সময় চারটি বলয় থেকে
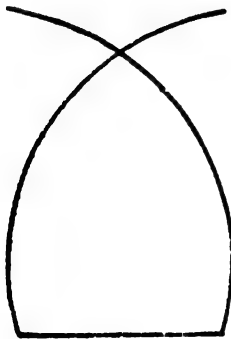
রেখাচিত্র : ৮
কৌণিক খিলান, দ্বিবলয়
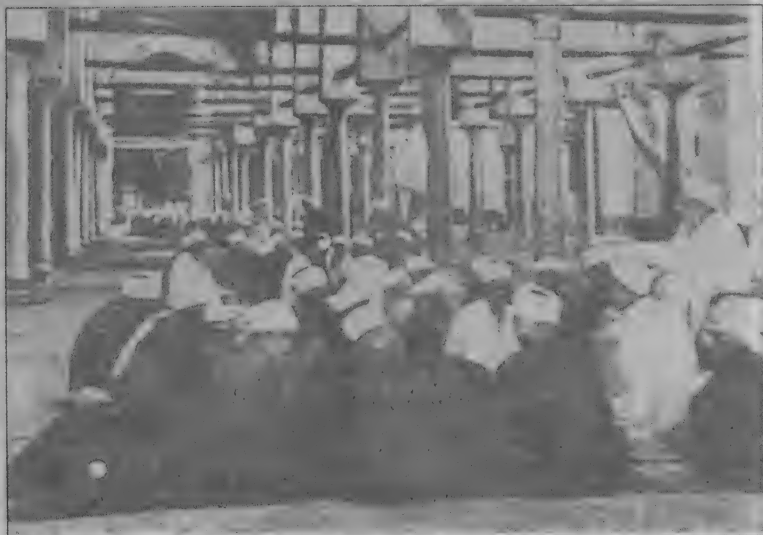
৩৩। কায়রো, আল-আজহার মসজিদের শিক্ষকসহ ছাত্রগণ

৩৪। ইসফাহান, জা'মি মসজিদ, বাইরের দৃশ্য

কৌণিক খিলান নির্মিত হলে তা চার-বলয় খিলান Four-centred arch নামে পরিচিত হয় (রেখাচিত্র-৯)।

রেখাচিত্র : ৯
কৌণিক খিলান, চার-বলয়
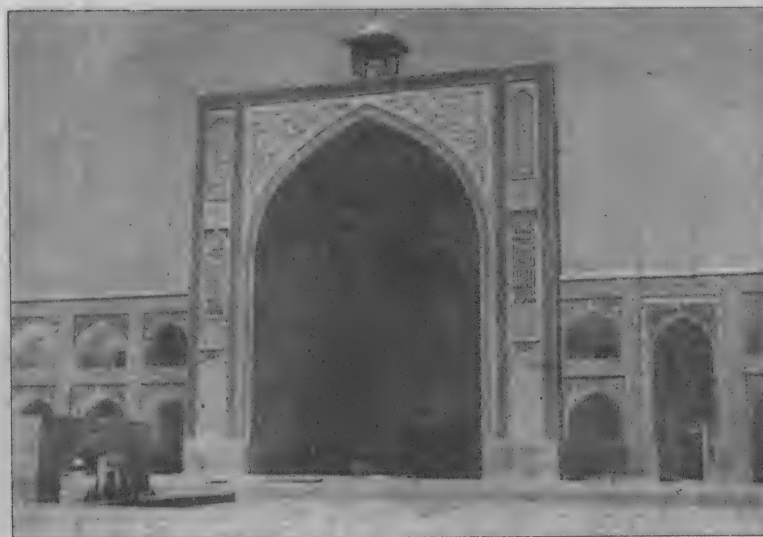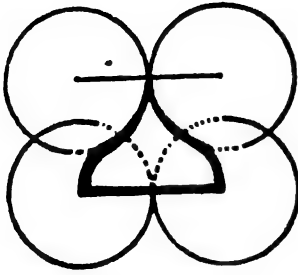
আব্বাসীয় খিলাফতে আল্-মনসুর রাক্কায় যে প্রাসাদ নির্মাণ করেন তারই মূল ফটকে চার-বলয়ের খিলান দেখা যাবে। কৌণিক চার বলয়ের খিলানের keystone-এ ইংরেজি "S"-এর আকৃতিতে নক্শা করা থাকলে তাকে বলা হয় 'Ogee arch'। ভারত উপমহাদেশের মুসলিম স্থাপত্যের আদিভূমি দিল্লীতে কুওয়াতুল ইসলাম নামে যে মসজিদ নির্মিত হয় তার screen arch Ogee ধরনের (রেখাচিত্র-১০)।

খিলানের প্রকারভেদ অনেক রয়েছে। অলঙ্করণ ও বৈপরিত্য খিলানকে সুষমামণ্ডিত কবেছে। মুসলিম স্থাপত্যে বিভিন্ন ধরনের খিলানের সমাবেশ দেখা যাবে। ত্রি-পত্র, পাঁচ-পত্র অথবা বহুপত্র সদৃশ খিলান বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। জেরুজালেমের কুব্বাত আস-সাখরার ভূগর্ভে সোলায়মানের যে মিহ্‌রাব (৬৯১ খ্রীস্টাব্দ) রয়েছে তা ত্রি-পত্র সদৃশ। ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় হযরত পাণ্ডুয়ায় নির্মিত আদিনা মসজিদের প্রধান মিহ্‌রাবে ত্রি-পত্র সদৃশ খিলান নির্মিত হয়েছে

রেখাচিত্র : ১০
ওজি (Ogee) খিলান

(চতুর্দশ শতাব্দী)। এই ধরনের খিলানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তিনটি পাতার বক্র রেখার পরস্পর সমন্বয় (রেখাচিত্র-১১)। ত্রি-পত্র খিলান থেকে পাঁচ-পত্র খিলানের সৃষ্টি (রেখাচিত্র-১২)। মনোরম ও সুদৃশ্য পাঁচ-পত্রবিশিষ্ট খিলান মুসলিম স্থাপত্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বপ্রাচীন দৃষ্টান্ত সম্ভবত সামার্‌রা ও ইবনে তুলুন মসজিদের বহিঃপ্রাচীরে নির্মিত জানালায় ও কুলুঙ্গীতে। প্রাক-মুঘল যুগে বিভিন্ন মসজিদের মিহ্‌রাবে পাঁচ খিলান প্রযোগ করা হয় ; যেমন, ঢাকা জেলার সোনারগাঁয়ের গোয়ালদি মসজিদে (ষোড়শ শতাব্দী)। পাঁচ-পত্রের অধিক যে

৩৫। ইসফাহান জামে মসজিদ, অপর দৃশ্য

৩৬। ইসফাহান, জা'মি মসজিদ, মিহ্‌রাব
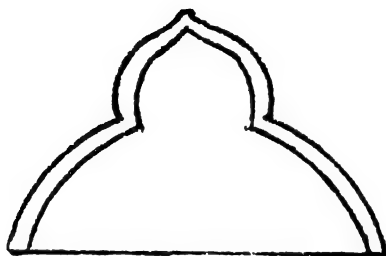
রেখাচিত্র : ১১
ত্রি-পত্র (Trefoil) খিলান
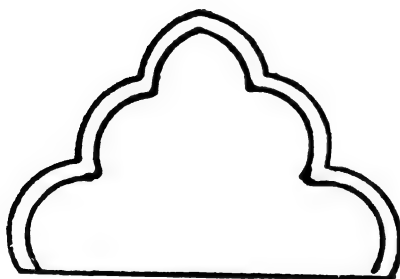
রেখাচিত্র : ১২
পাঁচ-পত্র (Cinquefoil) খিলান

অলঙ্কৃত খিলান দেখা যাবে তাকে বলা হয় বহুপত্র খিলান বা multifoil arch (রেখাচিত্র-১৩)। আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য ও কারুশিল্পের নৈপূণ্য দেখা যাবে এ ধরনের খিলানে। স্পেনের আল-হাম্‌রা ও আল-কাযার প্রাসাদে, দিল্লীর ইল্‌তুৎমিশের সমাধি এবং প্রাক্‌-মুঘল যুগের বাংলার অসংখ্য মসজিদে, যেমন– বাঘার মসজিদ (১৫২৩ খ্রীঃ), গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ (১৪৯৩–১৫১৯ খ্রীঃ) ইত্যাদি।

৩৭। ইসফাহান, মসজিদ লুতফুল্লাহ

৩৮। ইসফাহান, মসজিদ-ই-লুৎফুল্লাহ, অলঙ্করণ

খিলানের ব্যাপক ব্যবহারে মুসলিম স্থপতিগণ অপরিসীম পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। পাঁচ-পত্রবিশিষ্ট খিলানের বহুল প্রয়োগ দেখা যাবে স্পেনের কর্ডোভা মসজিদে। এই

রেখাচিত্র : ১৩
বহু-পত্র (Multifoil) খিলান

খিলানের এক অপূর্ব বৈচিত্র্য স্থপতি ব্যক্ত করেছেন পরস্পরচ্ছেদকৃত পাঁচ-পত্র এবং ত্রি-পত্র খিলানে (রেখাচিত্র-১৪)। এ ধরনের সংমিশ্রণে খিলান তৈরি করতে হয় স্তম্ভের উপর থেকে। পাশাপাশি স্তম্ভের উপর থেকে দুটি পাঁচ-পত্র খিলান নির্মাণ করে অপর
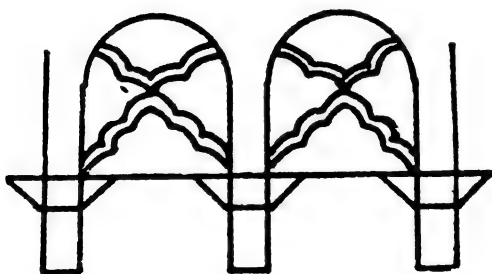
রেখাচিত্র : ১৪
পরস্পরচ্ছেদকৃত পাঁচ-পত্র খিলান

একটি ত্রি-পত্র খিলান দ্বারা সংযোজিত হয়। এ ধরনের খিলান পরস্পরের উপর স্থাপিত থাকে।

৩৯। ইসফাহান, মসজিদ-ই-শাহ, বাইরের দৃশ্য

৪০। ইসফাহান, মসজিদ-ই-শাহ্, অভ্যন্তরীণ দৃশ্য

মুসলিম স্থাপত্যের অলঙ্করণে খিলানের প্রভাব ও প্রয়োগ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ছোট ছোট দ্বিবলয় কৌণিক খিলানের সমাবেশ এবং চাতুর্যের সঙ্গে সমন্বয়ের ফলে সৃষ্টি হয়েছে Stalactite বা মুকারনাস (রেখাচিত্র-১৫)। প্রথম সারিতে সাতটি, দ্বিতীয়
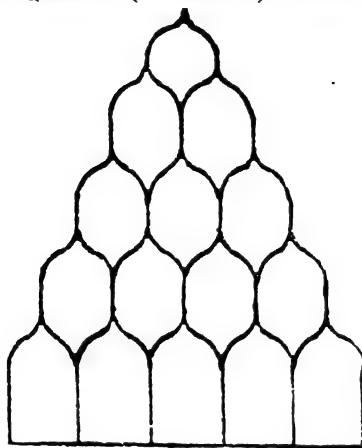
রেখাচিত্র : ১৫
স্টালাকটাইট পেনডেনটিভ

সারিতে ছয়টি, তৃতীয়টিতে পাঁচটি এবং চতুর্থটিতে চারটি, পঞ্চমটিতে দুটি এবং সর্বশেষ স্তরে একটি খিলান এক চমৎকার ও অসাধারণ স্থাপত্যিক অলঙ্করণের সৃষ্টি
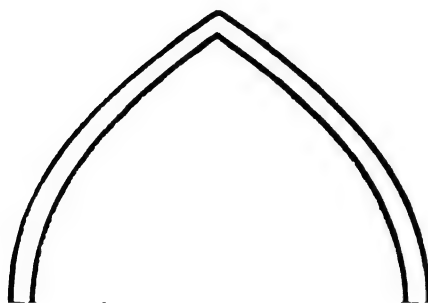
রেখাচিত্র : ১৬
কৌণিক ও ঈষৎ চাপা

করে। খিলানের বিভিন্ন প্রয়োগের মধ্যে আরও যে আকৃতি মসজিদ স্থাপত্যে দেখা যাবে, তা হচ্ছে কৌণিক অথচ ঈষৎ চাপা বা Stilted arch (রেখাচিত্র-১৬)।

৪১। ইসফাহান, মসজিদ-ই-শাহ্, গম্বুজ

৪২। দিল্লী, কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদ, খিলান

ক্রেসওয়েল এ ধরনের খিলানের উল্লেখ করেছেন মাসাত্তার প্রাসাদ, রাক্কার প্রাসাদ এবং ইবনে তুলুনের মসজিদের আলোচনা প্রসঙ্গে। উপমহাদেশের মুঘল স্থাপত্যে Stilted খিলানের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যাবে ; যেমন, সেকেন্দ্রার আকবরের সমাধিতে। যখন দুটি
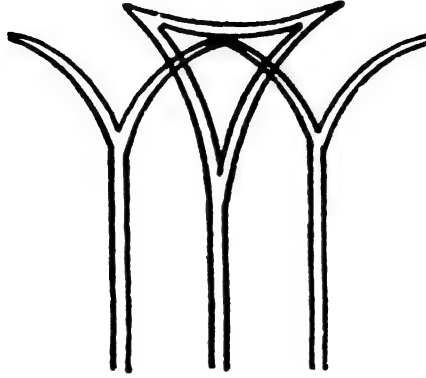
রেখাচিত্র : ১৭
পরস্পরচ্ছেদকারী খিলান

খিলান পরস্পরকে ছেদ করে তখন তাকে বলা হয় পরস্পরছেদকারী খিলান। মুসলিম স্থাপত্যে এ ধরনের উদাহবণ রয়েছে, যেমন– ভারতের বিজাপুরের জা'মি মসজিদ (সপ্তদশ শতাব্দী)। এই ইমারতে পৃথিবীর বৃহত্তম গম্বুজ নির্মাণে Intersecting arch সহায়তা করেছে (রেখাচিত্র-১৭)।

খিলান প্রসঙ্গে আরও যে সমস্ত রীতি স্থাপত্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে অধিবৃত্ত খিলান বা Parabolic ও Tudor খিলান এবং গথিক খিলান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধিবৃত্ত খিলান প্রাক্-মুসলিম যুগে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন– টেসিফোনের সাসানীয় প্রাসাদ। তাক-ই কিসরায় এ ধরনের খিলান দ্বি-বলয় অথবা চারটি বলয় থেকে সৃষ্ট নয় এবং একটু লম্বা ধরনের। পারস্যে খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে নির্মাণের পদ্ধতি হিসেবে কৌণিক খিলান প্রয়োগ করা হয় এবং এগুলোকে Elliptical arch বলা
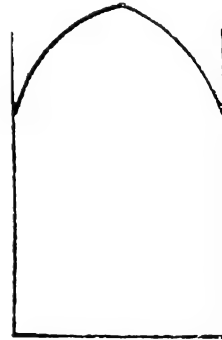
রেখাচিত্র : ১৮
ইলিপটিক্যাল খিলান
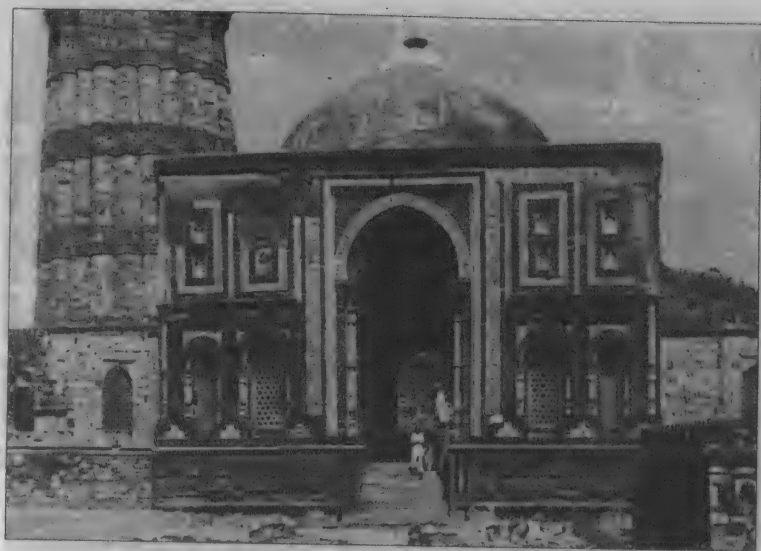
৪৩। দিল্লী, কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদ, আলাই দরওয়াজা
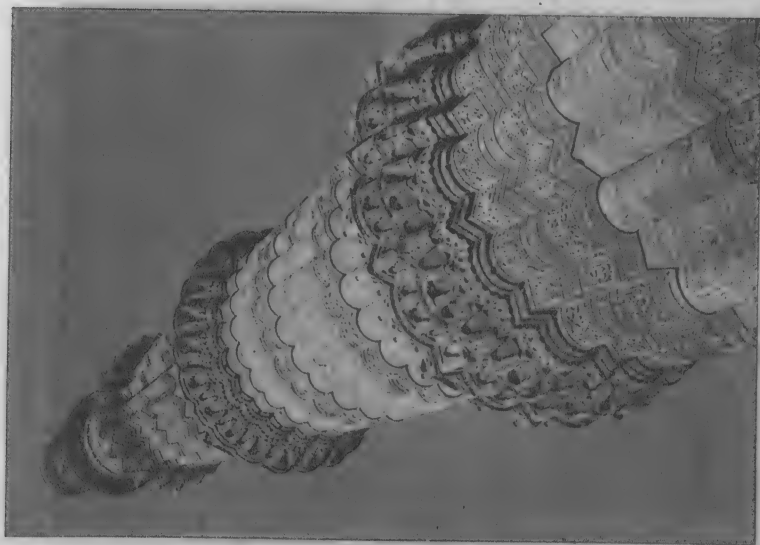
৪৪। দিল্লী, কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদ, কুতুব মিনার

হয় (রেখাচিত্র-১৮)। মুসলমানগণ এ ধরনের খিলানের পরিবর্তে দ্বিবলয় খিলানকে প্রাধান্য দেন। পারস্যের দামগান ও নায়িন মসজিদে দ্বিবলয়বিশিষ্ট কৌণিক খিলান দেখা যাবে। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে যে গথিক স্থাপত্যরীতির উদ্ভব হয় তার মূল ভিত্তি হচ্ছে কৌণিক খিলান। ইংল্যান্ডের সল্‌সবেরী গির্জায় (১২২০–৫৮ খ্রীস্টাব্দ) গথিক খিলান রয়েছে। ঈষৎ চাপা এবং দীর্ঘ এই খিলান গথিক স্থাপত্যের প্রধান উৎস। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মুসলিম স্থাপত্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত দ্বি-বলয়বিশিষ্ট কৌণিক খিলান থেকে পরবর্তীকালে ইউরোপে গথিক খিলান তথা স্থাপত্যকীর্তির উদ্ভব হয়েছে (রেখাচিত্র-১৯)। এক্ষেত্রে ইবনে তুলুনের মসজিদের অবদান অপরিসীম। গথিক খিলানের এই উৎকর্ষ যখন চরমে পৌঁছায়, তখন পঞ্চদশ শতাব্দীতে Tudor গথিক নামে চার-বলয়বিশিষ্ট একধরনের খিলানের প্রচলন হয় (রেখাচিত্র-২০)। বিশেষ করে ইংল্যান্ডে এর বহুল ব্যবহার দেখা যাবে। এই খিলানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রশস্ত span এবং এর কৌণিক রেখা খুবই স্পষ্ট। ভারতবর্ষের মুসলিম স্থাপত্যে এ ধরনের খিলানের দৃষ্টান্ত দেখা যাবে বিজাপুরের ইমারতসমূহে।
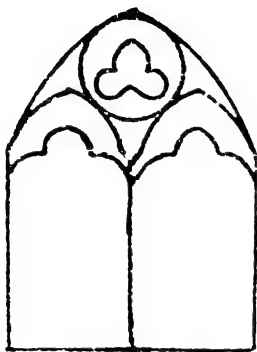
রেখাচিত্র : ১৯
গথিক খিলান

কখনও কখনও লিনটেলের উপরে একধরনের খিলান ব্যবহৃত হয়। এই খিলান প্রকৃত খিলান নয় ; কেবল অলঙ্করণের নিমিত্তে দেওয়ালে নির্মিত হয় Relieving arch, অর্থাৎ নিম্নমুখী চাপ লাঘবের জন্য সৃষ্টি করা হয় (রেখাচিত্র-২১)। মুসলিম স্থাপত্যের বহু ইমারতে এর প্রয়োগ দেখা যাবে। যেমন কুব্বাত আস-সাখরার প্রবেশদ্বারে, ইবনে তুলুনের মসজিদের মিনারের চারিপাশে চতুষ্কোণাকার প্রাচীরে।

খিলান যখন দেওয়ালের কুলুঙ্গীর কাজ করে এবং কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগে না তখন তাকে বলা হয় decorated arch বা অলঙ্কৃত খিলান।
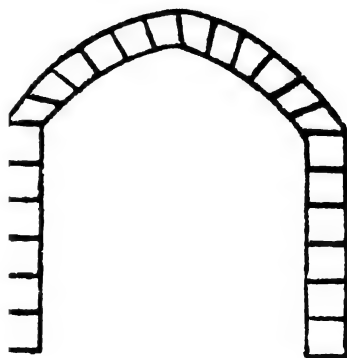
রেখাচিত্র : ২০
টিউডর গথিক
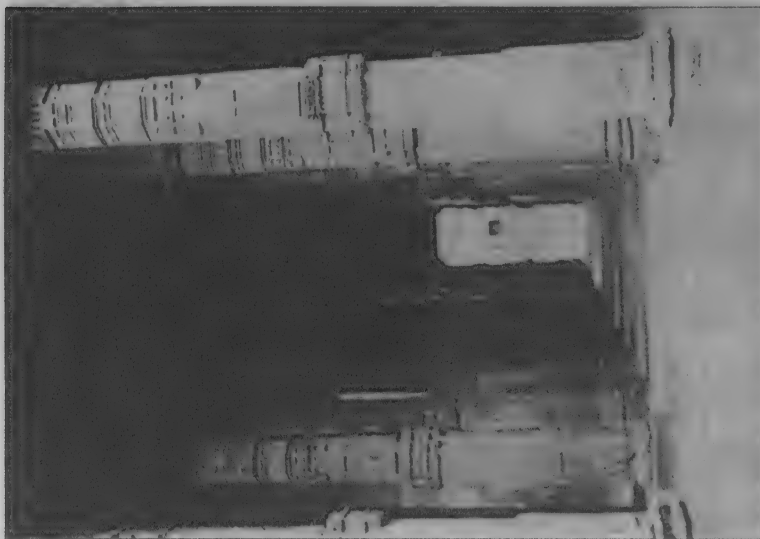
৪৫। আজমীর, আড়াই-দিন-কা ঝোপড়া মসজিদ
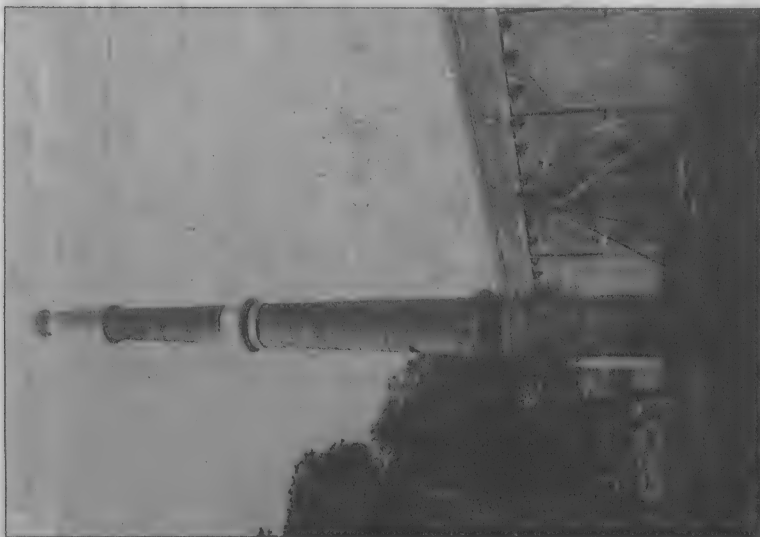
৪৬। বিয়ানা, উখা মসজিদ ও মিনার

কতকগুলো খিলান পাশাপাশি স্থাপিত হলে যে খিলানরাজির সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় Arcade অর্থাৎ খিলানসারি (রেখাচিত্র-২২)। একই স্তরে এবং একই আকারের খিলান দ্বারা খিলানসারি নির্মাণ করা হয়। ইমারত নির্মাণে সাধারণত দুই ধরনের স্তম্ভ ব্যবহার করা হয়। এক শ্রেণীকে বলে pier অর্থাৎ আয়তাকার অথবা চতুষ্কোণাকার স্তম্ভ, অন্যটিকে বলা হয় গোলাকার স্তম্ভ বা Column (রেখাচিত্র-২৩)। Pier অথবা column থেকে খিলানসারি নির্মাণ করা হয় এবং column (রেখাচিত্র-২৪)-এ বিভিন্ন অংশ থাকে, যেমন—ভিত্তিমূল বা base, মধ্যবর্তী অংশ বা shaft, শীর্ষদেশ বা capital। Capital-এর উপরে কখনও কখনও impost বা একটি পাথরের খণ্ড স্থাপন করা হয়ে থাকে। Impost-এর উপর থেকে খিলান সৃষ্টি করা হয়। কুব্বাত-আস-সাখরায় প্রথম অষ্টভুজাকৃতি খিলানে এ ধরনের স্তম্ভ দেখা যাবে। গ্রীক স্থাপত্যে গোলাকার স্তম্ভের বিভিন্ন প্রকরণ রয়েছে। বিশেষ করে তিনটি বহুলপরিচিত রীতি হচ্ছে Doric, Ionic এবং Corinthian। এগুলো গ্রীক স্থাপত্যে order বা শ্রেণী

রেখাচিত্র : ২১
নিম্নমুখী চাপরোধকারী খিলান
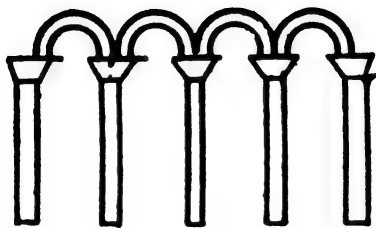
রেখাচিত্র : ২২
খিলানসারি (Arcade)

নামে অভিহিত। সর্বপ্রথম রীতি হচ্ছে Doric। 'ডোরিক' স্তম্ভে প্রধানত তিনটি অংশ থাকে। ভিত্তিভূমি বা stybolate, মধ্যবর্তী গোলাকার স্তম্ভ বা shaft এবং শীর্ষদেশ বা
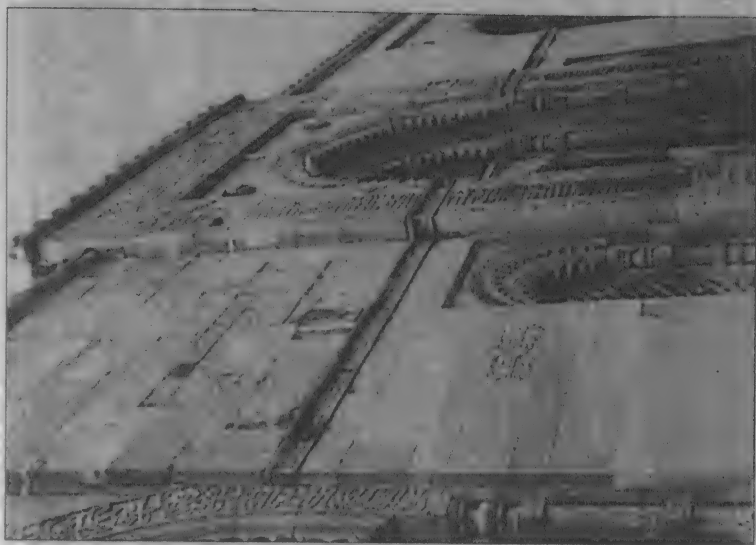
৪৭। দিল্লী, জামাতখানা মসজিদ

৪৮। দিল্লী, কালান মসজিদ

capital। এ ধরনের স্তম্ভের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গোলাকার মাঝের অংশটি নিচ থেকে উপরের দিকে সরু হয়ে গেছে (taper) এবং shaft-টিতে লম্বালম্বি ঘনঘন খাঁজ কাটা
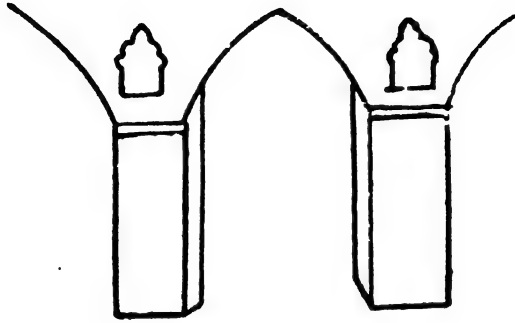
রেখাচিত্র : ২৩
আয়তাকার (pier) স্তম্ভ

রয়েছে (রেখাচিত্র-২৫)। এর্জিনায় নির্মিত Aphaia-র (খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী) মন্দির অথবা সমসাময়িক এক্রোপলিসের Propylaea-মন্দিরে ডোরিক স্তম্ভের ব্যবহার খুবই আকর্ষণীয়। দ্বিতীয় রীতি Ionic নামে সুপরিচিত। এই ধরনের স্তম্ভের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, Doric রীতির অনুকরণ হলেও শীর্ষদেশ অর্থাৎ capital-এর আকৃতি ভিন্ন প্রকৃতির। Ionic স্তম্ভের প্রধান রীতি ও কৌশল হচ্ছে শীর্ষদেশের চার-পাশে চারটি কুণ্ডলাকৃতির (volutes) নক্শা (রেখাচিত্র-২৬)। ইউফিসাসের আর্টমিসের মন্দিরে (খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী) অথবা এক্রোপেলিসে 'নিকের' মন্দিরে Ionic স্তম্ভ দেখা যাবে। সর্বশেষ শ্রেণীটির নাম হচ্ছে Corinthian (রেখাচিত্র-২৭)।
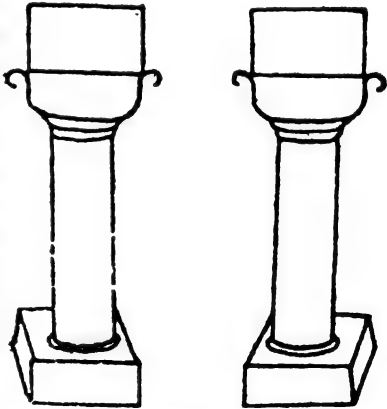
রেখাচিত্র : ২৪
গোলাকার (column) স্তম্ভ

খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম দশকে করিছে এই রীতির উদ্ভব হয় এবং গ্রীক স্থাপত্যে করিন্থীয় রীতি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। রোমীয় স্থাপত্যে এবং মুসলিম স্থাপত্যকলায় করিন্থীয় স্তম্ভের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। এথেন্সের জিয়ুসের মন্দির এবং Bassae-এ এপোলো দেবতার মন্দির করিন্থীয় স্তম্ভের
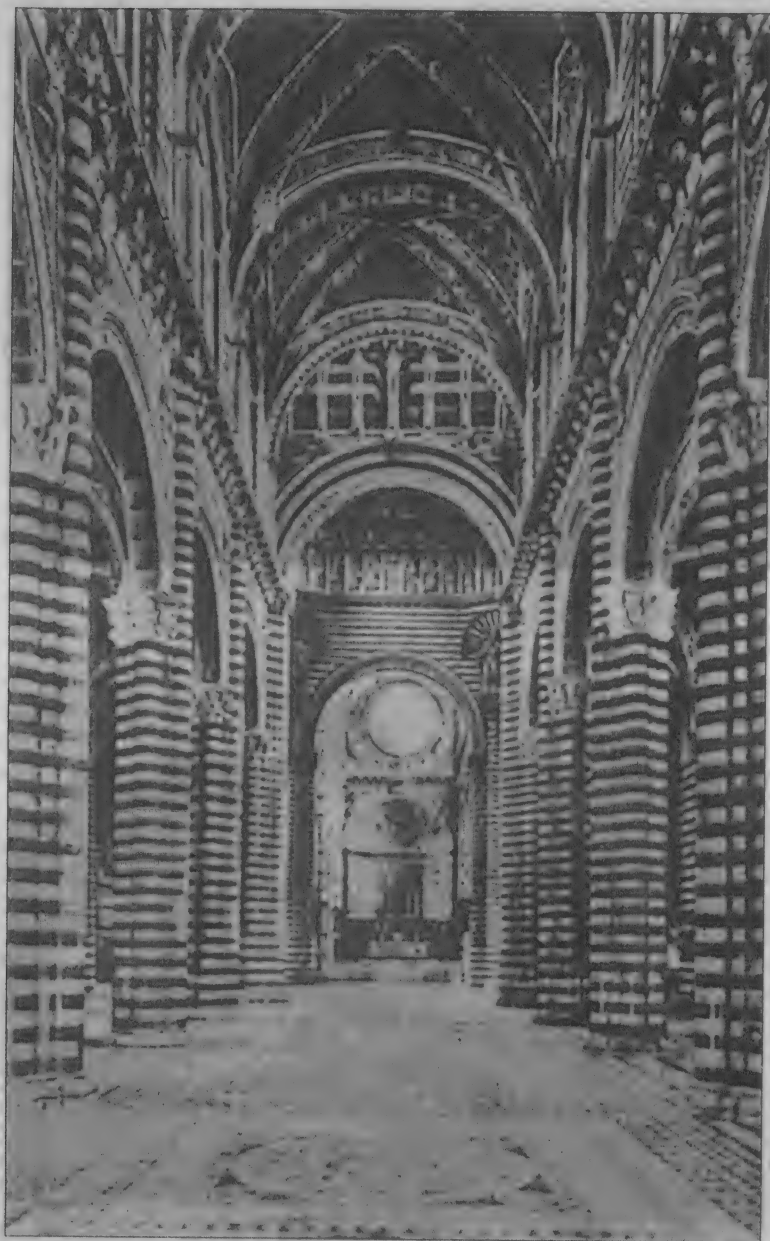
৪৯। সিয়েনা গীর্জা

সাহায্যে নির্মিত হয়। এই স্তম্ভের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, করিন্থে যে কুণ্ডলাকৃতির লতাপাতা পাওয়া যায় তার প্রতিফলন এই স্তম্ভের শীর্ষদেশে লক্ষ করা যাবে। কুব্বাত আস-সাখরা, দামেস্কের মসজিদ ও কর্ডোভা মসজিদে করিন্থীয় স্তম্ভের দৃষ্টান্ত দেখা যাবে।[১]
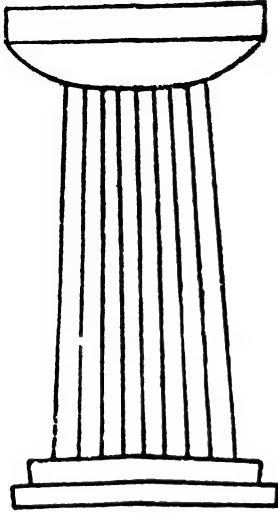
রেখাচিত্র : ২৫
ডোরিক (Doric) স্তম্ভ

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থাপত্যকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইমারত ছাদ দ্বারা আবৃত করার সমস্যা সর্বাপেক্ষা গুরুতর। এই সমস্যা প্রধানত তিনটি উপায়ে সমাধান করা হয়ে থাকে, যথা সমান্তরালভাবে কাঠ বা পাথরের লিনটেল ব্যবহারে, গম্বুজ এবং ভল্ট দ্বারা। স্তম্ভের উপর যখন সমান্তরাল ছাদ ন্যস্ত থাকে তখন সেই ইমারতকে hypostyle অর্থাৎ স্তম্ভরাজি দ্বারা নির্মিত ইমারত বলা হয়। প্রাচীন মিশরীয় মন্দির (কারনাক) এবং গ্রীক মন্দিরে (এজিনার Temple of Aphaia খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী) এ ধরনের স্তম্ভরাজি দেখা যাবে।

ইমারতকে ছাদ দ্বারা আবৃত করাই স্থপতির প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমান্তরাল ছাদ ছাড়াও গম্বুজ বা ভল্টের সাহায্যে সমাধান করা হয়েছে। সাধারণত চতুষ্কোণাকার এলাকায় গম্বুজ এবং আয়তাকার ইমারতের উপর ভল্ট ব্যবহার হয়ে থাকে। গম্বুজ সাধারণভাবে অর্ধবৃত্তাকার (hemispherical) হয়ে থাকে। চতুষ্কোণের চার কোণায় বিশেষ পদ্ধতিতে একপ্রকার উপাদান সংযোগ করে অষ্টভুজাকারে আনা হয় ; অষ্টভুজ থেকে abutment অথবা একখণ্ড পাথর দিয়ে ষোল কোণায় রূপান্তরিত করা হয় এবং এই ষোল কোণা থেকে অর্ধবৃত্তাকারে আনার পর গম্বুজ নির্মিত হয় (রেখাচিত্র-৩১)। যে পদ্ধতিতে গম্বুজ নির্মিত হয় তা হচ্ছে (ক) pendentive (রেখাচিত্র-২৯) এবং (খ) squinch বা স্কুইঞ্চ। চতুষ্কোণের প্রতিটিতে ত্রিকোণাকার যে এলাকা রয়েছে তাকে spherical pendentive বলা হয়।

---

১. এ ছাড়া সমন্বিত স্তম্ভ বা composite column-এর ব্যবহার রয়েছে। যখন Ionic শ্রেণীর কুণ্ডলাকৃতি বোঁটা volute করিন্থীয় শ্রেণীর করিন্থ গাছের লতাপাতার সংমিশ্রণ হবে শীর্ষদেশে, তখন তাকে composite স্তম্ভ বলা হয়। এথেন্সের অলিম্পিয়ান জিয়ুসের মন্দিরে (খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী) এ ধরনের শীর্ষদেশ স্তম্ভের অগ্রভাগে দেখা যাবে। কমপোজিট ক্যাপিটাল কুব্বাত আস-সাখরায় ব্যবহৃত হয়েছে।
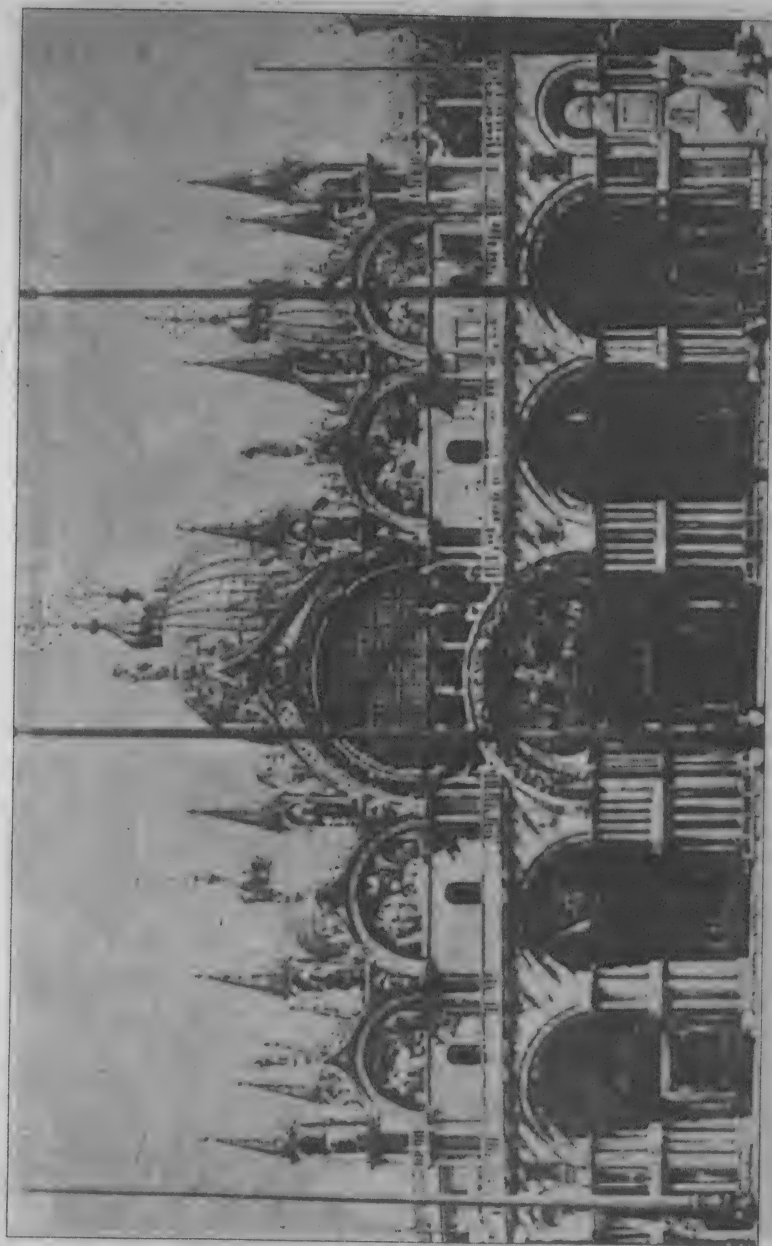
৫০। ভেনিস, সেন্টমার্কের গীর্জা
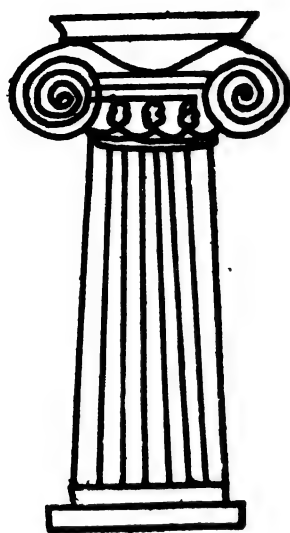
রেখাচিত্র : ২৬
আয়ওনিক (Ionic) স্তম্ভ

কখনও কখনও pendentive-এর স্থলে একধরনের ক্ষুদ্রাকার খিলান ব্যবহার করা হয়। এগুলো squinch খিলান নামে পরিচিত। বায়জানটাইন স্থাপত্যের গৌরব ইস্তাম্বুলের সেন্ট সোফিয়া গির্জায় triangular pendentive-এর সাহায্যে গম্বুজ নির্মিত হয়েছে (খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী)। মুসলিম স্থাপত্যে সম্ভবত কুসাইর আমরার প্রাসাদে (৭১১–১৫ খ্রীঃ) সর্বপ্রথম spherical-triangle pendentive ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী পর্যায় হাম্মাম আস-সারখ ও উখাইদির ছাড়াও মুসলিম স্থাপত্যের প্রায় সমস্ত রীতিশৈলীতে pendentive ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়। ত্রিকোণাকার pendentive-এর স্থানে squinch-এর ব্যবহার গম্বুজ নির্মাণকে ব্যাপকতা দান করেছে (রেখাচিত্র-৩০)। ক্রেসওয়েল কালাত সিমানে নির্মিত সেন্ট সাইমিওনের গির্জায় চারটি স্কুইঞ্চের সাহায্যে চতুষ্কোণকে অষ্টভুজে রূপান্তরিত করার কথা বলেন। বায়জানটাইন রীতি ছাড়াও পঞ্চম শতাব্দীতে সাসানীয় প্রাসাদে বিশেষ করে সার্বিস্তানে স্কুইঞ্চের ব্যবহার ছিল। মুসলিম স্থাপত্যে স্কুইঞ্চের সার্বজনীন ব্যবহারে অসংখ্য গম্বুজ নির্মাণের পথ সুগম হয়। দামেস্কের মসজিদ, সুসার মসজিদ, কায়রোয়ান মসজিদে স্কুইঞ্চের ব্যবহার ছিল। এ প্রসঙ্গে ক্রেসওয়েলের উদ্ধৃতি দেওয়া যায় :

"The earliest existing squinches in Islam, a feature followed from Sasanian Persia, dated from this period : e.g, Ukhaidir, 778 ; Samarra, 836 ; Great Mosque of Susa, 850; Great Mosque of Qairawan as altered in 862-3 ; and the Great Mosque of Tunis, 1864."

রেখাচিত্র : ২৭
করিন্থীয় (Corinthian) স্তম্ভ
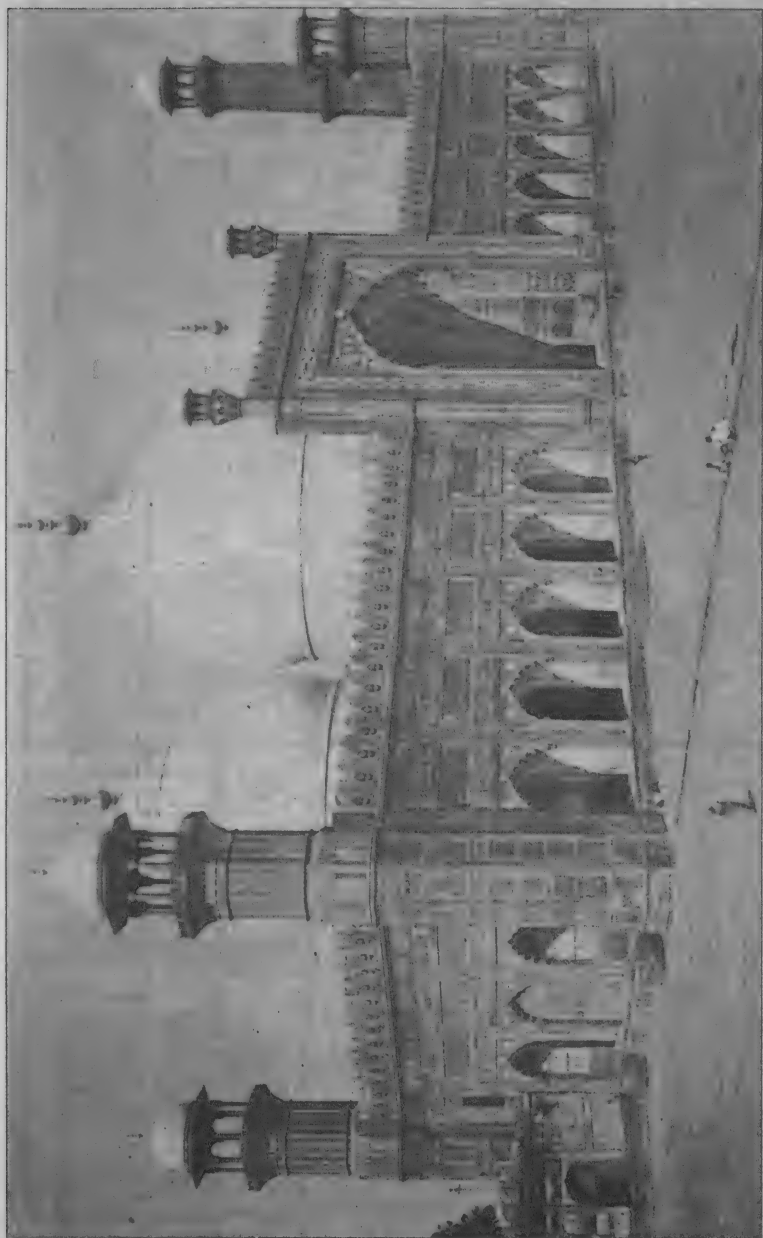
৫১। লাহোর, বাদশাহী মসজিদ

গম্বুজের আকৃতি বিভিন্ন রকমের হতে পারে এবং গম্বুজ বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠিত। ছাদের উপর যে অংশে গম্বুজটি স্থাপিত তাকে বলে ড্রাম (drum)। এর উপরে
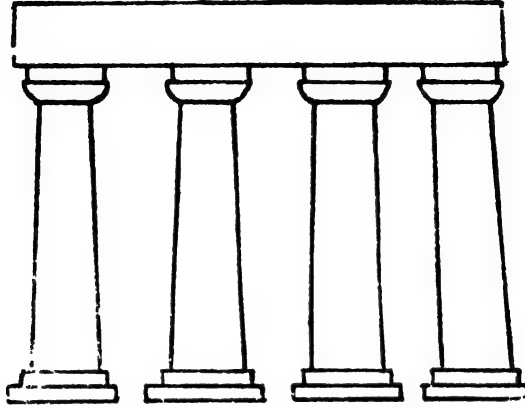
রেখাচিত্র : ২৮
স্তম্ভরাজি দ্বারা নির্মিত ইমারত

নক্‌শা করা প্যারাপেট থাকতে পারে। গম্বুজটি একেবারে সাধারণ ও চ্যাপটা হতে পারে; আবার খাঁজকাটা বা fluted হতে পারে (রেখাচিত্র-৩২)। Fluted গম্বুজের
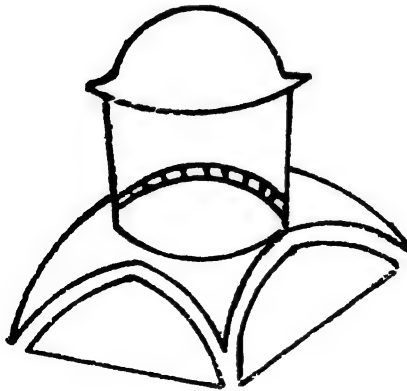
রেখাচিত্র : ২৯
পেনডেনটিভ (Pendentive)

৫২। ব্রাইটন, ইংল্যান্ড, রয়াল প্যাভিলিয়ন

৫৩। সলসবেরী, ইংল্যান্ড, গীর্জা

নিদর্শন মুসলিম স্থাপত্যে অসংখ্য রয়েছে ; বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কুব্বাত আস-সাখরা, কায়রোয়ান মসজিদ, কায়রোর সানজারের সমাধি, সামরকন্দে আমির তৈমুরের সমাধি, দিল্লীর দুর্গের আওরঙ্গজেবের মতি মসজিদ ইত্যাদি।
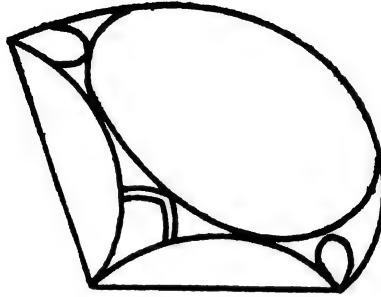
রেখাচিত্র : ৩০
স্কুইঞ্চ (Squinch)

গম্বুজের শীর্ষে যে উপাদান থাকে তাকে বলে চূড়া বা finial। বিভিন্ন ইমারতে বিভিন্ন রকমের চূড়া ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন—কুব্বাত আস-সাখরায়, তুরস্কের মসজিদে ও বিজাপুরের মসজিদে একফালি চাঁদের আকৃতিতে (Crescent finial) সৃষ্টি করা হয় (রেখাচিত্র-৩৩)। আবার বাংলাদেশের মসজিদে কলসের finial দেখা যাবে।
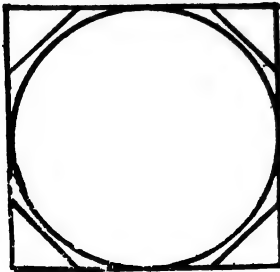
ড্রাম গম্বুজের উচ্চতা বৃদ্ধি করে ও ইমারতের সামঞ্জস্য বজায় রাখে। গম্বুজ দুই প্রকারের : এক আবরণ (single shell)-বিশিষ্ট, যা সচরাচর সর্বত্র লক্ষ করা যাবে ; রোমান ও বায়জানটাইন গম্বুজ এক আবরণের। মুসলিম ইমারতের প্রায়ই গম্বুজ এ ধরনের কিন্তু ব্যতিক্রমধর্মী গম্বুজ হচ্ছে দ্বি-গম্বুজ। পরপর দুটি আবরণ সম্পূর্ণরূপে পৃথকভাবে একই ভিত্তিমূল থেকে যখন নির্মিত হয়ে গম্বুজ সৃষ্টি করা হয়, তখন তাকে দ্বি-গম্বুজ বলে। এই গম্বুজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, দুটি আবরণের মাঝে খালি জায়গা (vaccuum)

রেখাচিত্র : ৩১
গম্বুজ নির্মাণ পদ্ধতি
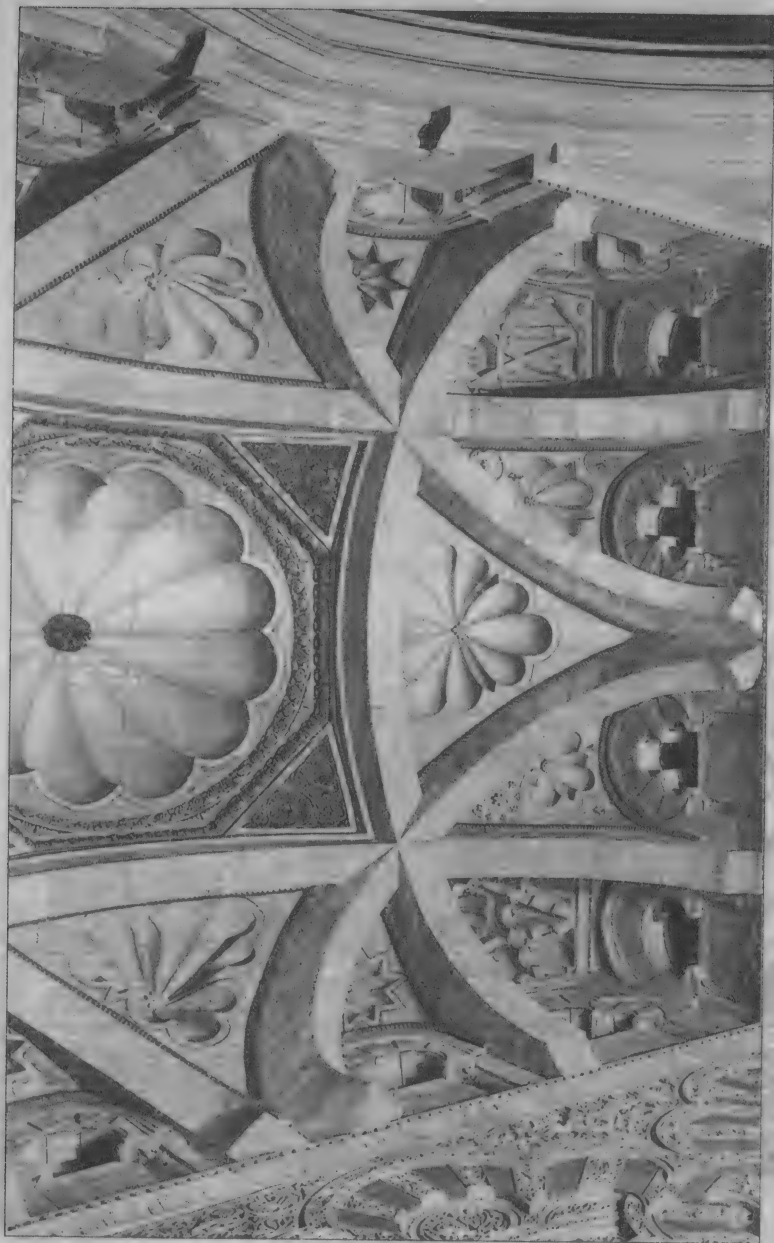
৫৪। গ্রানাডা, আল-হামরা প্রাসাদ, ছাদ
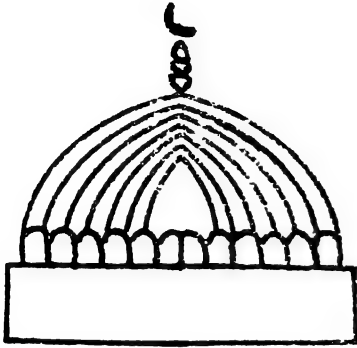
রেখাচিত্র : ৩২
গম্বুজ ও ড্রাম

রয়েছে এবং প্রয়োজেন একটি দরজার মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে সর্বপ্রথম দ্বি-গম্বুজের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে কুব্বাত আস-সাখরায় (রেখাচিত্র-৩৪)। পরবর্তী পর্যায়ে একই রীতিতে গম্বুজ নির্মিত হয় তুসের আমির তৈমুরের সমাধিতে, দিল্লীর হুমায়ুনের সমাধিতে এবং আগ্রার তাজমহলে। ইমারতের ছাদে কখনও কখনও খিলানের উপর নির্মিত এবং গম্বুজাকৃতি ক্ষুদ্রাকার প্যাভেলিয়ান দেখা যাবে। সাধারণত kiosk নামে পরিচিত এই সমস্ত অলঙ্করণ-রীতির মূল উদ্দেশ্য সৌন্দর্যবৃদ্ধি। Kiosk-এর ছাদে যে ছোট আকারের গম্বুজ স্থাপিত হয়, তা পরিভাষায় cupola নামে পরিচিত (রেখাচিত্র-৩৫)।

আয়তাকার ইমারতে ছাদ দ্বারা আবৃত করা যায় ভল্টের সাহায্যে। ভল্টের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে খিলানাকৃতি ছাদ হিসেবে যা ইট, পাথর বা মার্বেলে তৈরি। ভল্ট সাধারণত দুই ধরনের হয় : (ক) tunnel অথবা wagon ভল্ট ; (খ) গ্রন্থিযুক্ত ভল্ট অথবা groin vault। আপাতদৃষ্টিতে ভল্ট খিলানরাজির সম্প্রসারণ বলে মনে হবে। পাশাপাশি দুটি প্রাচীর থেকে ভূসুয়ার্স পদ্ধতিতে পরপর অসংখ্য খিলান সৃষ্টি করলেই একত্রিতভাবে তা tunnel ভল্টে পরিণত হবে। এ ধরনের ভল্টে ছাদ স্বভাবত ঢালু (curved) থাকে এবং নিম্নমুখী চাপ ব্যাহত করার জন্য খুব দৃঢ় করে প্রাচীর তৈরি করা হয়। রোমান ভল্ট সর্বজনবিদিত এবং পরবর্তীকালে বায়জান-টাইন, সাসানীয় ও মুসলিম স্থাপত্যে এর ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। তেসিফোনের (মাদাইন)-এ 'তাক-ই-কিসরা' সাসানীয় ভল্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন (রেখাচিত্র-৩৬)। মুসলিম আমলে কুসাইর আমরা, হাম্মাম আস-সারখ, কাসর আল-হাইর প্রভৃতি
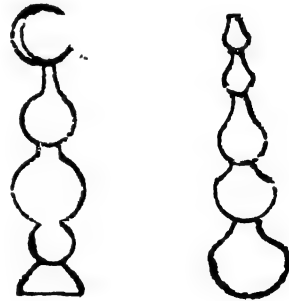
রেখাচিত্র : ৩৩
অর্ধচন্দ্রিমা চূড়া ও কলস চূড়া

৫৫। গ্রানাডা, আল-হামরা প্রাসাদ

ইমারত ছাড়াও অসংখ্য মসজিদে ভল্টের ব্যবহার রয়েছে, যেমন— উখাইদির, দামগানের তারিখখানা, সুসার বু ফাতাতা ও জা'মি মসজিদ। এ ছাড়া উপমহাদেশের অনেক
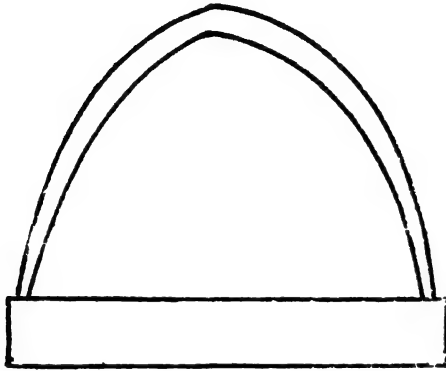
রেখাচিত্র : ৩৪
দ্বি-গম্বুজ (Double-dome)

মসজিদে, যেমন— গুলবার্গের জা'মি মসজিদে, মালদা জেলার বড় পাণ্ডুয়ায় আদিনা মসজিদের টানেল ভল্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। টানেল ভল্ট ব্যতীত গ্রন্থিযুক্ত. অথবা ribbed ভল্টের প্রয়োগ দেখা যাবে। আদিনা মসজিদের লিওয়ানের মধ্যবর্তী স্থানে 'নেভ'-এ গ্রন্থিযুক্ত ভল্ট বা শিরাযুক্ত (ribbed) ভল্ট ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রোমানেস্ক স্থাপত্য, বিশেষ করে ফ্রান্সের বারগন্ডি অঞ্চলে Vezelayতে নির্মিত Sainte Madeleine গির্জায় (১০৮৯–১২০৬ খ্রীঃ) এ ধরনের ribbed ভল্ট দেখা যাবে (রেখাচিত্র-৩৭)। পরস্পর দুটি গ্রন্থি বা rib যখন ছেদ করে এবং তার সাহায্যে ভল্ট নির্মিত হয় তখন তাকে cross অথবা groin ভল্ট বলা হয়। গথিক স্থাপত্যে cross ভল্টের ব্যাপক প্রয়োগ ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, Amiens-এর গির্জা (ত্রয়োদশ শতাব্দী) ও ইটালীর Assisi-তে সেন্ট ফ্রানসিসের গির্জা (ত্রয়োদশ শতাব্দী) (রেখাচিত্র-৩৮)।
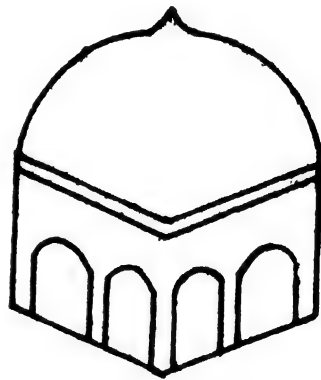
রেখাচিত্র : ৩৫
কিয়স্ক (Kiosk)
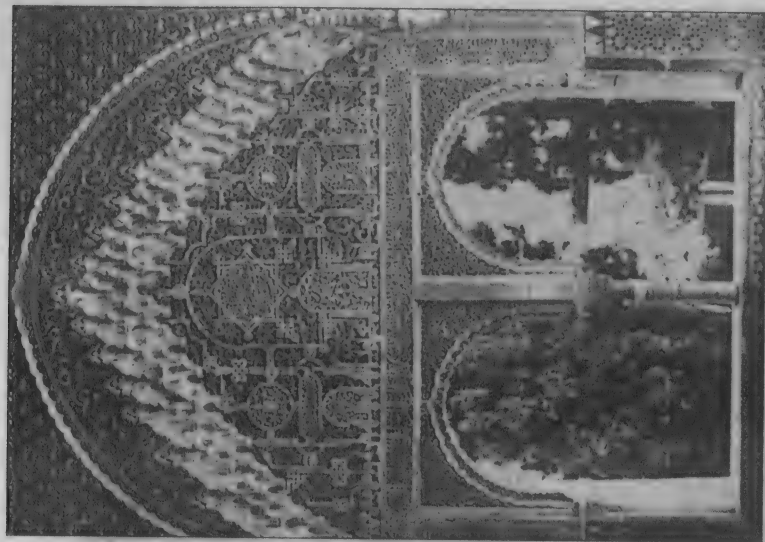
৫৭। পালের্মো, সিসিল, পালাটিনা চ্যাপেল, স্টালাকটাইট

৫৬। গ্রানাডা, আল-হামরা প্রাসাদ, রাণীর কক্ষ, স্টালাকটাইট
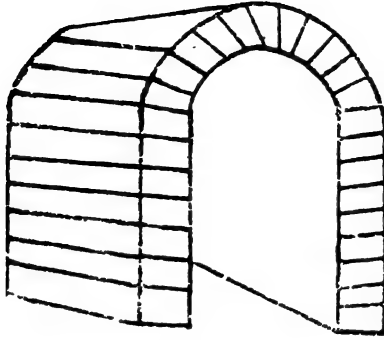
রেখাচিত্র : ৩৬
টানেল ভল্ট (Tunnel vault)

মুসলিম স্থাপত্যে অনেক পূর্বেই cross ভল্টের ব্যবহার প্রচলিত হয়, যেমন– কুসাইর আমরা (অষ্টম শতাব্দী) ও রাক্কার বাগদাদ ফটকে (অষ্টম শতাব্দী)। প্রাক্-মুসলিম যুগের বাংলার মসজিদেও এর প্রয়োগ দেখা যাবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত গৌড়ের চামকাটি এবং লোটন মসজিদের বারান্দা। Cross ভল্ট নির্মাণে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে দুটি লম্বালম্বি ও সমান্তরাল ভল্ট যখন পরস্পরকে মাঝখানে ছেদ করবে তখনই cross ভল্টের সৃষ্টি হবে (রেখাচিত্র-৩৯)। অল্পপরিসর এলাকায় সাধারণ টানেল ভল্ট ব্যবহার করা যায়, কিন্তু বৃহত্তম স্থানে cross ভল্ট নির্মাণ করা হয়।
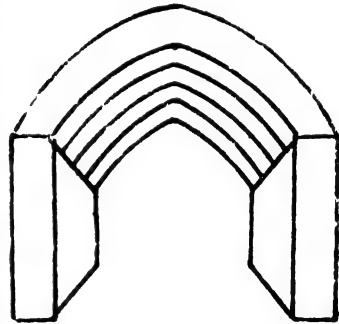
রেখাচিত্র : ৩৭
শিরাযুক্ত ভল্ট (Ribbed vault)

মুসলিম স্থাপত্যে গ্রীক, রোমীয়, বায়জানটাইন ও সাসানীয় প্রভাব অনস্বীকার্য এবং এই সমস্ত প্রাচীন স্থাপত্য-কীর্তির বহু উপাদান মুসলিম স্থাপত্যে প্রয়োগ হয়েছে। একটি গ্রীক স্তম্ভের বিভিন্ন অংশ থাকে, যা বায়জানটাইন প্রভাবিত আদি মুসলিম ইমারতে, যেমন– কুব্বাত আস-সাখরা, দামেস্ক মসজিদ, আল-আক্সা মসজিদ প্রভৃতিতে লক্ষণীয়। স্তম্ভের ভিত্তি হচ্ছে Stybolate ; এর দুটি অংশ : মূলভিত্তিকে বলে base, তার উপরে pedestal ; Stybolate-এর উপর দণ্ডায়মান থাকে স্তম্ভ বা column। স্তম্ভের দ্বিতীয় অংশে রয়েছে
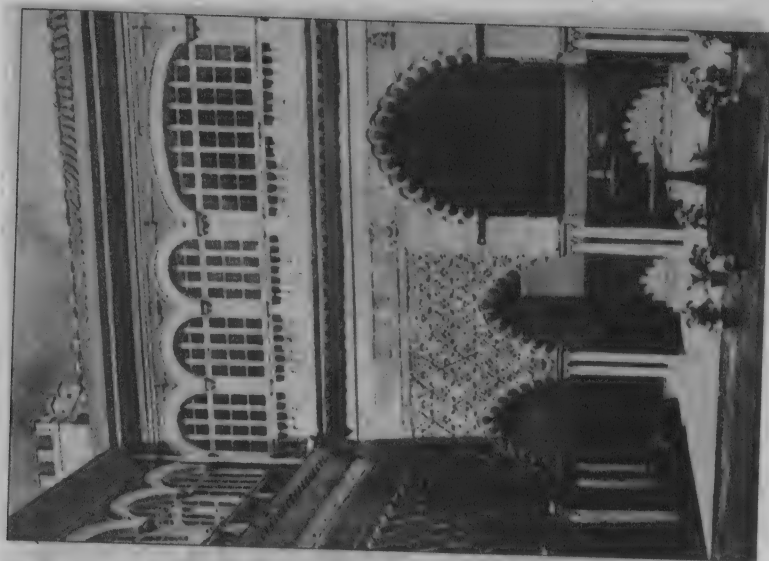
৫৮। সেভিল, আল-কাযার, কুমারীদের চত্বর
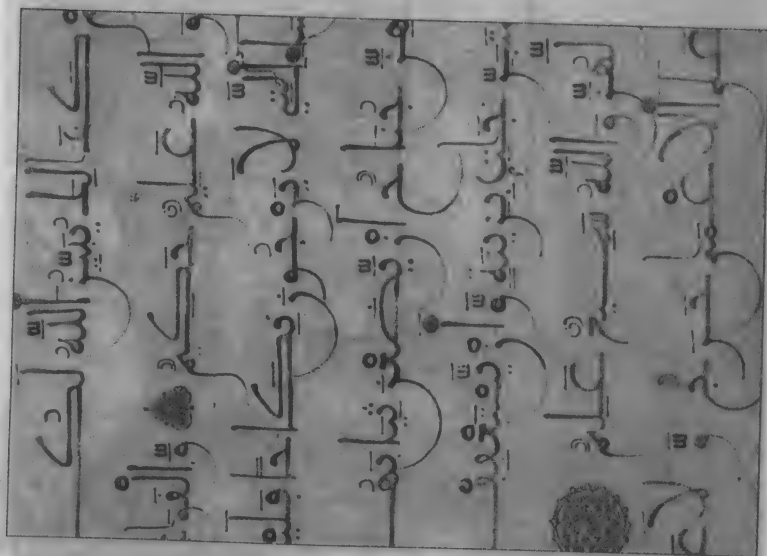
৫৯। সেভিল, হস্তলিপি শিল্প

shaft বা মধ্যমাংশ ; এই অংশে কখনও কখনও খাঁজকাটা বা fluting দেখা যাবে এবং খাঁজের খাড়া রেখাকে entasis বলা হয়। Shaft-এর উপরের অংশ অর্থাৎ

রেখাচিত্র : ৩৮
ক্রস বা গ্রইন ভল্ট : ভেতরের দিকে
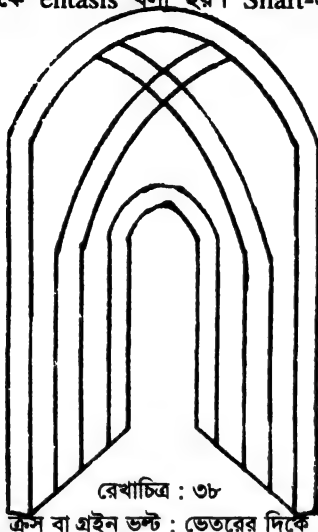
স্তম্ভের শীর্ষদেশকে বলে capital। শীর্ষদেশ তিন অংশে বিভক্ত, যথা নিচের অংশ necking, মাঝের অংশ echinus এবং উপরের অংশ abacus। Capital-এর
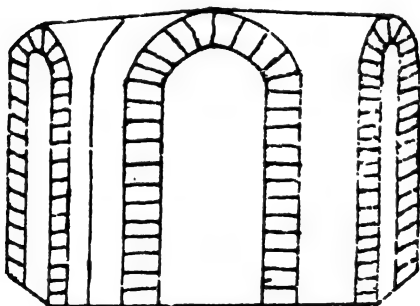
রেখাচিত্র : ৩৯
ক্রস ভল্ট : বাইরের দিকে

উপরের অংশকে বলে entablature ; এর তিনটি অংশ architrave, impost এবং frieze (রেখাচিত্র-৪০)। ফ্রিজের উপরে ত্রিকোণাকার ছাদের যে অংশ দেখা যাবে

৬০। তুরস্ক, মসজিদে ব্যবহৃত ঝাড়বাতি

তাকে বলে pediment। ছাদে pediment থেকে যে অংশ ঢালু হয়ে বিস্তৃত থাকে তাকে cornice বা কার্নিশ বলা হয়।
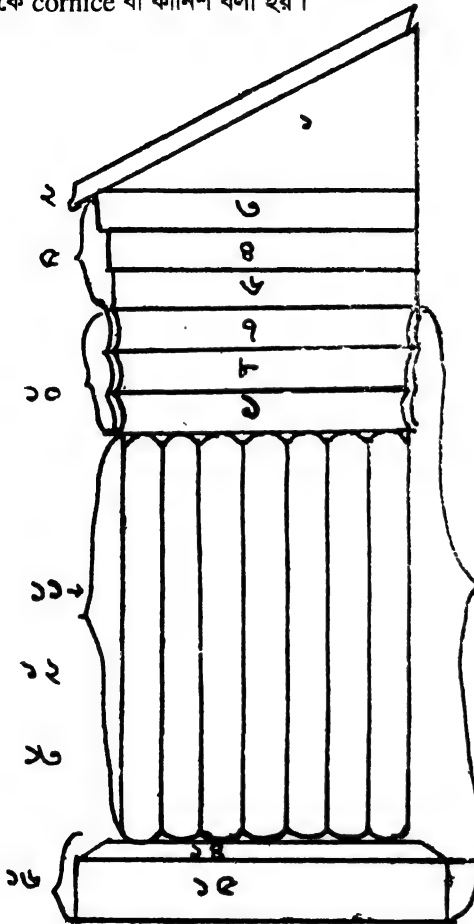
রেখাচিত্র : ৪০
গ্রীক স্তম্ভের বিভিন্ন অংশ

ছাদের নির্মাণকৌশল প্রসঙ্গে gable অর্থাৎ ঢালু ছাদের কথা এসে যায়। ঢালু ছাদ সৃষ্টি করা হয় দুটি সমান্তরাল প্রাচীর থেকে দুটি অংশে। প্রাচীন গ্রীস, রোম, বায়জানটাইন এমনকি গথিক, রোমানেস্ক ও রেনেসাঁ স্থাপত্যে ধর্মমন্দিরে gable ছাদ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ (রেখাচিত্র-৪১)। এথেন্সের এক্রোপলিসের Parthenon-এর মন্দিরে (খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী) ফিড়িয়াসের সৃষ্ট gable ছাদে আদি ও চমৎকার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যাবে। মুসলিম স্থাপত্যে ঢালু ছাদের প্রয়োগ অস্বাভাবিক ছিল না। দামেস্ক

৬১। গ্রানাডা, আল-হামরা প্রাসাদ, টালীর অলঙ্করণ

মসজিদ, আল-আকসার মসজিদ, কর্ডোভা মসজিদ ছাড়াও বাংলাদেশের অনেক ইমারতের অংশবিশেষ চালাঘরের অনুকরণে ছাদ তৈরি হয়েছে। গৌড়ের ফতেহ্ খানের সমাধিতে সর্বপ্রথম দুটি চালা দ্বারা নির্মিত হয় ঢালু ছাদ। প্রাকৃতিক কারণে এ ধরনের ছাদ নির্মিত হয়ে থাকে। দো-চালা ছাড়া চার-চালার ছাদও বিশেষভাবে স্থপতিদের কাছে আকর্ষণীয় (রেখাচিত্র-৪২, ৪৩)। চারটি চালার সমন্বয়ে গঠিত এই ছাদ বাগেরহাটের তথাকথিত ষাট গম্বুজ, গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ ও দারাসবাড়ী মসজিদ প্রভৃতি ইমারতে দেখা যাবে। কোনো ইমারত স্তম্ভরাজি দ্বারা বিভক্ত হলে খিলানপথ বা সমান্তরাল সারির সৃষ্টি হয়। বায়জানটাইন গির্জার অভ্যন্তরে দুই ধরনের সারি দেখা যাবে : (ক) আইল বা সমান্তরাল খিলানপথ, (খ) 'বে' (bay) বা লম্বালম্বি স্তম্ভ পথ বা খিলানপথ। সাধারণত গির্জা বা মসজিদ কয়েকটি আইল-এ বিভক্ত হয়। 'বে'-এর ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য এবং মধ্যবর্তী 'বে'-কে 'নেভ' (nave) বলা হয় (রেখাচিত্র-৪৪)। ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাভেন্নার গির্জায় 'বে'
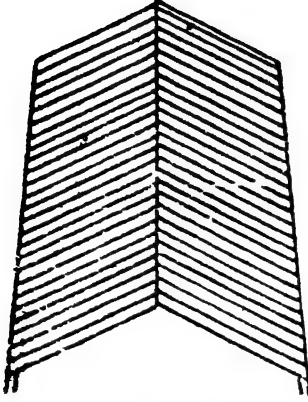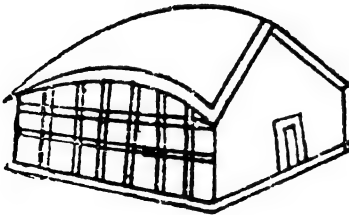
রেখাচিত্র : ৪১
ঢালু ছাদ (gable)
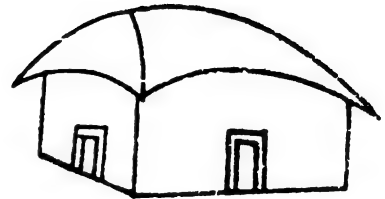
রেখাচিত্র : ৪২
দো-চালা ঘর

রেখাচিত্র : ৪৩
চার-চালা ঘর

এবং 'নেভ'-এর দৃষ্টান্ত দেখা যাবে। সাধারণত মসজিদে 'বে' এবং 'নেভ' কিবলার দিকে প্রসারিত (রেখাচিত্র-৪৫)। কখনও কখনও 'আইল' ও 'নেভ' একত্রে দেখা যাবে অর্থাৎ

৬২। গোয়াদালাজারা, প্রাসাদ
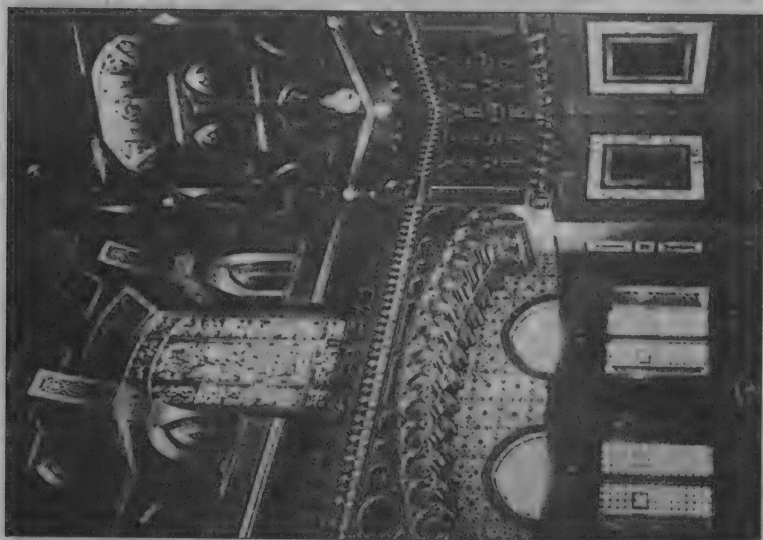
৬৩। কার্তিক, আরব কক্ষ

আইলকে নেভ দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করা হয়, যেমন—দামেস্কের মসজিদ ও কাসর আল-হাইরের মসজিদ। বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ প্রভৃতি দৃষ্টান্তে 'আইল' ও 'নেভ'-এর সমন্বয় হয়। গম্বুজ অথবা ঢালু ছাদ নির্মাণের সুবিধার্থে আইলকে 'নেভ' দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করা হয়।

রেখাচিত্র : ৪৪
'বে' (Bay) ও 'নেভ' (Nave)
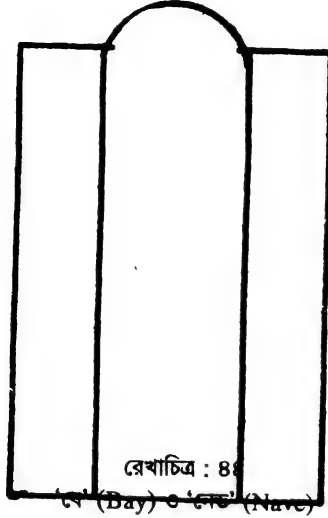
ইমারতের সংরক্ষণের জন্য প্রাচীরে একধরনের ঠেস বা support ব্যবহৃত হয়। দুর্গে প্রতিরক্ষার জন্য যেগুলো নির্মিত হয় সেগুলোকে bastion বলা হয়। সাধারণত এ

রেখাচিত্র : ৪৫
মসজিদের 'আইল' ও 'নেভ'
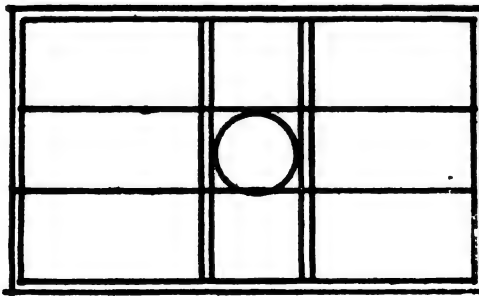
সমস্ত উপাদান দুর্গের মাঝে মাঝে দেওয়াল থেকে অর্ধবৃত্তাকারে নির্মিত হয়। এ ছাড়া গোলাকার অথবা আয়তাকার একধরনের ঠেস ইমারতে দেখা যাবে। সাধারণ পরিভাষায় এগুলো buttress নামে পরিচিত (রেখাচিত্র-৪৬)। উমাইয়া যুগে মাসাত্তা
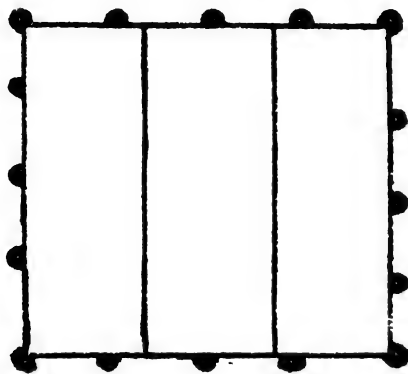
রেখাচিত্র : ৪৬
পোস্তা (buttress)

কসর আততুবা, আব্বাসীয় যুগে উখাইদির প্রাসাদে bastion-এর নজীর পাওয়া যাবে। এ ছাড়া দিল্লীর দুর্গ, লালবাগের দুর্গ প্রভৃতিতেও bastion ব্যবহৃত হয়েছে। ছোট
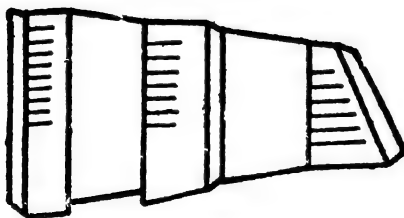
রেখাচিত্র : ৪৭
দেওয়ালের ঠেস (আয়তাকার)

আকারে দেওয়াল মজবুত করার জন্য buttress নির্মিত হয়েছে কায়রোয়ান (রেখাচিত্র-৪৭), কর্ডোভা, সামার্‌রা বা আবু দুলাফের মসজিদে (রেখাচিত্র-৪৮)। কায়রোয়ান ও

কর্ডোভায় আয়তাকার এবং সামার্‌রা ও আবু দুলাফের অর্ধবৃত্তাকার ঠেস লক্ষ করা যাবে। ঠেস অথবা buttress নির্মাণে কখনও কখনও tapering অর্থাৎ নিচে থেকে উপরের
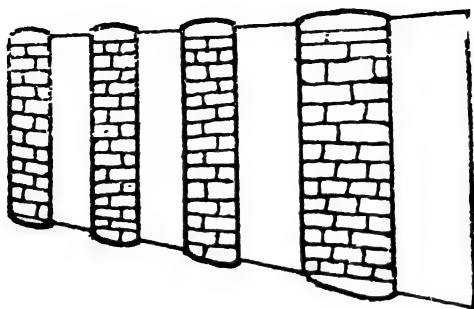
রেখাচিত্র : ৪৮
মসজিদের ঠেস (গোলাকার)

দিকে ঢালু হয়ে যায়। ঠেস-এর এই ঢালু ব্যবস্থাকে bater বলা হয়। মিশরীয় মন্দিরে এরকম bater সর্বপ্রথম দেখা যাবে। পরবর্তীকালে মুসলিম স্থাপত্যে এই bater প্রয়োগ করা হয়, যেমন— কায়রোয়ান মসজিদের মিনার ও জৌনপুরের মসজিদসমূহে (রেখাচিত্র-৪৯)। Buttress-এর বাইরের দিকের অংশ তেরছা করে নির্মাণ করা হয়। এই ধরনের buttress-কে bevelled off বলে। ইমারতের ছাদের উপর থেকে যে উপাদান চারপাশে ছাদকে ঘিরে থাকে তাকে উন্নত বক্স বা প্যারাপেট বলে। ইবনে তুলুনের মসজিদে সর্বাপেক্ষা উন্নতমানের নক্‌শাকৃত প্যারাপেট দেখা যাবে। এর নিচে আছে একসারি ছোট গোলাপের আকৃতিতে ইটের নক্‌শা যা rosette নামে পরিচিত। প্যারাপেটের অপর নাম হচ্ছে 'merlon' (রেখাচিত্র-৫০)। উপমহাদেশের মুসলিম ইমারতে যে 'merlon' ব্যবহৃত হয় তাকে সাধারণত কানজুরা (kanjura) বলে। মুসলিম স্থাপত্য বহুবিধ উপকরণ ও উপাদানে সমৃদ্ধ। বিজাপুরের মিহতার মহলে (রেখাচিত্র-৫১) যে সমস্ত উপাদান
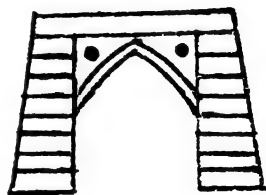
রেখাচিত্র : ৪৯
সম্মুখ-প্রাচীরের ঢালু অংশ

ইমারতের সৌন্দর্য ও স্থাপত্যশৈলীকে উৎকর্ষ দিয়েছে, তা হচ্ছে ক্ষুদ্র চূড়া বা শৃঙ্গ (pinnacle) অথবা (turret), যা প্রবেশপথের উভয় পাশে থাকে। মূল ভবনের ছাদ
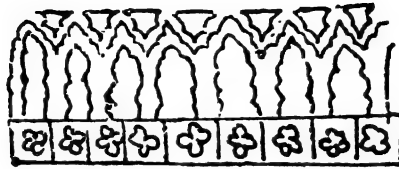
রেখাচিত্র : ৫০
ছোট গোলাপ

১। শৃঙ্গ
২। স্ট্যালাকটাইট ব্র্যাকেট
৩। ওরিয়েল জানালা
৪। ব্র্যাকেট
৫। ইভ বা ছাঁচ
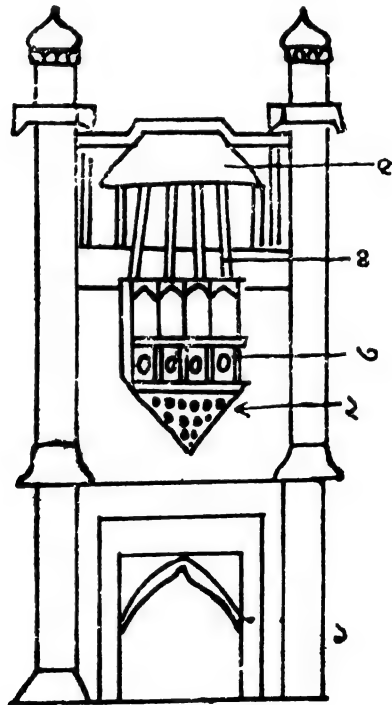
রেখাচিত্র : ৫১
প্রবেশ-তোরণের অংশ

থেকে কার্নিশ নির্মিত হয়, কিন্তু কার্নিশের নিচে ছোট আকারে যে ঢালু ছাদ জানালার উপর থাকে তাকে eave বা chajja বলে। এই eave-এর ভার বহন করে থাকে যে অংশ, তাকে একধরনের দণ্ড বা bracket বলা হয়। যদি জানালা মূল ভবন থেকে বাইরের দিকে ঝুলন্ত অবস্থায় নির্মিত হয় তা হলে সেটাকে বলা হবে oriel জানালা। এই জানালা আর এক ধরনের ব্র্যাকেট দ্বারা নির্মিত হয় এবং এর চাপ বহন করে থাকে stalactite bracket।

মসজিদের ভূমির পরিকল্পনা নানারূপ হতে পারে,– যেমন চতুষ্কোণাকার, যেমন– বাগদাদে মনসুরের জামে মসজিদ, ইরানের কাজ, দাম্ভী, আরদাবিলের মসজিদ, দিল্লীর খিড়কি (রেখাচিত্র-৫২) ও কালান মসজিদ, হুগলীর মোলা সিমলা মসজিদ, ঢাকার সোনারগাঁয়ের নিকট গোয়ালদির মসজিদ এবং আয়তাকার, যেমন–দামেস্কের মসজিদ, সামাররার মসজিদ, দিল্লীর কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ, হযরত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ।
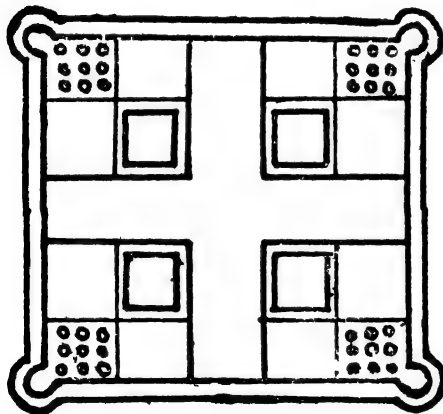
রেখাচিত্র : ৫২
দিল্লীর খিড়কি মসজিদে ক্রুশাকৃতি ভূমি পরিকল্পনা

অভ্যন্তরীণ স্তম্ভশ্রেণীর বিন্যাসে 'আইল' ও 'বের' সমন্বয় থাকতে পারে ; কিন্তু কখনও কখনও ক্রুশাকৃতি বা cruciform লিওয়ানও দেখা যাবে। ফিরোজশাহ তুঘলক দিল্লীতে খিড়কি এবং কালী নামে যে দুটি মসজিদ নির্মাণ করেন, তার নামাযগাহটি ক্রুশাকৃতি। ইরানের মসজিদে একটি অভিনব ভূমি পরিকল্পনা লক্ষ করা যাবে, যা

সাধারণভাবে 'আইওয়ান' Ivan নামে পরিচিত (রেখাচিত্র-৫৩)। লিওয়ানের দিকে কিবলামুখী একটি ভল্টের হলঘরকে 'আইওয়ান' বলে। ইসফাহানের জা'মি মসজিদের 'আইওয়ান' দেখা যাবে। 'আইওয়ানের' সম্মুখের প্রাচীরকে ফাসাদ (facade) বলে। সাসানীয় স্থাপত্যের প্রভাবে ইরানের মুসলিম স্থাপত্য 'আইওয়ানের' ব্যবহার শুরু হয়। 'আইওয়ান' কখনও কখনও অর্ধবৃত্তাকারে portal এবং stalactite লক্ষ করা যায় (রেখাচিত্র-৫৪)।
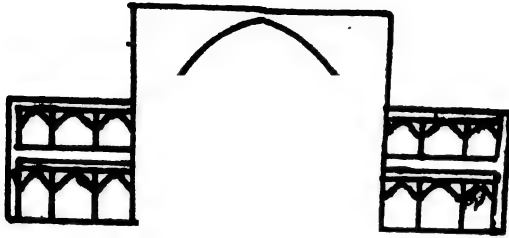
রেখাচিত্র : ৫৩
'আইওয়ান'
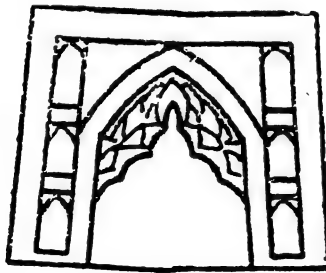
রেখাচিত্র : ৫৪
স্টালাকটাইট পোর্টাল

মুঘল স্থাপত্যেও এর প্রচলন ব্যাপকভাবে হয়েছে। বাংলাদেশে মুঘল স্থাপত্যের অনুকরণে লালবাগ দুর্গ মসজিদে এ ধরনের অর্ধবৃত্তাকার portal দেখা যাবে।

চতুষ্কোণাকার, আয়তাকার এবং 'আইওয়ান' টাইপের ইমারত ছাড়া অষ্টভুজাকৃতি (octagonal) সৌধ মুসলিম স্থাপত্যকে ঐশ্বর্য দান করেছে। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই কুব্বাত আস-সাখরা বা Dome of the Rock-এর উল্লেখ একান্তই প্রয়োজন। রোমান ও বায়জানটাইন স্থাপত্যে অষ্টভুজাকৃতি ইমারত দেখা যাবে (রেখাচিত্র-৫৫)।

এ প্রসঙ্গে রাভেন্নায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে দুটি অষ্টভুজের উপর নির্মিত সেন্ট ভিটেলের (St. Vitale) গির্জার উল্লেখ খুবই প্রাসঙ্গিক। তবে কুব্বাত আস-সাখরার অভ্যন্তরে একটি বৃত্ত বা rotunda রয়েছে। বৃত্তের চারপাশে যে পরিবেষ্টিত এলাকা প্রদক্ষিণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে বলে ambulatory।
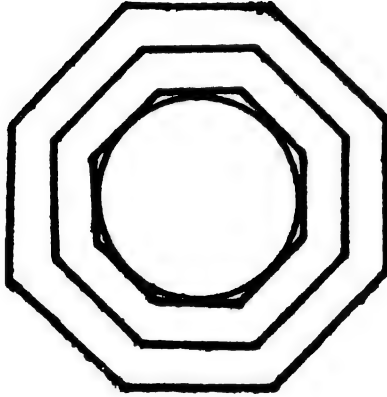
রেখাচিত্র : ৫৫
কুব্বাত আস-সাখরার ভূমি পরিকল্পনা

'তাওয়াফ' করার জন্য এর বিশেষ প্রয়োজন আছে। মুসলিম স্থাপত্যে পরবর্তী পর্যায়ে অনেক স্মৃতিসৌধে অষ্টভুজ ভূমি পরিকল্পনা কুব্বাত আস-সাখরার অনুকরণে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন– কুব্বাত আস-সুলাইবিয়া, সামাররা, ৮৬২ খ্রীঃ ; সুলতানীয়ায় ওগলজাইতুর সমাধি (চতুর্দশ শতাব্দী) এবং আগ্রার তাজমহল।

মুসলিম স্থাপত্যের মূলভিত্তি হচ্ছে মসজিদ। একটি মসজিদের বিভিন্ন অংশ থাকে। রসূল করীম (সঃ) কর্তৃক মদিনায় নির্মিত মসজিদটি বিশ্বে ইসলামী যুগের ঐতিহ্যবাহী

সর্বপ্রথম মসজিদ।[১] ৬২২ থেকে ৭১৫ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত মসজিদের স্থাপত্যশিল্পের ক্রমবিবর্তন হয় এবং পরিশেষে এটি দামেস্কের মসজিদে পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে। একটি মসজিদের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে কিবলা প্রাচীর (রেখাচিত্র-৫৬)। মসজিদ নির্মাণের জন্য পবিত্র মক্কার কা'বা শরীফের দিকে প্রথমে প্রাচীর নির্মাণ করে প্রাচীরের মাঝখানে একটি মিহরাব স্থাপন করতে হয়। এই মিহরাব কেবলমাত্র কিবলা নির্ধারকই নয়, ইমামের জন্য নির্দিষ্ট স্থান, যেখান থেকে তিনি জামা'আতে নামায পরিচালনা করেন। মিহরাবের পর ধর্মীয় গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় হচ্ছে মিমবার। ইমাম একটি উঁচু স্থান থেকে খুৎবা পাঠ করেন। সাধারণত তিন ধাপবিশিষ্ট এবং পরবর্তী পর্যায়ে অলঙ্কৃত বহুসিঁড়িবিশিষ্ট মিমবার ব্যবহৃত হয়েছে। মু'আবিয়া (রাঃ) সর্বপ্রথম মাকসুরা প্রবর্তন করেন। মিনবারের সামনে লিওয়ানে একটি কাঠের পরিবেষ্টিত এলাকা থাকে। খলিফা স্বীয় নিরাপত্তার জন্য মাকসুরায় নামায পড়তেন। জামা'আতে নামাযের জন্য মুসল্লীদের আযানের মাধ্যমে মসজিদে আহ্বান করা হয়। যে উঁচু স্থান থেকে আযান দেওয়া হয় তাকে মিনার বলে। ওযু ব্যতিরেকে নামায আদায় করা সম্ভবপর নয়। এর কারণে সাহানে ওযুর জন্য চৌবাচ্চা অথবা ফোয়ারা স্থাপন করা হয়। একটি মসজিদের ভূমি পরিকল্পনার দিক থেকে মোটামুটি তিন অংশে ভাগ করা হয়, যথা : নামাযের স্থান লিওয়ান অথবা জুল্লা, সাহান অথবা খোলা চত্বর বা অঙ্গন, রিওয়াক অর্থাৎ খিলানবিশিষ্ট সাহানের তিন দিকে (কিবলাদিক ছাড়া) বেষ্টিত ও আবৃত পথ। এ ছাড়া কোনো কোনো মসজিদে মূল ভবনের বাইরে খোলা চত্বর থাকে। স্থাপত্যের পরিভাষায় এটি জিয়াদা নামে পরিচিত। মিহরাব বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, যেমন—সাধারণ চ্যাপ্টা, অবতলাকৃতি (concave), অর্ধগোলাকার, আয়তাকার, অষ্টভূজ ইত্যাদি। ৭০৭—৯ সালের পূর্বে অবতল মিহরাব ব্যবহৃত হয়নি। প্রথম স্থাপিত হয় মদিনার মসজিদে। দামেস্ক, কায়রোয়ান, সুসা, ইবনে তুলুনের মসজিদে অবতলাকৃতি মিহরাব দেখা যাবে (রেখাচিত্র-৫৭)। কিন্তু উখাইদির এবং ইরানের অনেক মসজিদে, যেমন—দামগানে আয়তাকার মিহরাব ব্যবহৃত হয়।

স্থাপত্যকলার সঙ্গে অলঙ্করণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রাচীনকাল থেকে ইমারতের সাজসজ্জা করা হয়েছে বিভিন্ন উপায়ে। অলঙ্করণের বিভিন্ন প্রকরণ রয়েছে এবং তা

---

১. বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ ও আদি মসজিদ মক্কা শরীফে অবস্থিত বায়তুল্লাহ কা'বাগৃহ ও আল-মসজিদুল হারাম (আল-কুরআন ৩ : ৯৬)। হাদীসের বর্ণনামতে, হযরত আদম (আঃ) কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। হযরত নুহ (আঃ)-এর মহাপ্লাবনে এটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সহযোগিতায় এটি পুনর্নির্মাণ করেন (আল-কুরআন ২ : ১২৫, ১২৭)। বিশ্বের দ্বিতীয় আদি মসজিদ হলো বায়তুল মুকাদ্দাসের আল-মসজিদুল আক্সা। একটি হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আল-মসজিদুল হারামের নির্মাণের চল্লিশ বছর পর আল-মসজিদুল আক্সা নির্মিত হয় (মিশকাত, বাবুল মসজিদ)। সম্ভবত হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বয়ং মক্কার মসজিদটি নির্মাণের পর জেরুজালেম মসজিদটি নির্মাণ করেন অথবা তাঁর পৌত্র হযরত ইয়াকুব (আঃ) এটি নির্মাণ করেন এবং এই উভয় মসজিদের নির্মাণকালের ব্যবধান চল্লিশ বছর। হযরত সুলায়মান (আঃ) বিধ্বস্ত আল-মসজিদুল আক্সার পুনর্নির্মাণ করেন।

নির্ভর করে উপকরণের উপর। স্থাপত্যিক উপকরণ বলতে সাধারণত ইট, পাথর ও মার্বেল বোঝা যায়। ইটের উপর পলেস্তারা করে নানারকম নক্‌শা উৎকীর্ণ করলে তাকে
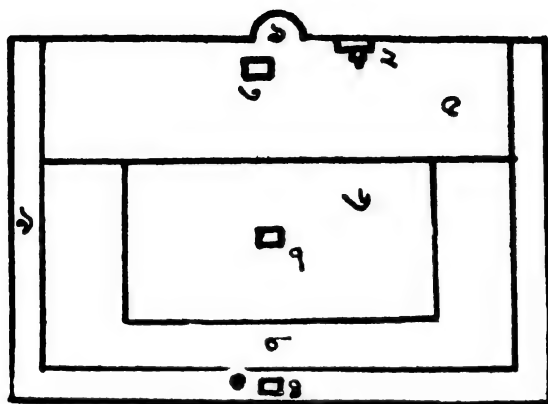
রেখাচিত্র : ৫৬
মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনা

১। মিহরাব
২। মিমবার
৩। মাকসুরা
৪। মিনার
৫। লিওয়ান
৬। সাহান
৭। ওযুর স্থান
৮। রিওয়াক
৯। জিয়াদা

বলা হয় stucco। যখন পলেস্তারা কাঁচা থাকে তখন দক্ষ কারিগর অসাধারণ নৈপুণ্যে লতাপাতা ও জ্যামিতিক নক্‌শা কেটে থাকেন (রেখাচিত্র-৫৮)। পারস্যে প্রায় ২০০০ বছর ধরে এই রীতি প্রচলিত আছে। মুসলিম স্থাপত্যের অলঙ্করণে স্ট্যাকোর প্রচলন আব্বাসীয় খিলাফতে এক নবযুগের সূচনা করে। আল মুতাসিমের প্রাসাদ এবং

বুলকাওয়ারা প্রাসাদ, ইবনে তুলুনের মসজিদ, সামাররার মসজিদ, নায়িনের মসজিদ, সিরাজের জা'মি মসজিদে স্ট্যাকোর উৎকর্ষ লক্ষ করা যাবে। সামাররা অলঙ্করণের
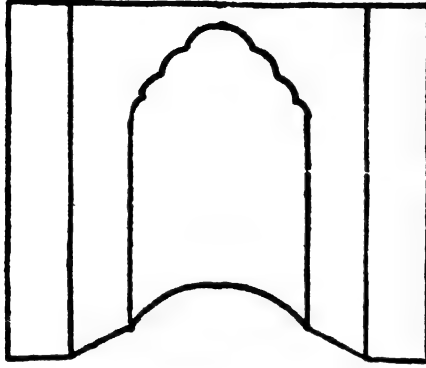
রেখাচিত্র : ৫৭
অবতলাকৃতি মিহরাব

রকমফের নির্ণয় করা হয়েছে A B C শ্রেণীতে। ইটের ইমারতকে পোড়ামাটির ফলক দ্বারা শোভিত করার প্রচলন প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। সুমেরীয়,

রেখাচিত্র : ৫৮
স্ট্যাকো অলঙ্করণ

ব্যাবিলনীয়, সাসানীয় ও মুসলিম যুগে terracotta অর্থাৎ পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত উপমহাদেশে টেরাকোটার ব্যবহার খুবই সার্বজনীন। পাঞ্জাব,

মুলতান, ঢোলকা, গৌড়, বাঘা, বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানের মুসলিম ইমারতে টেরাকোটার নক্‌শা লক্ষ করা যায়। কাদামাটিকে ফলকের সাহায্যে নক্‌শার আকার দিয়ে আগুনে পোড়ানো হয় এবং পরে পরপর সাজিয়ে একটি অলঙ্করণ মোটিভ সৃষ্টি করা হয়।

মুসলিম স্থাপত্যিক অলঙ্করণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে মিনাকরা টালী (glazed tile)। বহু প্রাচীনকাল থেকে মিনাকরা টালী ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাচীন মিশরের সাক্কারা মন্দিরে, ব্যাবিলনীয় ইমারতে, সুসার প্রাসাদে এর প্রয়োগ ছিল। মুসলিম ইমারতের মধ্যে কায়রোয়ান মসজিদ, ইরানের অসংখ্য মসজিদ, গজনী মিনার, গৌড়ের লোটান মসজিদ, বাগেরহাটের খানজাহান আলীর সমাধিতে মিনাকরা টালী দেখা যাবে। কাদামাটি দিয়ে প্রথমে বড় আকারের টালী তৈরি করে রঙের প্রলেপ ও কখনও কখনও কাচের সংমিশ্রণে রঞ্জিত করা হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে পোড়ানো হয়। এর অপর এক নাম faience।

পাথরের উপরে নানা ধরনের অলঙ্করণ হয়ে থাকে, বিশেষ করে পাথরে খোদাই (stone carving), 'মোজাইক' বা 'ফুসাইফিসা', opus sectile অর্থাৎ সাদা পাথরের মধ্যে কেটে নানা রঙের পাথর বসিয়ে নক্‌শা করা হল। মাসাত্তা ও কাসর আত-তুবায় মুসলিম কারুশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ, ইলতুৎমিশের সমাধি, আলাই দরওয়াজা, কুতুব মিনার এবং গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ, কুসুম্বার মসজিদে পাথর খোদাই করে অপূর্ব নক্‌শা সৃষ্টি করা হয়েছে। পাথরের সাহায্যে সর্বোৎকৃষ্ট অলঙ্করণ রীতিকে বলা হয় মোজাইক (Mosaic)। পাথরের উপর ছোট ছোট চারকোণা পাথরের নুড়ি, কাচ, মার্বেল-এর বিন্যাসে যখন কোনো মোটিভ সৃষ্টি করা হয় তখন তাকে mosaic বলে। প্রাচীন রোমীয় ও বায়জানটাইন স্থাপত্যে মোজাইকের বহুলব্যবহার ছিল। ইটালীর র‍্যাভেন্নায় নির্মিত সেন্ট ভিটেল গির্জায় (৫২৬-৫৪৭ খ্রীঃ) বায়জানটাইন গ্লাস মোজাইকের অপূর্ব দৃষ্টান্ত রয়েছে। বায়জানটাইন প্রভাবে মুসলিম স্থাপত্যে মোজাইকের প্রচলন হয়। Papadopoulo বলেন যে, উমাইয়া স্থাপত্যে ৬৮৫ থেকে ৭৫০ পর্যন্ত মোজাইকের ব্যবহার দেখা যায়। খলিফা আবদুল মালিকের খিলাফতকালে কুব্বাত আস-সাখরা মোজাইক দ্বারা অলঙ্কৃত হয়। খলিফা আল-ওয়ালিদ বায়জানটাইন সম্রাটের নিকট থেকে মোজাইকের খণ্ড এবং কারিগর সংগ্রহ করে মদিনার মসজিদ ও দামেস্ক মসজিদের পুনর্নির্মাণের প্রয়াস পান। ক্রেসওয়েলের মতে, সম্ভবত মুসলিম স্থাপত্যের সর্বপ্রথম গ্লাস মোজাইকের ব্যবহার হয় পবিত্র কা'বা শরীফের পুনর্নির্মাণে (৬৮৪ খ্রীঃ)। মোজাইকের অংশগুলি যখন বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত হয়ে এক-একটি নক্‌শা বা মোটিভের সৃষ্টি করে তখন তাকে বহুবর্ণের (polychrome) মোজাইক বলে। আব্বাসীয় যুগে মোজাইকের ব্যবহার হ্রাস পেলেও কোনো কোনো প্রাসাদ, যেমন– সামাররায় নির্মিত বালকুয়ারা প্রাসাদে গ্লাস মোজাইক শোভা বৃদ্ধি করেছে। নানা ধরনের লতাপাতা, যেমন– একান্থাস, cornucopia (প্রাচুর্য-শৃঙ্গ), গলা ও কানের অলঙ্কার, আঙুর প্রভৃতি।

দেওয়ালের অলঙ্করণে ফ্রেসকোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ফ্রেসকোর অর্থ হচ্ছে নরম ও ভেজা পলেস্তারার উপর চিত্র অঙ্কন। মুসলিম আমলে fresco বা দেওয়াল

চিত্রের সর্বপ্রাচীন নির্দশন পাওয়া যায় কুসাইর আমরার প্রাসাদে। অবশ্য সভ্যতার আদিযুগ থেকে দেওয়ালচিত্রের প্রচলন দেখা যায়। আলতামিরা গুহায় সর্বপ্রথম দেওয়ালচিত্র পাওয়া যায়। রোমীয় ও বায়জানটাইন যুগে ফ্রেসকোর বহুল প্রচলন দেখা যাবে। মুসলিম স্থাপত্যে কুসাইর আমরার ফ্রেসকো সম্বন্ধে ডালটন বলেন, "No such extensive decoration in fresco is known to have survived in any other secular building earlier than the Romanesque period." আব্বাসীয় আমলে মুতাসিম তাঁর রাজপ্রাসাদ (জাওসাক আল-খাকানী) দেওয়ালচিত্র দ্বারা সুশোভিত করেন।

মুসলিম ইমারতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশালতা এবং আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য ছাদ উঁচু করা। Triforium বা লিওয়ানের খিলানরাজির উপরে একটু উঁচু করে একটি গ্যালারী সৃষ্টি করা হয়। মসজিদে আল-আকসায় সর্বপ্রথম এ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। উপমহাদেশের মুসলিম স্থাপত্যেও এর নিদর্শন দেখা যাবে, বিশেষ করে আহমদাবাদের মসজিদসমূহে। আলো-বাতাসের জন্য সুন্দর সুন্দর জানালা তৈরি করা হয়। পাথর কেটে যে জানালা নির্মিত হয় তাকে জালী (Jali) বলে। একখণ্ড পাথরকে জ্যামিতিক নক্শায় কেটে যে জালী তৈরি করা হয় তা lattice নামেও পরিচিত। কুব্বাত আস-সাখরা, দামেস্কের মসজিদে, লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে পরীবিবির মাযারে, কসুম্ভার মসজিদে পাথরে কাটা জালীর জানালা ব্যবহৃত হয়েছে। কেবলমাত্র পাথরেই নয়, ইটের দেওয়ালেও সূক্ষ্ম জালীর জানালা মুসলিম স্থাপত্যিক অলঙ্করণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইবনে তুলুনের মসজিদের প্রাচীরে এ ধরনের জানালা দেখা যাবে। ইংরেজি পরিভাষায় এর নাম perforated screen, কখনও কখনও জালীর জানালাকে grill বলা হয়।
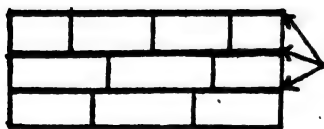
রেখাচিত্র : ৫৯
ইংলিশ বন্ধনী

অন্যান্য স্থাপত্যিক সংজ্ঞার ব্যাখ্যা নিম্নে দেওয়া হল : Brick bonding ; ইটের বন্ধনী বা যেভাবে স্তরে স্তরে ইট সাজানো হয় তাকে brick bonding বলে; এর অপর নাম headers এবং stretchers। মুসলিম স্থাপত্যে এই রীতির বহুল প্রচলন ছিল। ইবনে তুলুনের মসজিদে ইংলিশ বন্ধনীর ব্যবহার ছিল (রেখাচিত্র-৫৯)। ইটের গাঁথুনিতে এই পদ্ধতির সার্বজনীন প্রয়োগ দেখা যাবে। আরব্য নক্শাকে সাধারণ ভাষায় Arabesque বলা হয়। এটি মুসলিম স্থাপত্যিক অলঙ্করণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। লতাপাতা ও জ্যামিতিক মোটিভের পরস্পর সন্নিবেশে এক অপরূপ নক্শার সৃষ্টি করেছেন মুসলিম কারুশিল্পীগণ। সকল স্থাপত্যরীতিতে ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যাবে ; বিশেষ করে কায়রো, কর্ডোভা, দিল্লী, ইসফাহানের ইমারতে লক্ষণীয়। কখন কখন লতাপাতার সঙ্গে জ্যামিতিক মোটিভের সংমিশ্রণে অ্যারাবেস্ক সৃষ্টি করা হয়।

খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাচীন পারস্যের রাজবংশ একামেনীয়দের রাজধানী পার্সিপলিসের ব্যবহৃত একধরনের ক্যাপিটালকে বৃষ ক্যাপিটাল বলা হয়। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শীর্ষদেশ বৃষের আকারে নির্মিত। ৬৪১ সনে পারস্য বিজয়ের পর মুসলমানগণ ইস্তাখার বা পার্সিপলিস দখল করেন এবং সেখানে জা'মি মসজিদ নির্মাণ করেন। পার্সিপলিটান ক্যাপিটালের বৃষ-শীর্ষদেশ সম্বলিত স্তম্ভের সাহায্যে এই মসজিদ স্থাপিত হয়।
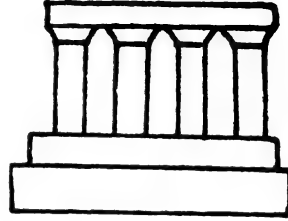
ক্যাপিটাল যখন স্বর্ণমণ্ডিত হয় তখন তাকে gilt capital বা স্বর্ণমণ্ডিত শীর্ষদেশ বলা হয়। কুব্বাত আস-সাখরায় এর নিদর্শন রয়েছে। কোনো ইমারতের নিম্নাংশকে Dado বলা হয় (রেখাচিত্র-৬০)। Dado ভিত্তিমূলের কাজ করে এবং এর উপর নির্ভর করে সৌধ নির্মিত হয়। প্রাচীন সব স্থাপত্যিক রীতিতে এর ব্যবহার ছিল।

রেখাচিত্র : ৬০
দেওয়ালের নিম্নাংশ (Dado)

ইমারত নির্মাণে যে মসলা গাঁথুনির জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে mortar বলে। এই উপাদান চুনাবালি ও পানি দিয়ে তৈরি হতে পারে। কখনও কখনও কাদা বা patch ব্যবহৃত হয়। জিপসামের ব্যবহার দেখা যাবে উখাইদিরে।
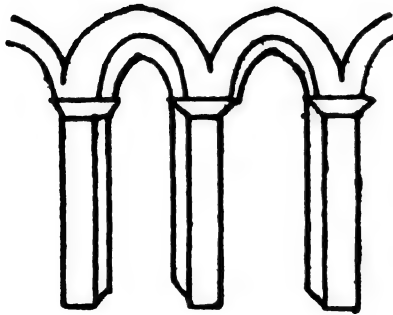
রেখাচিত্র : ৬১
খিলানের অংশ

খিলানের উপরে যে ধরনের উঁচু নক্‌শাকৃত বেড়ী ব্যবহৃত হয়, স্থাপত্যের পরিভাষায় তাকে moulding বলে। কায়রোয়ানের তিন দরজাবিশিষ্ট মসজিদের খিলানের উপরে moulding ব্যবহৃত হয়েছে। একটি খিলানের বিভিন্ন অংশ থাকে যথা, বাইরের বক্ররেখা বা extrados, অভ্যন্তরীণ বক্ররেখা বা intrados, ভিতরের অংশ বা Soffit, খিলানের পাশে অর্থাৎ দুটি খিলানের মধ্যের ত্রিকোণাকার স্থানকে Spandrel বলা হয়। Spandrel-এ সাধারণত ছোট আকারের গোলাপ ফুল বা rosette থাকে (রেখাচিত্র-৬১)।
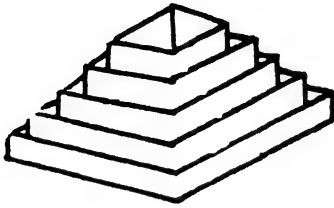
রেখাচিত্র : ৬২
যিকুরাত (Ziggurat)

সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় এবং অ্যাসিরীয় স্থাপত্যে একধরনের স্তরবিশিষ্ট মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। এর নাম Ziggurat বা যিকুরাত। যিকুরাত নির্মাণের পদ্ধতিও খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ, কারণ সর্বপ্রথমে একটি বিশাল চতুষ্কোণাকার ভিত্তি স্থাপন করে ক্রমশ উপরের দিকে ক্ষুদ্রাকারে চতুষ্কোণ স্তর তৈরি করা হয়। উপরে ওঠার জন্য পেঁচানো সিঁড়ি থাকে এবং যিকুরাতের উপরে একটি মন্দির নির্মিত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, সামার্‌রায় জা'মি মসজিদ এবং আবু দুলাফের মসজিদের মিনার যিকুরাত দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় (রেখাচিত্র-৬২)।

রেখাচিত্র : ৬৩
ড্রামে খিলান জানালা

ইমারতের অভ্যন্তরে আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য গম্বুজে অর্ধবৃত্তাকার জানালা ব্যবহৃত হয়। এই জানালাকে lunette বলে (রেখাচিত্র-৬৩)। কখনও কখনও ড্রামেও জানালা নির্মিত হয়। দামেস্কের মসজিদে lunette-এর প্রয়োগ রয়েছে। ছাদের পানি নিষ্কাশনের জন্য যে উপাদান ব্যবহৃত হয় তাকে নল বা gargoyle বলা হয়।
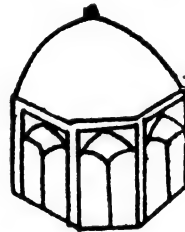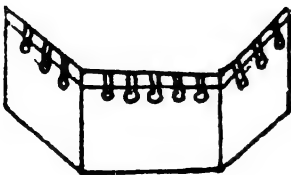
রেখাচিত্র : ৬৪
পানি নিষ্কাশনের নল (gargoyle)

সাধারণত একটি কিম্ভূতকিমাকার জন্তুর মুখের আদলে নলটি তৈরি হয়। গথিক স্থাপত্যে এর বহুল প্রচলন দেখা যাবে। মুসলিম ইমারতে যথা কুব্বাত আস-সাখরায় এ ধরনের নল আছে (রেখাচিত্র-৬৪)।

২। মুসলিম স্থাপত্যের পটভূমি

মুসলিম স্থাপত্যকলার প্রকৃত মূল্যায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রাক্-মুসলিম যুগের স্থাপত্যশৈলী সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ। খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে বিশেষ করে হযরত উমরের (রাঃ) শাসনামলে ইসলামের সম্প্রসারণ ও সম্প্রচার ব্যাপক আকার ধারণ করে। হুরগুরুঞ্জের মতে, প্রথম খলিফাদের সামরিক সাফল্য ব্যতীত ইসলাম কখনওই একটি সার্বজনীন বিশ্বধর্মে পরিণত হতে পারত না। মিশর, সিরিয়া ও পারস্যবিজয়ের ফলে প্রাচীন সভ্যতার দ্বার মুসলমানদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে মুসলিম অভিযান একটি যুগান্তকারী ঘটনা। শিবলী নোমানী বলেন, আমর ইবনুল আসের শাসনামলে ফুসতাত এবং সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাসের সময়ে কুফা এবং বসরা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানভাণ্ডারসমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। মুসলিম রাষ্ট্র পারস্য ও রোমান বায়জানটাইন সংস্পর্শে এলে ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা, কৃষি, দর্শন, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়। ভেরহোভেন বলেন, "এইরূপ চলতে থাকলে (যুদ্ধাভিযান) অকৃত্রিম ইসলাম আন্তর্জাতিকীকরণ হল, প্রাচীন সভ্যতার সম্পদগুলি আহরণ করা হল।" মুসলমান বিজয়ের ফলে মুসলিমগণ প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক হলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে পুনরায় তা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। বেকার যথার্থই বলেন, "ইসলাম বিচ্ছিন্নতা হতে মুক্তি পেয়ে প্রাচ্য-হেলেনিক সভ্যতার উত্তরাধিকারী হল। এটিকে বিশ্ব-ইতিহাসে ক্রমবিবর্তনের সর্বশেষ যোগসূত্র বলে মনে করা হয়।"

আরব ভূখণ্ডের বাইরে ইসলাম যে প্রচণ্ড প্রভাব ও প্রতিপত্তি সৃষ্টি করেছিল তার মূলে রয়েছে ইসলামের মূল ধর্মীয় আদর্শ ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতার আঁতাত। কিন্তু ইসলাম প্রাচীন মিশরীয়, গ্রীকো-রোমান, বায়জানটাইন অথবা সুমেরীয়-ব্যাবিলনীয়, অ্যাসিরীয়, এ্যাকামেনীয়, সাসানীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে উপাদান গ্রহণ করেছে বলে একথা কখনওই বলা যাবে না যে, মুসলিম স্থাপত্যে মৌলিকত্ব ও অভিনবত্ব নেই অথবা মূল ঐতিহ্যের ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যালোয়ানের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়, "The simplest tribesmen who had lived under tent or behind the mud walls of Arabia with unconscious genius made use of the technical and artistic ability which they found in the great cities of the time, in Jerusalem, Damascus and elsewhere and thus initiated the growth of wonderous buildings as places of worship and as residences for their princes. This was the architecture of Islam, steeped in the traditions of the past but created a new for the spread of faith which soon attracted to it the best of contemporary skill for the adornment of its monuments".

অধ্যাপক ম্যালোয়ান বিশেষত দুটি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। প্রথমত, মুসলিম স্থাপত্য ধর্মীয় অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ধর্মের সম্প্রসারণ, ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের একটি উপযুক্ত মাধ্যম। মসজিদ নির্মাণের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব এই মতবাদকে সমর্থন করে। দ্বিতীয়ত, মুসলিম স্থাপত্যে প্রাক্-মুসলিম স্থাপত্যশৈলী ও অলঙ্করণের প্রভাব অনস্বীকার্য। মুসলিম চিত্রকলায় যেমন বৈদেশিক প্রভাব ছিল,

অনুরূপভাবে মুসলিম স্থাপত্যেও অমুসলিম স্থাপত্যরীতির প্রভাব থাকা বিচিত্র ছিল না ; কারণ স্থানীয় স্থাপত্য ও অলঙ্করণ রীতির প্রভাব ছাড়াও কখনও কখনও অমুসলমান ইমারত থেকে স্থাপত্যিক উপাদান গ্রহণ করা হয় ; তৃতীয়ত, মুসলিম ইমারত নির্মাণে অসংখ্য অমুসলমান স্থপতি, কারিগর, শ্রমিক, কারুশিল্পী নিয়োজিত হন। মুসলিম স্থাপত্যের উন্মেষে যে সমস্ত প্রাক্-মুসলিম স্থাপত্যরীতির (style of architecture) প্রভাব দেখা যায় তা হচ্ছে– (১) মেসোপটেমীয় (২) বায়জানটাইন (৩) কপটিক।

১. মেসোপটেমীয় সভ্যতার বিভিন্ন স্তর রয়েছে :

(১) সুমেরীয়, খ্রীস্টপূর্ব ৪০০০–১৮০০ ; (২) পুরাতন ব্যাবিলনীয়, খ্রীস্টপূর্ব ১৮০০–১২০০ ; (৩) অ্যাসীরীয়, খ্রীস্টপূর্ব ১৩০০–৬১২ ; (৪) ব্যাবিলনীয় অথবা কালদীয়ান, খ্রীস্টপূর্ব ৬১২–৫৩৯ ; (৫) পারস্য সাম্রাজ্য, খ্রীস্টপূর্ব ৫৩৯–৩৩০ ; (৬) পার্থিয়ান-সাসানীয়।

পৃথিবীর তিনটি নদীভিত্তিক সভ্যতার সর্বপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যাবে মেসোপটেমিয়ার দুটি পাশাপাশি নদী টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, যা 'শাতুল আরব' নামে পরিচিত। প্রচুর পলিমাটি এই অঞ্চলে পাওয়া যায় এবং এই পলিমাটি দিয়ে ইট তৈরি করে রৌদ্রে পোড়ানো হয়। এই সমস্ত উপকরণ দ্বারা তৈরি ইমারত উর, উরুক ও ব্যাবিলনে দেখা যাবে।

১.১. সুমেরীয় : নিকট প্রাচ্য বিশেষ করে মেসোপটেমিয়ায় আদি মানুষের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এ অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বাসস্থানের সন্ধান পাওয়া যায়। গোলাকার ঘরবাড়ি অথবা কাদামাটি দিয়ে আয়তাকার গৃহ অথবা ইটের ইমারত এই সুমেরীয় যুগে নির্মিত হয়। সহজলভ্য উপাদান দ্বারা ব্যবহারিক প্রয়োজনে ইমারত তৈরি করা হত। পশ্চিম এশিয়ায় শাতুল আরবে খ্রীস্টপূর্ব ৪০০০ বছর পূর্বে সর্বপ্রথম মানুষ ইমারত নির্মাণের প্রয়াস পায়। পাথর ও কাঠের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন সুমেরীয়গণ রৌদ্রে পোড়া ইট দিয়ে মন্দির নির্মাণ করে দেওয়াল চিত্র দ্বারা শোভিত করত। খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ বছরে নির্মিত উরুকের সাদা মন্দির (White Temple) সুমেরীয় স্থাপত্যের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। উঁচু এবং ঢালু প্লাটফরমের উপর রৌদ্রে পোড়া ইট দ্বারা তৈরি এই মন্দিরটি ঠেস বা পোস্তা (buttress) দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। বুরুজ ছিল এবং সুউচ্চ প্রবেশপথ দ্বারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হত। সাদা পলেস্তারা দিয়ে দেওয়াল আচ্ছাদিত হত। সুমেরীয় স্থাপত্যের অসাধারণ কীর্তি যিকুরাত (ziggurat)। 'যিকুরাত' কথার অর্থ 'মন্দিরের বুরুজ' (Temple tower); পরপর ক্রমশ হ্রাসমান কতকগুলো স্তর বা প্লাটফর্মের সাহায্যে যিকুরাত নির্মিত হত। সুমেরীয় স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি– যিকুরাত নির্মিত হয় উর (Ur)-এ খ্রীস্টপূর্ব ২১১৩-২০৪৮ সালের মধ্যে। মন্দিরে প্রবেশের জন্য ঢালু সিঁড়ির পথ (sloping step) স্থাপিত হয়।

সুমেরীয় স্থাপত্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর প্রভাব পরবর্তী স্থাপত্যরীতিতে অবশ্যই ছিল। প্রধান স্থাপত্যিক বেশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ইটের ব্যবহার, রৌদ্রে পোড়া ইটের গাঁথুনী

এবং আগুনে পোড়া ইট দ্বারা আচ্ছাদন, দেওয়ালে রঙিন চিত্রাবলী, মোজাইকের স্তম্ভ (উরুকের মন্দির), গম্বুজ ও খিলানের ব্যবহার, পোস্তা (buttress), ঈষৎ ঢালু দেওয়াল (batter), যিকুরাতে রঙিন পাথরের নক্শা (inlay), ডিম্বাকার ভূমি-পরিকল্পনা (oval plan), (খাফাজা, খ্রীস্টপূর্ব ২৬০০) ঢালু সিঁড়ি প্রভৃতি।

১.২. **পুরাতন ব্যাবিলনীয় যুগ** : সুমেরীয় সভ্যতা সম্ভবত সর্বপ্রাচীন এবং সুমেরীয়দের পরে মেসোপটেমিয়াতে যে সভ্যতার নিদর্শন ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে বলে পুরাতন ব্যাবিলনীয় যুগ। ডুঙ্গীর মৃত্যুর পর সুমেরীয় সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং খ্রীস্টপূর্ব ১৮০০ সালে আমরাইট নামে এক সেমিটিক জাতি সুমেরীয় অঞ্চল দখল করে ব্যাবিলনে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে। আমরাইটগণ পুরাতন ব্যাবিলনীয় হিসেবে পরিচিত এবং এই বংশের স্বনামধন্য সম্রাট ছিলেন হামুরাবি। হামুরাবির অনুশাসন (Code of Hammurabi) ছাড়াও এ যুগের অসামান্য কীর্তির নিদর্শন ছিল স্থাপত্যে। প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল মেসোপটেমীয় সভ্যতার দ্বিতীয় স্তর। পুরাতন ব্যাবিলনের কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই, কারণ খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে নতুন ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নেবুচাদনেজার নতুনভাবে ব্যাবিলনের হৃত সমৃদ্ধি ও গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য নতুনভাবে নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

১.৩. **অ্যাসিরীয় যুগ** : মেসোপটেমিয়ায় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন অ্যাসিরীয়গণ। সম্ভবত ইরাকের উত্তরে মসুল অঞ্চলে খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ সালে অ্যাসিরীয়গণ রাজত্ব করতেন। কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব ১৯০০ থেকে লিখিত তথ্য পাওয়া যায়। বহু শতাব্দী রাজত্ব করার পর তারা ব্যাবিলনীয়দের সংস্পর্শে আসে এবং তাদের রাজত্বের কাল নির্ধারিত হয় খ্রীস্টপূর্ব ১৩০০-৬১২। অ্যাসিরীয়গণ খুবই যুদ্ধপ্রিয় জাতি ছিলেন। স্থাপত্যকলার একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা আসুর, নিনিভা, খোরশাবাদ প্রভৃতি স্থান অসামান্য কীর্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁরা পার্থিব সুখ ও শান্তি অধিক পছন্দ করতেন। এ কারণে গগনচুম্বী প্রাসাদ, বৃহদাকার ভাস্কর্য সৃষ্টি করে তাঁরা অমর হয়ে রয়েছেন। খ্রীস্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে দ্বিতীয় আসুর-নসির-পাল নিমরুদে প্রাসাদ স্থাপন করেন। আসুর অ্যাসিরীয়দের ধর্মীয় রাজধানী ছিল, কিন্তু নিমরুদ এটিকে পার্থিব রাজধানীতে রূপান্তরিত করেন। দ্বিতীয় সারগণ (খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী) খোরশাবাদে এবং সেনাচেরিব নিনিভায় নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এই প্রাচীন অ্যাসিরীয় শহরগুলো সুসমৃদ্ধ ছিল এবং অসংখ্য মন্দির ও প্রাসাদে শোভিত ছিল। নিনিভা সম্বন্ধে বলা হয়েছে "Raised on brick platforms, level with their surrounding fortifications, their principal gateway were flanked by 'guardian' figures of human headed bulls or lions sculptured in stone inside, there halls and corridors were lived with pictures and inscriptions, carved in relief on stone slabs up to nine feet high. Some idea of the richness and luxury with which these buildings were decorated has been obtained from fragments of painted murals and the plentiful

remnants of ivory furniture, city walls, often more than twenty feet thick, were further strengthened by innumerable towers with crenellated ballements."[১]

মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণে সুমেরীয় ও প্রাচীন ব্যাবিলনীয় স্থাপত্যে ইটের ব্যবহার সার্বজনীন ছিল, কিন্তু অ্যাসিরীয় স্থাপত্যে ইটের স্থলে সহজলভ্য পাথর স্থাপত্য উপাদান হিসেবে সমাদৃত ছিল। অ্যাসিরীয় প্রাসাদ ও মন্দির ৩ থেকে ৫ ফুট সিঁড়িবিশিষ্ট উঁচু প্লাটফর্মের উপর নির্মিত হয়। স্থাপত্যের পরিভাষায় Stybolate নামে অভিহিত এই প্লাটফর্মের প্রয়োজন ছিল নিরাপত্তার জন্য। খোরশাবাদে সারগণের প্রাসাদটির প্লাটফর্ম রৌদ্রে পোড়া ইটের, কিন্তু পাথরের আচ্ছাদনে মজবুত করা হয়। সিঁড়ি মানুষের যাতায়াতের জন্য ছিল, কিন্তু ঘোড়ার জন্য ঢালু পথ বা ramp নির্মিত হয়। প্রাচীরবেষ্টিত রাজধানী খোরশাবাদে প্রাসাদ, যিকুরাত, আবাসিক এলাকা, প্রশাসনিক ভবন, অস্ত্রাগার প্রভৃতি ছিল। প্রাসাদের অঙ্গনে প্রবেশের জন্য তৈরি করা হত সুউচ্চ ফটক, যার দুপাশে বিশালাকার ডানাবিশিষ্ট বৃষ অথবা সিংহ স্থাপিত হয়। অর্ধগোলাকার খিলানের মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরে যাওয়া যায় এবং প্রবেশ-ফটকটি মিনাকরা টালী দ্বারা অলঙ্কৃত। সুমেরীয় যিকুরাতের অনুকরণে অ্যাসিরীয়গণ যিকুরাতে মন্দির নির্মাণ করতেন। অ্যাসিরীয় নৃপতিগণ তাঁদের রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন মন্দির নির্মাণ করতেন। কারণ ধর্মীয় ও রাজকীয় কার্যকলাপ সমন্বিত করা হয়। অবশ্য মিশরীয়দের মতো তাঁরা ধর্মীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন না।

অ্যাসিরীয় প্রাসাদ অসংখ্য কুঠরী দ্বারা নির্মিত হয়। প্রাসাদের প্রাচীর ভিতরের দিক থেকে চুনাপাথর অথবা আলবাস্টার (স্ফটিক ধরনের পাথর) দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। এই চুনাপাথরের উপর দক্ষ শিল্পী অ্যাসিরীয় নৃপতিদের সামরিক অভিযান অথবা মৃগয়ার দৃশ্য খোদাই করতেন। পাথরে খোদাইকৃত নক্শাকে bas-relief বলা হয়। বহিঃপ্রাচীরের নিম্নাংশ মজবুত করার জন্য পাথরের স্তর ছিল এবং প্রাচীর অসংখ্য বুরুজ (towers) দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়। প্রাচীরের উপরের অংশ প্যারাপেট বা চূড়া (battlemented cresting) দ্বারা অলঙ্কৃত। প্রধান হলঘরের উভয় পাশে ডানাবিশিষ্ট সিংহ অথবা বৃষের অতুলনীয় ভাস্কর্য যেন প্রাসাদকে অশুভ প্রভাব থেকে রক্ষা করছে। প্রাসাদের ঘরগুলোতে খোদাই করা নক্শায় ও নানা বর্ণের সমাবেশে চিত্র অঙ্কিত হত। অ্যাসিরীয় প্রাসাদের প্রবেশপথগুলো অর্ধগোলাকার খিলান দ্বারা সৃষ্ট এবং খিলানের উপরে রঞ্জিত ইটের একটি বক্রাকার স্তর দ্বারা শোভিত (archivolt) ছিল। উল্লেখ্য যে, খোরশাবাদের প্রাসাদের পয়ঃপ্রণালীতে সর্বপ্রথম খ্রীস্টপূর্ব ৭২২ সালে কৌণিক খিলান ব্যবহৃত হয়। ফ্রেচারের মতে, অ্যাসিরীয় কৌণিক খিলানের উৎসস্থল ছিল। প্রাসাদে কোনো জানালা দেখা যায় না; ধারণা করা হয়, দরজা দিয়ে আলো প্রবেশ করত। কখনও কখনও দেওয়ালের মধ্যে নলাকৃতির ছিদ্র সৃষ্টি করা হত। প্রাসাদের ছাদ সমান্তরাল হলেও মূলত কুঠরীগুলো ভল্ট দ্বারা নির্মিত। ছাদ বিটুমিন দিয়ে আচ্ছাদিত

---

১. Great Architecture of the World New York 1979, p. 42.

করা হত, যাতে অভেদ্য হয়ে পানি চুয়াতে না পারে। অ্যাসিরীয় প্রাসাদে যদিও কোনো গম্বুজের নিদর্শন পাওয়া যায়নি, তবুও ভাস্কর্যে উৎকীর্ণ গম্বুজের দৃষ্টান্ত থেকে ধারণা করা হয় যে, ছোট ছোট কুঠরীগুলো গম্বুজ দ্বারা আবৃত ছিল। নিনিভার প্রাসাদ-দেওয়ালে গম্বুজবিশিষ্ট কুঠরী খোদিত দেখা যায়। গম্বুজের নির্মাণ ইটের রীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তা সুমেরীয় পদ্ধতির ফলশ্রুতি।

সুমেরীয় স্থপতি উরুকের মন্দিরে যে ধরনের স্তম্ভ ব্যবহার করেছেন সেরূপ স্তম্ভসারি অ্যাসিরীয় স্থাপত্যে লক্ষ করা যায় না। তবুও বিশেষজ্ঞগণ খোরশাবাদের পাথরে খোদাই করা নক্শা থেকে মনে করেন যে, আওনিক কুণ্ডলীসম্বলিত স্তম্ভের ব্যবহার ছিল। অলঙ্করণের মাধ্যম হিসেবে কারিগরেরা মিনাকরা টালী এবং মার্বেলের খণ্ড দ্বারা ইটের ইমারতকে আচ্ছাদিত করত। খুবই মসৃণ এবং ঈষৎ নরম চুনাপাথরের বিশাল খণ্ডে নানা ধরনের অলঙ্করণ খোদিত করা অ্যাসিরীয় ভাস্কর্য কারুশিল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত অ্যাসিরীয় যুগের স্থাপত্যে ভাস্কর্য এবং পাথর খোদাইয়ের দৃষ্টান্ত দেখা যাবে। নিনিভা থেকে লব্ধ একটি পাথরখণ্ডে বিভিন্ন অলঙ্করণের মোটিভ উৎকীর্ণ রয়েছে। এই সমস্ত মোটিভের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, (ক) ছোট গোলাপ (rosette) (খ) পদ্মাকুড়ি (lotus bud), (গ) তালগাছের পাতা (palmettes) (ঘ) গীলোস (guilloche)। ফ্লেচার মনে করেন যে, অ্যাসিরীয় স্থাপত্যে অলঙ্করণের মোটিভ প্রাচীন মিশরীয় শিল্পকলা দ্বারা প্রভাবান্বিত, কিন্তু গ্রীক স্থাপত্য ভাস্কর্য দ্বারা পরিচালিত। Ralph and Burns বলেন, "Architecture ranked second to Sculpture from the standpoint of artistic excellence. Assyrian palaces and temples were built of stone obtained from the mountainous areas of the north, instead of the mud brick of former times. Their principal features were the arch and the dome. The column was also used but never very successfully. The chief demerit of this architecture was its hugeness, which the Assyrians appeared to regard as synonymous with beauty."[১]

১.৪ নব্য ব্যাবিলনীয় (কালদীয়ান) : খ্রীস্টপূর্ব ৬১২ সালে নিনিভার পতনের ফলে অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং মেসোপটেমীয় সভ্যতার সর্বশেষ পর্ব নব্য ব্যাবিলনীয় অথবা কালদীয়ান সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নেবুচাঁদনেজার (বাখতে নাসর) ব্যাবিলনের প্রাচীন ঐতিহ্য, গৌরব ও সমৃদ্ধিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস পান। প্রাচীন সুমেরীয় শহরগুলো পুনর্নির্মিত হয়, রাজধানী ব্যাবিলন সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হয়। শহরটিকে দুটি প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত করা হয় এবং বিভিন্ন ইমারত নির্মাণ করে সুশোভিত করার ফলে এর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন স্থাপত্যরীতি অর্থাৎ ইট ও মিনাকরা টালীর ব্যবহার অনুসৃত হতে থাকে।

---

১. Western Civilization, Their History and Their Culture, p. 80.

নেবুচাঁদনেজার (বাখতে নাসর) অ্যাসিরীয় রাজাদের মতো কেবল বিজেতাই ছিলেন না, একজন একনিষ্ঠ নির্মাতাও ছিলেন। অ্যাসিরীয়দের সময়ে প্রাচীন ব্যাবিলন ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তিনি নতুন পরিকল্পনায় রাজধানীকে নির্মাণের মনস্থ করেন। নেবুচাঁদনেজারের মৃত্যুর একশ বছর পরে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ব্যাবিলন সম্বন্ধে বলেন, "It is more splendid than any other city known to us." ইউফ্রেটিসের পূর্বতীরে অবস্থিত এই নগরী বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাচীন ব্যাবিলনের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কোলডেওয়ে উনিশ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে খননকার্য পরিচালনা করে আড়াই বছরের প্রাচীন সভ্যতার দ্বার উন্মোচন করেন। ইউফ্রেটিসের উপর একটি বিরাট পুল পার হয়ে প্রধান ফটকে প্রবেশ করতে হত। শহরটি প্রদক্ষিণ-বেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং সুমেরীয় ও অ্যাসিরীয় কীর্তির অনুকরণে অসংখ্য বুরুজ এবং প্যারাপেটের সাহায্যে এই প্রাচীর নির্মিত হয়। প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল আয়তাকার প্রাচীন শহরের বিভিন্ন অনিন্দ্যসুন্দর ইমারত নির্মিত হয়। পবিত্র পথ বা Sacred way পার হয়ে বিখ্যাত ও মিনাকরা টালী দ্বারা অলঙ্কৃত ইসতার ফটকে (Ishtar Gate) পৌঁছাতে হত। প্রশস্ত এবং মার্বেলখণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত রাজপথ বিশাল প্রাসাদের দিকে চলে গেছে। নেবুচাঁদনেজার তাঁর অপূর্ব সুষমামণ্ডিত গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ (summer palace) নির্মাণ করেন শহরের উত্তর প্রান্তে। প্রাচীন সড়কের শেষপ্রান্তে মারদুকের মন্দির এবং একটি যিকুরাত অবস্থিত ছিল। সুমেরীয় ও অ্যাসিরীয় যিকুরাতের অনুরূপ পিরামিডাকৃতি যিকুরাত নির্মিত হয়েছে ব্যাবিলনে। ব্যাবিলনের বুরুজ বা Tower of Babel নামের উৎপত্তি সম্ভবত এই মন্দির থেকেই হয়েছে।

প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতার অতুলনীয় ঐতিহ্যের আভাস ব্যাবিলনের ধ্বংসস্তূপে পাওয়া যাবে। মেসোপটেমীয় স্থাপত্যশৈলী কৌশল ও অলঙ্করণ রীতির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় নব্য ব্যাবিলনীয় অথবা কালদীয়ান যুগে। নেবুচাঁদনেজার এবং সেনাচেরিবের পৃষ্ঠপোষকতায় মেসোপটেমীয় স্থাপত্যের চরম বিকাশ ঘটে। ইটের প্রয়োগে অতুলনীয় সৌধ নির্মিত হতে থাকে। নেবুচাঁদনেজারের ঝুলন্ত উদ্যান (Hanging Garden) পৃথিবীর অন্যতম সপ্তম আশ্চর্য হিসেবে সুবিদিত ছিল। পিরামিডের আকৃতিতে নির্মিত এই উদ্যানটিকে দূর থেকে মনে হত ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। প্রাসাদের পরপর দুটি প্রবেশপথ বুরুজ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং ইসতার ফটক তৎকালীন সর্বাধিক অলঙ্কৃত প্রাচীর হিসেবে চিহ্নিত হয়। মিনাকরা টালীর ব্যবহারে এই ফটকের প্রাচীর শোভিত ছিল এবং বিভিন্ন নক্‌শা, জীবজন্তু–সিংহ, বৃষ, ড্রাগন দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। অ্যাসিরীয় স্থাপত্যের অনুরূপ ইমারতের ছাদ সমান্তরাল (flat) ছিল, কিন্তু ভল্টের ব্যবহার অব্যাহত থাকে। Etemenanki নামে যে যিকুরাত নির্মিত হয় তা উজ্জ্বল রঙের মিনাকরা টালী দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। অলঙ্করণ পদ্ধতি ও মোটিভের ব্যবহারে প্রাচীন মেসোপটেমীয় ধারা অনুসৃত ছিল।

১.৫ পারস্য সাম্রাজ্য : খ্রীস্টপূর্ব ৫৩৯ সালে সাইরাস পারস্যে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ব্যাবিলন অধিকার করেন। সমগ্র মেসোপটেমীয় ও পারস্যে এ্যাকামেনীয় সাম্রাজ্য

প্রতিষ্ঠা করে এক নতুন সভ্যতা এবং স্থাপত্যরীতির উদ্ভাবন করেন সাইরাস। মহান সাইরাস (Cyrus the Great) পাসারগাদে রাজধানী স্থাপন করেন, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারিগণ প্রথম দরায়ুস (Darius) এবং জ্যারেক্সেস (Xerxes) ইরানের দক্ষিণে সিরাজের নিকটবর্তী পার্সিপলিসে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। খ্রীস্টপূর্ব ৩৩০ সালে আলেকজান্ডার কর্তৃক পার্সিপলিস বিধ্বস্ত হওয়া পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্য অব্যাহত ছিল। বলা বাহুল্য যে, পারস্য সভ্যতা পূর্ববর্তী সভ্যতার প্রভাবে গড়ে ওঠে। মেসোপটেমিয়া, মিশর, লিবিয়া প্রভৃতি সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে এক অভিনব স্থাপত্যরীতির প্রচলন করেন এ্যাকামেনীয়গণ। Ralph and Burns বলেন, "It was the architecture of the Persians, however which gave the most positive expression of the eclectic character of their culture."

পারস্য স্থাপত্যে বিভিন্ন স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ দেখা যাবে। পার্সিপলিসের প্রাসাদের উঁচু প্লাটফর্ম এবং স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ভিত্তিভূমি ব্যাবিলনীয় ও অ্যাসিরীয় স্থাপত্যকলা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। পারস্য স্থপতি ও ভাস্করগণ ডানাবিশিষ্ট বৃষ এবং উজ্জ্বল রঙে মিনাকরা টালী ও অন্যান্য মোটিভ মেসোপটেমীয় স্থাপত্যশিল্প থেকে অনুসরণ করেন। কিন্তু মেসোপটেমিয়ান ভল্টের সাহায্যে উদ্ভূত স্থাপত্য (vaulted architecture) পার্সিপলিসে লক্ষ করা যায় না ; পক্ষান্তরে মিশরীয় স্তম্ভ দ্বারা উদ্ভূত স্থাপত্যকলার (columnar style) প্রতি তারা অনুরক্ত ছিল। এ কারণে পার্সিপলিসে খিলান, গম্বুজ এবং ভল্টের ব্যবহার দেখা যায় না। অপরদিকে খেজুর পাতা এবং পদ্মের প্রয়োগে প্রতীয়মান হয় যে, মিশরীয় স্থাপত্য অলঙ্করণের প্রভাব রয়েছে। স্তম্ভের কুণ্ডলাকৃতি শীর্ষদেশ অবশ্যই গ্রীক স্তম্ভ দ্বারা প্রভাবান্বিত। স্তম্ভের খাঁজও একই উৎসের প্রমাণ করে। Ralph and Burns বলেন, "The latter (Persepolis) built in imitation of the temple at Karnak, had an enormous central audience hall containing a hundred columns and surrounded by innumerable rooms which were used as offices and as quarters for eunuchs and members of the royal harem."[১]।

পারস্য সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানে এ্যাকামেনীয় স্থাপত্যরীতির উন্মেষ ঘটে এবং সমসাময়িক স্থাপত্যকলায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এ্যাকামেনীয় স্থাপত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাসারগাদে খ্রীস্টপূর্ব ৫৫ সালে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সাইরাস প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ করেন। স্তম্ভরাজি সৃষ্টি করা হয় পাথর অথবা কাঠের সাহায্যে এবং কাঠের স্তম্ভগুলো সবুজ, লাল, নীল, হলুদ রঙে রঞ্জিত ছিল। এমনকি ধাতুর পাত দিয়েও মোড়া থাকত। মন্দির সাধারণত নির্মিত হত চতুষ্কোণাকার বুরুজের আকৃতিতে। পাসারগাদে প্রথম সাইরাসের সমাধির এখনও অক্ষত অবস্থান পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঢালু (gable) ছাদ দ্বারা আবৃত ও পিরামিডের স্তরের উপর নির্মিত পাথরের শবাধার (cenataph)। প্রথম দরায়ুস সুসায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। সুসা

---

১. op. cit. p. 93.

প্রাসাদ নির্মাণে দরায়ুস বিভিন্ন স্থান থেকে উপকরণ, স্থপতি ও কারিগর সংগ্রহ করেন ; ব্যাবিলন থেকে রৌদ্রে পোড়া ইট ; লেবানন থেকে দেবদারু গাছ ; yaka নামীয় এক-ধরনের কাঠ ভারতবর্ষ (গান্ধারা) ; ব্যাকটিরিয়া থেকে স্বর্ণ; সকদিয়ানা থেকে মূল্যবান লাপিজলাজুলী পাথর ; খাওয়ারিজম থেকে নীলকান্তমণি (turquoise) ; মিশর থেকে রূপা এবং আবলুস কাঠ (ebony) ; হাতির দাঁত আনা হয় মিশর, ভারতবর্ষ এবং এলেম থেকে পাথর সংগৃহীত হয়। যে সমস্ত শিল্পী সুসার প্রাসাদ নির্মাণে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁদের শৈল্পিক দক্ষতা ছিল অপরিসীম। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁদের আনা হয়; পাথরের খোদাইকারী ও ভাস্করগণ সর্দিয়ান এবং গ্রীক দ্বীপ আইওনিয়ার অধিবাসী ছিল। সোনার কারিগর মিশরীয় এবং মেডেসের অধিবাসী ; হাতির দাঁতের শিল্পী ব্যাবিলন থেকে আসেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন শিল্পধারার সমন্বয় ঘটে সুসার স্থাপত্যকর্মে। ব্যাবিলনীয় রীতিতে (ইসতার ফটক) সুসার প্রাসাদগাত্রে বিভিন্ন রঙের সমাবেশে মিনাকরা টালীর ব্যবহার বৈচিত্র্য আনে। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় দু'টি তীরন্দাজের প্রতিকৃতি। সাসানীয় নৃপতি দ্বিতীয় শাহপুর সুসাকে ধ্বংস করে নিশাপুর নামে একটি নতুন শহর নির্মাণ করেন।

সুসায় প্রাসাদ নির্মিত হলেও প্রথম দরায়ুস পার্সিপলিসে খ্রীস্টপূর্ব ৫১৮-১৬ সালে একটি ধর্মীয় রাজধানী (Ritual capital) স্থাপন করেন। এ্যাকামেনীয় স্থাপত্যের অসাধারণ কীর্তি পার্সিপলিস পূর্ববর্তী স্থাপত্যশৈলীর উপর নির্ভরশীল ছিল। পোপ বলেন যে, "Persepolis itself exhibits magnitude, power and wealth, with a commanding force sufficient to evoke those powers."

পাথরের পাহাড়ের সুউচ্চ ভিত্তিভূমিতে বিশাল পরিকল্পনায় নির্মিত হয় পার্সিপলিস। ৯০০ × ১৫০০ ফুট পরিমাণের প্লাটফর্মের উপর নির্মিত এই অত্যুৎকৃষ্ট প্রাসাদের বিভিন্ন ভবন ও কুঠরী ছিল, যেমন– সুবিস্তীর্ণ সিঁড়ি, সকল জাতীয় ফটক (Gate of all Nations) জারেকসেসের প্রাসাদ, আপাদানভ বা সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট হল, দরায়ুসের প্রাসাদ। পার্সিপলিসের স্থাপত্যকর্ম মূলত পাথর দিয়ে সৃষ্টি। যদিও প্রাসাদগাত্রে এবং প্রাচীরে রৌদ্রে পোড়া ইটের ব্যবহার একেবারেই অসম্ভব ছিল না। সকল জাতীয় ফটকের দু'পাশে অ্যাসিরীয় ভাস্কর্যের প্রভাবে এ্যাকামেনীয় নরপতিদের মুখমণ্ডল-সম্বলিত ডানাযুক্ত জোড়া বৃষমূর্তি যেন পাহারাদারের কাজ করছে। জারেকসেসের প্রাসাদ স্তম্ভ দ্বারা নির্মিত এবং স্তম্ভগুলোর শীর্ষদেশ বৃষ, সিংহ অথবা গ্রিফিনের আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়। এ্যাকামেনীয় ভবনগুলোর ছাদ ছিল সমান্তরাল এবং ছাদ দেবদারু, সেগুন অথবা আবলুস কাঠের বীম দিয়ে আচ্ছাদিত। উল্লেখ্য যে, কোনো প্রকার খিলানের ব্যবহার দেখা যায় না ; সুসার প্রাসাদেও অনুরূপ স্তম্ভ (bull capital) এবং কাঠের ছাদ ব্যবহৃত হয়। অ্যাসিরীয় পাথর খোদাই (bas relief)-এর অনুকরণে পার্সিপলিসের প্রাসাদগাত্রে বিভিন্ন নক্শা উৎকীর্ণ করা হয়।

এ্যাকামেনীয় স্থাপত্যে ব্যবহৃত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অলঙ্করণ রীতি পরবর্তীকালে মুসলিম ও ভারতীয় বৌদ্ধ স্থাপত্যে প্রভাব বিস্তার করে, বিশেষ করে বৃষ শীর্ষদেশসম্বলিত স্তম্ভ। যে সমস্ত মোটিভ ও অলঙ্করণ রীতিকে উৎকর্ষ দিয়েছে তা হচ্ছে পদ্মফুল, তালপাতা,

আওনিয়ান কুণ্ডলী (Ionian volutes) বৃষ, সিংহ ও গ্রিফিনের আকৃতিতে খোদাইকৃত শীর্ষদেশ, ছোট গোলাপ, পিরামিড-এর আকৃতিতে নির্মিত প্যারাপেট সূর্যমুখী ফুল ইত্যাদি।

খ্রীস্টপূর্ব ৩৩০ সালে মহাবীর আলেকজান্ডার পার্সিপলিস দখল ও ধ্বংস করলে এ্যাকামেনীয় বংশের পতন হয়। গ্রীক আধিপত্য বিস্তারের ফলে পারস্য শিল্পকলার ধারা স্তিমিত হলেও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়নি। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পারস্যের উত্তরাঞ্চল থেকে পার্থিয়ান নামে এক জাতির উদ্ভব হয় এবং ক্রমশ তারা সেলুকাসের রাজ্য দখল করে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

১.৬ **পার্থিয়ান সাসানীয় :** খ্রীস্টপূর্ব ১২৩ সালে দ্বিতীয় মিথরিদাটেসের রাজত্বকালে পারস্য শিল্পকলা পুনরুজ্জীবিত হয় এবং স্থাপত্যের পুনরায় বিকাশ ঘটে। রাজধানী হাটরা (Hatra) একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। হাটরার প্রাসাদ বিশালাকার পাথরের তৈরি ছিল এবং সম্মুখের দিকে দুটি প্রবেশপথ দিয়ে ব্যারাল ভল্ট দ্বারা আবৃত দুটি আইওয়ানে যাওয়া যেত। পোপ বলেন, "These large ivans parallel to each other in this instance will later develop into the grant ivan entrances of the Islamic epoch"।[১] পোপ বলেন যে, হাটরার উদ্ভাবিত আইওয়ান পরবর্তীকালে সাসানীয় স্থাপত্যেই নয়, পারস্যের মুসলিম স্থাপত্যের মূলভিত্তি ছিল। উপরন্তু, প্রদক্ষিণ পথবেষ্টিত চতুষ্কোণার প্রকোষ্ঠ পরবর্তী যুগে সাসানীয় এবং ইসলামী ইমারতে, বিশেষ করে গম্বুজ দ্বারা আবৃত চতুষ্কোণাকার কুঠরী বা সমাধিতে প্রয়োগ দেখা যায়। পার্থিয়ান আমলে নির্মিত আমুরের প্রাসাদে সর্বপ্রথম অঙ্গনের দিকে সংযোজিত চারটি আইওয়ানের ব্যবহার রয়েছে, যার ক্রশাকৃতি নক্‌শা অসম হলেও পরবর্তীকালে পারস্য মসজিদ ও মাদ্রাসাকে প্রভাবান্বিত করে। আমুর প্রাসাদের ফাসাদ বা সম্মুখ-প্রাচীর টেসিফোনে নির্মিত তাক-ই-কিসরা প্রাসাদের সম্মুখভাগের পূর্বসুরি। মুসলিম স্থাপত্যে এই রীতি pishtaq নামে পরিচিত, পার্থিয়ান স্থাপত্যে ভুসুয়ার্স খিলানের ব্যবহার দেখা যাবে, যেমন– তাক্‌ত-ই-সুলায়মান।

পার্থিয়ানদের পতনের পর ২২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম আরদাশির কর্তৃক সাসানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সাসানীয় বংশ রাজত্ব করে। তিনি ফিরোজাবাদে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। প্রাচীন সুমেরীয় এবং ব্যাবিলনীয় ভল্টের রীতিতে প্রধান আইওয়ান প্রবেশ পথটি নির্মিত। এর পাশেও দুটি আয়তাকাব আইওয়ান এবং পিছনে তিনটি গম্বুজবিশিষ্ট কুঠরী রয়েছে। পোপের মতে, এই গম্বুজগুলো ইরানের সর্বপ্রাচীন গম্বুজ। সাসানীয় রাজত্বে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি হচ্ছে টেসিফোনে বা ইসতিখারে নির্মিত অতুলনীয় প্রাসাদ তাক-ই-কিসরা। তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে প্রথম শাহপুর কর্তৃক নির্মিত এই প্রাসাদটি সাসানীয় আইওয়ানের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাসানীয় স্থাপত্য তথা পরবর্তীকালে মুসলিম স্থাপত্যকলায় তাক-ই-কিসরার প্রবেশপথে যে সুউচ্চ ভল্টবিশিষ্ট আইওয়ান এবং অলঙ্কৃত সম্মুখ-প্রাচীর

---

১. op. cit. p. 47, Fig. 33

(facade) রয়েছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ৭৫ ফুট ব্যাস, ৯০ ফুট উঁচু এবং ১৫০ ফুট গভীর এই আইওয়ানের উভয় পাশে ২২ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীর-নক্‌শা খুবই আকর্ষণীয়। সমান্তরাল কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করে facade-টির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং প্রতিটি স্তরে একজোড়া সংলগ্ন স্তম্ভের সাহায্যে অসংখ্য blind খিলানের সৃষ্টি করা হয়েছে। মূল আইওয়ানের খিলানটি আগুনে পোড়া ইট দ্বারা তৈরি এবং খিলানের আকৃতি catenary ধরনের। Papadopaoulo বলেন, "The open fronted ivan later became a common place of Muslim Architecture." তাক-ই-কিসরার ভল্টের প্রভাব পারস্যের মসজিদ ছাড়াও ভারতবর্ষের বহু মসজিদে পরিলক্ষিত হয়। ব্যারাল ভল্টের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হযরত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের 'নেভ'-এর উপর নির্মিত ভল্টটি। তৃতীয় শতাব্দীতে নিশাপুরে নির্মিত শাহপুরের অপর একটি প্রাসাদে ভল্ট এবং গম্বুজের সমন্বয় দেখা যাবে এবং স্ট্রাবোর তৈরি একটি কুলুঙ্গী (niche) স্ক্রল বা লতাপাতার কুণ্ডলী প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান ইমারতকে সমৃদ্ধ করেছে।

সাসানীয় স্থাপত্যকলায় গম্বুজ নির্মাণকৌশল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সারবিস্তানে নির্মিত পঞ্চম বাহরামের প্রাসাদ স্কুইঞ্চের সাহায্যে গম্বুজ তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রাচীরের স্থলে স্তম্ভের সাহায্যে গম্বুজ সম্ভবত পারস্যের এই প্রাসাদে প্রথম নির্মিত হয়। কৌণিক স্কুইঞ্চের ব্যবহার পরবর্তী পর্যায়ে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে নির্মিত কসর-ই-শিরিনের প্রাসাদ-গম্বুজে দেখা যাবে। স্কুইঞ্চের ধারা মুসলিম পারস্য এবং ভারতবর্ষের মুসলিম ইমারতে অব্যাহত থাকে। অলঙ্করণের ক্ষেত্রে সাসানীয় স্থাপত্যের বিশেষ অবদান রয়েছে। পৌরাণিক বৃক্ষ, যেমন– তালপাতা, ক্ষুদ্রাকৃতি তালপাতা (palmette) ছাড়া ডালিম এবং দ্রাক্ষা, লতাপাতা, জীবনবৃক্ষ (Tree of life) গ্রীক প্রভাব থাকলেও সাসানীয় অলঙ্করণ রীতির মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। কৌণিক স্কুইঞ্চের ব্যবহার ইরানে প্রথম দেখা যাবে দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত নিশাপুরের অগ্নিমন্দিরে। স্কুইঞ্চের সাহায্যে চতুষ্কোণকে অষ্টভুজে রূপান্তরিত করে গম্বুজ নির্মাণ করা হয়। এক গম্বুজবিশিষ্ট চতুষ্কোণাকার ইমারত নির্মাণে এ ধরনের সাসানীয় অগ্নিমন্দিরের প্রভাব রয়েছে। স্তম্ভের ব্যবহার সীমিত হলেও যে কয়েকটি স্তম্ভের নিদর্শন তাক-ই-বুসতানে (ষষ্ঠ শতাব্দী) দেখা যায় তা খুবই আকর্ষণীয়।

এ প্রসঙ্গে লতাপাতার নক্‌শার (foliate) শীর্ষদেশ এবং জাফরি কাটা (lattice) শীর্ষদেশসম্বলিত স্তম্ভ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পোপ বলেন : "Fretwork and various types of imbrication enlivened many a panel and beaded circles or carefully wrought square frames provided designs that were used not only in architectural ornament but in a rich and masculine textile art as well. By its won excellence and display of vitality, Sasanian ornament passed beyond the borders of the Sasanian Empire to become a stimulating factor in Coptic Egypt, Rome, Byzantium and medieval Europe. In addition to its westward

diffusion, it exerted constructive influence eastward across Asia to become influential not only in India, but especially in the arts ot T'ong Chin".[১]

২. বায়জানটাইন :

নবী করীম হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর সময় থেকে আরব দেশের সঙ্গে আরব ভূখণ্ডের বাইরের যোগাযোগ ছিল। কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। ৬২৮ সালে হুদায়বিয়া সন্ধির পর মহানবী (সাঃ) তাঁর প্রিয় শিষ্যদের ধর্মপ্রচারার্থে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন। বিভিন্ন রাজ্যের সম্রাট ও রাজপুরুষদের ন্যায় ও সত্যের ধর্ম ইসলামের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবার জন্য আমন্ত্রণলিপিসহ দূত প্রেরণ করা হয়। সিলমোহর করা আমন্ত্রণপত্র আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারস্য অধিপতি খসরু পারভেজ, আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা মাকৃকাস প্রমুখ শাসনকর্তার নিকট পাঠানো হয়।

আবিসিনিয়ার ভূপতি শ্রদ্ধাভরে পত্র গ্রহণ করে ইসলাম কবুল করেন। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস সাদরে ও যথোপযুক্ত সম্মানসহকারে মুসলিম দূত দাহিয়াতুল কালবীকে অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে বিনীতভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অপারগতার কথা জানান। আলেকজান্দ্রিয়ার রোমক শাসনকর্তার নিকট হাতিব ইবনে আবী বালতাআকে প্রেরণ করা হয়। পত্র পাঠ করে তিনি বলেন "তিনি (রসূল করীম) সেই রসূল যাঁর আগমন সম্বন্ধে হযরত ঈসা ভবিষ্যদ্বাণী করেন।" রোমক এবং আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা বায়জানটাইন নৃপতি ছিলেন।

খলিফা আবুবকর (রাঃ)-এর শাসনামলে ৬৩৪ খ্রীস্টাব্দে আজনাদাইনের যুদ্ধে বায়জানটাইন সেনাবাহিনী পরাজয়বরণ করলে সিরিয়ায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তৃত হয়। হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের অসীম বীরত্বে ইয়ারমুকের যুদ্ধে সম্রাট হিরাক্লিয়াস পরাজিত হন এবং জেরুজালেমসহ সমগ্র সিরিয়া মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। হযরত উমর (রাঃ) স্বয়ং জেরুজালেমে আগমন করে শহরের হস্তান্তর গ্রহণ করেন। মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে সমগ্র সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিশর বায়জানটাইন সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ইসলাম আরব ভূখণ্ডের বাইরে প্রতিষ্ঠিত হলে স্থাপত্যরীতির আমূল পরিবর্তন হয় এবং খুবই অসাধারণ ও অনাড়ম্বর স্থাপত্যরীতি বায়জানটাইন স্থাপত্যশৈলীর মুখোমুখি হয়।

সম্রাট কনস্টানটাইন ৩১৩ খ্রীস্টাব্দ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং ৩৩০ খ্রীস্টাব্দে কনস্টানটিনোপলে (পূর্বনাম বায়জানটিয়াম—বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল) নতুন রাজধানী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বায়জানটাইন সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়। ৩৩০ থেকে ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী সুলতান প্রথম মুহম্মদ কর্তৃক কনস্টানটিনোপল বিজয় পর্যন্ত বায়জানটাইন সাম্রাজ্য স্থিতিশীল ছিল। বলা বাহুল্য যে, বায়জানটাইন স্থাপত্য ও চিত্রকলা

১. Op. cit. p. 65.

প্রাক্-বায়জানটাইন প্রভাব দ্বারা উদ্ভূত। ডেভিড টেলবট রাইস বলেন, "It was this fusion that was the very essence of the Byzantine elements from Rome, from the Hellenistic world and from the East being welded together and tempered by the directing influence of the new Christian faith."[১] শিল্পকলার সংমিশ্রণের ধারা জাস্টিনিয়ানের (৫২৭-৬৫) রাজত্বে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে এবং সান্তা সোফিয়া (আয়া সোফিয়া) গির্জায় বায়জানটাইন স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। রাইস বলেন, "Sancta Sophia was erected as Cathedral of Christendom and it has ever since remained one of the world's most important buildings; an essentially Byzantine architectural style was established."[২]

বায়জানটাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ৩৩০ থেকে ৩৯৫ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম থিউডোসিয়াসের রাজত্ব পর্যন্ত প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্য অবিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু থিউডোসিয়াসের মৃত্যুর পর রোমীয় সাম্রাজ্য দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি পূর্ব রোমীয় সাম্রাজ্য যার রাজধানী ছিল কনস্টানটিনোপলে এবং পশ্চিম রোমীয় সাম্রাজ্য যার রাজধানী ছিল রোম। ৩৯৫ থেকে তৃতীয় থিউডোসিয়াসের রাজত্ব পর্যন্ত বায়জানটাইন শিল্পকলার ধারা অব্যাহত ও সুসংহত ছিল, কিন্তু ৭২৬ থেকে ৮৪৩ সাল পর্যন্ত বিমূর্ত চিত্রশিল্পের প্রচলন হয় ইসলামের মূর্তিবিরোধী চিত্রকর্মের প্রভাবে (Iconoclastic period)। ইসলামে জীবিত প্রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কন নিষিদ্ধ—এই মতবাদের ফলশ্রুতি হিসেবে বায়জানটাইন শিল্পে যীশুখ্রীস্টের প্রতিকৃতি অঙ্কন বন্ধ হয়ে যায়। কেবলমাত্র জ্যামিতিক প্রতীকধর্মী ক্রশ মোটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এরপর ৮৪৩ থেকে ১২০৪ সাল পর্যন্ত বায়জানটাইন শিল্পকলা পূর্বের রীতি পুনরুজ্জীবিত করে অসংখ্য গির্জা নির্মাণ করে। বায়জানটাইন সাম্রাজ্যের অনেক উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে পালিওলোগের যুগ (Palaeologue age : ১২৬১-১৪৫৩) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১২৬১ খ্রীস্টাব্দে মাইকেল প্যালিওলোগাস কনস্টানটিনোপল দখল করে বায়জানটাইন শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর সাম্রাজ্য রাজধানী কনস্টানটিনোপল স্যালোনিকাসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় মুহম্মদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে উছমানী তুর্কীগণ কনস্টানটিনোপল অবরোধ ও দখল করলে বায়জানটাইন সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়।

বায়জানটাইন স্থাপত্যশিল্পের মূল উৎস ছিল গ্রীক রোমীয় স্থাপত্যিক ঐতিহ্য। ৩৩০ সালে কনস্টানটিনোপলে যে ধরনের স্থাপত্যশৈলীর উদ্ভব হয় তাকেই বায়জানটাইন বলা হয়। পরবর্তীকালে এই শিল্পরীতি সমগ্র পূর্ব রোমীয় সাম্রাজ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। মুসলিম বিজয় একদিকে যেমন সাসানীয় অপরদিকে বায়জানটাইন শিল্পকলার ঐতিহ্যের সংস্পর্শে আসার নিশ্চয়তা দান করে। মুসলমানগণ

---

১. Byzantine Art, 1962, p. 16

২. ibid, p. 21

উত্তরাধিকারসূত্রে বায়জানটাইন স্থাপত্যকীর্তি ও শিল্পকলার ঐতিহ্য লাভ করে, ঠিক যেমনভাবে তাদের পূর্বে বায়জানটাইনগণ রোমক এবং রোমকগণ গ্রীসের শিল্পকলার উত্তরাধিকার লাভ করে। সুতরাং উমাইয়া খিলাফতের শুরু থেকেই মুসলিম স্থাপত্যে শিল্পকলা বায়জানটাইন শিল্পরীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। কনস্টানটিনোপলে উন্নতমানের পাথর পাওয়া যেত না। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত ও প্রস্তুত ইট এবং কংক্রিটের জন্য rubble ব্যবহার করা হত। বহু দূর-দূরাঞ্চল থেকে মার্বেল সংগ্রহ করে ইমারতে প্রয়োগ করার প্রথা ছিল। পূর্ব রোমীয় সাম্রাজ্যে নতুন স্থাপত্যরীতির উদ্ভব হয়। স্থপতিগণ গম্বুজের সাথে সমান্তরাল ছাদও নির্মাণ করত। দেওয়ালে ছোট ছোট জানালা এবং খিলানপথের সৃষ্টি বায়জানটাইন স্থাপত্যের অভিনবত্ব সৃষ্টি করে।

বায়জানটাইন স্থাপত্যকলায় দুটি পৃথক রীতি লক্ষ করা যাবে। প্রথম পর্যায়ে ৩৩০ থেকে ৫৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ; দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু ৫৩৭ সালের পর থেকে। প্রথম পর্যায়ের সূচনা হয় কনস্টানটাইন কর্তৃক কনস্টানটিনোপলে বায়জানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর থেকে এবং এই ধারা অব্যাহত থাকে জাস্টিনিয়ান কর্তৃক কনস্টানটিনোপলে সান্তা সোফিয়া গির্জা নির্মাণ পর্যন্ত। ৫০৭ সালে সান্তা সোফিয়া গির্জা নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই গির্জা অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে বায়জানটাইন গির্জাগুলোতে। বস্তুত বায়জানটাইন স্থাপত্যের ইতিহাস গির্জারই ইতিহাস। প্রথম পর্যায়ে দুধরনের গির্জা নির্মিত হয়। প্রথমটি আয়তাকার তিনটি আইল-বিশিষ্ট ব্যাসিলিকা (গির্জা) ধরনের ; এতে অক্ষরেখা থাকত সমান্তরাল, মাঝের আইলটিকে বলা হত 'নেভ' ; 'নেভ' পার্শ্ববর্তী আইল দুটির চেয়ে উঁচু করে নির্মিত হত আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য (clerestory)। রাইস বলেন, "Basilicas, with the characteristic three aisles divided by columns were much in favour all over the Christian world during the first two or three centuries of official Christianity for they were economical and simple to build and at the same time held a large body of people"[১] খ্রীস্টান যুগের পূর্বে ব্যাসিলিকার প্রচলন ছিল বিশেষ করে হেলেনিস্টিক এবং রোমীয় যুগে। রাইস বলেন যে, কাঠের ছাদবিশিষ্ট রোমীয় ব্যাসিলিকা প্রথমদিকে গির্জা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ব্যাসিলিকার নিদর্শন পাওয়া যাবে রাভেন্নার Basilica Ursiana (৩৭০-৮৪ খ্রীস্টাব্দ), ব্যালবেকের কনস্ট্যানটাইন গির্জায় এবং জেরুজালেমের Holy Sepulchre গির্জায়। প্রাক্-খ্রীস্টীয় যুগের ইমারত থেকে মার্বেল স্তম্ভ ও ভল্টের ছাদ রয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীতে সেলোনিকায় নির্মিত St. Demetrius-গির্জায় গোলাকার স্তম্ভের সঙ্গে আয়তাকার পিয়ারের পর্যায়ক্রম ব্যবহার সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়। ক্রমশ রোমীয় গোলাকার খিলান এবং করিন্থীয় শীর্ষদেশসম্বলিত মার্বেল স্তম্ভের প্রয়োগ হতে থাকে। পুরাতন St. Peter গীর্জা (২৬ খ্রীঃ) এবং Sancta Sofia গির্জা বায়জানটাইন ব্যাসিলিকা গির্জার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। শেষোক্ত দৃষ্টান্তে খিলানরাজির উপর জানালার প্রয়োজনে ক্ষুদ্র

---

১. op. cit, p. 59.

খিলানরাজি সৃষ্টি করা হয়েছে। দামেস্কের মসজিদে এ ধরনের দ্বিতীয় খিলানশ্রেণী লক্ষ করা যায় লিওয়ান ও রিওয়াকে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্তম্ভের শীর্ষদেশের উপর Impost বা পৃথক প্রস্তরখণ্ড স্থাপনের প্রথা সার্বজনীনভাবে সমাদৃত হয়। গির্জাগুলোর পূর্বদিকে এক অথবা তিনটি অর্ধবৃত্তাকার অবতল কুলুঙ্গী (মিহরাবের সঙ্গে সমতুল্য) বা apse নির্মিত হয়। কখনও তিনটি আইলের স্থলে পাঁচটি আইলবিশিষ্ট ব্যাসিলিকা গির্জা দেখা যাবে। অর্ধবৃত্তাকারের স্থলে বহুভুজাকৃতি apse সৃষ্টি করা হয়েছে (র‍্যাভেন্না)।

বায়জানটাইন স্থাপত্যের প্রথমযুগে আয়তাকার ছাড়াও গোলাকার ব্যাসিলিকা নির্মিত হয়েছিল। গোলাকার ইমারতের প্রাচীনতম নিদর্শন সম্ভবত Spalato-তে Diocletian's Palace-এ নির্মিত সমাধি। গম্বুজবিশিষ্ট গোলাকার বায়জানটাইন গির্জার নিদর্শন রয়েছে রোমের Sancta Costanza গির্জা (৩২৪-২৬ খ্রীঃ), জেরুজালেমের Church of the Resurrection (৩২৭-৩৫ খ্রীঃ) এবং র‍্যাভেন্নায় St. Vitale গির্জা (৫২৬-৪৭ খ্রীঃ) এবং কনস্টানটিনোপলে সেন্ট সার্জিয়াস ও সেন্ট বাক্কাস গির্জায় (৫২৬-৩৭ খ্রীঃ)। সান্টা কসটানজায় অভ্যন্তরীণ গোলাকার স্থানটিতে (rotunda) মার্বেলের সাহায্যে ইটের গম্বুজ নির্মিত হয়েছে এবং মাত্র একটি প্রদক্ষিণ-পথ দ্বারা বেষ্টিত। Resurrection গির্জায় গোলাকার (rotunda) স্থানটি অষ্টভুজ দ্বারা বেষ্টিত। লক্ষণীয় যে, কুব্বাতুস সাখরায় দ্বিতীয় অষ্টভুজ দেখা যাবে। রোমের সান্তা স্টীফানো (৪৬৮ খ্রীঃ) গির্জায় প্রথম অষ্টভুজ এবং পরপর দুটি গোলাকার প্রদক্ষিণপথ লক্ষ করা যাবে। অপরদিকে র‍্যাভেন্নার St. Vitale গির্জাটি দুটি অষ্টভুজসম্বলিত গম্বুজাকৃতি ইমারত।

গোলাকার গির্জা ব্যতীত চতুষ্কোণাকার ধর্মমন্দির খ্রীস্টানদের খুবই প্রিয় ছিল। এই দুটি রীতির সমন্বয়ে সৃষ্ট style-কে centralized type বলা হয়। বসরার গির্জা (Cathedral of Bosra) (৫১২-১৩ খ্রীঃ) একটি চতুষ্কোণাকার গম্বুজবিশিষ্ট ইমারত এবং গম্বুজটি চারটি পিয়ারের উপর স্থাপিত। চতুষ্কোণাকার ইমারতে গম্বুজ নির্মাণ দুরূহ সমস্যা সন্দেহ নেই। কিন্তু চতুর স্থপতিগণ দুটি পন্থা উদ্ভাবন করেন, যথা : (ক) পেনডেনটিভ এবং (খ) স্কুইঞ্চ। পেনডেনটিভের উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে মতবিরোধ রয়েছে। সিরিয়ায় পেনডেনটিভের ব্যবহার ছিল। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে জেরাস আম্মান এবং সামারিয়াতে নির্মিত ইমারতে পেনডেনটিভ দেখা যায় এবং সম্ভবত সেই কারণেই বলা যায় যে, সিরিয়া থেকে বায়জানটাইন স্থাপত্যে অনুসৃত হয়। যদিও বায়জানটাইন গির্জায় পেনডেনটিভের বহুল প্রয়োগ দেখা যায় তবুও স্কুইঞ্চের নিদর্শনও পাশাপাশি ছিল, যেমন– নেপলসের Bapistry of Soter (৪৬৫-৮১ খ্রীঃ)। স্কুইঞ্চের উৎস সম্বন্ধে মতানৈক্য রয়েছে। এ সত্ত্বেও বলা যায় যে, এটি পূর্বদেশীয় স্থাপত্যকলার উদ্ভাবন, বিশেষ করে সাসানীয় যুগে পারস্যের ফিরোজাবাদ প্রাসাদে এর দৃষ্টান্ত দেখা যাবে খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে।

বায়জানটাইন স্থাপত্যের স্বর্ণযুগের সূচনা হয় জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকালে। ৫৩২ সালে জাস্টিনিয়ান মেলিটাসের ইসিডর (Isidore) এবং থ্রেলেসের অ্যান্টিমিয়াস (Antimius)-কে বায়জানটাইন স্থাপত্যের সর্বোৎকৃষ্ট ইমারত নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ

করেন। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে এই অতুলনীয় কীর্তির নির্মাণ সমাপ্ত হয়। কনস্ট্যানটাইন যে বায়জানটাইন স্থাপত্যরীতির প্রবর্তন করেন তার মাত্র দু শতাব্দীর মধ্যে সান্তা সোফিয়ায় পূর্ণতা ও চরম উৎকর্ষ লাভ করে। সান্তা সোফিয়া গির্জার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, বায়জানটাইন স্থাপত্যশিল্পের দুটি ধারা–ব্যাসিলিকা এবং গম্বুজবিশিষ্ট চতুষ্কোণ–এই অসাধারণ শৈল্পিক নৈপুণ্যে সৃষ্ট ইমারতে সংমিশ্রিত হয়েছে। মূলভূমি পরিকল্পনা ছিল স্তম্ভের উপর চিরাচরিত রীতিমাফিক 'free cross' ধরনের গির্জা নির্মাণ। কিন্তু এই গির্জার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ হচ্ছে গম্বুজ। গির্জার মধ্যস্থলে চারটি মোটা পোস্তা ধরনের (buttress) পিয়ারের উপর থেকে খিলানের সাহায্যে গম্বুজ নির্মিত হয়। চতুষ্কোণ থেকে গোলাকার স্তরে উত্তরণের জন্য পেনডেনটিভ ব্যবহৃত হয়েছে। সান্তা সোফিয়া গির্জার গম্বুজের ব্যাস ১০৭ ফুট এবং ভূমি থেকে ১৮০ ফুট উঁচু। রাইস এই অত্যুৎকৃষ্ট স্থাপত্যিক সৃষ্টির প্রশংসা করে বলেন, "But only a genius could have produced from such diverse elements, a building which was in itself so definite a unity as Sancta Sophia, and which was not only to work a stage in the history of architecture but was also to survive for some fourteen hundred years as the most glorious representative of its class."[১] সান্তা সোফিয়া গির্জার প্রভাব কেবলমাত্র পরবর্তী গির্জাতেই দেখা যাবে না, যেমন– সেলোনিকার সান্তা সোফিয়া (ষষ্ঠ শতাব্দী) অথবা লাইসীয়ার Church of the Assumption ; অটমান তুরস্কে ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত মসজিদসমূহ ও কনস্টানটিনোপলের প্রখ্যাত গির্জা ভূমি নক্শা দ্বারা প্রভাবান্বিত।

১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে কনস্টানটিনোপল তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ কর্তৃক অধিকৃত হলে বায়জানটাইন সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং সান্তা সোফিয়া গির্জা মসজিদে রূপান্তরিত হয়। গির্জার মোজাইক চিত্রগুলো ঢেকে দেওয়া হয় এবং চার কোণায় সরু ও দীর্ঘ মিনার নির্মিত হয়। বর্তমানে এটি জাদুঘর হিসেবে পর্যটকদের আকর্ষণ করছে।

বায়জানটাইন স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, গ্রীক ও রোমান স্থাপত্যই হচ্ছে এর মূল উৎস। কিন্তু বিভিন্ন উপাদানের উৎকর্ষে বায়জানটাইন স্থাপত্য ও অলঙ্করণরীতি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাচ্যদেশীয় উপকরণ হলেও গম্বুজ বায়জানটাইন স্থাপত্যে ব্যাসিলিকার পাশাপাশি এক অভিনব দিকের সূচনা করে। এই গম্বুজ মঠ, সমাধি ও গির্জায় বহুল প্রয়োগ দেখা যাবে। স্তম্ভরাজির (columnar style) পাশাপাশি গম্বুজ (domical construction) নির্মাণ এবং এই দুই ধারার সমন্বয় বায়জানটাইন স্থাপত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মূলত ভল্ট এবং গম্বুজের চরম উৎকর্ষ লক্ষ করা যায়। সান্তা সোফিয়া গির্জায়, গম্বুজ নির্মাণের কৌশল বায়জানটাইন স্থপতি আয়ত্ত করতে সক্ষম হন এবং আদি খ্রীস্টান গির্জাগুলোর সঙ্গে বায়জানটাইন গির্জাগুলোর তুলনা করলে প্রতীয়মান হবে যে প্রাচীনতম গির্জাগুলোতে

---

১. op. cit. p. 20.

ঘণ্টা, বুরুজ (campanile) ছিল, কিন্তু বায়জানটাইন গির্জায় কোনো bell tower ছিল না। লক্ষণীয় যে, মিনারের সঙ্গে এ ধরনের বুরুজের সাদৃশ্য রয়েছে। বায়জানটাইন স্থাপত্য বিশেষত গম্বুজ দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং কখনও কখনও একটি বিশাল কেন্দ্রীয় গম্বুজের চারিপাশে ক্ষুদ্রাকৃতি গম্বুজ সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে লম্বালম্বি রেখা বা vertical impression সহজেই নজরে পড়ে। বায়জানটাইন গম্বুজ প্রকৃত গম্বুজ, কারণ, পেনডেনটিভের মাধ্যমে ইট, পাথর এবং কংক্রিট দ্বারা নির্মিত এবং আকৃতিতে গোলার্ধের মতো (hemispherical)। কিন্তু প্রাচীনতম গির্জাগুলোর গম্বুজগুলোতে গম্বুজ ছিল না এবং থাকলেও ভল্টের সাহায্যে নির্মিত। সেন্ট ভিটেল গির্জার গম্বুজটিকে ঠিক গম্বুজ বলা যায় না, কারণ ছোট ছোট পোড়ামাটির টালীর সংযোগ করে কাঠের ছাদ নির্মিত হয়েছে, যদিও আকারে গম্বুজের মতো দেখায়। গম্বুজ নির্মাণের চরম উৎকর্ষ প্রকাশ পায় সান্তা সোফিয়া গির্জায় গম্বুজের আকৃতি গঠন ও স্থাপত্যশৈলীতে যা আকৃত্রিম, অসাধারণ ও খুবই হালকা : "It is a dome pierced by forty windows, which in the words of a contemporary, seemed not to rest upon a solid foundation, but to cover the place beneath as though it was suspended from heaven by a golden chain."

গম্বুজের চারিপাশে জানালার ব্যবহার খুবই আকর্ষণীয় এবং আলো-বাতাস প্রবেশের সহায়ক। বায়জানটাইন স্থাপত্যে অর্ধগোলাকার, রোমীয় ধরনের খিলান ব্যবহৃত হয়েছে। গম্বুজ নির্মাণের জন্য চারটি অর্ধগোলাকার খিলান একটি চতুষ্কোণাকার স্থান থেকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয় ; যেমন—সান্তা সোফিয়া গির্জা এবং গম্বুজের ব্যাস চতুষ্কোণের ব্যাসের সমতুল্য হতে হয়। কখনও কখনও গম্বুজ একটি বৃত্তাকার ড্রামের উপর স্থাপিত হয়। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বায়জানটাইন গম্বুজ রোমীয় গম্বুজ অপেক্ষা অধিকতর দক্ষতাপূর্ণ এবং হালকা ছিল।

ভল্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে বায়জানটাইন স্থপতি চাতুর্যের পরিচয় দেন। অনেক গির্জায় ক্রশাকৃতি নক্শার সঙ্গে ভল্টের সমন্বয় দেখা যাবে, যেমন—সান্তা সোফিয়া গির্জায় কখনও কখনও কেন্দ্রীয় গম্বুজের চারপাশে ক্রশের চার বাহুর শেষ প্রান্তে চারটি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত ভেনিসের সেন্ট মার্কের গির্জা বায়জানটাইন বহুগম্বুজবিশিষ্ট ইমারতের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। গম্বুজের আকৃতি সাধারণত তিন প্রকারের—(ক) খুবই সাধারণ পেনডেনটিভ দ্বারা ; (খ) জটিল (compound) অর্থাৎ পেনডেনটিভ দ্বারা নির্মিত গম্বুজের উপরে পৃথকভাবে আর একটি গম্বুজ ড্রামের উপর তৈরি করা হয় (সেন্ট মার্কের গির্জায় দুটি গম্বুজ দেখা যাবে); (গ) তরমুজের আকৃতি অর্থাৎ খাঁজকাটা গম্বুজ সেন্ট থিওডোর এবং সেন্ট সার্জিয়াস। অতি সাধারণ গ্রীক স্তম্ভের পরিবর্তে বায়জানটাইন গির্জায় নতুন ধরনের শীর্ষদেশ সংযুক্ত করা হয় ; যেমন—কোর্নিক একান্থাস পাতার নক্শাসম্বলিত (করিন্থীয়), আইওনিক, কমপোজিট (আইওনিও এবং করিন্থীয়), মুখাকৃতিসহ একান্থাস (floriated head), বৃষসম্বলিত (with bull), ঈগল সম্বলিত (with eagle) প্রভৃতি। কিন্তু স্তম্ভের বিন্যাসে বায়জানটাইন impost capital বা শীর্ষদেশের উপর পৃথক একটি প্রস্তরখণ্ডের ব্যবহার প্রচলিত হয়। এটি খিলানকে

নির্মাণ করতে সাহায্য করে। ইংরেজি পরিভাষায় এটি abacus বা dosseret block নামে পরিচিত। সান্তা সোফিয়ায় ব্যবহৃত পাখি ও ঝুড়ির নক্‌শাসম্বলিত শীর্ষদেশ (bird and basket capital) বিশেষভাবে আকর্ষণীয়।

বায়জানটাইন গির্জার দেওয়াল সাধারণত ইটের তৈরি ছিল এবং অভ্যন্তরে রঙিন মার্বেল পাথর অথবা উজ্জ্বল গ্লাস মোসাইক দ্বারা আচ্ছাদিত করা হত। বাইরের প্রাচীর খুবই সাদাসিধা ছিল। কখনও কখনও প্রাচীর ইট এবং পাথরের পরস্পর ব্যবহারে তৈরি করা হত। গির্জার প্রবেশপথ ছিল অর্ধবৃত্তাকার খিলানের মধ্য দিয়ে; এ ছাড়া সমান্তরাল, আংশিক খিলান (Segmented arch) এবং অশ্বনালাকৃতি খিলান ব্যবহৃত হয়েছে। গম্বুজের নিম্নাংশে এবং ড্রামে অর্ধবৃত্তাকার খিলানাকৃত জানালা দিয়ে আলো ও বাতাস প্রবেশ করত। জানালাগুলো স্বচ্ছ মার্বেলের জালী বা গ্লাস দ্বারা অলঙ্কৃত থাকত।

মুসলিম স্থাপত্যিক অলঙ্করণে বায়জানটাইন প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় মোসাইকের প্রয়োগ, বিন্যাস ও উৎকর্ষে। সম্ভবত বায়জানটাইন রীতি ব্যতীত অপর কোনো শিল্পমাধ্যমে মোসাইকের সুষ্ঠু ও সার্বজনীন প্রয়োগ দেখা যায় না। রাইস বলেন, "Throughout the long period from the fourth to the fourteenth century, mosaics were things of primary importance and it is to them that the highest place must be assigned in the study of Byzantine Art."[১]

খ্রীস্টানধর্মের প্রভাবে বায়জানটাইন শিল্প মূলত একটি ধর্মীয় শিল্পকলা (religious art) এবং এই কারণে যীশুখ্রীস্টের জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মোসাইকের মাধ্যমে গির্জার প্রাচীরে, গম্বুজের নিচে (ceiling), apse-এর শীর্ষদেশে, পেনডিনটিভে এবং প্রায় সর্বত্র অলঙ্কৃত করা হয়। Ralph and Burn-এর মতে, "In the place of painting the Byzantine artists generally preferred mosaics. These were designs produced by fitting together small pieces of colored glass or stone to form a geometrical pattern, symbolical figures of plants and animals, or even an elaborate scene of theological significance."

বায়জানটাইন গির্জার নিম্নভাগ মার্বেল দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল এবং কখনও কখনও পাথরে খোদিত নক্‌শা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। প্রাচীরের উপরের অংশে ভল্ট এবং গম্বুজে গ্লাসমোসাইক দ্বারা সুশোভিত করা হয়। মেঝেতে রঙিন মার্বেল ব্যবহার করা হত এবং কখনও কখনও মোসাইকের নক্‌শাও দেখা যায়। পরিভাষায় এর নাম হচ্ছে 'Opus Sectile' এবং 'Opus Alexandrinum'। গ্রীক স্থপতি এবং মোসাইক শিল্পী বায়জানটাইন গির্জার অলঙ্করণে নিয়োজিত হতেন এবং এর ফলে গ্রীক প্রভাব লক্ষ করা যায়। বায়জানটাইন গির্জাশিল্পে (Church Art) গ্রীক নক্‌শার রূপান্তর ঘটে, যেমন—

১। Op. Cit. p.78.

সাধারণ একান্থাস পাতা কৌণিক আকার ধারণ করে। বায়জানটাইন মোসাইকের রঙের বিন্যাস ও বৈপরিত্য শিল্পমনা ব্যক্তিদের মুগ্ধ করে।

মোসাইক ব্যতীত দেওয়ালচিত্র বা fresco বায়জানটাইন স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অলঙ্করণ রীতি। সর্বপ্রাচীন খ্রীস্টান দেওয়াল চিত্র দেখা যাবে রোমের ভূগর্ভস্থ সমাধি ক্ষেত্রে (Catacomb)। পরবর্তী পর্যায়ে বায়জানটাইন শিল্পকলার দেওয়ালচিত্র সিরিয়ার গির্জাসমূহে প্রতিভাত হয়েছে। এই দেওয়ালচিত্র আলেকজান্দ্রিয়ার কপটিক শিল্পকলায় এবং মুসলিম যুগে বিভিন্ন প্রাসাদে, যেমন– কুসাইর আমরায় দেখা যাবে। কুসাইর আমরার প্রাসাদে যে চারজন রাজার প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে কনস্টানটাইনও রয়েছেন। ক্রেসওয়েল বলেন, "কুসাইর আমরার চিত্রাবলী স্পষ্টত বায়জানটাইন ধর্মীয় শিল্পকলার স্থলে সিরিয়ার পরবর্তী হেলেনিক শিল্পরীতির অনুকরণে চিত্রিত হয়।"[১] এতদ্‌সত্ত্বেও বলা যায় যে, হেলেনিস্টিক প্রভাব বায়জানটাইন রীতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।[২]

বায়জানটাইন শিল্পকলার উৎস কেবলমাত্র গ্রীক ও রোমীয় বলা যাবে না। হেলেনিস্টিক এবং প্রাচ্যদেশীয় প্রভাবও এই শিল্পরীতিকে প্রাণবন্ত করেছিল। বলাই বাহুল্য যে, চতুর্থ শতাব্দীতে বায়জানটাইন এবং সাসানীয় পারস্যের মধ্যে শিল্পী-স্থপতির আদান-প্রদান হত। ফেরদৌসী উল্লেখ করেন যে, প্রথম শাহপুর (২৪১-৭২ খ্রীঃ) সুসতারে কারুন ব্রিজ তৈরির জন্য একজন বায়জানটাইন স্থপতি নিযুক্ত করেন। তৎকালীন যুগে পারস্যে এবং পরবর্তী যুগে মুসলিম আমলে বায়জানটাইন সাম্রাজ্য রুম (Rum) নামে পরিচিত ছিল।

অপরদিকে সাসানীয় শিল্পকলার বহু উপাদান রুমে ব্যবহৃত হয়। 'তাক-ই-বুস্তানে' ময়ূরের পুচ্ছের যে নক্‌শা দেখা যায় তা বায়জানটাইন মোসাইকে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়া র‍্যাভেন্নার সেন্ট ভিটেল গির্জার দেওয়ালচিত্রে পোশাক-পরিচ্ছদ, মুকুট, অলঙ্কার সাসানীয়। মুসলিম স্থাপত্য ও চিত্রকলায় বায়জানটাইন প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু অপরদিকে বায়জানটাইন শিল্পকলায় মুসলিম প্রভাব দেখা যাবে, বিশেষ করে বয়নশিল্প এবং খোদাই-এর কাজে। এ প্রসঙ্গে কুফীরীতিতে উৎকীর্ণ আরবী লিপিকলার উল্লেখ করা যায়। বায়জানটাইন পাণ্ডুলিপি (Manuscript of the Homilies of John Chrysostom) ও মৃৎপাত্রের কুফীরীতির প্রয়োগ সত্যই তাৎপর্যপূর্ণ।

৩. কপটিক শিল্পকলা

খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়ায় হেলেনিস্টিক শিল্পরীতি অব্যাহত থাকলেও বায়জানটাইন খ্রীস্টান শিল্পকলার প্রভাব নীল নদীর অববাহিকায় অনুপ্রবেশ করে। ৬৪১ খ্রীস্টাব্দে আমর ইবনুল আস মিশর বিজয় করেন এবং স্থানীয় খ্রীস্টান অধিবাসীগণ

১। Op. Cit., p. 95.
২। Rice, p.112

কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি। মিশরীয় খ্রীস্টানদেরকে কপটিক বলা হয় এবং তাদের সৃষ্ট শিল্পকলা কপটিক শিল্পরীতি নামে পরিচিত। রাইস কপটিক শিল্পকলার উৎস সম্বন্ধে বলেন, "Many of the elements that went to form Coptic art may be attributed to Ancient Egypt ; many were basically Hellenistic. But these two elements alone could never have produced the Coptic style had not the expressionistic Syrian element also exercised its influence."[১] খ্রীস্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত প্রস্তুত বিভিন্ন কার্পেট, ভাস্কর্য, দেওয়ালচিত্র, মিনিয়েচার ও গির্জায় কপটিক শিল্পকলা মূর্ত হয়ে রয়েছে। বলাই বাহুল্য যে, মুসলিম চারু ও কারুকলায় খ্রীস্টান প্রভাব বিদ্যমান ছিল এবং সিরিয়া, মিশর এবং মেসোপটেমিয়ায় প্রচলিত খ্রীস্টান বায়জানটাইন শিল্পকলা মুসলিম শিল্পকলার অন্যতম উৎস ছিল। শিল্পের পরিভাষায় খ্রীস্টান বায়জানটাইন শিল্পকর্মকেই কপটিক বলা হয়।

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে মিশর বায়জানটাইন সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল এবং ৬৪০ সালে হেলিওপোলিসের যুদ্ধে শাসনকর্তা সাইরাসকে পরাজিত করে মুসলমানগণ মিশরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। মিশরে কপটিক শিল্পকলার ধারা তখন অব্যাহত ছিল। প্রাচীন গ্রীক এবং প্রাচ্যের উপকরণের সংমিশ্রণে কপটিক রীতিকৌশলের উদ্ভব হয়। মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি খোদিত খিলানে কপটিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এতে প্রকৃতিধর্মী হেলেনিক শিল্প প্রাচ্যের রীতিমাফিক নক্শাকৃতি পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই খিলান দু-স্তরে তালপাতা এবং দ্রাক্ষালতা, ডুমুর ও বেদানাসম্বলিত একটি লতাপাতার বেষ্টনী খোদিত করা হয়েছে। ডিমান্ড মনে করেন যে, এটি হেলেনিস্টিক রীতির অনুরূপ নয় এবং পরবর্তীকালে ইসলামী অলঙ্করণে এর প্রভূত প্রভাব দেখা যায়। কপটিক শিল্পের সর্বাধিক বহিঃপ্রকাশ রয়েছে সুন্দর সিল্ক, লিনেন এবং কার্পেটে। তৃতীয় এবং চতুর্থ শতাব্দীতে উৎপাদিত কপটিক কার্পাস বস্ত্রে জ্যামিতিক ও লতাপাতার নক্শাসহকারে প্রতিকৃতি বোনা হত। গ্রীক-রোমীয় বিষয়বস্তু হলেও বোনার রীতি ও কৌশলে প্রাচ্যের প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল। মিশর বিজয়ের পরেও কপটিক শিল্পচর্চা যে অব্যাহত থাকে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে খ্রীস্টান বিষয়বস্তুর সঙ্গে জ্যামিতিক নক্শার সংমিশ্রণে বিচিত্র ধরনের কাপড় বোনা থেকে। কখনও কখনও কপটিক মটিভের সঙ্গে আরবী লিপি বোনানো হত এবং এরূপ শিল্পদ্রব্য মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে কপটিক স্থপতির অবদান রয়েছে বিশেষ করে ফুসতাতের মসজিদের মিমবার এবং ইবন তুলুন মসজিদের নির্মাণে।

৩। মুসলিম স্থাপত্যের উন্মেষ

সংজ্ঞা : মুসলমানদের সৃষ্ট স্থাপত্য ও শিল্পকলার উৎস সম্বন্ধে নানাবিধ মতামত প্রচলিত আছে, বিশেষ করে এর সংজ্ঞা নিয়ে। রিভয়রা এবং তার অনুসারীগণ মুসলিম স্থাপত্যকে কোনো প্রকার স্বকীয়তা, নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্য দিতে অস্বীকার করেন। তাদের মতে,

১। op. cit. p. 49.

'মুসলিম' নামে কোনো পৃথক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্যরীতি নেই ; এটি বায়জানটাইন শিল্পকলার একটি প্রশাখা মাত্র। তাঁদের মতে, "সারাসেনো" (Saracenic) নামে কোনো স্থাপত্য শিল্পরীতি উদ্ভব হয়নি। অপরদিকে গার্ডিয়ান উইলকিনসন, স্টানলী লেনপুন এবং উইলিয়াম ওয়ার মুসলিম স্থাপত্যকে 'সারাসেনিক' নামে অভিহিত করেন। উইলকিনসন বলেন, "Saracenic architecture passed usual phases of transformation common to others, which have been derived from one or more predecessor and that it advanced by a very reasonable transition from its first condition of pupilage to a new and independent State."[১] স্টানলী লেনপুলের মতে, "The Saracenic art possesses an unmistakable style which is instantly recognized wherever it occurs, from the pillars of Hercules and the Alcazar of Seville to the mosques of Samarkand and the ruins of Gaur in Bengal and this style was developed and brought to perfection in the middle Ages."[২] উইলিয়াম ওয়ারও মুসলিম স্থাপত্যকীর্তিকে 'সেরাসেনিক' নামে অভিহিত করে ইবনে তুলুনের মসজিদ সম্বন্ধে বর্ণনা দেন, "But the quality of Mohammedan architecture lies not wholly in the disposition of the plans and the composition of the masses within and without. The novelty, ingenuity and elegance of the structural and decorative details are equally admirable, and some of them present peculiarities of unusual interest."[৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ওয়ার তাঁর প্রবন্ধের শিরোনামে 'সেরাসেনিক' বললেও বর্ণনায় 'মোহামেডান' বলেছেন, অর্থাৎ তিনি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেননি। 'সেরাসেনিক' সংজ্ঞাটি অযৌক্তিক, কারণ, মুসলিম স্থাপত্য কোনো বিশেষ একটি ইসলাম ধর্মাবলম্বী জাতি বা গোষ্ঠীর সৃষ্টি নয়। এ প্রসঙ্গে রিনি স্পিয়ার্সের উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, "The term 'Saracenic' could hardly be applied to the architecture of Spain, Persia or Turkey."[৪]

অপরদিকে ডরবী[৫] মুসলিম স্থাপত্যকে 'আরবী' ('Arabic') এবং এডওয়ার্ড লেন 'অ্যারাবিয়ান' ('Arabian') নামে অভিহিত করেছেন। লেন বলেন, "The

---

১। Wilkinson, G. On Saracenic Architecture, Journal of the Royal Institute of British Architects, Paper, 18th March 1861, p 217

২। Lanepoole, S., The Art of the Saracens in Egypt, London, 1888 p v.

৩। Ware, W. R., Saracenic Architecture, Harvard Engineering Journal, Vol IV, April 1905. No. 1 p. 9.

৪। Spiers, R. P., Mohammedan Architecture, Encyclopaedia Britaniaca, Vol II Cambridge, 1910, 11th Edition, Vol II, p 422

৫। Dorbee, B, Arabian Art in Egypt. Burlington magazine, Vol xxxvi, 1920, Jan, do ce ii, Gayet. Art Arabe.

excellence attained by the Arabs in architecture and decoration has been remarkable in every country subjugated to their rule. The style has borne the same characteristics throughout the great Arabian Empire, flourishing most when that Empire was dismembered and there is no difficulty in identifying Arab Art in Egypt as a centre or in India."[১] এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতবর্ষের, স্পেনের অথবা তুরস্কের মুসলিম স্থাপত্যকে কখনওই আরব স্থাপত্য বলা যাবে না। মৌলিক ইসলামী স্থাপত্যের উপাদানের সার্বজনীন প্রয়োগে ঐক্য অবশ্যই লক্ষ করা যায়। কিন্তু স্থানীয় শিল্পকলার প্রভাবে প্রতিটি মুসলিমঅধ্যুষিত অঞ্চলে স্থাপত্য ভিন্ন এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে। গ্রান্ট পিরে বলেন, "Arabic art is incorrect since the Arabs had no art of their own. 'Arabian art' is correct enough when speaking of the influence of Arabian nationality but not of race."[২]

মুসলিম স্থাপত্যকে কখনও 'মুসলমান' ('Mussalman') আবার কখনও 'Mahommedan' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ফরাসী লেখকগণ বিশেষ করে মুসলমান শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মুসলিম শব্দ থেকে মুসলমান কথাটির উৎপত্তি এবং মুসলিমের বহুবচন হিসাবে অর্থ অধিকসংখ্যক মুসলিম।[৩] এই শব্দ দ্বারা ধর্মীয় অনুভূতির সৃষ্টি করা হয়, ঠিক যেমনভাবে মোহামেডান ('Mahommedan' of 'Mohammedan,') সংজ্ঞাগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। রিনি স্পিয়ার্স Mahommedan শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং খ্রীস্টান লেখকগণ বহুবার রসূলে করীমকে মোহাম্মদ (সাঃ) না বলে 'মেহমেট' ('Mahomet') বলেছেন এবং এরই ফলশ্রুতিতে 'মেহমেটানের' উৎপত্তি। এ প্রসঙ্গে স্পিয়ার্স বলেন, "It was the Mahommedan religion which prescribed the plan and the features of the Mosques and it was the restriction of that faith which led to the principal characteristics of the style."[৪] স্ট্রাইগস্কীও মোহামেদান (Muhammedan) নামে অভিহিত করেন।[৫] সালাদীন মন্তব্য করেন, "Muhammadan Architecture deserving of the name is that style of architecture which has sprang up alongside of the Islamic Civilization and which borrows from the very characteristics of the social conditions in the midst of which it has been developed and distinctly peculiar and well-designed

১। Lane, E, W, Arabian Architecture, in the Manners and Customs of the Modern Egyptian, edited by E.Rhys, London, 1923, Appendix F. P 584
২। Grand-pierre, C. The Religious background of Islamic Art and Persian Art, New York, 1938 p. 5.
৩। ibid, p 5.
৪। op. cit, p. 422.
৫। Strzygowski, J. Art (Muhammadan), in Encyclopaedia of Religion and Ethics. vol I. 1908, p. 845.

impress."[১] মোহামেটান অথবা মোহামেডান সংজ্ঞা সার্বজনীন মুসলিম স্থাপত্যের রূপরেখা প্রকাশ না করে ধর্মীয় দিকটিতে অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। উপরন্তু, মুসলিম স্থাপত্যের সৃষ্টিতে মুসলিম এবং অমুসলমান স্থপতি, কারিগর, শ্রমিক, মোসাইক শিল্পীর অবদান রয়েছে। লেনপুল বলেন, "Both the terms 'Arab' or 'Mohammadan Art' are misleading for the artists in this style were seldom Arabs and many of them were Christians."[২]

মুসলিম স্থাপত্যের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে কোনো কোনো লেখক মোসলেম ('Moslem'), আবার অনেকেই মুসলিম এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'ইসলামী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ডিজ (Diez) ও রিচমন্ড মোসলেম শব্দটি প্রয়োগ করেন।[৩] কিন্তু শুদ্ধ বানান হবে 'মুসলিম'। ইসলাম শব্দ থেকে মুসলিম এসেছে এবং যারা ইসলামের অনুসারী তারাই মুসলিম। নির্ভরযোগ্য এবং তথ্যবহুল আলোচনায় মুসলিম স্থাপত্য কথাটি সার্বজনীন রূপ লাভ করেছে। মুসলিম স্থাপত্যের অবিসংবাদী বিশেষজ্ঞ কে. এ. সি. ক্রেসওয়েল তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা করে যে বিশাল এবং গবেষণাপ্রসূত গ্রন্থাবলী রচনা ও প্রকাশনা করেন তার শিরোনাম "Early Muslim Architecture.।" মিশরের ইমারতসমূহের উপর তিনি যে গ্রন্থাবলী রচনা করেন তাও "Muslim Architecture of Egypt" নামে সুপরিচিত। মুসলিম অথবা ইসলাম এই দুটি শব্দ পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ হয়ে থাকে প্রথমটি জাতি এবং দ্বিতীয়টি ধর্মকে নির্দেশ করে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য যে, ধর্মীয় অনুভূতির ফলে মসজিদ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু পার্থিব ইমারত (Secular monuments) নির্মাণে ধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল না। দ্বিতীয়ত, মুসলিম স্থপতি, কারিগর ও কারুশিল্পীর তৈরি ইমারতগুলোকে মুসলিমই বলা শ্রেয়। মুসলিম স্থাপত্য কোনো বিশেষ মুসলিম জাতির সৃষ্টি নয় ; বিভিন্ন জাতির অবদান রয়েছে। সামগ্রিকভাবে মুসলিম বলা হয় এই কারণে যে, ভৌগোলিক সীমারেখা, জাতিগত পার্থক্য, আবহাওয়ার দারুণ প্রভেদ, নির্মাণের উপকরণের সহজলভ্যতা প্রভৃতি সত্ত্বেও মুসলিম স্থাপত্যের একটি ঐক্য ও সার্বজনীন রূপ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে গ্রান্ডপিরের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়, "To the creation of Islamic art men of many races, employed by them contributed their talents, their asthetic feeling to a type of architecture and decoration which soon covered a great part of the known world at a time when European painting and decorative arts were hampered in their development by the limitations of hieratic conceptions imposed by Christian ecclesiasticism."[৪]

১। Saladin, H., Architecture (Mahammadan) in Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol I, 1908, p.745.

২। Lanepoole, S, op. cit. p v.

৩। Diez,E, Masjid, in Encyclopaedia of Islam, vol. III, Part I, p. 380, Richmond, E. T. Moslem Architecture 623 to 1517, London, 1926

৪। op. cit, p. 10

স্তরভেদ : মুসলিম স্থাপত্যের আদি যুগকে মোটামুটিভাবে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায় ; (ক) প্রাথমিক স্তর অথবা formative/primitive ; (খ) উমাইয়া : Syro-Byzantine এবং (গ) আব্বাসীয় : Mesopotamian-Sassanian.

৬২২ সালে মদিনায় রসূলে করীম (সঃ) ইসলামের প্রথম মসজিদ স্থাপন করার পর থেকেই মুসলিম স্থাপত্যের সূচনা হয়। অতি সাধারণ উপকরণের সাহায্যে নির্মিত মদিনার মসজিদটি trend-setter হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। এই ইমারতে ইসলামের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। মদিনা মসজিদ পরবর্তীকালে সমাজ ও ধর্মীয় জীবনের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ('the rallying point of communal life')। অনেকেই এই ইমারতকে বলেছেন 'Symbol of civil and religious power' : স্থাপত্যকলার উদ্ভাবনে মদিনা মসজিদের অবদান অপরিসীম। প্রথম অঙ্গনবিশিষ্ট মসজিদ (Courtyard type) হিসেবে এই মসজিদটি পরবর্তী মসজিদ-স্থাপত্যরীতিতে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছে। মসজিদের উপাদানের প্রচলন করে মদিনা মসজিদ 'archtype' বা prototype-এর মর্যাদা লাভ করে। লিওয়ান, সাহান, কিবলা, মিমবার, ওজুর স্থান আযানের যে সুষ্ঠু বিন্যাস মদিনা মসজিদে হয়েছিল তার ফলেই মসজিদ-স্থাপত্যের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ হতে থাকে। এই কারণে মসজিদকে "bedrock of Muslim architecture" বলা হয়েছে। পিউরিটান ইসলামের চরম প্রতীক এই মসজিদটি ছিল অলঙ্কারবিহীন এবং খুবই সাধারণ ও সাদামাটা। Papadopoulo বলেন, "Primitive as the dwelling of Muhamad was, with a rustic simplicity befitting the Arab mores of its time, it had a general disposition dictated directly by the functions it had to fulfil and by the very simple means within the grasp of the Arabs".[১]

মদিনা মসজিদের পরে বসরা, কুফা ও ফুসতাতে যে অতি সাধারণ ও সহজলভ্য উপকরণ দ্বারা মসজিদ তৈরি করা হয় তাতে প্রথম মসজিদের প্রভাব রয়েছে। ৬২২-৬৬১ পর্যন্ত মসজিদস্থাপত্য বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত ছিল এবং সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তিভূমির উপর প্রাচীন আরব দার বা গৃহের অনুকরণে নির্মিত। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় কুফা মসজিদের 'যুল্লা' নির্মাণে প্রাচীন লাখ্‌মিদ প্রাসাদের স্তম্ভগুলোর ব্যবহারে। অনেকেই এই সুউচ্চ যুল্লাকে পারস্যের Apadana বা Hall of Columns-এর সাথে তুলনা করেছেন। এ ছাড়া সর্বপ্রাচীন আল-আক্‌সা মসজিদটিও প্রাচীন কোনো ইমারতের ধ্বংসাবশেষের উপকরণ দ্বারা তৈরি। ক্রেসওয়েল মনে করেন Royal Stoa of Herod-এর উপর এই মসজিদ স্থাপিত। এসত্ত্বেও মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনা এবং অভিনব উপাদান সংযোজনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক যুগে স্থপতিগণ সতর্কতা অবলম্বন করেন। ফুসতাত মসজিদে মদিনা মসজিদের অনুকরণে মিমবার নির্মাণ হযরত উমর (রাঃ) নিষিদ্ধ করেন এই কারণে যে, সম্ভবত এটি একটি সিংহাসনে রূপান্তরিত হতে পারে। এই প্রাচীন যুগের স্থাপত্যকীর্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ, উমাইয়া খিলাফতের

১। Papadopoulo, A, Islam and Muslim Art, London, 1976 p.217.

শুরু থেকেই এর আমূল এবং যুগান্তকারী পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বস্তুত মসজিদ স্থাপত্য তথা মুসলিম স্থাপত্যকলায় পরিবর্তন দেখা যায় প্রাক্-উমাইয়া যুগে নির্মিত মসজিদগুলোর পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারে।

বৈদেশিক প্রভাবের অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, প্রাক্-মুসলিম যুগে ৬০৮ খ্রীস্টাব্দে পবিত্র কা'বা শরীফের পুনর্নির্মাণে আবিসিনীয় স্থপতি বাকুম অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু রসূলে করীম (সঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদুনের আমলে কোনো বৈদেশিক প্রভাব মুসলিম ইমারতে অনুপ্রবেশ করেনি। তাঁরা অমুলসমান কারিগর অথবা উপাদান নিয়োগ করলেও অনৈসলামিক স্থাপত্যরীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হননি। ক্রেসওয়েল যথার্থই বলেন, "We have seen that the Arab conquerors for at least a generation, remained so untouched by any architectural ambitions that they showed not the slightest desire to make use of the developed architectural talents of the conquered peoples."[১]। এই কারণেই প্রথমযুগের মসজিদগুলো ছিল খুবই জৌলুসবিহীন ইমারত। গার্টরুড বেল[২] সেজন্য মদিনা, বসরা, কুফা এবং ফুসতাতের মসজিদগুলো 'primitive Arab unadorned architecture of sun-dried bricks and palm trunks" বলে অভিহিত করেন। কিন্তু ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বায়জানটাইন প্রভাব অনুভূত হতে থাকে। সিরিয়ায় যেমন বায়জানটাইন, অনুরূপভাবে মেসোপটেমিয়া এবং পারস্যে সাসানীয় স্থাপত্যকলার প্রভাব সর্বপ্রথম বৈদেশিক মোটিভ, নির্মাণকৌশল ও সুকুমার শৈলী হিসেবে অনুপ্রবেশ করে। হিট্টি বলেন–"In Syria Moslem architecture was influenced by the pre-existent Christian Syro-Byzantine style with its native and Roman antecedent. In Mesopotamia and Persia it was affected by the Nestorian and Sasanid forms based on earlier native tradition. In Egypt many decorative motifs were supplied by the local Copts."[৩]

মসজিদ-স্থাপত্যের প্রকৃত উন্মেষে উমাইয়া খলিফাদের অবদান অনস্বীকার্য এবং উল্লেখ্য যে, প্রথমযুগের মসজিদসমূহের পুনর্নির্মাণ-প্রচেষ্টায় মসজিদ একটি বিজ্ঞানসম্মত স্থাপত্যরীতিতে পরিণত হল। ইসলাম আরব দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠিত হলে ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা এক বিশাল পরিধির মধ্যে ব্যাপৃত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে ফারগুসনের উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, "Had the religion been confined to it native land, it is probable that no mosques worthy of the name would have been erected."[৪] খলিফা মু'য়াবিয়ার রাজত্বে যিয়াদ ইবনে আবিহ কুফা ও

১। A Short Account, p. 156.

২। Bell, Y. Palace and Mosque of Ukhaider, Oxford, 1914. vol II, p. 96.

৩। Hitti. P. K., History of the Arabs, London, 1951, p. 260.

৪। Quoted by R. P Spiers, in Mahommedan Architecture, Encyclopaedia Britanica, vol II. Cambridge, 1910. p. 422.

বসরা মসজিদে সংস্কার, সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণ করেন মার্বেলস্তম্ভের সাহায্যে। ক্রেসওয়েল বলেন, "the first mosques to be worthy of the name of architecture were the second great Umayyad mosques at Basra (665 A.D.) and Kufa (670 A.D.)."[১] ফুসতাতের মসজিদে ৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে মিনার নির্মিত হয় এবং নিঃসন্দেহে এই উপকরণ মসজিদে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্যিক সংযোজন। এ ছাড়া এই মসজিদে হযরত উসমানের (রাঃ) সময়েই নুবায়ার রাজা মাকরানা কর্তৃক প্রদত্ত একটি মিমবার স্থাপিত হয়। আরব ভূখণ্ডেই সর্বপ্রথম মুসলিম ইমারতে মোসাইকের ব্যবহার প্রচলিত হয়। ৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে অগ্নিদগ্ধ হয়ে কা'বা শরীফ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মাসউদী বলেন যে, এই পবিত্র ইমারত পুনর্নির্মাণে ইয়েমেনের রাজধানী সানার একটি গির্জা থেকে গ্লাস মোসাইক সংগ্রহ করে ব্যবহৃত হয়। ক্রেসওয়েলের মতে, "This is the earliest instance of the use of mosaics in Islam, for it antedates those of the Dome of the Rock by seven years।"[২] মদিনা মসজিদে উমাইয়া আমলে সর্বপ্রথম একটি অবতল মিহ্‌রাব স্থাপিত হয়। খলিফা আল-ওয়ালিদের শাসনামলে হিজাজের শাসনকর্তা উমর ইবনে আবদুল আজীজ ৭০৭–৯ খ্রীস্টাব্দে মদিনা মসজিদে এই মিহ্‌রাবটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ৭১০–১২ খ্রীস্টাব্দে আল-ফুসতাতের আমরের মসজিদে দ্বিতীয় অবতল মিহ্‌রাব নির্মাণ করা হয়। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদ-স্থাপত্যের সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক এবং ধর্মীয় উপকরণসমূহ প্রাথমিক যুগের মসজিদ নির্মাণে এবং পুনর্গঠনের সময় উদ্ভাবিত হয়েছিল।

মসজিদস্থাপত্যের প্রথম পর্যায়েই অমুসলমান স্থপতি, কারিগর শিল্পী নিয়োগ বিচিত্র ছিল না। প্রায়ই বলা হয়েছে যে, কা'বা শরীফের পুনর্নির্মাণে ৬০৮ খ্রীস্টাব্দে আবিসিনীয় স্থপতি বাকুমকে নিয়োগ করা হয় এবং ৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় সংস্কার করার সময় পারস্যের কারুশিল্পীগণ গ্লাস মোসাইক দ্বারা অলঙ্করণে অংশগ্রহণ করেন। হযরত উসমানের খিলাফাতে আর-ফুসতাতের মসজিদে নুবীয়ার খ্রীস্টান রাজা মারকানা প্রেরিত মিমবারটি প্রতিষ্ঠার জন্য বোকতার নামে একজন খ্রীস্টান নুবীয় কারিগরের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। কুফা মসজিদ পুনর্নির্মাণের সময় জিয়াদ ইবনে আবিহ জবল আহওয়াজ থেকে পাথর সংগ্রহ করে স্তম্ভ নির্মাণ করেন। যুল্লার সম্প্রসারণ ও সংস্কারে পারস্য স্থপতির অবদান ছিল। ক্রেসওয়েলের মতে, মসজিদ-স্থাপত্যের অন্যতম প্রধান উপকরণ মাকসূরা দামেস্কের প্রথম মসজিদে (৬৩৬-৭০ খ্রীঃ) স্বীয় নিরাপত্তার জন্য মু'আবিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত ৬৬৪-৬৫ খ্রীস্টাব্দে এই মাকসূরা স্থাপিত হয়।

৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে আবদুল মালিক খিলাফতের মসনদে আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালকে মুসলিম-স্থাপত্যের আদি যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ৬২২ থেকে ৬৮৫ অর্থাৎ ৬৩ বছরের মসজিদ স্থাপত্যের ক্রমবিকাশে প্রায় সমস্ত উপকরণ ও উপাদানের

১। Architecture, in Encyclopaedia of Islam, vol I. NE. 1960 p. 610.
২। A Short Account, p. 15.

আবির্ভাব ও প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু সেগুলোর সমন্বিত ও সুসংবদ্ধভাবে একত্রিভূত করা সম্ভবপর হয়নি। তা ছাড়া বৈদেশিক স্থপতির অংশগ্রহণ সত্ত্বেও কোনো অমুসলমান স্থাপত্যরীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি।

এই যুগের উল্লেখযোগ্য মসজিদসমূহ হল বসরা, কুফা ও ফুসতাতের নবপ্রতিষ্ঠিত সেনাছাউনি শহরে নির্মিত মসজিদ। উতবা ইবনে গাযওয়ান হিঃ ১৪/৬৩৫ অথবা হিঃ ১৬/৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে শীতকালীন সেনানিবাস হিসেবে বসরা শহরের পত্তন করে এর মধ্যভাগে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। চতুর্দিক নলখাগড়ার বেড়া দ্বারা বেষ্টিত উন্মুক্ত স্থানেই নামায আদায় করা হত। হযরত উমরের (রাঃ) খিলাফতে বসরার শাসনকর্তা আবু মুসা আল-আশআরী রৌদ্রে শুকানো ইট (লিব্ন) দ্বারা মসজিদটির পুনর্নির্মাণ করেন। ছায়ার জন্য ছাদে ঘাস ব্যবহার করা হয়। সাদ ইবনে আবী ওয়াক-কাস ১৭/৬৩৮ অথবা ১৮/৬৩৯ খ্রীস্টাব্দে কুফা সেনানিবাসের কেন্দ্রস্থলে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরিখা দ্বারা বেষ্টিত নলখাগড়ার দেওয়াল ও উন্মুক্ত সম্মুখভাগ (সাহন)-বিশিষ্ট এই মসজিদটিও পরে সূর্যোত্তাপে শুকানো ইট দ্বারা পুনর্নির্মিত হয়। মদিনা মসজিদসংলগ্ন সুফফা-এর অনুকরণে কুফার এই মসজিদের সঙ্গে সর্বপ্রথম যুল্লা (ছায়া-ছত্র) নির্মিত হয়।

আরব ভূভাগের বাইরে তৃতীয় মসজিদটি নির্মিত হয় মিশরবিজয়ী আমর ইবনে আস্ কর্তৃক আল-ফুস্তাতের সেনাছাউনিতে হিঃ ২০/৬৪১-৪২ খ্রীস্টাব্দে। আফ্রিকা ভূখণ্ডে এটি সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাচীন মসজিদ। এই যুগের সেনানিবাসে নির্মিত চতুর্থ মসজিদ উকবা ইবনে নাফে কর্তৃক হিঃ ৫০/৬৭০ খ্রীস্টাব্দে কায়রোয়ানে নির্মিত হয়। এই সকল মসজিদই মদিনা মসজিদের পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত হয়। উমাইয়া শাসনামলে এই সকল মসজিদ বিশেষ জাঁকজমকপূর্ণভাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে প্রথম যুগের মসজিদের সঙ্গে উমাইয়া আমলের সিরিয়ার ইমারতগুলো বিশেষ করে জেরুজালেমের মসজিদ আল-আক্সা, দামেস্কের জা'মি মসজিদের তুলনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, পরবর্তী মসজিদসমূহ ইসলামের মৌলিক ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত প্রয়োজনে নির্মিত হত : গগণচুম্বী ও অত্যুৎকৃষ্ট সৌধসৃষ্টির কোনো প্রবণতা ছিল না, যা উমাইয়া স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। বেকার প্রসঙ্গত উল্লেখ করেন যে, খলিফা আল-ওয়ালিদের সঙ্গে হযরত উসমানের (রাঃ) এক পুত্রের স্থাপত্যকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আল-ওয়ালিদ গর্বভরে বলেন যে, "তোমাদের চেয়ে আমাদের ইমারত বহু উৎকৃষ্ট।" প্রত্যুত্তরে হযরত উসমানের (রাঃ) পুত্র বলেন, "সত্য, কিন্তু আমরা মসজিদের অনুকরণে নির্মাণ করেছি এবং আপনি খ্রীস্টান গির্জার রীতিতে নির্মাণ করেছেন।"

আরব ভূখণ্ডের বাইরে ইসলাম সর্বপ্রথম সিরিয়ায় বায়জানটাইন শিল্পরীতির সংস্পর্শে আসে। সুতরাং খুবই স্বাভাবিক যে, উমাইয়া স্থাপত্যকলা বায়জানটাইন গির্জাশিল্প (Church Art) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রধানত তিনটি উপায়ে বায়জানটাইন প্রভাব মুসলিম স্থাপত্যে অনুপ্রবেশ করে, প্রথমত সিরিয়ার বিভিন্ন স্থান

অধিকৃত হলে বিজয়ী মুসলমানগণ ধর্মীয় নির্দেশ পালনের জন্য স্থানীয় পরিত্যক্ত ও ভগ্নপ্রায় কোনো কোনো ইমারতকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করতে বাধ্য হন।[১]

উল্লেখ যে, সিরিয়ায় কোনো কোনো প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত উপাসনালয়কে রূপান্তরিত করে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কখনও কখনও স্থানীয় খ্রীস্টানদের সঙ্গে সমঝোতা করে গির্জার কোনো অংশে নামায পড়া হয়, যেমন– দামেস্কে মুসলমানগণ ৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে সেন্ট জনের গির্জার পূর্বদিক মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করেন।

গির্জাকে মসজিদে রূপান্তরের যে নজীর দেখা যায় তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে সকল বিজিত জাতি অধিকৃত অঞ্চলের গৃহসামগ্রী ও স্থাপত্য নিদর্শন প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণে ব্যবহার করেছে। রোমানগণ গ্রীকদের এবং বায়জানটাইনগণ রোমীয় এবং মুসলমানগণ বায়জানটাইন ইমারত দখল ও সংস্কার করে সৌধ রচনা করেছে। দামেস্কের উমাইয়া মসজিদ প্রথমে একটি গ্রীক মন্দির ছিল। দেবতা যুপিটারের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত প্যাগান মন্দিরটি বায়জানটাইন সম্রাট থিউডোসিয়াসের (৩৭৯-৯৫ খ্রীঃ) রাজত্বে সেন্ট জনের গির্জায় রূপান্তরিত হয়। ৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে মুসলিমবাহিনী এই গির্জার পূর্বপ্রান্তে মসজিদ স্থাপন করেন। মুসলিম স্থাপত্যে বায়জানটাইন প্রভাবের দ্বিতীয়; কারণ প্রাচীন পরিত্যক্ত বা বিধ্বস্ত ইমারতসমূহের স্তম্ভে পাথর, ইট প্রভৃতি নির্মাণ-উপকরণের ব্যবহার। সমরাভিযানের সময় অথবা নতুন শহর স্থাপনের পর নাগরিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে মসজিদ নির্মাণ করে নামাযের ব্যবস্থা অপরিহার্য। পরিত্যক্ত ব্যাসেলিকান গির্জা ছাড়া অমুসলমান ইমারত থেকে নির্মাণ-উপকরণ আহরণ করেও কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস কুফার মসজিদের যুল্লা নির্মাণ করেন হিরার লাখমিদ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ

১। মসজিদকেও পরবর্তী পর্যায়ে বহু দেশে জাদুঘর বা বাসস্থান–এমনকি মন্দিরেও রূপান্তরিত করা হয়। বিজিত দেশের কোনো কোনো উপাসনালয়কে মসজিদে রূপান্তর কিংবা মসজিদরূপে ব্যবহারের কয়েকটি সংগত কারণ আছে। স্থানীয় অধিবাসীদের ইসলামগ্রহণের ফলে পুরাতন উপসনালয়টি তারাই মসজিদরূপে ব্যবহার করেন অথবা অধিবাসীদের দেশান্তর গমনের কারণে উপাসনাগৃহটি দীর্ঘকাল যাবৎ পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। খ্রীস্টান শাসনামলে জেরুজালেমের বহু ইহুদী উপাসনালয় ও গ্রীক মন্দির এইভাবে পরিত্যক্ত হয়। Solomon`s Great Temple খ্রী. পূ. ৫৯৯ সালে নেবুচাদ নেজার (বাখ্‌তু নাসর) কর্তৃক বিধ্বস্ত হয় এবং তিনি ইহুদীগণকে জেরুজালেম থেকে ব্যাবিলনে নির্বাসিত করেন। কয়েক শতাব্দীকাল পরে উক্ত পরিত্যক্ত স্থানেই মসজিদে আক্‌সা নির্মিত হয়। উমর জেরুজালেমের কর্তৃত্ব গ্রহণ ও খ্রীস্টানদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকার প্রদানের পর নামাযের সময় উপস্থিত হলে খ্রীস্টান অধ্যক্ষ গির্জার মধ্যেই নামায পড়ার অনুরোধ জানালে তিনি তা এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, তিনি এখানে নামায পড়লে পরবর্তীতে এটি মসজিদে রূপান্তরিত হবে। তাই তিনি গির্জার নিকটে উন্মুক্ত স্থানেই নামায পড়েন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জেরুজালেমের হারাম শরীফের যে প্রস্তরটি বা প্রস্তরখণ্ড থেকে মিরাজ গমন করেন, হযরত উমর জনৈক নও মুসলিম ইহুদীর সাহায্যে সেই স্থানের সন্ধান লাভ করেন। স্থানটি তখন বালুর স্তূপ ও আবর্জনারাশিতে আবৃত ছিল। হযরত উমর (রাঃ) স্থানটি পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করে সেখানে নামায আদায় করেন ও একটি মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন। এই মসজিদটিই "উমরের মসজিদ" নামে অভিহিত। খলিফা আবদুল মালিক ৬৮৮–৯১ খ্রীস্টাব্দে বহু অর্থব্যয়ে বিশ্বের অনবদ্য একটি স্মৃতিসৌধ এই স্থানে নির্মাণ করেন–যা ইতিহাসে কুব্বাতুস সাখরা নামে খ্যাত।

থেকে সংগৃহিত মার্বেল স্তম্ভ দ্বারা। হাজ্জাজের পুত্র মুহাম্মদ কাযউইনে যে জা'মি মসজিদ নির্মাণ করেন তা "বৃষ মসজিদ" (Bull Mosque) নামে পরিচিত, কারণ এই মসজিদে অ্যাকামেনীয় যুগের বৃষ শীর্ষদেশসম্বলিত স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়। ইস্তেখারের (Persepolis) জা'মি মসজিদ সম্বন্ধে মাক্দেশী বলেন, "The Friday Mosque at Istakhr (Persepolis) is constructed after the fashion of the congregational mosques of Syria with round columns on the top of each column is a cow. They say that it was formerly a temple of fire." কাযউইনের মতো ইস্তেখারে "bull headed capital" or বৃষ শীর্ষদেশ-সম্বলিত স্তম্ভরাজি দ্বারা নির্মিত মসজিদের নির্মাণ বিচিত্র নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কুফা মসজিদের লিওয়ান পারস্যের প্রাসাদের Apadana অর্থাৎ Hall of Columns এবং পরবর্তীকালে পারস্যে কাযউইন এবং ইস্তেখারে Apadana-র ব্যবহার দেখা যায়। ক্রেসওয়েল বলেন যে, এন্টিওকে নির্মিত Church of Mary থেকে মার্বেল স্তম্ভ সংগ্রহ করে দামেস্কের মসজিদে ব্যবহৃত হয়।[১] বালাদুরী উল্লেখ করেন যে, আল-ওয়ালিদ দামেস্ক মসজিদের নির্মাণের জন্য বায়জানটাইন সম্রাটের নিকট শিল্পী ও স্থপতি ছাড়াও মোসাইক প্রেরণের জন্য পত্র দেন। ভারতবর্ষেব মুসলিম স্থাপত্যের আদিপর্বেও স্থানীয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু মন্দিরের উপকরণ দিয়ে কোনো কোনো মসজিদ স্থাপন করা হয়, যেমন– দিল্লীর কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ এবং আজমীরের আড়াই-দিন-কা ঝোপড়া মসজিদ।

প্রাক্-মুসলিম ধর্মমন্দিরের রূপান্তর এবং অমুসলিম ইমারত থেকে নির্মাণসামগ্রী আহরণ করে মসজিদ নির্মাণের প্রাথমিক প্রয়াস ছাড়াও উমাইয়া খলিফাগণ অমুসলমান দক্ষ কারিগর, শিল্পী, স্থপতি, নক্শাবিদ ও শ্রমিক নিয়োগ করেন। মুসলিম স্থাপত্যে বায়জানটাইন প্রভাব অনুপ্রবেশের তৃতীয় কারণ হচ্ছে বায়জানটাইন সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশরে বসবাসকারী গ্রীক রোমীয় ও বায়জানটাইন স্থাপত্যরীতিতে অভিজ্ঞ কারিগর নিয়োগ। লেন বলেন, "The influence of Byzantine on the art of the Arabs cannot be doubted. It was at first the direct use of Byzantine workmen and afterwards the gradual adaptation of portions of their architecture to a new style."[২] বলাই বাহুল্য, মুসলিম স্থাপত্যের প্রাক্কালে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগর, স্থপতি ও কারুশিল্পীর যথেষ্ট অভাব ছিল। তৎকালীন সময়ে বায়জানটাইন এবং সাসানীয় শিল্পকলার মতো অতিপ্রাচীন এবং অত্যুৎকৃষ্ট সাংস্কৃতিক ধারক এবং বাহক হিসেবে মুসলমানগণ যখন সিরিয়া, ইরাক, পারস্য, মিশর এবং উত্তর আফ্রিকায় রাজত্ব করতে থাকেন তখন খুবই স্বাভাবিক যে স্থানীয় স্থাপত্যরীতির প্রভাবে মুসলিম ইমারতগুলোর গঠনশৈলী ও অলঙ্করণের কিছুটা বিবর্তন ঘটবে। Rice যথার্থই বলেন, "the Omayyad, with its capital at Damascus, adopted a culture which was essentially Syro-Byzantine."[৩]

১। A Short Account, p. 65.
২। Lane, p. 591.
৩। Rice. p. 225.

মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের উন্মেষে যে সমস্ত অভিজ্ঞ এবং দক্ষ অমুসলমান শিল্পী বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যায়। কুফা মসজিদ নির্মাণ করেন পারস্যের মাজদীয়ান ধর্মাবলম্বী স্থপতি রুজবী ইবন বুজর্গ মিহ্‌র। মদিনা মসজিদের পুনর্নির্মাণে গ্রীক ও কপটিক স্থপতিগণ অংশগ্রহণ করেন। ৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে কা'বা শরীফের পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব পালন করেন পারস্যদেশীয় কারিগরেরা। ফুসতাত মসজিদের মিহ্‌রাব নির্মাণে কপটিক সূত্রধর বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং মদিনা মসজিদ অবতল মিহ্‌রাবটিও কপটিক দারুশিল্পীর অপূর্ব শিল্পকর্ম। মুসলিম স্থাপত্যের উন্মেষে আবদুল মালিক এবং তাঁর পুত্র আল-ওয়ালিদের অবদান অবিস্মরণীয়। মুসলিম স্থাপত্যের অসাধারণ দুটি কীর্তি—কুব্বাতুস্ সাখরা এবং দামেস্কের জা'মি মসজিদ নির্মাণে বায়জানটাইন স্থপতিদের অবদান নগণ্য নয়। অনিন্দ্যসুন্দর বায়জানটাইন গির্জা Church of Holy Sepulchre-কে স্থাপত্যশৈলী এবং অপরূপ অলঙ্কারের মাধ্যমে ম্লান করার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় কুব্বাতুস সাখরা (Dome of the Rock)। অনুরূপভাবে পিতার অমর কীর্তির সমতুল্য করে আল-ওয়ালিদ দামেস্কের জা'মি মসজিদ নির্মাণ-প্রচেষ্টা ব্যাহত হত, যদিনা তিনি বায়জানটাইন স্থপতি ও কারিগর এবং পর্যাপ্ত মোসাইক (ফুসাইফিসা) না পেতেন। রাইস মন্তব্য করেন, "The conception of the plan of the Dome of the Rock would have been impossible, as Creswell has shown without Byzantine and Christian Syrian prototypes, while the decoration of these two buildings with mosaics would have been equally impossible had not extensive technical and ornamental experience been made in the preceeding centuries under the patronage of the Byzantine Emperors."[১]

মুসলিম স্থাপত্যে বায়জানটাইন প্রভাব অনুপ্রবেশ করেছে বিভিন্ন কারণে। প্রথমত, মরুবাসী আরবগণ সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে গিয়ে বিদেশী ভাবধারায় বায়জানটাইন স্থাপত্যকীর্তির মতো চাকচিক্য ও সৌকর্যবিশিষ্ট ইমারত নির্মাণে ব্রতী হন। দ্বিতীয়ত, প্রাক্-মুসলিম যুগে বহু শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা বায়জানটাইন স্থাপত্য ঐতিহ্যের অবস্থিতি ও প্রভাব এবং তৃতীয়ত, বিজিত অঞ্চলে বায়জানটাইন স্থাপত্যকীর্তির সহ-অবস্থান। Papadopoulo যথার্থই বলেন, "Simply put, the Dome of the Rock as a muslim monument and the first muslim example of its type, as well as the first to profit from all the technical and artistic possibilities of Byzantine architecture."[২] এমনকি কোনো কোনো লেখক কুব্বাতুস সাখরাকে বায়জানটাইন শিল্পকলার চরম প্রকাশ বলেছেন। এ প্রসঙ্গে রাইসের মন্তব্য, "Yet craftsmen and artists of the very first rank were still (717 A.D) to be found, and the superb mosaics in St. Demetrius at

১। op.cit. p 225.
২। op cit. p 243

Salonica, in the Dome of the Rock at Jerusalem and in the Great Mosque at Damascus, though in the two latter cases executed for Islamic patrons, may be classed as Byzantine monuments, attesting the importance of the age in the world of art."[১] কুব্বাতুস সাখরা অথবা দামেস্কের জা'মি মসজিদকে কখনওই বায়জানটাইন ইমারত বলা যায় না। ঐতিহাসিক ও স্থাপতিক দিক দিয়ে এ দুটি ইমারত মুসলিম স্থাপত্যের অতুলনীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমারত। বায়জানটাইন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় কুব্বাতুস সাখ্রার ভূমি-পরিকল্পনায় (বসরার ক্যাথেড্রাল্, ৫১২-১৩ খ্রীঃ), পবিত্র পাথরবেষ্টিত গম্বুজ (Church of Holy Sepulchre) বৃত্তের বেষ্টনীতে স্তম্ভ এবং পিয়ারের পর্যায়ক্রম ব্যবহার (Santa Costanza, ৩২৪-২৬ খ্রীঃ), গম্বুজের ব্যাস (Anastasis, ৩২৭-৩৫ খ্রীঃ), ড্রামের উপর গম্বুজ নির্মাণ (Church of the Nativity, ৫৩০ খ্রীঃ), স্তম্ভের সংযোগকারী কাঠের বন্ধনী (Sancta Sophia, ৩২৬-৩০ খ্রীঃ), লিনটেন এবং অর্ধবৃত্তাকার প্রবেশপথ (Cathedral of Bosra), প্রবেশপথের ঢালু ছাদ (Church at Qallat Simnan, পঞ্চম শতাব্দী), কাঠের গম্বুজ (Temple of Marneion at Gaza, দ্বিতীয় শতাব্দী)। বিশেষভাবে মোসাইকের ব্যবহারে মুসলিম স্থাপত্যশিল্প বায়জানটাইন কারিগরের উপর নির্ভরশীল ছিল। নবম শতাব্দীতে 'ফুসাইফিসা' সম্বন্ধে যে তথ্য জানা যায় তাতে প্রতীয়মান হয় যে, পাথর অথবা গ্লাসের টুকরো বায়জানটাইন সম্রাট আল-ওয়ালিদের অনুরোধে সরবরাহ করেন। কুব্বাতুস সাখরায় মোসাইকের অলঙ্করণ সিরিয়ার বায়জানটাইন ইমারত থেকে অনুকরণ করা হয়। বিশেষ করে রোমের সেন্ট পিটার গির্জা (৪৫০ খ্রীঃ), ট্রিয়েস্ট্রের নিকট প্যারেনযোর ব্যাসিলিকা (ষষ্ঠ শতাব্দী) এবং বেথেলহেমের ন্যাটিভিটি গির্জা মোসাইকের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রাইস মনে করেন, "At the Dome of the Rock the mosaics are formal and decorative, with Hellenistic and Persian influences curiously combined."[২] গ্রীক-রোমীয় বায়জানটাইন স্থাপত্য অলঙ্করণ থেকে আহরিত অ্যাকান্থাস, দ্রাক্ষালতা, অঙ্গুরলতা, গহনা, পুষ্পদান, প্রাচুর্যশৃঙ্গ প্রভৃতি নক্শার পাশাপাশি সাসানীয় মোটিভ, যেমন—ডানা, অর্ধচন্দ্র ও তারকা এবং মিনাকরা টালি সেলজুক আমলে ব্যবহৃত হয়েছে।

বায়জানটাইন রীতি-শৈলী দামেস্কের মসজিদে সর্বাধিক উৎকর্ষ লাভ করে। বায়জানটাইন আমলে নির্মিত সেন্ট জনের গির্জা (Church of St. John the Baptist, ৩৭৯-৯৫ খ্রীঃ) থেকে রূপান্তরিত মসজিদটিতে বায়জানটাইন প্রভাব প্রকট আকারে দেখা দিয়েছে স্থাপত্যপদ্ধতি ও অলঙ্করণরীতিতে। Papadopoulo মন্তব্য করেন, "Everything here is in accordance with Byzantine norms of construction and Byzantine style, with the characteristic rhythms

---

১। op cit. p. 22.

২। op. cit. p. 92.

of columns and widows, an impressive prayer hall facade facing the court with a frontispiece crowned by a triangular pediment recalling the Parthenon monumental portals no longer disposed casually but in regular manner in the centre of the three walls, and binary rhythms in the two-storied arcades, twinned windows, are so on."[১] দামেস্কের মসজিদে যে গোলাকার অশ্বনালাকৃতি খিলান ব্যবহৃত হয়েছে তা সিরিয়ার নিসিবিনে Baptistry of Mar Yaqub নামক ধর্মমন্দিরে প্রথম উদ্ভাবিত হয়। দামেস্ক মসজিদের স্থাপত্যিক উপকরণের সাথে সাথে আলঙ্কারিক মোটিভের প্রয়োগে বায়জানটাইন প্রভাব দেখা যায়। করিন্থীয় ও কম্পোজিট ক্যাপিটাল, মার্বেলের আচ্ছাদন, স্বর্ণমণ্ডিত মার্বেল ও কাষ্ঠখোদাই মোসাইক চিরাচরিত বায়জানটাইন রীতি ও কৌশলকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বায়জানটাইন প্রভাবে মুসলিম স্থাপত্যের মৌলিকত্ব, নিজস্বতা, স্বকীয়তাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আদৌ ম্লান হয়নি। গার্ডেনার উইলকিনসন বলেন, "That the Saracens borrowed from the Byzantines is perfectly true, and this is quite in accordance with the history of other styles but it is not on that account precluded from assuming a new and independent character, when it remodelled and adapted those elements it found suitable to its requirements, and has made them its own ; and in all cases it may be safely predicted that each new style is derived from more than one parent."[২]

ব্যাসিলিকা দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও দামেস্কের মসজিদটি মুসলিম স্থাপত্যে একটি অনন্যসাধারণ ইমারত ; কারণ এতে মসজিদ-স্থাপত্য একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে দামেস্ক মসজিদ সাহ্‌ন "Courtyard" অর্থাৎ চত্বরবিশিষ্ট মসজিদের ভূমি-নকশায় অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে। এমনকি এর পূর্বেই জেরুজালেমের আল-আক্‌সা মসজিদ ইসলামের ধর্মীয় ইমারতের ক্রমবিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। রাইসের ভাষায়, "The mosque of Al-Aqsa at Jerusalem appears originally to have had the form of a great columnar hall, and represented a new conception in Islamic architecture, though its columns and capitals were Byzantine."[৩] পরবর্তী পর্যায়ে কাসরু'ল হাইর আশ শারকী, হাররান, কুসাইরু'ল হাল্লাবাত, দে'রা প্রভৃতি স্থানে যে মসজিদ নির্মিত হয় তা দামেস্ক মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনা দ্বারা প্রভাবান্বিত।

১। op. cit, p. 234,

২। op. cit. p. 217

৩। Rice, D.T., Islamic Art, London, 1965, pp. 13-14.

উমাইয়া স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, মূলত পাথর ও মার্বেলই নির্মাণের প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মার্বেলস্তম্ভের প্রাধান্য বেশি দেখা যাবে এবং স্বভাবত গ্রীক স্তম্ভের শির্ষদেশের প্রতিফলন যথা আইওনিয়ান, করিন্থীয় এবং কমপোজিটের প্রয়োগ দেখা যাবে। খিলান সাধারণত তিন ধরনের ছিল : গোলাকার, বৃত্তাকার, অশ্বনালাকৃতি এবং কৌণিক। ছাদ ঢালু অর্থাৎ একচালাবিশিষ্ট, এবং সমান্তরাল গম্বুজের প্রয়োগ দেখা যাবে, কিন্তু কাঠের ছাদবিশিষ্ট, আকারে গোলার্ধের মতো, কখনও কখনও খাঁজকাটা (fluted) কাঠের বন্ধনী স্তম্ভের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করে। গম্বুজ নির্মাণে স্কুইঞ্চের স্থলে পেনডেনটিভের ব্যবহার সার্বজনীন। ট্যানেল ভল্ট ইট এবং পাথর দিয়ে তৈরি করা হত।

উমাইয়া খিলাফত থেকে আব্বাসীয় খিলাফতে উত্তরণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে কূহনেল বলেন, "ইসলামী পাশ্চাত্য যখন চূড়ান্তভাবে আব্বাসীয় খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং প্রাচ্য রাজধানী দামেস্ক থেকে পূর্বদিকে প্রাচীন ইরানী শহর টেসিফোনের নিকট নব-প্রতিষ্ঠিত বাগদাদে নীত হয়, তখন এই স্থানান্তর কারুশিল্পসহ সংস্কৃতির সকল শাখার উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রাচ্যে আরবের পাশাপাশি ইরানী বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। প্রথম পর্যায়ে যে গ্রীক পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্যবন্ধন মুসলিম স্থাপত্যকে প্রসারিত করে এই পর্যায়ে এসে তা শিথিল হয়ে পড়ে এবং মেসোপটেমিয়ার বর্ধিষ্ণু সাসানীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।"[১] একই কথার প্রতিধ্বনী করে Marcais বলেন, "with the change of capital from Damascus to Baghdad a vast stream of Iranian influence came pouring in, charged with Sasanian survivals and reminiscences and with even more ancient Mesopotamian memories. The contribution of Hellenistic art to that of Islam, became increasingly secondary and could not withstand the impact of this refreshing Orientalization."[২] ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে উমাইয়া বংশের পতনের ফলে আব্বাসীয় রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। এর রাজধানী সিরিয়ার প্রাণকেন্দ্র ও বায়জানটাইন শিল্পরীতির পাদপীঠ থেকে মেসোপটেমিয়ার বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে অবশ্য রাজধানী সিরিয়া এবং কুফার মধ্যবর্তী স্থান হাশেমিয়ায় স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু খলিফা আল-মনসুর ৭৬১-৬৩ খ্রীস্টাব্দে টাইগ্রীস নদীর পশ্চিম তীরে মনসুরার প্রাকৃতিক পরিবেশে মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের একটি ব্যতিক্রমধর্মী এবং অবিস্মরণীয়—বৃত্তাকার শহর বাগদাদ প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ বারো বছর ধরে সিরিয়া, মসুল, পারস্য, কুফা ও ওয়াসিত থেকে সংগৃহীত সুদক্ষ কারিগর শিল্পী ও স্থপতির অক্লান্ত পরিশ্রমে 'দারুস সালাম' এক সুসমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়।

সিরিয়ার মসজিদগুলোর সঙ্গে ইরাকের মসজিদগুলোর তুলনা কবলে দুটি ভিন্নমুখী স্থাপত্যরীতির ধারা সহজেই নজরে পড়বে। আব্বাসীয় খিলাফতের বহু পূর্ব থেকে

১। আর্নেস্ট কূহনেল, ইসলামী শিল্পকলা ও স্থাপত্য, অনুবাদ বুলবন ওসমান, চট্টগ্রাম, ১৯৭৮, পৃ. ২১।

২। Marcais, G. Abbasid Art in Encyclopaedia of World Art, p. 6.

এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে নির্মিত মসজিদসমূহেও পারস্য স্থপতি ও স্থাপত্যরীতির ছাপ রয়েছে। ডিস বলেন যে, ইরাক বিজিত হলে সামরিক ছাউনি নির্মাণে স্থানীয় স্থপতিগণ অংশগ্রহণ করেন। সাদ্‌ ইবনে আবী ওয়াক্‌কাস মা'দাইন (টেসিফোন) দখল করে প্রাচীন সাসানীয় প্রাসাদে 'তাক-ই-কিস্‌রা' অর্থাৎ খসরুদের প্রাসাদে জামাতে নামায পড়েন। Streck বলেন যে, "সাসানীয় রাজ্যের রাজধানী মাদাইন দখল মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।" সাসানীয় রাজা প্রথম সাহাপুর (২৪১-৭২ খ্রীঃ) এই অনিন্দ্যসুন্দর ভল্টের তৈরি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। Streck-এর ভাষায়, "The Muslims pending the building of a mosque of their own, used the grand hall (vaulted) of Iwan, provisionally after the capture of Ctesiphon the paintings and images executed in gilt reliefs remained in tact for two centuries"[১] উমাইয়া খলিফা মু'য়াবিয়ার খেলাফতকালে যিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ্ কুফা মসজিদের সংস্কার করেন। এই সংস্কার পরিচালনা করেন একজন পারসিক রুজবিহ্ ইবনে বুজুর্গমিহর।[২] ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে পুনর্নির্মিত কুফা মসজিদের ছাদ কয়েকটি মার্বেলস্তম্ভ সংযোগ করে উঁচু করা হয়। ৪৯ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট ছাদ এবং অভ্যন্তরীণ স্তম্ভরাজির সমাবেশে কুফা মসজিদটিকে পারস্যের কোনো প্রাসাদের অভ্যন্তর বলে ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। ক্রেসওয়েল বলেন, "It is obvious that its roofing system resembled that of an apadana or Hall of Columns of the old Persian Kings."[৩] কুব্বাতু'স সাখারার নির্মাণে কোনো পারস্য কারিগর নিযুক্ত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। তবে অন্য কারণে সাসানীয় মোটিভ লক্ষ করা যায়, যেমন– অর্ধচন্দ্র ও তারকা। উমাইয়া আমলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ওয়াসিতে ৭০০-৪ খ্রীস্টাব্দে যে মসজিদের নির্মাণ করেন তার চিরাচরিত আয়তাকার উমাইয়া মসজিদের স্থলে পূর্ববর্তী চতুষ্কোণাকার মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। হাজ্জাজের এই মসজিদের লিওয়ান কুফা মসজিদের যুল্লার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। ক্রেসওয়েল উল্লেখ করেন যে, এই মসজিদের খননকালে প্রাপ্ত কয়েকটি চুনাপাথরের গায়ে সাসানীয় ধরনের নক্‌শা খোদিত হয়েছিল।[৪]

পারস্য বিজয়ের পর মুসলমানগণ ইসতেখার (Persepolis) এবং কাযউইনে প্রাক্‌-মুসলিম পারস্যের স্থাপত্য-উপাদানের ব্যবহারে মসজিদ নির্মাণ করেন তার উল্লেখ করা হয়েছে। খলিফা আল-ওয়ালিদ দামেস্কের মসজিদ নির্মাণে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কারিগর ও স্থপতি সংগ্রহ করেন এবং একথা নিশ্চিত করে জানা যায় যে, বায়জানটাইন ও মাগরিবী ছাড়াও পারস্য ও ভারতবর্ষ থেকে আগত শ্রমিক কারুশিল্পী নিয়োজিত ছিলেন। উমাইয়া স্থাপত্য এবং চারুশিল্পে সাসানীয় প্রভাব দেখা যাবে। কুব্বাতু'স্‌

১। Streck, M., Al-Madian, in Encyclopaedia of Islam, vol. III, p. 80.

২। তাবারী বলেন যে, যিয়াদ প্রাক্‌-ইসলামী যুগের (অথবা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের'– Days of Ignorance) স্থপতিদের নিয়োগ করেন, A Short Account, p. 13.

৩। Ibid. p. 13.

৪। Ibid. p. 41

সাখরার মোসাইকে দুটি ডানাবিশিষ্ট নক্শা, মাশাত্তার খোদিত ফ্রিজের বৃষকে বধরত সিংহ, ডানাবিশিষ্ট পৌরাণিক জন্তু গ্রিফিন, দুটি ডানাবিশিষ্ট লতাপাতা বা 'কানডালাব্রা খিরবাত আল-মাফজারের একটি ফ্রেস্কোতে অঙ্কিত হরিণকে বধরত সিংহ এবং প্রতীকধর্মী বৃক্ষ, সাসানীয় শিল্পকলার প্রভাবকে সুনিশ্চিত করে। ভল্টের ব্যবহার পারস্য স্থাপত্যের অনবদ্য অবদান। মাসাত্তা এবং কস্‌র-ই-তুবায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ প্রকোষ্ঠ (bayt) সম্বলিত যে প্রাসাদ দেখা যায় তার রীতি ও কৌশল পারস্য স্থাপত্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। রাইস মনে করেন যে, কুসাইর আমরায় পরাজিত ইসলামের শত্রুদের প্রতিকৃতি রয়েছে, তাতে সাসানীয় রাজার প্রতিমূর্তি রয়েছে বলা যায় এবং সমগ্র চিত্র-পরিকল্পনাটি সাসানীয়!

আব্বাসীয় খেলাফতের পারস্য সভ্যতার উপাদান উমাইয়া রাজত্বকাল অপেক্ষা অধিকতর ছিল। কারণ কৃষ্টি ও সভ্যতার উন্মেষে আব্বাসীয় খলিফাগণ বায়জানটাইনের পরিবর্তে পারস্যের উপর নির্ভবশীল ছিলেন। প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতার বেলাভূমিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হলে ইসলামী সাম্রাজ্যের পার্সিকরণ শুরু হয়। মনসুরের রাজত্বকালে নির্মিত বাগদাদ ও রাক্কার দুর্গে পারস্য প্রভাব প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বাগদাদ শহর নির্মাণে পারস্য কারিগর ও স্থপতি অংশগ্রহণ করে, এমনকি এর পূর্বে মার্ভে যে 'দারুল ইমারা' নির্মাণ করেন তাতে সাসানীয় আইওয়ানের প্রভাব লক্ষ করা যাবে। আব্বাসীয়গণ পারস্য সম্রাটদের অনুকরণে বাগদাদ, রাক্কা, উখাইদির, বুলকাওয়ারা প্রভৃতি প্রাসাদ-দুর্গ তৈরি করে অক্ষয় কীর্তি বেখে গেছেন। রৌদ্রে পোড়া ইট এবং পোড়া ইট খিলান, ভল্ট, লম্বালম্বি খিলানরাজি, গম্বুজ, সাসানীয় প্রাসাদে দেখা যাবে এবং ফিরোজাবাদ তাক্-ই-কিসরা, কস্‌র-ই-খারানা, কস্‌র-ই-শিরিন প্রভৃতি প্রাসাদের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। রাক্কায় মনসুর কর্তৃক নির্মিত প্রাসাদের ফটকের সঙ্গে তাক-ই-কিস্‌রার প্রাসাদ-প্রাচীরের সাদৃশ্য রয়েছে, যেমন—কৌণিক খিলান, সংলগ্ন স্তম্ভ, দেওয়ালের অভ্যন্তরে খোদিত খিলান, ক্রস ও টানেল ভল্ট প্রভৃতি। যে জ্যমিতিক নক্শা অথবা 'হাজার বাফ' রাক্কা এবং উখাইদিরে ব্যবহৃত হয়েছে তাও সম্ভবত পারস্য শিল্পকলার প্রভাব। উখাইদিরে "কোর্ট অব-অনারের" যে প্রাচীর রয়েছে তা পারস্যের 'পিসতাক' দ্বারা প্রভাবান্বিত ; উপরন্তু, ভল্টের প্রকোষ্ঠ, নক্শাকৃতি খিলানরাজি, বায়তের ব্যবহার অর্ধগোলাকার পোস্তা (buttress) পারস্য স্থাপত্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাগদাদ থেকে রাজধানী সামাররায় স্থানান্তরিত হলে মু'তাসিম ও মুতাওয়াক্কিল যে সমস্ত প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করেন তাতে পারস্য প্রভাব রয়েছে।

নির্মাণ-উপকরণের বৈচিত্র্য মেসোপটেমীয় শিল্পরীতিতে পুষ্ট আব্বাসীয় স্থাপত্যে বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়েছে। উমাইয়া আমলের চুনাপাথর মার্বেল প্রভৃতির স্থলে ইটের ব্যবহার সুমেরীয়-ব্যাবিলনীয় পদ্ধতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ইটের প্রয়োগ শুধু স্থাপত্যেই নয় অলঙ্করণেও দেখা যাবে, স্টাকো, টেরাকোটার উদ্ভব ইট ব্যতিরেকে কখনওই সম্ভবপর হত না। উমাইয়া যুগেও ইরাকে নির্মিত ওয়াসিতের মসজিদ সম্পূর্ণরূপে ইটের তৈরি ছিল। আব্বাসীয় যুগের অন্যতম প্রাচীন বাগদাদের মসজিদ নির্মাণে কাদামাটি এবং রৌদ্রে পোড়া ইটের প্রয়োগ দেখা যায়। চতুষ্কোণাকার ভূমি-

পরিকল্পনা কুফা ও ওয়াসিত মসজিদেও লক্ষ করা যায়। প্রাথমিক যুগের এই সমস্ত মসজিদের ছাদ সরাসরি কোনোপ্রকার খিলান ছাড়া কাঠের স্তম্ভ অথবা ইটের পিয়ারের উপর ন্যস্ত থাকত—এ ধরনের ইমারতকে প্রাচীন পারস্যের আপাদানা (Apadana) বলা হয়। পার্সিপলিসে যারেকসেসের আপাদানা রয়েছে। চতুষ্কোণাকার ও খিলানরাজির উপর নির্মিত ছাদবিশিষ্ট মসজিদের দৃষ্টান্ত দেখা যায় রাক্কা এবং আবু দুলাফের মসজিদে। এই ভূমি-পরিকল্পনা পরবর্তী পর্যায়ে একদিকে মিশরের আমলে মসজিদে (৮২৭ খ্রীঃ) এবং ইবনে তুলুনের মসজিদে অন্যদিকে গম্বুজসহকারে পারস্যের কায, দাস্তি ও এজিরানে ব্যবহৃত হয়েছে। রাক্কা মসজিদ সম্বন্ধে ক্রেসওয়েল মন্তব্য করেন, "This mosque standing on the dividing line between Syria and Mesopotamia, provides an interesting example of the blending of two types." চতুষ্কোণাকার ভূমি-পরিকল্পনা, সাহান, অর্ধগোলাকৃতি পোস্তা (bastion) এবং অধিকসংখ্যক প্রবেশপথ মেসোপটেমীয় রীতির পরিচায়ক হলেও তিন আইলবিশিষ্ট লিওয়ান, ঢালু ছাদে (gable), পিয়ারের সংলগ্ন স্তম্ভের শীর্ষদেশে একানথাসের ব্যবহার গ্রীক রোমান-বায়জানটাইন রীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

উখাইদিরের মসজিদটি পারস্য স্থাপত্যের ঐতিহ্য বহন করে রয়েছে। রাইস বলেন, "The vaults and arches were all of elliptical form–the pointed version, allthough known in Syria, had not yet been developed in Mesopotamia. The elliptical arch had been used extensively by the Sasanians, and the whole palace had a very Sasanian characters : Indeed it was regarded as Sasanian until the discovery that one of the chambers on the ground floor was actually a mosque"[১] ভল্টের ব্যবহার নিঃসন্দেহে মেসোপটেমীয় স্থাপত্যরীতি থেকে গ্রহণ করা হয় এবং এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে—সাসানীয় 'তাক-ই-কিসরা'। ইটের তৈরি টানেল ভল্ট উখাইদিরের মসজিদের লিওয়ানে সর্বপ্রথম দেখা যাবে। পরবর্তীকালে ভল্টের দ্বারা নির্মিত মসজিদ দামগানের তারিকখানা, সুসার রিবাতের মসজিদ, বূ-ফাতাতা মসজিদ এবং জা'মি মসজিদ।

উমাইয়া মসজিদের কিবলা-প্রাচীরে অর্ধগোলাকার অবতল মিহরাব নির্মিত হয়েছে। কিন্তু আব্বাসীয় যুগে এবং পরবর্তী পারস্যের মসজিদে আয়তাকার মিহরাব স্থাপিত হয়। উখাইদিরের মসজিদে সর্বপ্রথম আয়তাকার অবতল মিহরাব প্রতিষ্ঠা করা হয়। সামাররা, আবু দুলাফ, দামগান ও নায়িনের মসজিদে এ ধরনের মিহরাব দেখা যাবে।[২] বায়জানটাইন প্রভাবে উমাইয়া আমলে মার্বেলস্তম্ভের ব্যবহার অধিক ছিল, কিন্তু আব্বাসীয় স্থাপত্যের প্রারম্ভেই ইটের তৈরি পিয়ারের প্রচলন হয়। রাক্কার মসজিদের

১। Rice, Islamic Art, pp. 31-32

২। Bell. G., Palace and Mosque at Ukhaidir, Oxford, 1914, p. 190.

লিওয়ানের সাহানের সম্মুখের খিলানরাজি পিয়ারের ব্যবহার সম্ভবত এখানেই প্রথম লক্ষ করা যায়। দামেস্কের মসজিদে পাথরের পিয়ার সাহানের চতুর্দিকে দেখা গেলেও ইটের পিয়ারের সার্বজনীন প্রয়োগ দেখা যাবে সামাররার আবু দুলাফের মসজিদে। পরবর্তীকালে কায়রোতে ইবনে তুলুন মসজিদ নির্মাণকালে মেসোপটেমীয় প্রভাবে পিয়ার ব্যবহার করা হয়।

উমাইয়া যুগে রোমান বায়জানটাইন ধরনের অর্ধগোলাকার খিলান বহুল প্রচলিত ছিল ; কিন্তু কৌণিক খিলান, যার উৎপত্তি হয় আসীরীয় সভ্যতায়, আব্বাসীয় স্থাপত্যকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। দামেস্কের মসজিদের লিওয়ানের প্রবেশপথের খিলান ফ্রেমটি ঈষৎ কৌণিক হলেও উমাইয়াগণ কৌণিক খিলান প্রয়োগে পক্ষপাতী ছিলেন না। আব্বাসীয় যুগে দুটি কেন্দ্র এবং চারটি কেন্দ্র থেকে (Two-centred এবং four-centred) কৌণিক খিলান নির্মাণের কৌশল ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়। উখাইদিরের ভল্ট সামান্য কৌণিক হলেও ক্রেসওয়েলের মতে, রামলার চৌবাচ্চায় (Cistern, 789 A.D.) কৌণিক খিলান সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় ("The earliest known example of the systematic and exlusive employment of the free-standing pointed arch."[১] কিন্তু কৌণিক খিলান ইবনে তুলুনের মসজিদে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং সার্বজনীন উপাদানে পরিণত হয়। রাইস বলেন যে, "The most important of all the Mesopotamian works overseas is, however, undoubtedly the Great Mosque of Ibn Tulun at Cairo."[২] কৌণিক খিলান প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "The pointed arch had already been used in Syria, but in the mosque of Ibn Tulun we have one of the earliest examples of its use of an extensive scale, some centuries before it was exploited in the west by the Gothic architects."[৩] চার বিন্দু থেকে নির্মিত কৌণিক খিলানকে 'পারস্য খিলান' বলা হয়। সর্বপ্রথম রাক্কার প্রাসাদে বাগদাদ ফটকে এই ধরনের খিলান ব্যবহৃত হয় (৭৭২ খ্রীঃ)। সামাররার 'বাব আম্মা' প্রাসাদেও চার বিন্দু থেকে উদ্ভূত খিলান প্রয়োগ করা হয় এবং পারস্যের মসজিদে ও ভারতবর্ষের মোগল স্থাপত্যকীর্তিতে এ ধরনের খিলান দেখা যায়।

বায়জানটাইন এবং উমাইয়া স্থাপত্যে গম্বুজ নির্মিত হয় পেনডিনটিভের সাহায্যে ; কিন্তু সাসানীয় পারস্য (ফিরোজাবাদ) থেকে অনুকরণ করে মুসলিম স্থপতিগণ সর্বপ্রথম মুসলিম ইমারতে স্কুইঞ্চের প্রয়োগ করেন। ক্রেসওয়েল আব্বাসীয় ইমারতে স্কুইঞ্চের সর্বপ্রথম ব্যবহারের উল্লেখ করেন, যেমন– উখাইদির (৭৭৮ খ্রীঃ), সামাররা (৮৪৯-৮৫৩ খ্রীঃ), সুসার জা'মি মসজিদ (৮৫০ খ্রীঃ), কায়রোয়ানের জা'মি মসজিদ (৮৬২-৬৩ খ্রীঃ) এবং তিউনিসের জা'মি মসজিদ (৮৬৪ খ্রীঃ), আব্বাসীয় স্থাপত্যশৈলীর বৈচিত্র্যময়

১। A Short Account, p. 230.
২। Islamic Art, p. 44.
৩। Ibid, p. 45.

রূপ মুসলিম স্থাপত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হচ্ছে যিকুরাতের অনুকরণে প্যাঁচালো সিঁড়িবিশিষ্ট গোলাকার (cylindrical) মিনার। উমাইয়া যুগে মসজিদের মিনার চতুষ্কোণাকার ছিল, যেমন– ফুসতাত, দামেস্ক, কায়রোয়ান। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সিরিয়ার খ্রীস্টান গির্জার চতুষ্কোণাকার বুরুজ দ্বারা এসমস্ত মিনার প্রভাবান্বিত ছিল। কিন্তু আব্বাসীয় স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান গোলাকার মিনার। প্রাচীন মেসোপটেমীয় যিকুরাত থেকে অনুকরণ করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ সমস্ত সুউচ্চ, ক্রমশ ঢালু (tapering) এবং গোলাকার মিনার নির্মিত হয়েছে। সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে সামাররার জা'মি মসজিদের 'মালবিয়া' মিনার। পরবর্তীকালে আবু দুলাফের মসজিদে এবং আংশিকভাবে ইবনে তুলুনের মসজিদে এরূপ মিনার নির্মাণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, পারস্যের এবং ভারতবর্ষের অনেক মিনার গোলাকৃতি এবং ক্রমশ ঢালু করে স্থাপিত হয়, যেমন– ইসফাহানের চেহেল দুখতারান, সাভা, গজনী, জাম, কুতুব মিনার, বিদর এবং গৌড়ের ফিরোজা মিনার।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খিলানাকৃতি কুলুঙ্গীর অপূর্ব সমাবেশের সৃষ্টি করা হয় স্টালাকটাইট (stalactite), (আরবীতে বলা হয় 'মুকারনাস')। Papadopoulo বলেন, "The Iranian form that most influenced the architecture of other Islamic countries is beyond question the system of successive squinches that finally developed into honey-combs of stalactities, the muqarnas." মুকারনাসের প্রয়োগ বায়জানটাইন-প্রভাবিত উমাইয়া স্থাপত্যে লক্ষ করা যাবে না। আব্বাসীয় খিলাফতের অলঙ্করণের এক অভিনব পন্থা আবিষ্কৃত হয় এবং সম্ভবত বাগদাদে হারুনুর-রশীদের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী যোবায়দার সমাধিতে সর্বপ্রথম মুকারনাসের ব্যবহার দেখা যায়। বিনি স্পীয়ার্সের বর্ণনা অনুযায়ী, "The 8th century tomb of Zubayda, wife of Harun, octagon, was vaulted over by a series of niches in nine stages of levels, rising one above the other and brought forward on the inside thus covering the tomb."[১] পরবর্তী পর্যায়ে পারস্য, তুরস্ক, স্পেন, ভারতবর্ষের অসংখ্য ইমারতে বিশেষ করে মসজিদে মুক'রনাসের ব্যবহার সার্বজনীন রূপ ধারণ করে।

উমাইয়া যুগে পাথর বা মার্বেলের উপর নির্ভরশীল অলঙ্করণরীতির, যেমন মোসাইকের বহুলপ্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু আব্বাসী যুগে অলঙ্করণরীতির আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সাসানীয় স্টাকোর অনুকরণে মুসলিম ইমারত শোভিত করা হত। আব্বাসীয়দের পূর্বে কাসরু'ল হাইর-এর প্রাসাদের বুরুজে স্টাকোর ব্যবহার ছিল; এমনকি সিরামিক মৃৎপাত্রের খণ্ড দিয়েও অলঙ্কৃত করা হয়।[২] কিন্তু সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এবং তাৎপর্যপূর্ণ ইটের অসাধারণ দৃষ্টান্ত রয়েছে রাক্কার বাগদাদ ফটকে, সামাররা-এর মুতাসিমের প্রাসাদ জওসাক আল-খাকানিতে। এই প্রাসাদের বাবু'ল

১। Spiers, R. p Mahommedan Architecture in Encyclopaedia Britannica, vol.II. Cambridge, 1910, 11th edition, p 425.

২। A Short Account, pp. 11–15 .

আম্মার অলঙ্করণ সম্বন্ধে হার্যফেল্ড বলেন যে, প্রাসাদের নিম্নভাগ স্টাকো দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সামাররার মসজিদ এবং আবু দুলাফের মসজিদেও স্টাকো এবং মিনাকরা টালির ব্যবহার দেখা যাবে। উল্লেখ্য যে, মেসোপটেমীয় শিল্পধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আব্বাসীয় স্থপতি ও কারিগরগণ স্টাকো ও মিনাকরা টালির যে রীতি প্রচলন করেন পরবর্তীকালে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, পারস্য এবং ভারত উপমহাদেশে তার অসংখ্য নজির রয়েছে। কায়রোয়ান মসজিদের রঞ্জিত টালি (Lustre tile) সামাররার অলঙ্করণের অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে। এমনকি বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, কায়রোয়ানের টালি মেসোপটেমিয়া থেকে আমদানী করা হয়।[১] ইবনে তুলুনের মসজিদে এ ধরনের অলঙ্করণের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ক্রেসওয়েল বলেন, "It is principally in respect of its ornament and its piers that the Mosque of the Tulun is a foreign, Iraqi building planted down on the soil of Egypt, and a large number of Iraqi craftsmen must have been employed for its ornament in wood and stucco."[২]

মুসলিম স্থাপত্যের ক্রমবিকাশে কপটিক শিল্পকলার প্রভাব অনস্বীকার্য। মিশরবিজয়ের পর থেকেই মিশরীয় খ্রীস্টান বায়জানটাইন শিল্পকর্ম প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলাকে প্রভাবান্বিত করতে থাকে তা পূর্বেই বলা হয়েছে। কপটিক শিল্পকলার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রাইস বলেন যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় হেলেনিস্টিক শিল্পধারা অব্যাহত থাকলেও নীল নদীর অববাহিকায় একধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খ্রীস্টান শিল্পরীতির উদ্ভব হয় যা প্রকাশধর্মী। একে রাইস "Christian art of a severer and more expressive type, akin to that of Syria."[৩] বলে অভিহিত করেন। এই শিল্পরীতিই পরবর্তীকালে কপটিক নামে পরিচিত হয়। প্রাচীন মিশরীয় বায়জানটাইন খ্রীস্টান শিল্পধারার সংমিশ্রণের ফলেই কপটিক শিল্পের আবির্ভাব। সপ্তম শতাব্দীতে খলিফা হযরত উসমানের (রাঃ) শাসনামলে 'আমর ইবনু'ল আস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফুসতাত (কায়রোর উপকণ্ঠে) মসজিদে একটি মিমবার সংযোজিত হয়। ক্রেসওয়েলের মতে, মিশরের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ ইবনে সাদকে (৬৪৪-৫৬ খ্রীঃ) নুবীয়ার খ্রীস্টান রাজা জাকারিয়া ইবনে মারকানী একটি মিমবার উপহার দেন। উল্লেখ্য যে, হযরত উমর (রাঃ) ইতিপূর্বে ফুসতাত মসজিদে আমর কর্তৃক মিমবার স্থাপনের আবেদন নাকচ করেন। আলোচিত মিমবারটি সম্পূর্ণ তৈরি অবস্থায় ফুসতাতে প্রেরিত হয় এবং সুষ্ঠুভাবে স্থাপনের জন্য মারকানী একজন সুদক্ষ কপটিক সূত্রধরকে পাঠান। এই মিমবারটি অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে অক্ষত অবস্থায় ছিল। পরে ফুসতাত মসজিদের সম্প্রসারণ এবং সংস্কারের সময় কুররা ইবনে শারিক (৭০৯-১৪ খ্রীঃ) পুরাতন মিমবারের স্থলে একটি নতুন মিমবার সংযোজন করেন। আরবী ঐতিহাসিকদের তথ্য অনুযায়ী এই নতুন মিমবারটি ফুসতাতের কোনো গির্জা

১। A Short Account, p. 297

২। Ibid, p.317.

৩। Rice, Byzantine Art,p.49

থেকে আনা হয় এবং কুইবেল সাক্কারায় আপা জেরিমিয়াস গির্জায় (Monastery of Apa Jeremias) খননকালে যে বেদী আবিষ্কার করেন তার সঙ্গে ফুসতাতের মিমবারের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায় ধারণা করা হয় যে, সাক্কারার মিমবারটির অনুকরণে ফুসতাতের মিমবারটি নির্মিত হয়। ক্রেসওয়েল বলেন যে, এই মিমবারটি কোনো খ্রীস্টান অথবা কপটিক বেদী (pulpit) থেকে অনুকরণ করা হয়েছে।[১]

কপটিক স্থপতি, কারিগর, সূত্রধর ও শ্রমিকদের অবদান উমাইয়া যুগে স্পষ্টত নজরে পড়ে। খলিফা আল-ওয়ালিদের আমলে উমর ইবনে আবদুল আজিজ মদিনা মসজিদের সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন। নির্মাণকাজ ত্বরান্বিত করার জন্য খলিফা মদিনায় ৮০ জন গ্রীক এবং কপটিক শিল্পী ও কারিগর প্রেরণ করেন। ওয়াকিদীর উদ্ধৃতি দিয়ে সমহুদি বলেন, "কপটিক স্থপতিগণ মসজিদের কিবলার দিকে এবং গ্রীকগণ (বায়জানটাইন) মসজিদের পশ্চাতে এবং পাশে নির্মাণকাজে নিয়োজিত হন।" এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে, যেহেতু কপটিকগণ প্রধান নামাযঘর বা লিওয়ানের পুনর্নির্মাণে নিয়োজিত ছিলেন সেহেতু ৭০৭-৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁরাই ইসলামের প্রথম অবতল মিহরাব কিবলা প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রেসওয়েলের মতে, মিহরাব একটি কপটিক আবিষ্কার এবং এ ধরনের মিহরাব সাক্কারার আপা জেরামিয়াসের গির্জায় ছিল।[২] ক্রেসওয়েল আক্‌সা মসজিদ এবং কুব্বাতু'স সাখ্‌রায় অলঙ্করণে কপটিক কারুশিল্পীর অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

খলিফা আল-ওয়ালিদের অমর কীর্তি দামেস্কের জা'মি মসজিদ নির্মাণে অন্যান্য দেশের স্থপতি কারিগরের মতো মিশর থেকে কপটিক শিল্পী নিয়োজিত ছিলেন। ক্রেসওয়েলের মতানুসারে মাসাত্তার পাথরে খোদাইকাজে কপটিক শিল্পীর প্রভাব রয়েছে। তাঁর ভাষায় "Vine decoration and birds in the triangle A-L' at Mushatta were executed by the Coptic, workmen...........sometimes interpolated by Sassanian art motives."[৩]

আব্বাসীয় খিলাফতের কপটিক শিল্পীদের বিশেষ প্রভাব দেখা যায় না; যদিও লেন বলেন যে, আল-মামুন কপটিকদের বিদ্রোহ দমন করে কতিপয় কপটিক গির্জা মসজিদে রূপান্তরিত করেন।[৪] স্টাকোর অলঙ্করণে কপটিক কারুশিল্পীদের অবদানের কথা প্যাপাডোপোলো উল্লেখ করেন, বিশেষ করে আবু দুলাফের অলঙ্করণ রীতির প্রসঙ্গে। কায়রোতে নির্মিত ইবনে তুলুনের মসজিদ সম্বন্ধে আরব ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ইবনে তুলুন যখন কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত গির্জা থেকে সংগৃহীত ৩০০ মার্বেলস্তম্ভ দ্বারা মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন তখন একজন বন্দী কপটিক খ্রীস্টান স্থপতি জানান

১। Creswell, Coptic influence on Early Muslim Architecture, Bulletin, Cairo, p. 29.

২। A Short Account, p. 44

৩। Coptic influence, p 34

৪। Lane, op cit, p. 591.

যে, মিহ্‌রাবের উভয় পাশের দুটি স্তম্ভ ছাড়া তিনি মসজিদটি নির্মাণ করতে সক্ষম। ইবনে তুলুন একথা জানতে পেরে তাঁকে মুক্তি দেন এবং সিরিয়াবাসী এই খ্রীস্টান মসজিদটি ইট দ্বারা পিয়ারের সাহায্যে নির্মাণ করেন। সিরীয় স্থপতি মিশরের কপটিক স্থাপত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং কপটিক না হলেও স্থাপত্যিক অলঙ্করণে কপটিক প্রভাব সহজেই লক্ষ করা যায়। Papadopoulo-র উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য : "We think that in their own artistic traditions the Copts already possessed all the necessary elements and talents and their own tendency to abstruction and geometrical stylization was well established in their textiles long before the coming of Islam. Moreover, the way the stucco is incised here is derived from Copts were past masters."[১]

৪। মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য

খলিফা হযরত উমরের (রাঃ) শাসনামলে কুফায় প্রতিষ্ঠিত মসজিদের কাঠের কড়িতে আগুন লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রাদেশিক গভর্নর নতুনভাবে পাথরের সাহায্যে এটি পুনর্নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রত্যুত্তরে খলিফা বলেন, "করতে পারেন, কিন্তু তিনটি কক্ষের অধিক যেন না হয় এবং ইমারতটি খুব উঁচু করবেন না এবং রসূলুল্লাহ্‌র অনুসৃত রীতি পালন করুন যাতে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্র স্থায়ী হয়।" হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে যে, যে সমস্ত জাতি জাঁকজমকপূর্ণ সৌধ নির্মাণ করে তারা সহজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই প্রসঙ্গে আদ, সামুদের কথা বলা হয়েছে। ইবনে খালদূন বলেন যে, প্রাক্-ইসলামীযুগে আরব দেশে প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থানের মতো (আসীরীয় এবং ব্যাবিলনীয়, মিশরীয়, একামেনীয় প্রভৃতি) উৎকৃষ্ট স্থাপত্যরীতির প্রচলন ছিল না, অবশ্য দক্ষিণ আরবে স্যাবীয়ান এবং হিমীয়ারী যুগের স্থাপত্য নিদর্শন রয়েছে।[২] প্রাক্-মুসলিম আরবের সর্বাপেক্ষা পবিত্র ইমারত ছিল মক্কার কা'বা গৃহ। এমনকি কা'বাগৃহও ছিল সাধারণ ও অনাড়ম্বর গৃহ "An unpretentious cube like building of primitive simplicity, originally roofless serving as a shelter for a black meteorite, which was venerated as a fetish."[৩]

আরব ভূখণ্ডে মহিমামণ্ডিত স্থাপত্যরীতির কোনো ঐতিহ্য না থাকার কারণ শুষ্ক মরুভূমির প্রভাব। প্রথম যুগের মসজিদগুলোর অনাড়ম্বরতা ও আপাতদৃষ্টিতে আলঙ্কারিক দৈন্যের মূল কারণ মরুভূমির জীবনযাত্রার প্রভাব। জনৈক লেখক বলেন, "Something of the simplicity of the desert perhaps entered into the style of the mosque."

১। Papadopoulo, p. 250.

২। Hitti, History of the Arabs, pp. 54-55.

৩। Hitti.p. 100.

এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে হযরত উমর (রাঃ) রসূলে করীমের পর্ণকুটিরসম মসজিদের অনুকরণে কুফা মসজিদের সংস্কারের নির্দেশ দেন। রসূলে করীম স্বয়ং বলেছেন যে, "যা ভাল তাই গ্রহণ কর এবং যা মন্দ তা বর্জন কর।" রসূলে করীম (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে ইসলাম মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় নি এবং সেই আদর্শের প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল মদিনা, বসরা, কুফা ও ফুসতাতের আদি মসজিদসমূহে। উমাইয়া আমলে এই আদর্শের পরিবর্তন ঘটে বৈদেশিক প্রভাব, রাজতন্ত্রের জৌলুস ও অত্যুৎকৃষ্ট এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ইমারত নির্মাণের উচ্চাভিলাষে। আবদুল মালিকের কুব্বাতুস সাখরা এবং আল-ওয়ালিদের দামেস্কের মসজিদের নাম উল্লেখ করা যায়। এ প্রসঙ্গে আরব ঐতিহাসিকদের তথ্য অনুযায়ী দামেস্কে মসজিদ নির্মাণে সময় লাগে আট বছর এবং ব্যয় হয় এগারো লক্ষ বিশ হাজার অথবা ছাপ্পান্ন লক্ষ দীনার। মুসলিম স্থাপত্যের আদিপর্বে কেবলমাত্র ধর্মীয় ইমারত ব্যতীত অপর কোনো জাগতিক রীতি অর্থাৎ প্রাসাদ নির্মিত হয়নি। কিন্তু বায়জানটাইন এবং সাসানীয় স্থাপত্যের সংস্পর্শে আসার পর উমাইয়া ও আব্বাসীয়গণ বিশালাকায় ও অতুলনীয় প্রাসাদ নির্মাণ করতে থাকেন, যেমন, উমাইয়া যুগের কুসাইর আমরা, মাসাত্তা, কসরু, তুবা এবং আব্বাসীয় যুগে বাগদাদ, রাক্কা, উখাইয়দির, সামাররা প্রভৃতি। প্রাসাদ নির্মাণেই বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়নি, মসজিদের সৌন্দর্য ও কলেবর বৃদ্ধিতেও খলিফাগণ অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। আল-মুতাওয়াক্কিল সামাররার জা'মি মসজিদের নির্মাণে ৭০০,০০০ দীনার ব্যয় করেন।[১] আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেখানে হযরত উমর (রাঃ) ফুসতাত মসজিদের মিমবারটি সিংহাসন (throne)-এ রূপান্তরিত হতে পারে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, সেখানে পরবর্তী যুগে অজস্র অর্থ ব্যয় হয় সুরম্য প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণে।

মুসলিম স্থাপত্যে সর্বাধিক প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে মসজিদ এবং এই মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম জাহানের মধ্যে একটি যোগসূত্র ও ঐক্য স্থাপিত হয়। দানী অবশ্য যথার্থই বলেছেন যে, "There is no Quranic text prescribing the form, style and technique of Muslim Architecture."[২] কিন্তু পবিত্র কুর'আন শরীফে স্পষ্টভাষায় নামাযকে ইসলামের একটি প্রধান ও অপরিহার্য স্তম্ভ বলা হয়েছে : "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা নামায পড় ও যাকাত প্রদান কর।" ("আকীমু'স সালাত ওয়া আতুয যাকাত") বিশেষ করে শুক্রবারে জুমার নামায আদায়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে (৬২ : ৯, ৫ : ৬৩)। হাদীছেও বলা হয়েছে "মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করবে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরি করে দেবেন।" কুর'আন ও হাদীছের ভাষায়, মসজিদ নির্মাণ একটি পবিত্র কর্তব্য এবং নামাযের সঙ্গে সম্পর্কিত। জামা'আতে নামায পড়ার নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে মসজিদ বিশ্বের স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে একটি অভিনব স্থাপত্যমাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মসজিদ-স্থাপত্যের মূলে রয়েছে কিবলা নির্ধারণের প্রয়াস।

১। Hitti, p. 417.

২। Dani, A.H., Our Heritage in Muslim Architecture, Proceedings and papers of the second National seminar on Muslim Architecture, p.17.

৬২৪ খ্রীস্টাব্দে কুবার মুসাল্লায় নামায পরিচালন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ আল্লাহর আদেশে ওহীর মাধ্যমে[১] উত্তরদিকে জেরুজালেম থেকে দক্ষিণদিকে অর্থাৎ কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে সিজদা দেন। এর পর থেকে সমগ্র মুসলিম জাহানে কা'বা শরীফ ইসলামের কিবলারূপে নির্ধারিত হল এবং স্বীকৃতি লাভ করল। আরনল্ড এই ঘটনার গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, "It marks a new political and moral orientation."[২] একমাত্র কিবলার মাধ্যমে মুসলমানদের সুদূর চীন থেকে মরক্কো পর্যন্ত কা'বার দিকে ফিরে নামায আদায়ের যে নির্দেশ দেওয়া হয় তার ফলেই সার্বজনীন ইসলামের গোড়াপত্তন হয়।

কিবলা ছাড়াও আরবী ভাষায় খুৎবা পাঠ এবং আরবী হরফের প্রয়োগ, স্থাপত্যিক অলঙ্করণ ইসলামের ঐক্য ও সংহতি প্রকাশ করছে। কূহনেলের ভাষায়, "জীবনজিজ্ঞাসার জবাব এবং ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে পথনির্দেশ হিসেবে কুর'আন শরীফের যে অলৌকিক গুরুত্ব রয়েছে, তা-ই এই আত্মীকরণে সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয়। মৌলিক ভাষায় কুর'আন শরীফ প্রচারের ফলে আরবী হরফের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা সমগ্র ইসলামী বিশ্বকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করে।"[৩] মুসলিম শিল্পকলাকে বিমূর্ত অর্থাৎ abstract শিল্পরীতি বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং ধর্মীয় ইমারতে জীবন্ত প্রাণীর প্রতিকৃতি (figural art) না থাকায় এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। টিটাস বারকাহার্ট বলেন, "Islamic Art is abstract in character. Islam is centred on unity and unity cannot be expressed by any kind of image... The absence of images in Mosques has in the first place the negative object of eliminating a 'presence', which might set itself up against the invisible presence of God and which might also be a source of error by reason of the imperfection of all symbols, in the second place it has the positive object of affirming the transcendence of God in the sense that the Divine essence cannot be compared to anything whatsoever."[৪]

স্থাপত্যিক অলঙ্করণে আরবী হরফ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের সর্বত্র আরবী অথবা ফারসী হরফে উৎকীর্ণ হয়েছে শিলালিপি। এই লিপিতে ইমারতের নির্মাণতারিখ, নির্মাতা ও পৃষ্ঠপোষকের উল্লেখ থাকে। মুসলিম লিপিশৈলী তিনটি রীতির মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়েছে, (ক) কুফী, (খ) নাসখী এবং নাসতালিক। কুর'আন শরীফের

১। আল-কুর'আন, ২ : ১৪৪ : "আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি প্রায় লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরাইয়া দিতেছি যাহা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, উহার দিকে মুখ ফিরাও এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, ইহা তাহাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য।"

২। Arnold, The Preaching of Islam, Oxford, 1935, p. 8

৩। কূহনেল, পৃ. ২৩।

৪। Burchhart, T., The Spirit of Islamic Art, The Islamic Quarterly, vol 1 No. 4, Dec. 1954, p. 212

আয়াত পাথর, কাঠ ও ইট খোদাই করে স্থাপত্যের অলঙ্করণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন কারিগর এবং কারুশিল্পীগণ। ম্যানডেল যথার্থই বলেছেন, "Because of the Islamic prohibition against any representation of God, and in religious buildings, of any hurman figure, the decorative use of the script was indispensable. It was used for naming and his attributes and for verses from the Koran. Artists found an outlet for their incentive powers in devising every type of decorative inscription from angular script orramented with foliage and tendril to interlacing script, and from multi-coloured cursive to geometrical styles based on Chinese characters."[১]

মদিনা থেকে মসজিদ-স্থাপত্যে যে উন্মেষ হয় তা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারিত হয়। বিজিত অঞ্চলে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রভাবে মুসলিম শিল্পকলা বিভিন্ন রূপ ধারণ করলেও অলঙ্করণরীতির মাধ্যমে 'আরবীলিপি' অ্যারাবেস্ক, স্টালাকটাইট, খিলান ও গম্বুজ, ক্রিসেন্ট চূড়া (Crescent finial) প্রভৃতি প্রতীকীর মাধ্যমেই ইসলামী ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। এই সমস্ত উপাদান প্রতীকধর্মী শিল্পের (Symbolic art) অন্তর্গত। কিন্তু আরবী হরফের মতো অপর কোনো উপকরণের ব্যবহার মুসলিম স্থাপত্যকে ঐক্য ও সার্বজননী রূপদান করেনি। এ প্রসঙ্গে বামবারোর উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, "One of the visible links of Islam that can be seen throughout the Islamic world in countries of different races and cultural backgrounds is the Arabic script. The use of Arabic in the religion is an essential part of Islam, for it acts as a religious band drawing peoples together with a common religious language in much the same way as Latin was used in the early Christian Church,"[২] মূলত আলঙ্কারিক লিপিশিল্প মুসলিম স্থাপত্যের অবদান বলা যায়। আরবীলিপির ব্যবহারে মসজিদের ধর্মীয় শিল্পকলায় উত্তরণ হয়নি, যেভাবে গির্জাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় শিল্পের (hieratic art). উদ্ভব হয়েছিল বায়জানটাইন, গথিক, রেনেসাঁ যুগে। ধর্মীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্থপতি ও লিপিকার মসজিদ তৈরি করেছেন অথবা আলঙ্কারিক লিপিকলার প্রয়োগ করেছেন। সেজন্য মসজিদ মূলত ধর্মীয় প্রয়োজনে একটি ব্যবহারিক ইমারত। ধর্মীয় অনুশাসন পালনের জন্য নির্মিত মসজিদ ধর্মীয় কর্ম হতে পারে কিন্তু ইসলামে ধর্মীয় শিল্পকলার

১। How to recognize Islamic Art, p. 34.
কুর'আন শরীফের ৫ : ৭২-তে প্রাণীর ছবি অঙ্কন সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু এর ব্যাতিক্রম দেখা যাবে চীনা মসজিদে (ড্রাগন) এবং তুরস্কের কয়েকটি মসজিদে।

২। Bamborough, P. Treasures of Islam, Dorset, p. 21.

কোনো স্থান নেই। এই কথার প্রতিধ্বনি করে ডরবী[১] বলেন, "Arabic (Muslim) Art cares only conventionally for the next life." Didactic অর্থাৎ উপদেশতত্ত্বসম্বলিত শিল্পকলা ইসলাম কখনওই পৃষ্ঠপোষকতা করেনি। তাই মুসলিম স্থাপত্যের প্রতিটি স্কুল অর্থাৎ রীতিপদ্ধতির মধ্যে বাহ্যিক বৈসাদৃশ্য থাকলেও স্থাপত্য ও অলঙ্করণের বিচারে একটি অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে। প্রতিটি রীতিপদ্ধতি স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অথচ মৌলিক মুসলিম উপাদানে সমৃদ্ধ। ডরবী বলেন, "Its keynote is essentially the love of the graceful things...its joy is in the texture, in pure singing colours and in refinement of form for its own sake."[২]

মুসলিম স্থাপত্যিক অলঙ্করণে আরবী নক্‌শা বা Arabesque একটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং স্থায়ী ভূমিকা পালন করেছে। ভাস্কর্য ও জীবন্ত প্রাণীর অঙ্কন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়ায় মুসলিম অলঙ্কারবিদ নানা ধরনের জ্যামিতিক ও লতাপাতার সমন্বয়ে একধরনের মোটিভ সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর অন্য কোনো স্থাপত্য স্টাইলে arabesque দেখা যাবে না, বরং ইউরোপীয় স্থাপত্যিক অলঙ্করণ ও শিল্পকলায় প্রভাব বিস্তার করেছে।[৩] ইসলামী শিল্পকলার অনবদ্য সৃষ্টি অ্যারাবেস্ককে 'ornamental dialectics', আবার কখনও 'plastic metaphysics', বলে অভিহিত করা হয়। বারকাহার্ট অ্যারাবেস্কের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, "In the arabesque, which is a typical creation of Islam, geometrical genius is blended with the nomadic genius. The arabesque is a sort of ornamental didactics in which logic combines with the living continuity of rhythms ; it is made up of two fundamental elements ; interlacement and a plant-motive. Interlacement is essentially an expression of geometrical speculation, whereas the plant motif represents a sort of graph of rhythm, being composed of spiral forms, it is taken less perhaps from actual plants than form a purely linear idiom...The arabesque also bears witness to the spirit of synthesis proper to Islam, to its faculty of assimilating heritages of widely different kinds. In its decorative art Islam, has in point of fact, gathered in the ornamental legacies of many different peoples, it levels out, no doubt, reducing them to their most general formulas but it endows them with a sort of intellectual lucidity."[৪]

১। Dorbee, B., Arabic Art in Egypt, Burlington Magazine, xxvi, 1920, Jan, No. cc II, p. 31.

২। Dorbee, p, 31.

৩। Kader, M. A. & Hasan, S.M., The impact of Muslim Architecture on European Architecture, Shilpakala, vol. I. 1979. p.8.

৪। Burchhart., op. cit, p. 214.

অ্যারোবেস্ক ছাড়াও মুসলিম স্থাপত্যিক অলঙ্করণে 'মুকারনাস' ও জালির জানালা বা 'mushrabbiya' খুবই প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। 'মুকারনাস' আরবী শব্দ এবং এর অর্থ স্টালাকটাইট যা পরপর অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার কুলুঙ্গী দ্বারা সৃষ্ট একটি আলঙ্কারিক মোটিভ। ইরানে বহুলপ্রচলিত হবার আগে এটি বাগদাদে অষ্টম শতাব্দীতে যুবাইদার সমাধিতে ব্যবহৃত হয়। পারস্যের মসজিদে, বিশেষ করে ইসফাহানের জা'মি মসজিদে 'মুকারনাসের' অপূর্ব প্রয়োগ রয়েছে। সিরিয়া, মিশর, তুরস্ক এবং ভারতবর্ষে মুঘলযুগে 'মুকারনাসের' ব্যবহার দেখা যায়। তবে সম্ভবত হিস্পানো-মোরেস্ক স্থাপত্যকীর্তিতে এর অত্যুৎকৃষ্ট ব্যবহার বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। অ্যারাবেস্কের মতো মুকারনাস ইসলামের নিজস্ব স্থাপত্যিক উপাদান, যা পরবর্তীকালে ইউরোপীয় স্থাপত্যেও প্রভাব বিস্তার করেছে। 'মুকারনাস'কে মৌচাকের ন্যায় অসংখ্য কুলুঙ্গীর সমষ্টি (honeycomb of successive niches) বলা হয়েছে। রেনেসাঁ যুগে ইউরোপের এবং সিসিলির ইমারতে 'মুকারনাসের' দ্বারা অলঙ্করণ করার প্রবণতা দেখা যায়।[১] মুসলিম অলঙ্করণের অপূর্ব আবিষ্কার হচ্ছে 'জালির' জানালা যার আরবী নাম হচ্ছে "মাসরাবিয়া" (lattice, fretwork)। মিশরের অসংখ্য মসজিদে এবং ঘরবাড়িতে কাঠের সূক্ষ্ম জালি দ্বারা বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক এবং লতাপাতার যে নক্‌শা দেখা যাবে তাকেই 'মাসরাবিয়া' বলে।

মুসলিম অলঙ্করণের উদ্ভাবনের মূলে প্রধানত তিনটি প্রভাব কাজ করেছে ; প্রথমত, বিমূর্ত মোটিভ দ্বারা বিভিন্ন ধরনের একক অথবা জড়ানো (intertwined) নক্‌শাসৃষ্টির পেছনে ধর্মীয় চেতনাবোধ কাজ করেছে। দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়াও শিল্পবোধ ও সৌন্দর্যচেতনা, মৌলিক শিল্পকৌশলের জন্য কারুশিল্পীগণ খ্যাতি অর্জন করেন। প্রসঙ্গত ইসলামে ধর্মীয় অলঙ্করণের স্থান নেয়। উদ্ভিদজগৎ এবং জ্যামিতিক নক্‌শার সঙ্গে আরবীলিপির সংমিশ্রণে যে স্থাপত্যিক অলঙ্করণের সৃষ্টি হয়েছে তাতে পৃথিবীর অপরাপর শিল্পরীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে Christie-র বক্তব্য উল্লেখ করা যায়, "Arabic script, the sole contribution to Islamic art is a universal mark of Muslim dominance or influence wherever it spread."[২] একাদশ শতাব্দীর Homlies of John Chrysostom-এর পাণ্ডুলিপিতে কুফী রীতিতে লিখিত লিপি দেখা যাবে। এমনকি মার্সিয়ার রাজা অফফা (৭৫৭-৯৬ খ্রীঃ) তার স্বর্ণমুদ্রায় 'কালিমা' মুদ্রিত করেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত এই স্বর্ণমুদ্রাটির একদিকে রাজার নাম এবং অপরদিকে 'কালিমা' দেখ যাবে। নবম শতাব্দীর আইরিশ ব্রোঞ্জে গিল্টি করা ক্রুশেও 'বিস্‌মিল্লাহ' শব্দটি খোদিত রয়েছে কুফী রীতিতে।[৩] সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রজার যে শিরোভূষণ পরিধান করতেন তার পাড় কুফী হরফে নক্‌শাকৃত ছিল।

১। Kader and Hasan, ibid. p. 80.

২। Christie, A. H. Islamic Minor Arts and their influence upon European work, Legacy of Islam, p.113.

৩। Kader and Hasan, pp. 88-89.

মুসলিম স্থাপত্য কারিগর, সূত্রধর, কারুশিল্পী বিভিন্ন উৎস থেকে স্বজ্ঞানে অথবা অবচেতন মনে নানা ধরনের নক্‌শা দ্বারা ইমারত সৌন্দর্যমণ্ডিত করতেন, গ্রীক, রোমান, বায়জানটাইন, সুমেরীয়, আসরীয়, ব্যবিলনীয়, অ্যাকামেনীয়, ভিসিগথিক, ক্যপটিক, ভারতীয় এবং চৈনিক প্রভৃতি উৎস থেকেই সংগৃহীত হয়েছে স্থাপত্য ও অলঙ্করণের উপাদান ; কিন্তু তাঁরা নিছক অনুকরণ (servile imitation) করেননি কখনওই। প্রধানত, যে সমস্ত নক্‌শার মোটিভ মুসলিম স্থাপত্যকীর্তির দেওয়াল শোভিত করে রয়েছে তা হচ্ছে নির্বস্তুক (abstract) এবং প্রথাগত (conventional)। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মোটিভ হচ্ছে অ্যাকান্থাস (Acanthus), আলা গ্রেক (Ala Greeque), অ্যারাবেস্ক (Arabesque), বিড (Bead), গীলোস (Guilloche), গিঁট (Knot), মতি (Galoon), কারতুস (Cartouche), পাতা (leaf), বরফি (Lozenge), পদক (Medallion), তালপাতা (Palm), রঁসো (Rinceau), চক্র (Rosctte), কুণ্ডলাকৃতি লতা (Scroll), তারা (Star), ঢেউ (Wave), তারসাদ বা মোটা দড়ি (Torsade), খুপি (Tassel), আঁকাবাঁকা লাইন (Zigzag : Chevron), প্রাচুর্যশৃঙ্গ (Cornucopiae) প্রভৃতি। বিভিন্ন উৎস থেকে আহৃত উপকরণের ব্যবহারে মুসলিম অলঙ্করণ শধু সমৃদ্ধই হয়নি, বরং সুষ্ঠু সমন্বয় ও প্রকৃত ভারসাম্য সৃষ্টির ফলে রসোত্তীর্ণ শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভবপর হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন মুসলিম স্থাপত্যের স্টাইলে আমদানীকৃত এবং স্থানীয় স্থাপত্যিক ও অলঙ্করণের উপাদানের বাস্তবধর্মী সংমিশ্রণ সম্ভবপর হয়েছিল বলেই মুসলিম স্থাপত্যে বৈসাদৃশ্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্য লক্ষ করা যাবে। Papadopoulo বলেন, "It is only just to acknowledge that in all their various domains the craftsmen of Islam created objects of consummate refinement in which they exploited with prodigious skill their full repertory of motifs while remaining faithful to the more profound aesthetic principles of Muslim art."[১]

মুসলিম স্থাপত্যের বিভিন্ন প্রকারভেদ লক্ষ করা যায়। মুসলিমবাহিনীর অসামান্য বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়ে পড়ে। বেকারের মতে, "Islam emerged from its isolation and becomes heir to the Oriental-Hellenistic civilization. It appears to be the last link in a long development of universal history."[২] ভারত উপমহাদেশ থেকে সুদূর স্পেন, মধ্য-এশিয়া ও তুরস্ক থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা মুসলিম-শাসনের অন্তর্ভুক্ত হলে স্থানীয় শিল্পকলার প্রভাব অবশ্য সনাতনী মুসলিম স্থাপত্যে এসে পড়ে। এর ফলে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলে সংহতি ও মিশ্রণ (fusion) হয়। মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানীয় শিল্পরীতির প্রভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্যরীতির উদ্ভব হয়। সালাদীন মন্তব্য করেন, "Although Islam united the most different nations

---

১। op. cit. p. 28.

২। Breaker, C. H. The Expansion of the Saracens, in Cambridge Medieval History, vol. II. Cambridge, 1913, pp. 329-330.

under one banner, yet the diversity of races, conquered by Islam was destined to give rise to variety in Muhammadan architecture for wherever the new religion was planted it found itself face to face with fully formed civilizations, possessing a well-defined architecture and often very skilful workmen. The result was that the architecture of early Muhammadan buildings was the native architecture more or less strongly affected by new ideas and without the representation of living creature."[১]

ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্থাপত্যিক অবস্থা ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে মুসলিম স্থাপত্যকে কয়েকটি স্টাইল বা রীতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। সাধারণভাবে স্বীকৃত স্টাইলগুলো হচ্ছে, (১) 'সিরো-ঈজিপ্টীয়' (Syro-Egyptian); গ্রীকো-রোমীয়-বায়জানটাইন প্রভাবে সৃষ্ট আরব, সিরিয়া এবং মিশরে এই স্টাইলের অসংখ্য ইমারতের নিদর্শন দেখা যাবে; (২) ইরাকো-পারস্য (Iraqo-Persian); ইরাক বা মেসোপটেমিয়া, পারস্য, আর্মেনিয়া, তুর্কীস্থানে নির্মিত এই রীতির স্থাপত্যকীর্তি-গুলোতে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয়, সাসানীয় প্রভাব রয়েছে (৩) 'মগরেবী'; এই স্টাইল মগরেবী-মুরীশ (Maghrebi-Moorish) নামে পরিচিত, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, সিসিলি এবং স্পেনে আবির্ভূত এই স্থাপত্যরীতিতে স্থানীয় খ্রীস্টান এবং ভিসিগথিক প্রভাব দেখা যাবে। (৪) অটোমান (Ottoman); বায়জানটাইন প্রভাবে উদ্ভূত এই স্থাপত্যরীতি উৎকর্ষ লাভ করে তুরস্কে (৫) ভারতীয়-মুসলিম (Indo-Muslim) : স্থানীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্য ও অলঙ্করণের প্রভাব ভারতীয় মুসলিম রীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে এই স্টাইলের সাব-স্টাইল অর্থাৎ প্রাদেশিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ ও বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও মুসলিম স্থাপত্যের একটি অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে। তবুও বৈসাদৃশ্য প্রতিটি স্টাইলকে মৌলিকতা ও নিজস্বতা দান করেছে। এই কারণে রিচার্ড বার্টন বলেন, "What in Arabia was simple and elegant became highly ornate in Spain; florid in Turkey, sturdy in Syria and effiminate in India, still divergence had not even after the lapse of twelve centuries materially altered the fundamental form."[২]

মুসলিম স্থাপত্যের যে সার্বজনীন রূপ সহজেই ধরা পড়ে তা হচ্ছে মসজিদ নির্মাণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। স্থানীয় শিল্পী এবং নির্মাণের উপকরণের জন্য বিভিন্ন মুসলিম দেশে যে মসজিদ স্থাপিত হয়েছে তার গঠনশৈলী ও অলঙ্করণ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং বৈষম্যমূলক হওয়া স্বাভাবিক। কর্ডোভার মসজিদ, কায়রোর ইবনে তুলুন মসজিদ, দামেস্কের উমাইয়া মসজিদ, সামাররার আবু দুলাফের মসজিদ, দিল্লীর জুম্মা মসজিদ,

---

১। Saladin, op. cit, p.746.
২। Burton, R., Personal Narrative of a pilgrimage to Al-Madinah and Mecca, London, p. 95.

ইসফাহানের জা'মি এবং মসজিদ-ই-শাহ, ইস্তাম্বুলের সোলায়মানের মসজিদ, বুরসার উলু জা'মি একই রীতিপদ্ধতিতে নির্মিত না হলেও এই সমস্ত ইমারতে মৌলিক ইসলামী উপাদানের সমাবেশে এক অবিচ্ছেদ্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। উপরন্তু, বিভিন্ন অঞ্চলের কারিগর, স্থপতি, চারু ও কারুশিল্পীদের আদান-প্রদানের ফলে এক স্থাপত্যরীতির প্রভাব অন্য স্থাপত্যশৈলীতে পড়েছে। খলিফাগণ তাঁদের প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নির্মাণকাজের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিল্পী ও স্থপতি পাঠাবার নির্দেশ দেন। খলিফা আল-ওয়ালিদ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি মাগরীব, মিশর, রোম ছাড়াও ভারতবর্ষ ও পারস্য থেকে মুসলিম ও অমুসলমান কারিগর সংগ্রহ করেন। এর ফলেই এক অঞ্চলের স্থাপত্য-উপকরণ ও মোটিভ অন্য রীতিতে অনুপ্রবেশ করে। কুব্বাতুস সাখ্‌রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর পারস্য চারুশিল্পীগণ মিনাকরা টালি দ্বারা শোভিত করেন। কায়রোয়ান মসজিদে মিনাকরা টালির যে ব্যবহার লক্ষ করা যায়, তা মেসোপটেমিয়া থেকে সংগৃহীত এবং সামারার মৃৎশিল্পী সম্ভবত কায়রোয়ানে গিয়ে অলঙ্করণে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি কাঠের মিমবারটিও মেসোপটেমীয় শিল্পকর্মের নিদর্শন। রাইসের ভাষায়, "The Qairawan tiles serve to show the regard in which Mesopotamian pottery was held elsewhere, and there is evidence to indicate that other Mesopotamian arts were equally highly esteemed. The wooden member or pulpit at Qairawan was also the work of Mesopotamian craftsmen."[১] ইবনে তুলুনের মসজিদের দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। প্রথম আবদুর রহমান স্পেনে উমাইয়া বংশ স্থাপন করে সিরিয়ার বাইরে সুদূর স্পেনে উমাইয়া স্থাপত্যের ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করেন। এমনকি সিসিলিতে নরমান রাজা রজারের সময়ে অনেক ফাতেমীয় স্থপতি ও কারুশিল্পী কর্মরত ছিলেন এবং পালের্মোর প্যালাটিনা চ্যাপেলের (Palatina Chapel) অলঙ্করণ মূলত ফাতেমী শিল্পকর্ম।[২] ভারত উপমহাদেশের মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলার উন্মেষে আরব, তুর্কী, আফগান, পারস্য দেশীয় কারিগর ও শিল্পকুশলীদের অবদান রয়েছে। মিনাকরা টালি শিলালিপি খোদাই ছাড়াও মার্বেলে inlay অথবা pietra dura মূলত অভারতীয় উপাদান। মুঘল আমলের তথা ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাজমহল পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করেন একজন বিদেশী মুসলিম মোহাম্মদ ঈশা। মুগল আমলে মিনাকরা টালির ব্যবহার সার্বজনীন ছিল এবং "কাশী" (Kashi) নামের এই অলঙ্করণের উপাদান পারস্যের কাসান থেকে আনা হত। লাহোর ফটকের মিনাকরা টালির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বিদরে মাহমুদ গাওয়ান যে মাদ্রাসা নির্মাণ করেন পারস্য স্থপতির নৈপুণ্যে তা সম্ভবপর হয়েছে গুলবার্গার জা'মি মসজিদটির নির্মাতা কাযউইনের রফী দ্বারা। প্রাক্‌-মুঘল যুগের বাংলাদেশের ইমারতেও মিনাকরা টালি দেখা যাবে, যেমন—গৌড়ের লোটান মসজিদে এবং বাগেরহাটের খানজাহান আলীর সমাধিতে। এই সমস্ত টালিতেও পারস্য প্রভাব সুস্পষ্ট। পারস্য, আফগানিস্তান

১। Rice, Islamic Art, pp. 44-45.

২। ibid. p. 85.

এবং মধ্য-এশিয়া থেকে আগত শিল্পী ইমারতের নির্মাণে যে নিয়োজিত ছিল তার প্রমাণ রয়েছে শিলালিপিতে। বিহারে ১২৬৫ খ্রীস্টাব্দে খোদিত বারদুয়ারী শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, "কাবুলের মজিদ" নামে একজন দক্ষ স্থপতি নিয়োজিত হন। সুলতান সেকেন্দার শাহের আমলে ১৩৬৩ খ্রীস্টাব্দে খোদিত দিনাজপুরের দেবীকোটের এক শিলালিপিতে "স্বর্ণের কলমধারী গিয়াসের" (Ghiyath, Zarin Dasht) উল্লেখ আছে। অবশ্যই তিনি পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। এভাবে মুসলিমঅধ্যুষিত অঞ্চলের শিল্পী, কারিগর ও শ্রমিকদের পরস্পর আদান-প্রদানের ফলেই এক রীতির প্রভাব অন্য রীতিতে পড়ে মুসলিম স্থাপত্য ও অলঙ্করণ রীতিতে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে যেন সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে একই সূত্রে গ্রথিত করেছে। স্থানীয় ব্যতিক্রম ও বৈচিত্র কোনো-দিনই মৌলিক, অকৃত্রিম ও অত্যুৎকৃষ্ট মুসলিম উপাদানগুলোকে বিনষ্ট করতে পারেনি।

মুসলিম স্থাপত্যের এক আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য লক্ষ করছে মাত্র একটি মৌলিক নীতি, যাকে বলা যায় এককেন্দ্রিক (monocentric)। ইসলামের মূলমন্ত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। এক রাসূল তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, এক ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন, এক কা'বাগৃহ ইসলামের ধর্মীয় পীঠস্থান, যার কোনো বিকল্প নেই; একই জাতি মুসলিম (nation) আঞ্চলিক ভাষা, সাংস্কৃতিক ও জাতির (race) প্রভেদ সত্ত্বেও। এর মূলে রয়েছে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও চেতনা। আজও কোনো আঞ্চলিক ভাষায় খোৎবা পড়া হয় না এবং আরবী হরফ সমাদৃত পাঠে ও শিল্পকর্মে। এই অবিমিশ্র এককেন্দ্রিকতার প্রতিফলন দেখা যাবে স্থাপত্যে ও অলঙ্করণে। মোনাজাতের সময় দুহাত তুলে দোয়া করলে আঙুলগুলো মোটামুটি একটি কেন্দ্রে পৌঁছায়। অনেকের ধারণা কৌণিক খিলানের উৎপত্তি এভাবেই। মুসলিম স্থাপত্যে কৌণিক খিলান সার্বজনীন রূপ ধারণ করেছে এককেন্দ্রিকতার উপর ভিত্তি করেই। মিনার দেখা যাবে সরু হয়ে আকাশে যেন একটি বিন্দুতে শেষ হয়েছে। কারুশিল্পী যখন কোনো জ্যামিতিক অথবা লতাপাতার নক্শা সৃষ্টি করেন তখন কেন্দ্রীয় বিন্দু থেকেই মোটিভ টানা হয়। 'মুকারনাস' কৌণিক খিলানের সমষ্টি না হলে কখনওই সুন্দর দেখায় না। ইমারতের উপরে যে প্যারাপেট নির্মিত হয় তার নক্শাও বিন্দুতে শেষ হয়েছে। আরবী শিলালিপি যে লম্বালম্বি ও সমান্তরাল রেখার সমন্বয়ে খোদিত হয় তাতেও বিন্দু বা নোখতার প্রভাব খুব বেশি। গম্বুজের যে আকর্ষণীয় ও সুষমামণ্ডিত রেখা দূর থেকে দিক্‌চক্রবালে ভেসে ওঠে তার মূল নক্শা একটি কেন্দ্রবিন্দুভিত্তিক বৃত্ত। মিহরাব অবতল হলেও উপরে অর্ধগোলাকার কৌণিক গম্বুজে (half-dome, pointed) মিলেছে। সুতরাং এককেন্দ্রিকতা মুসলিম স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এবং এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে সাংস্কৃতিক কীর্তির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। এই এককেন্দ্রিকতার মূর্ত প্রতীক হচ্ছে মসজিদ।

৫। মসজিদ-স্থাপত্যের উন্মেষ

মুসলিম স্থাপত্যের একটি স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান হিসেবে মসজিদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের আলোচনায় মসজিদ শব্দের সঙ্গে আনুষঙ্গিক সংজ্ঞাগুলোর

বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন। এই সমস্ত সংজ্ঞাগুলো হচ্ছে 'মুসাল্লা', 'মিহবার', 'মজলিস', 'বায়ত' অথবা 'দার', 'যারিয়া' এবং 'আনাযা'-হাবরা', সুতরা'।[১]

মসজিদ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে 'সাজাদা' থেকে, যেমনভাবে 'সালাত' থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে মুসাল্লা। সালাত অর্থ ইসলাম ধর্মের একটি অপরিহার্য অনুশাসন হিসেবে প্রত্যহ পাঁচবার নামায পড়া। সালাতের অন্যতম একটি অংশ হচ্ছে সিজ্‌দা অর্থাৎ পরম করুণাময়ের উদ্দেশে অবনত মস্তকে কিবলার দিকে ফিরে নামায আদায় করা। সুতরাং শাব্দিক অর্থে যেখানে সিজ্‌দা দেওয়া হয় সেই স্থানটিকে মসজিদ বলা যায়। মসজিদের মতো মোসাল্লাতেও নামায পড়ার স্থান হিসেবে চিহ্নিত। রসূল করীম (সাঃ) মক্কায় অবস্থানকালে কা'বা শরীফের নিকট কখনও হযরত আবুবকরের (রাঃ) নির্মিত একটি বিশেষ স্থানে নামায পড়তেন। মক্কায় কোনো নির্দিষ্ট স্থান ছিল না এবং যেখানে তিনি সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়তেন তাকে মুসাল্লা বলা হত। পেডারসেন বলেন, "In the dogma of Muhammad, a sanctuary was not a fundamental necessity."[২] সুতরাং একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, স্থাপত্যের পরিভাষায় মক্কায় মসজিদের আবির্ভাব হয়নি; কারণ, যে-কোনো স্থানেই নামায পড়া যায়।

ইবনুল আরাবী[৩] মুসাল্লা এবং মসজিদের উল্লেখ করেন "মিহরাবুল বুয়ূত ওয়া মুসাল্লা'ততুল-জামায়াত (mihrab at buyut was musalla at-Jamat), অর্থাৎ গৃহের মিহরাব এবং জামা'আতের মুসাল্লা অর্থাৎ নামাযগৃহ। এক্ষেত্রে মিহরাব এবং মুসাল্লা জা'মি মসজিদের অর্থ প্রকাশ করছে। অন্য কথায় 'মিহরাব' এবং 'মুসাল্লা' মসজিদের ইঙ্গিতবাহী।

ডিজ বলেন, "প্রাক্-মুসলিম আরবে ব্যক্তিগত নামাগাহ মুসাল্লা নামে পরিচিত ছিল। এর প্রমাণ রয়েছে মদিনার বাইরে বানু সালিমার একটি স্থানে রাসূলে করীমের নামায পড়ার ঘটনাতে। এই স্থানটি বানু সালিমা গোত্রের অধীনে শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছিল। এই জায়গায় পহেলা সাওয়াল এবং জুল হিজ্জা মাসের ১০ তারিখে মেলা অনুষ্ঠিত হত।"[৪]

ডিজ প্রাক্-মুসলিম আরব থেকে মুসাল্লার উৎসের সন্ধান করেন; কিন্তু ওয়েনসিঙ্ক এর উৎপত্তিস্থল উত্তর সেমেটিক শস্য মাড়াইয়ের স্থান মনে করেন।[৫] কিন্তু প্রাক্-মুসলিম যুগে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে পালিত কোনো উৎসব থেকে মসজিদের প্রকৃত রূপ নির্ণয় করা দুরূহ। মদিনার মসজিদে জানাযার নামায পড়া হত; কিন্তু

১। Hasan. S. M , Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal, Dhaka 1979 ch I 1-7

২। Pedersen, John, Masjid in E1, vol. III. qt.I. 1913 p. 316.

৩। Jeffery, A., The foreign vocabulary of the Qur'an, 193, 8p. 197.

৪। Deiz, E. Musalla, in Encyclopaedia of Islam, supplement, 1934-38, p 158.

৫। Wensinek, A.J., Musalla, in Encyclopaedia of Islam, vol. III, pt 2. p. 746., Some Semetic rites of Mourning and religious studies on their origin and mutual relation, Amsterdam, 1917, p. 13.

ইসলামের বিধান অনুসারে জানাযার নামাযে সিজদা নিষিদ্ধ রয়েছে এই কারণে যে, প্রাক্-মুসলিম যুগের পূর্বপুরুষদের কবরপূজার মতো মৃত ব্যক্তিকে সিজদা করলে মহান আল্লাহর প্রতি অবমাননা করা হবে এবং প্রকৃত ধর্মীয় অনুশাসন বিস্মৃত হয়ে প্রাক্-মুসলিম কুসংস্কারে আরবগণ নিমজ্জিত হবে। যাহোক, মুসাল্লা এবং মসজিদ উভয়ই নামাজের স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মদিনায় মুসাল্লা এবং মসজিদ দুটি পৃথক সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মোহাদ্দিছীনদের মধ্যে মুসাল্লা এবং মসজিদে নামায পড়ার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যে মতানৈক্য ছিল তাতে প্রমাণিত হয় যে, এই দুটি পৃথক স্থান ছিল। ওয়েনসিঙ্ক মনে করেন যে, মুসাল্লা ছিল বৃষ্টির জন্য প্রার্থনার স্থান এবং মসজিদ ছিল উপাসনা ও আরাধনার জায়গা। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুসাল্লা অপেক্ষা মসজিদের গুরুত্ব অধিক ছিল এবং মদিনার মসজিদ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ পরবর্তীকালে এই মসজিদ মুসলিম বিশ্বে মসজিদ-স্থাপত্যের আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়। অপরদিকে প্রাক্-মুসলিম যুগেও কোনো গোত্রের আবাসভূমির একটি অংশকে মুসাল্লা বলা হত।

ডওটী[১] কাদামাটি দিয়ে তৈরি এক ধরনের প্লাটফর্মকে মুসাল্লা নামে অভিহিত করেন এবং বলেন যে, হাইলের সকল বাড়িতে এধরনের মুসাল্লা দেখা যাবে। তাঁর মতে, "এগুলো ছিল হাঁটু ভাঁজ করে বসার বা সিজদা দেওয়ার স্থান। এরকম অসংখ্য প্লাটফর্ম কাবার দিকে পাথরখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত করে মরুভূমিতে নির্মিত হয়।" কা'বার দিকে যে পাথরখণ্ড দিয়ে কিবলা নির্ধারণ করা হয় তাকে 'সুতরা' (sutra) বলে। নেবুহর[২] ইয়ামেনের বাইরে জামাতে নামাজ পড়ার জন্য ব্যবহৃত এ ধরনের স্থানকে 'মাসালী' বা মুসাল্লা বলেছেন।

হিউজেস মুসাল্লাকে মুসলমানদের নামাজ পড়ার জন্য ব্যবহৃত একটি মাদুর, কাপড় অথবা কার্পেট হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, মিশরে মুসাল্লাকে 'সাজ্জাদা' (sajjadah) বলা হয়। ফারর্সি ভাষায় নামায পড়ার আসনকে 'জায়নামাজ' বলে। কিন্তু জায়নামায দ্বারা মুসাল্লাকে বোঝানো যায় না। সাধারণভাবে চারদিকে ঘেরা একটি প্রবেশপথ এবং কিবলার দিকে মিহরাবসম্বলিত স্থানকেই মুসাল্লা বলে অভিহিত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে মুসাল্লা ও মসজিদের মধ্যে কোনো প্রভেদ করা যায় নি। কিন্তু স্থাপত্যকলার দিক থেকে বিচার করলে ডিজের ভাষায়, "মুসাল্লা এমন একটি ইমারত যা স্থাপত্যরীতি গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।"[৩] কিন্তু ডিজের ভাষ্য যুক্তিসংগত নয়, কারণ গাওহার সাদ কর্তৃক হিরাতে নির্মিত মসজিদটি মসজিদ এবং মুসাল্লা উভয় নামেই সুপরিচিত। কিন্তু ক্রমশ মুসাল্লা অপেক্ষা মসজিদ সংজ্ঞাটি অধিকতর প্রচলিত হয়।[৪]

১। Doughty, CM., Travels in Arabia Deserta, vol. II. pp. 248.

২। Niebuhr, C., in Reisebeschreibung, Kopenhagen, 1774.

৩। Diez, op, cit, p. 159.

৪। Pope. A.U., A Survey of Persian Art, vol. II. pp. 1125-26.

মুসাল্লার সঙ্গে মসজিদের তুলনামূলক আলোচনা ছাড়াও বিশেষজ্ঞগণ মসজিদের সঙ্গে মিহ্‌রাবের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আলোকপাত করেন। ইবনুল আরাবী বনী ইসরাইলদের মসজিদগুলোকে মাহারিব অর্থাৎ মিহ্‌রাবসমূহ নামে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, মসজিদের মতো মিহ্‌রাব সকল উপাদানে সমৃদ্ধ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রার্থনাগৃহ। সারজেন্ট ইবনুল আরাবীর উদ্ধৃতি দেন "মিহ্‌রাব এমন একটি স্থান যেখানে মুসল্লীগণ জমায়েত হন এবং একত্রে নামায আদায় করেন।"[১] আবু হানিফা (রাঃ) মিহ্‌রাব একটি খুবই উঁচু ও পবিত্র স্থান হিসেবে বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, "মিহ্‌রাব হচ্ছে সর্বাপেক্ষা আভিজাত্যপূর্ণ স্থান যেখানে নৃপতিগণ উপবেশন করতেন।" মিহ্‌রাবের এই অর্থ প্রকাশ পায় গুমাদানে নির্মিত অতুলনীয় প্রাসাদে। ইবনে কায়েস তাঁর দিওয়ানে মিহ্‌রাবের যে ব্যাখ্যা দেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে, মিহ্‌রাবগুলো মসজিদ অর্থাৎ সিজদার স্থান ছিল এবং এগুলো ভূমি থেকে ঈষৎ উঁচু করে অমসৃণ পাথরখণ্ড দ্বারা তৈরি করা হত। মুলার হামদানের কাওকাবান শিলায় উৎকীর্ণ মিহ্‌রাবকে "উপাসনালয়" বলেছেন।[২] রাসূল করীম (সঃ) স্বয়ং হযরত দাউদ (আঃ) এবং অন্যান্য পয়গম্বরের মিহ্‌রাবের কথা বলেন।[৩] তিনি দাউদ (আঃ)-এর মিহ্‌রাব বলতে তাবারী কর্তৃক উল্লেখিত জেরুজালেমের উপাসনালয়কে বোঝান। ইবনে কালনিশি 'মিহ্‌রাব আল মুসাল্লা' দ্বারা ইসলামী স্থাপত্যের পরিভাষায় মুসাল্লার মিহ্‌রাব হিসেবে ব্যাখ্যা করেননি। এখানে মাহারিব বহুবচনে মাসাজিদ অর্থাৎ অসংখ্য মসজিদকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৪]

মিহ্‌রাব মসজিদের একটি অবিচ্ছেদ্য এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং কিবলা নির্ধারক হিসেবে সর্বাধিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, স্থাপত্যিক উপাদান হিসেবে অর্ধগোলাকার অবতল মিহ্‌রাব আবির্ভাবের পূর্বে মিহ্‌রাবের অর্থ ব্যাপক ছিল। ৭০৭-৭০৯ খ্রীস্টাব্দে আল-ওয়ালিদের খিলাফতে হিযাযের শাসনকর্তা উমর ইবনে আবদুল আজিজ মদিনা মসজিদের সম্প্রসারণ ও সংস্কারের সময় সর্বপ্রথম অর্ধগোলাকার অবতল মিহ্‌রাব নির্মাণ করেন। অবশ্য সপ্তম শতাব্দীতে কুববাতুস সাখরার মিহ্‌রাব ছিল চ্যাপ্টা। এই মিহ্‌রাবের সঙ্গে ৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত রৌপ্যমুদ্রায় (দিরহাম) খোদিত মিহ্‌রাবের সাদৃশ্য রয়েছে।[৫] মিহ্‌রাব এবং মুদ্রা উভয়ই খলিফা আবদুল মালিকের রাজত্বের কীর্তি। কুববাতু'স সাখরার মিহ্‌রাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ চ্যাপটা হলেও এটি মিহ্‌রাবের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। প্যাঁচালো নক্‌শাশোভিত দুটি স্তম্ভের উপর লিনটেল পদ্ধতিতে নির্মিত। লিনটেলের উপরে তিনটি খাঁজবিশিষ্ট খিলান রয়েছে। সমগ্র মিহ্‌রাবটি একটি অলঙ্কৃত আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ।

১। Sergeant, R.B., Mihrab in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. xxxII, pp, 441.
২। Muller, D.H., Sifat Jaziratal-'Arab, Leiden, 1884-91, p. 107.
৩। Serjeant, p. 448.
৪। Amedoroz, H. F., History of Damascus, Leiden, 1908, No. 4.
৫। Miles, G.C, Mihrab and Anazah in Archaeologica. Orientalia, in memorian Ernst Herzfeld. New York, 1952, pp. 156-71. G. Feheruvari, Development of the Mihrab down to the xvth century, University of London Thesis, 1961.

শাব্দিকভাবে মিহরাব এবং 'আনয়াযা' অথবা 'সুতরা'-এর অর্থ একই প্রকার। মিহরাব শব্দটির উৎস হারবা (Harba) এবং হারবার অর্থ "একটি সংগ্রামস্থল" (শয়তানের বিরুদ্ধে)।[১] লেন মিহরাবকে মসজিদ হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, বনী ইসরাইলের বংশধরদের উপাসনাগারকে মিহরাব বলা হয় এবং মিহরাব মসজিদ হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইমরুল কায়েসের কবিতায় মিহরাব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর মুয়াল্লাকায় দক্ষিণ আরব নৃপতিদের প্রাসাদসমূহকে মিহরাব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া আল-আশা (al-Asha) এবং ইবনে দুরাইদ ইসতিকাকের কবিতায় মিহরাব শব্দের প্রয়োগ দেখা যাবে। আল-আশা পালমাইরার সমাধি বুরজকে (Tomb towers) মিহরাব নামে অভিহিত করেন। আল-কুর'আনেও মিহরাবের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২]

"অতঃপর তাহার প্রতিপালক তাহাকে ভালভাবেই গ্রহণ করেন এবং তাহাকে ভালভাবে পালন করেন এবং তিনি তাহাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। যখনই যাকারিয়ার কক্ষে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন তখনই তাহার নিকট খাদ্যসামগ্রী দেখিতে পাইতেন।" (৩ : ৩৭)

"অতঃপর সে কক্ষ (মিহরাব) হইতে বাহির হইয়া তাহার সমস্ত দাসের নিকট আসিল ও ইঙ্গিতে তাহাদিগকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে বলিলেন।" (১৯ : ১১)

"উহারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ (মাহাবির), মূর্তি, বৃহদাকার হাউসসদৃশ এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করিত।"। (৩৪ : ১৩)

পবিত্র কুর'আন শরীফের তিনটি স্থানে মিহরাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম দুটিতে মিহরাব দ্বারা কক্ষ বলা হয়েছে এবং শেষের আয়াতে প্রাসাদকে মিহরাব হিসেবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সূরা আল-ইমরানেই ৩৭ আয়াতে মিহরাব অর্থে সাধারণভাবে যে অবতল কুলুঙ্গী বোঝায় তা বোঝানো হয়নি। এক্ষেত্রে একজন মহিলার কক্ষ বা জেনানা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সূরা মরিয়ামের ১১ নম্বর আয়াতে মিহরাবকে মূলত একটি নামাযগাহ বা উপাসনালয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু অপরদিকে সূরা সাবার ১৩ নম্বর আয়াতে প্রাসাদকে মাহারিব বলা হয়েছে। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদ অর্থে মিহরাব ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা আল-ইমারানেব ৩৭ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যাদানকালে তাবারী বলেন যে, রসূলে করীমের ব্যক্তিগত কক্ষকেও মিহরাব বলা হত। তার ভাষায় মিহরাব হচ্ছে, "Any kind of room or Mosque which was built for her (Maryam) the most honoured place it is called so because it is the place of fight which the devil never will touch—as it is placed in the most honourable place of the house of Jerusalam."[৩]

১। Arabic-English Lexicon Book I, part 2,p. 541 AEL

২। AEL, p.541.

৩। Fehervari, pp. 32-33.

৭৮৮-৯৬ খ্রীস্টাব্দে উমাইয়া খলিফা হিশাম কর্তৃক নির্মিত খিরবাতু'ল মাফজারে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে দিওয়ান বা দরবারকক্ষ ছিল। হামিলটন বলেন, "It is easy to recognize in the apsidal dias and mihrab (in the secular sense) the form of chamber prescribed by long usage for the seats of Governors and princes."[১] একই মন্তব্য মাশাত্তা এবং কুসাইর আমরার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সারজেন্টের মতে, মিহরার হচ্ছে একসারি স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থান ("a row of columns with their intervening spaces")। তিনি মিহরাবের ব্যাখ্যা দেন এভাবে, "a pillared sitting place, open at one side, set at same eminence above ordinary ground level." ডওটী মেদাইন সালিহর দিওয়ান প্রসঙ্গে পূর্বেই এধরনের মন্তব্য করেন।

ইবনে হামযা তাঁর আল-মুহাল্লালের অহাকামু'ল মসজিদ পর্যায়ে যে ঘটনার উল্লেখ করেন, তাতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রথমযুগে মিহরাব দ্বারা সমগ্র ইমারতকে ইঙ্গিত করা হত। তিনি বলেন যে, রসূলে করীম (সঃ) অসুস্থ অবস্থায় মদিনা মসজিদের হুজরায় হযরত আয়েশার (রঃ) কক্ষে যখন অবস্থান করছিলেন তখন হযরত কক্ষের পর্দা তুললেন। মুসল্লীগণ হযরত আবুবকরের নেতৃত্বে নামায আদায় করেছিলেন এবং রসূলে করীমের সম্মান প্রদর্শনের জন্য নামায ক্ষান্ত দিয়ে তাঁর যোগদানের অপেক্ষায় ছিলেন। রসূলুল্লাহ তখন তাঁদের নামায সমাপ্ত করতে বলেন। আবুবকর তখন বিবি আয়েশার কক্ষের দিকে গিয়ে পর্দা ফেলে দিলেন। হযরত আলী বলেন যে, "যদি আবুবকর (রাঃ) মিহরাবে থাকতেন তা হলে তিনি রসূলুল্লাহকে কক্ষের পর্দা তুলতে দিতেন না।" রসূলুল্লাহর সেইদিনই ওফাত হয় এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর স্থানে ইমামতি করেন। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, মদিনা মসজিদে রসূলুল্লাহর জীবদ্দশায় মিহরাব নির্মিত হয়নি এবং হযরত আলী মিহরাব দ্বারা মসজিদকে উল্লেখ করেন। মিহরাব অর্থ এ পর্যায়ে পবিত্র স্থান বা সিজদার জায়গা। সার্জেন্ট বলেন যে, হাদরামাউতে মাহারিব দ্বারা মসজিদের একটি পোর্টিকো বা রিওয়াককে বোঝানো হয়।[২] মুসলিম স্থাপত্যের পরিভাষায় মিহরাব অবশ্য কিবলা নিদর্শক।

মসজিদের সঙ্গে প্রাক্-ইসলামী যুগের গোত্রীয় মজলিসের বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। ল্যামোর মতে, মসজিদের ধারণা প্রাক্-ইসলামী যুগের আরব বেদুঈনদের আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।[৩] মজলিস প্রাক্-ইসলামী যুগের আরব গোত্রের একটি বিশিষ্ট অনুশাসন। 'জালাসা' শব্দ থেকে উদ্ভূত মজলিসের অর্থ মিলনস্থান এবং যখন একটি বিশেষ গোত্রের লোকেরা দলনেতার অধীনে নির্দিষ্ট গোত্রীয় তাঁবুতে মিলিত হন তখন তাকে মজলিস বলে। ব্যক্তিগত তাঁবু অপেক্ষা গোত্রীয় নেতার তাঁবু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং মজলিস সেই অর্থে অতি পবিত্র ('হারাম') এবং অলঙ্ঘ্য ('হিমা')। উমাইয়া খলিফা মু'আবিয়ার খিলাফতকালে যিয়াদ ইবনে আবিহ ইরাকের গোত্রীয়

১। Fehervari. p. 42
২। Serjeant, pp. 439-453.
৩। Lammens, H., Ziad Ibn Abihi, Rivista degli studi Orientals; Hasan, op. cit, p. II No. 42.

মসজিদগুলোর কর্তৃত্ব খর্ব করার জন্য কুফা এবং বসরার মসজিদ দুটিকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে পুনর্নির্মাণ করেন বলে কোনো কোনো লেখক ধারণা করেন। ক্রেসওয়েল বলেন, "Ziyad who was well acquainted with the turbulent spirit of the cities of Iraq, thoroughly realised the political importance of the Mosque that dominating position in which was concentrated at that time the political and social life of the Arab Empire. At the sametime he felt that the Masjids of the tribes were a danger to him, hence his anxiety to embellish and enlarge the Great Mosque, so that by its splendour and proportions it would eclipse the tribal Masjids and attract all to it."[১]

ক্রেসওয়েল তাঁর এরূপ ধারণার সপক্ষে কোনো প্রামাণ্য সূত্রের উল্লেখ করেননি। মূলত ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে এবং খ্রীস্টান ও ইহুদীদের উপাসনালয়ের তুলনায় মসজিদের মর্যাদা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যেই উমাইয়া ও পরবর্তী যুগে মসজিদসমূহ সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছিল।

ল্যামোর মতে, মজলিস এবং 'নাদি' (Nadi) শব্দ দুটি পরস্পর অর্থবোধক। পূর্বে বলা হয়েছে যে, প্রাক্-মুসলিম আরব গোত্রীয় তাঁবু যেখানে 'দীন আর আরব' বা প্রাক্-ইসলামী ধর্ম পালন করা হত তাকেই মজলিস বলা হয়। ইসলামী যুগে এই মজলিসই মসজিদে রূপান্তরিত হয়, যেমন—বানু নাজ্জার গোত্রের মসজিদের উল্লেখ পাওয়া যায় ('মসজিদু'ল কাউম')। ল্যামো বলেন, "it (Masjid) succeeded the majlis of the tribe, a tent of the council among the individualistic Arabs whose social life was concentrated in it."[২]

মসজিদের সঙ্গে বায়েত বা 'দ্বার' অর্থাৎ গৃহের সম্পর্ক একেবারেই যৌক্তিকতাপূর্ণ। প্রাক্-ইসলামী যুগের মসজিদ এবং ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্যিক প্রতীক মসজিদের আদর্শগত এবং ধর্মীয় দিক থেকে অনেক প্রভেদ দেখা যাবে। ব্যবহারিক দিক থেকে মজলিসের সঙ্গে মসজিদেরও পার্থক্য রয়েছে। মসজিদ একটি স্থায়ী নামাযে ঘর, কিন্তু মজলিস গোত্রীয় মিলনকেন্দ্র ছাড়া কিছু নয়। উপরন্তু, ল্যামোর পবিত্র ('হারাম') এবং অলঙ্ঘ্যের ('হিমা') ধারণা মুসলিম মজলিস থেকে আসেনি, বস্তুত পবিত্র মক্কায় 'বায়তুল হারাম' এবং জেরুজালেমের 'বায়তুল মুকাদ্দাস' থেকে পবিত্রতা ও অলঙ্ঘ্যের ধারণা প্রচলিত হয় বহু পূর্বেই। যুদ্ধবিগ্রহ, হিংসাত্মক কার্যকলাপ হারাম শরীফে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এই ধারণা অলঙ্ঘ্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। কাজেই মসজিদের সঙ্গে মজলিসের তুলনা সঙ্গত নয়।

১। A Short Account, p. 12.

২। Lammens, op. cit, p. 241.

মসজিদের সঙ্গে যাবিয়ার (Zawiyah) তুলনা করা হয়েছে। রিচার্ড বার্টন[১] তাঁর আরব্য উপন্যাসে যাবিয়ার উল্লেখ করে বলেন যে, গির্জায় যেমন ভজনালয় (Chapel) রয়েছে মসজিদেও তেমনি যাবিয়া রয়েছে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র উপাসনালয়কে যাবিয়া বলা হয়, সিজদাগাহও বলা চলে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে চ্যাপেলের সঙ্গে যাবিয়ার তুলনা অহেতুক, কারণ যাবিয়া বলতে একটি ইমারতের অংশকে ইঙ্গিত করে এবং কখনও কখনও নামায পড়ার কক্ষকেও বোঝায়। ডুমাস বলেন, "the Zawiyah is to sum up, a religious school and a free hostel, in these two respects it has much in common with the medieval monastery."[২] অতএব যাবিয়ার অর্থ জা'মি মসজিদের অংশ নয়, বরং খ্রীস্টান সন্ন্যাসীদের কর্মস্থানের অনুরূপ একটি কক্ষ—যা নামাযের জন্যও ব্যবহৃত হত। পথযাত্রীদের বিশ্রামাগার হিসেবেও যাবিয়ার ব্যবহার লক্ষ করা যাবে।

এই প্রসঙ্গে উন্মুক্ত স্থানে নামায পড়ার সময় সম্মুখে কেবলার দিকে সুতরা বা আড়ালের উদ্দেশ্যে যে হারবা-আনাযা ব্যবহৃত হয় তার উল্লেখ করা যেতে পারে। আনাযা একটি কাঠের দণ্ড অথবা বর্শা। আনাযার ন্যায় হারবা ও সুতরাও একধরনের বর্শাকে নির্দেশ করে।[৩] লেন আনাযাকে মাথাবাঁকা একধরনের বর্শা বলেছেন। অনেকে মনে করেন যে, আনাযা বর্শা এবং দণ্ডের মাঝামাঝি। মিশকাতে সুতরা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, দণ্ডটি এক বিঘত লম্বা এবং এক ইঞ্চি মোটা হবে। এ প্রসঙ্গে মাইলস বলেন, "The anazah was the harbah or spear which the Abyssinian King Najjashi sent to Zubayr (bin) al-Awaam as a gift and which the latter in turn gave to Muhammad. As early as the year of the Hijrah it was carried by Bilal before the Prophet when he went forth to the Musalla on the two "Ids and was stuck in the ground in front of him to serve the dual purpose of sutrah and qibla, that is to delimit the piece of ground private to him during his prayers and to point the direction."[৪] যুদ্ধক্ষেত্রে নামাযের সময় মুসলমান সৈন্যগণ বর্শাগুলোকে সুতরা হিসেবে ব্যবহার করতেন।

শাব্দিক অর্থে সুতরা নামায পড়ার সময় ব্যবহৃত একটি আচ্ছাদন-অন্তরাল বোঝায়। এই অর্থে সুতরাকে কিবলামুখী হয়ে নামায পড়ার সময় সম্মুখে প্রোথিত একটি বস্তু বা দণ্ড বোঝায়। সুতরাং এটি একটি আচ্ছাদন বা পর্দা (veil) হতে পারে। এই অর্থে সুতরা একটি কিসওয়া (kiswa)।[৫]

প্রাক্-মুসলিম যুগে কা'বা শরীফে ব্যবহৃত কিসওয়া'র ধারণা থেকেই সুতরার উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

১। See Hasan, p. 4.
২। Ibid, p. 4.
৩। AEL, Book-I, part 4, p. 1304.
৪। Miles, op. cit. pp. 164-65.
৫। Gayet Al, L' Art Arabe, Paris, 1839, pp. 17-19.

সুতরা শব্দটির উৎস হচ্ছে 'সিতর' (sitr) অথবা সাতারা (satara)। মদিনা মসজিদে হুজরায় রসূলে করীমের পত্নীদের কক্ষগুলোর সামনে যে পর্দা টাঙানো থাকত সেগুলোকে সাতারা বলা হত।

কখনও কখনও বাঁশের দণ্ড এবং পাগড়ীকে সুতরা নামে অভিহিত করা হত। সুতরার সঙ্গে সম্পর্কিত আনাযা এবং হারবা কিবলার নির্দেশনা করে। বুখারী বলেন, "The Prophet ordered the Harba to be placed between his hands, and he took it as (a qiblah) and people followed him, and the door of praying faced the Harba. The Harba was fixed and they prayed in front of it."[১] অর্থাৎ কিবলা নির্ধারণের জন্যও হারবা ব্যবহৃত হত।

কুসাইর আমরায় উপবিষ্ট রাজকীয় ব্যক্তিদের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে রাজদণ্ড বা সুতরা দেখা যাবে। বেকার এই মতামত দ্বারা সুতরার প্রাক্-ইসলামী উৎস প্রমাণ করার চেষ্টা করেন; কিন্তু ইবন খালদুন উল্লেখ করেন যে, ইমাম মিমবারে খোৎবা পাঠের জন্য দাঁড়ালে তাঁর হাতে একটি দণ্ড থাকত। সুতরাং সুতরার উৎপত্তি হয়েছে মুসলিম ধ্যান-ধারণা থেকে।

আনাযা প্রসঙ্গে মাইলস বলেন যে, দামেস্কে ৬৯৫ সালে আবদুল মালিক যে রৌপ্যমুদ্রা জারী করেন তাতে একটি অর্ধবৃত্তাকার খিলানের মাঝে বর্শাকৃতি সুতরা দেখা যাবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুব্বাতু'স সাখরার ভূগর্ভস্থ গুহায় যে মিহরাব আবিষ্কৃত হয়েছে তাতেও একই ধরনের খিলান রয়েছে। দিরহামের আনাযা সম্বন্ধে মাইলস বলেন, "it terminates in an apical blade with two basal prongs bent back ground, and standing upon that appears to be a bifurcated base."[২] সুতরাং আনাযার সঙ্গে সুতরা এবং হারবার সাদৃশ্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রসূলে করীমের সময়ে মদিনা মসজিদে কোনো মিহরাব না থাকলেও কিবলা নির্ধারণের জন্য একখণ্ড পাথর রাখা হত।

সুতরা পরবর্তী পর্যায়ে ঈদগাহে ব্যবহৃত হতে থাকে। খোলা ময়দানে কেবলমাত্র কিবলার দিকে প্রাচীর এবং মাঝখানে একটি মিহরাব নির্মাণ করে ঈদগাহের সৃষ্টি করা হয়। রিচমণ্ডের ভাষায়, "They have a screen of wall about a hundred yards long with a central prayer niche and the normal three steps for the preachers and each extremity is garnished with an imitation minaret."[৩] মসজিদের একটি পূর্ণাঙ্গ সকল উপকরণে সমৃদ্ধ ধর্মীয় ইমারত, অপরদিকে কিবলা-নির্ধারক প্রাচীর, মিমবার ও মিহরাবসম্বলিত ঈদগাহ একটি খোলা প্রান্তর। ঈদগাহের প্রাচীরটিকে সুতরা বলা যায়। মুসলিম-বিশ্বের বহু স্থানে পবিত্র ঈদ উপলক্ষে এই সমস্ত ঈদগাহে নামায পড়া হয়। ঢাকায় শাহ সুজার শাসনামলে ১৬৪০

১। Wensinck A.S., A Handbook of Early Muhammadan Traditions, London, 1960, p. 223

২। Miles op. cit. 159.

৩। Richmond, Arabian Nights, Lot 2, p. 202.

সালে ধানমণ্ডির ১৪ নম্বর রোডে মুঘল আমলের ঈদগাহ্ এখনও কালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

মসজিদের আদর্শের কথা উল্লেখ করে বুখারী বলেন যে, রসূলে করীম মসজিদের উপর অসীম গুরুত্ব দিতেন। তাঁর ভাষায়, "The earth has been created for me as a masjid and a place of purity and whatever men from my Umma finds himself in need of prayer let him pray."[১] ধর্মীয় এবং স্থাপত্যিক দিক থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, ৬২২ সালে মদিনার মসজিদুল নবী থেকে ৭১৫ সালে নির্মিত দামেস্কের জা'মি মসজিদ পর্যন্ত মুসলিম স্থাপত্যের আধার হিসেবে মসজিদ-স্থাপত্যের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ ঘটেছে।
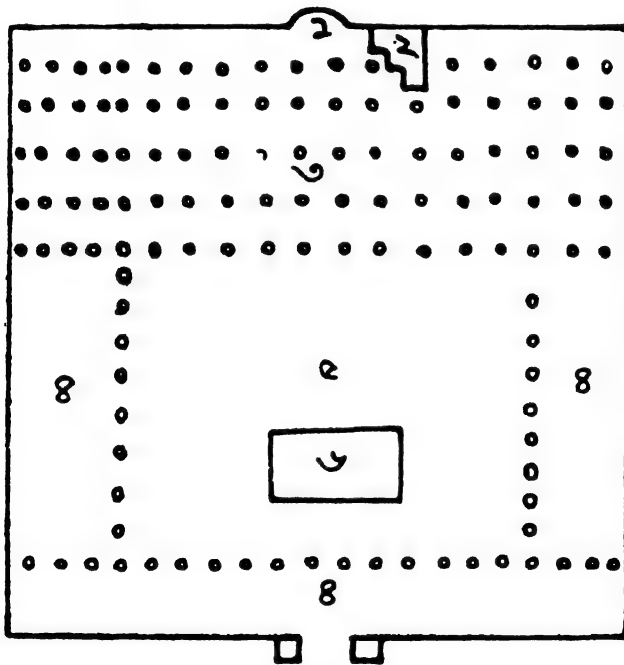
রেখাচিত্র : ৬৫
মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনা

১। মিহরাব ২। মিমবার ৩। লিওয়ান
৪। রিওয়াক ৫। সাহান ৬। ওজুর স্থান

১। Bukhari, Lot, I, p. 80.

২
প্রারম্ভিক যুগ
(৬২২–৬৬১ খ্রীঃ)

১। আল-মসজিদুন নব্বী, ৬২২ খ্রীঃ

পটভূমি :

রসূলে করীম হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ৬১০ খ্রীস্টাব্দে ওহী (ঐশীবাণী) লাভ করে ইসলাম ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। মক্কায় ছিল তাঁর শৈশবের বেলাভূমি এবং সেখানেই তিনি বিধর্মী কুরাইশদের মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদ বা তওহীদ প্রচার শুরু করেন। কিন্তু পাপাচারে নিমগ্ন মূর্তিপূজক নির্মম কুরাইশগণ তাঁর ধর্মপ্রচারে প্রচণ্ড বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এসত্ত্বেও তিনি গোপনে মক্কায় ধর্মপ্রচার করতে থাকেন। ক্রেসওয়েলের মতে, মক্কায় ইসলাম প্রচার ছিল রসূলের পক্ষে একটি ব্যক্তিগত মহতী ব্যাপার এবং নবদীক্ষিত মুসলমানদের একত্রে জমায়েত এবং জামা'আতে নামায আদায়ের কোনো ব্যবস্থা তখনও করা সম্ভবপর হয়নি। তবুও নিশ্চিত করে বলা যায় যে, নবী করীম (সঃ) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে একটি মুসাল্লায় নামায আদায় করতেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মক্কায় প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচার সম্ভবপর হয়নি। দ্বিতীয়ত, প্রকাশ্যভাবে নামায পড়ার কোনো স্থান অর্থাৎ মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।[১]

প্রাক্-ইসলামী যুগে এই কা'বাগৃহকে পৌত্তলিকতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করা হয় এবং মক্কাবিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই গৃহে ৩৬০টি দেবদেবীর মূর্তি ছিল। পৌত্তলিকতার পাদপীঠ থেকে ইসলামের পবিত্রতম ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে মক্কার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করলেন রসূলে করীম। বায়ত-উল হারামকে মসজিদ বলা যাবে কিনা এ সম্পর্কে কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সালাদীন বলেন, "This Ka'ba, the real sanctuary of Islam, and the only one which has a supernatural significance, is not a mosque. It is the house of God built by Abraham with a Divine

---

১। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুর'আন শরীফে বলা হয়েছে, "মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো মক্কায় অবস্থিত, তা পুণ্যময় ও বিশ্বজগতের দিশারী" (৩ : ৯৬)। এই গৃহ ইসলামের পবিত্র কা'বা শরীফ বা বায়ত-উল অথবা মসজিদুল হারাম নামে পরিচিত। এই স্থান হযরত ইব্রাহিমের সময় থেকে নামাযের এবং তাওয়াফের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে স্থাপত্যিক দিক থেকে রসূলের মসজিদকে ইসলামের প্রথম মসজিদ বলা হয়।

stone."[১] অর্থাৎ সালাদীন মনে করেন যে, কা'বা শরীফ মসজিদ নয়, আল্লাহর পবিত্র ঘর। অপরদিকে লেন মনে করেন, "The Temple of Mecca was an ancient Arab Sanctuary and became the most sacred mosque of the Muslims."[২] অর্থাৎ কা'বার মন্দিরটি ছিল আরবদের একটি প্রাচীন উপাসনালয়। পরবর্তীকালে এই ইমারতটি মুসলমানদের পূত পবিত্র ধর্মীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়। কা'বা শব্দের অর্থ চতুষ্কোণাকার গৃহ, উচ্চ গৃহ, মর্যাদাসম্পন্ন এবং গৌরবমণ্ডিত ইমারত।

আল-হাজরুল আস-ওয়াদ বা পবিত্র কালো পাথরকে কা'বা শরীফের ভিত্তিপ্রস্তর মনে করা হয়। হিট্টি বলেন, "The pagan Ka`ba which became Palladium of Islam was an unpretentious cube like (hence the name) building of primitive simplicity, originally roofless serving as a shelter for a black meteorite."[৩] কা'বা শরীফের গঠনশৈলী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, একটি চতুষ্কোণাকার পাথরের তৈরি গৃহকে কেন্দ্র করে একটি বিশাল চত্বর রয়েছে যেখানে পবিত্র হজ্ব উপলক্ষে হাজার হাজার ভক্তপ্রাণ মুসলমান হজ্বপালনের উদ্দেশ্যে সমবেশ হন এবং সেখানে নামায আদায় করেন এবং সেই অর্থেই কা'বা শরীফ একটি জা'মি মসজিদ অর্থাৎ একত্রে সমবেত হয়ে সিজদাসহকারে (সিজদা থেকে মসজিদ শব্দটির উৎপত্তি) নামায আদায় করা হয়। উপরন্তু, ইসলামের কিবলা হিসেবে চিহ্নিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কা'বা শরীফ মসজিদের দিকনির্দেশক এবং প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত। কিন্তু স্থাপত্যিক বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে, মসজিদের পূর্বসূচী হিসেবে কা'বা শরীফকে ধরা হয় না। মসজিদ শব্দটির দুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে সিজদা দেওয়ার জায়গা অর্থাৎ মুসাল্লা বা সিজদাসহকারে সালাত আদায়ের স্থান; দ্বিতীয়, মসজিদের বিশেষ কতকগুলো উপাদানসহকারে কা'বার দিকে কিবলা তৈরি করে জামায়াতে মুসলমানদের নামায পড়ার একটি বিশিষ্ট ধর্মীয় ইমারত, যাতে স্থাপত্যিক উপকরণ, যেমন–গম্বুজ, খিলান এবং ভল্ট ছাড়াও সাহান (চত্বর), রিওয়াক (ছাদবিশিষ্ট সাহনের তিনদিকে প্রবেশপথ), লিওয়ান (প্রধান নামাযঘর), মিনার (আযান দেওয়ার জন্য নির্মিত সুউচ্চ চূড়া) মিহরাব (কিবলা প্রাচীরে অবতলাকার স্থান যেখান থেকে ইমাম নামায পরিচালনা করেন), মিমবার (খোদ্‌বা পড়ার স্থান) ইত্যাদি থাকে। এ কারণেই সম্ভবত সালাদীন বলেন, "It is not the prototype of the mosque."[৪] কা'বা শরীফের পবিত্রতা ও ধর্মীয় গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর অনুকরণে কোনো ইমারত নির্মিত হয়নি। একথার উল্লেখ করে লেন বলেন, "No one has ever imagined any mosque to have been built in imitation of the Ka'ba."[৫]

১। Saladin,H. Architecture, in Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol I p 746

২। Lane, E.R.. Arabin Architecture. Appendix F The Manners and Customs of the Modern Egyptians, London, 1923 P 587

৩। Hitti, History of the Arabs, London, 1952 p 100.

৪। Saladin, ibid, p. 746.

৫। Lane, ibid, p, 588.

নবী করীম (সঃ) মক্কা নগরীতে অবস্থানকালে কোনো মসজিদ নির্মাণ করেননি, তখন প্রতিকূল পরিবেশে ধর্মপ্রচারও বিঘ্নিত হয়। কা'বা শরীফের অনুকরণে ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়নি। ৬২২ খ্রীস্টাব্দে রসূলে করীম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন এবং সেখানে মুসাল্লা নির্মাণ করে নামায আদায় করেন।[১] লেন বলেন যে, কুবার মসজিদটি ইসলামের "first public mosque." এই মতবাদ সঠিক নয়। বস্তুত মদিনা মসজিদের পূর্বে কোথাও জা'মি মসজিদ নির্মিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে Maurice Gaudefroy Demombynes বলেন, "The origins of the Mosque are complex. They are not imitations of the temple at Mecca which consists essentially of the Ka`ba with Zamzam, which the caliphs later caused to be surrounded by a large courtyard, enclosed within encircling galleries. The Mosque, according to Muslim tradition which we must accept has grown out of the court in which before the house of the Prophet in Medina the faithful gathered for the prayer to listen to the Revelation and to receive the exhortations, a part of which was soon roofed in by an awning so as to protect the worshippers from the sun's heat or foul weather."[২]

ইবনে হিশামের বর্ণনামতে নবী করীম (সঃ) কুবা থেকে শুক্রবার মদিনার উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে সালিম গোত্রের পল্লীতে প্রথম জুম'আর নামায পড়েন। এই জুম'আর নামাযে ১০০ জন সাহাবী শরীক হন। স্থানীয় লোকদের তিনি এস্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করতে বলেন। নামাযান্তে তিনি মদিনা শহর অভিমুখে রওয়ানা হন। মদিনার বহু আনসারও এখানে তাঁব সাথে মিলিত হন। এই শহরের প্রাচীন নাম 'য়াছরিব'। নবী করীমের সম্মানে এর নামকরণ হয় মদিনাতু'ন-নব্বী বা নবীর নগর, মদীনা মুনাওয়ারা—সমুজ্জ্বল মদিনা। মদিনা শহরে প্রবেশের পর শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি জায়গায় এসে নবী করীমের উট কাসোয়া থেমে যায় ও বসে পড়ে। ঐ স্থানের পাশেই ছিল একখণ্ড পতিত ভূমি যা খেজুর শুকানো ও উট বাঁধার জন্য ব্যবহৃত হত। রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথম নির্মাণেই ঐ স্থানটিকে একটি মসজিদের উপযুক্ত স্থানরূপে পছন্দ করেন। মদিনাবাসীরা মহানবীকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানান এবং সকলেই তাঁদের আতিথ্য গ্রহণের জন্য আন্তরিকভাবে তাঁকে অনুরোধ করেন। কিন্তু নবী করীম (সঃ) তাঁর মাতুল সম্পর্কীয় নাজ্জার গোত্রের আবু আয়ূব আল-আনসারীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। পতিত ভূখণ্ডটি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে তিনি জানতে পারেন যে, ভূমিখণ্ডের মালিক নাজ্জার গোত্রীয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদ্বয় সাহল সুহায়েল। নবী করীম ঐ ভূমিখণ্ড অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে সেখানে মসজিদ নির্মাণের সংকল্পের কথা প্রকাশ করলে

২। কতিপয় লেখক কুবার মসজিদকে প্রথম মসজিদ হিসেবে চিহ্নিত করলেও প্রকৃতপক্ষে মদীনার মসজিদটিই ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত প্রথম মসজিদ। স্থাপত্যিক দিক থেকে বিচার করলে কুবাকে মসজিদ বলা যায় না।

২। Muslim Institutions, London,1950, p. 76.

বালকদ্বয় এবং তাদের অভিভাবক আসআদ ইবনে জাবারা আল-আনসারী মসজিদ নির্মাণের জন্য বিনামূল্যে তা দান করার আগ্রহ ব্যক্ত করে। রসূলুল্লাহ (সঃ) এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন না এবং নাজ্জার গোত্রের প্রধানদের ভূমিখণ্ডের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করলেন। জমির মূল্য দশ মিছকাল স্বর্ণ নির্ধারিত হলে হযরত আবুবকর এই মূল্য পরিশোধ করেন। এর পরেই মসজিদের নির্মাণকাজ আরম্ভ হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং নির্মাণ স্বার্থে সাহাবাদের সাথে অংশগ্রহণ করেন। মসজিদের প্রাচীরসংলগ্ন নির্মিত হয় রসূলুল্লাহ ও তাঁর পরিবারের জন্য কুটির।

সমসাময়িক সর্বসম্মত বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সঃ) মদিনায় আগমনের অব্যবহিত পরেই মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু করেন এনং মসজিদের পাশেই নির্মিত হয় তাঁর ও তাঁর পত্নীদের পর্ণকুটির। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়–L. Caetani ও Creswell মনে করেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) মদিনায় নির্মাণ করেছিলেন তাঁর পরিবার-পরিজনদের জন্য বসতবাড়ি, মসজিদ নয়।

নির্মাণকৌশল :

সাহল ও সোহায়েলের জমি ক্রয় এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নবী করীম এর সীমানা নির্ধারণ করেন। গৃহাঙ্গন বা মসজিদের পরিমাপ ছিল চতুষ্কোণাকার। আয়তন মোটামুটি ১০০ বর্গহাত অর্থাৎ ৫৬ গজ প্রত্যেক দিকে। এই এলাকার সীমানা চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। প্রাচীরটির উচ্চতা ৭ হাত অর্থাৎ ১০´´–১১´´ এবং রৌদ্রে পোড়া কাঁচা ইট দিয়ে তৈরি ছিল। প্রাথমিক অবস্থায় এলাকাটি ছিল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে প্রখর সূর্যের তাপে নামাযের সময় মুসল্লীদের অসুবিধার কথা ভেবে নবী করীম উত্তরদিকে একটি পোর্টিকো বা ছাদবিশিষ্ট ছাউনি নির্মাণের অনুমতি দেন। উত্তরদিকে খেজুরগাছের কাণ্ড দিয়ে দুই সারি স্তম্ভ বসানো হয় এবং এরপর খেজুর পাতা ও কাদামাটি দিয়ে স্তম্ভরাজির উপর ছাদ নির্মিত হয়। ছাদবিশিষ্ট পোর্টিকোটি দিয়ে যে প্রার্থনাগার নির্মিত হয় পরবর্তীকালে মসজিদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ লিওয়ান হিসেবে তা পরিচিত।

মদিনার মসজিদটিতে প্রবেশের জন্য তিনটি প্রবেশপথ ছিল। দক্ষিণদিকের প্রধান ফটক দিয়ে বিশ্বাসীগণ চত্বরে প্রবেশ করতেন। পশ্চিমদিকের ফটকটির নাম ছিল 'বাবুল আতীক' বা 'বাবুল রাহমাত', এবং পূর্বদিকের প্রবেশপথটি 'বাবুল উসমান' বা 'বাবুল জিবরীল' নামে পরিচিত ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বাবুল উসমান দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতেন।

রসূলে করীম মদিনায় বসবাসের জন্য প্রাচীরবেষ্টিত এলাকার পূর্বদিকের দক্ষিণ কোণায় দুটি কুঠরি নির্মাণ করেন। এই প্রকোষ্ঠ দুটি মহানবীর দু'জন স্ত্রী বিবি আয়েশা এবং বিবি সাওদার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। প্রকোষ্ঠ দুটির প্রবেশপথ উত্তরদিকে ছিল ; বাইরে থেকে কোনো প্রবেশপথ ছিল না। কাঁচা ইট দিয়ে দেওয়াল নির্মিত হয়। চিরাচরিতভাবে খেজুরগাছের পাতা ও কাদামাটি দিয়ে ছাদ তৈরি ছিল এবং ঘরগুলোও

ঐভাবে বিভক্ত করা হয়। পূর্বদিকে দুটি প্রকোষ্ঠের সংলগ্ন এবং পাশাপাশি আরও ৭টি কুঠরি তৈরি করা হয়। রসূলে করীমের স্ত্রীদের বসবাসের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য যে, পশ্চিমদিকের প্রাচীরে কোনো প্রকোষ্ঠ ছিল না। প্রতিটি প্রকোষ্ঠ অতি সাধারণ উপাদান দিয়ে তৈরি এবং পর্দার পরিমাপ ছিল ৩ বর্গহাত। কুঠরিগুলোর ছাদ ছিল খুবই নিচু, এত নিচু যে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যেত। নবী করীম (সঃ) খুবই অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন, তাঁর কোনো আসবাবপত্র ছিল না। মাটির বিছানা করে পরিবার-পরিজন নিয়ে রাত্রি-যাপন করতেন।
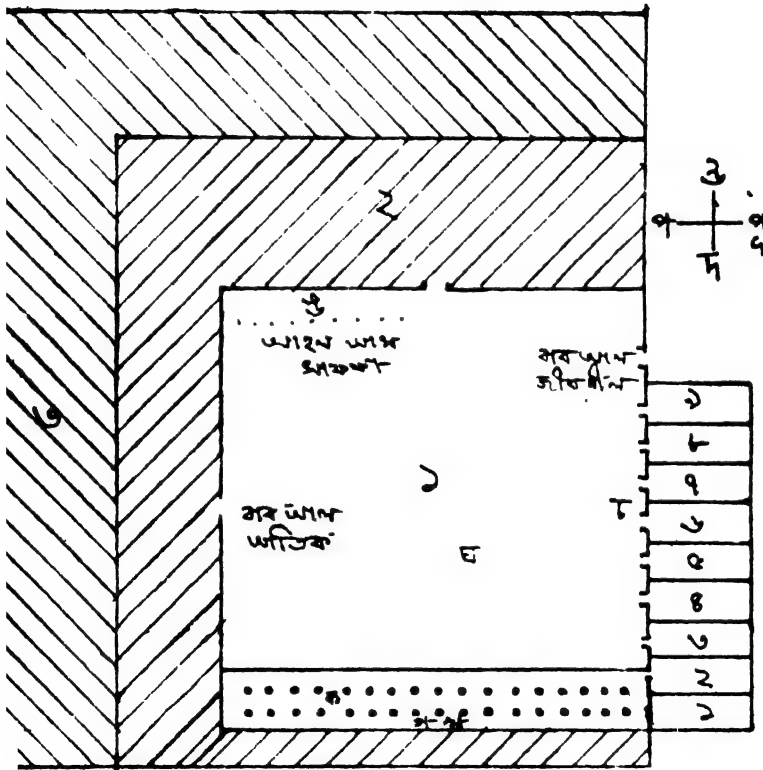
রেখাচিত্র : ৬৬
মদিনা, আল-মসজিদুন নব্বী, ভূমি-পরিকল্পনা

মসজিদের উত্তর প্রাচীরসংলগ্ন চালাযুক্ত ঘরটি (সুফফা, জুম্মা) ছিল আশ্রয়হীন মুহাজীর সাহাবীদের আশ্রয়স্থল। তাঁরা এই একচালা ঘরে অবস্থান করতেন বলে 'আস্‌হাবু'স সুফকা' নামে খ্যাত।

মসজিদ-স্থাপত্যের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উপাদানগুলো সর্বপ্রথম মদিনা মসজিদে আত্মপ্রকাশ করে, যেমন– কিবলা, মিমবার, মা'যিনা। রসূলুল্লাহ (সঃ) মদিনায় আগমন করে নবপ্রতিষ্ঠিত মসজিদে প্রথমে জেরুজালেমের আল-মসজিদু'ল আকসার অথবা বায়তু'ল মুকাদ্দিস-এর দিকে ফিরে নামায পড়তেন। এজন্য জেরুজালেমের আল-মসজিদু'ল আকসা ইসলামের প্রথম কিবলা নামে পরিচিত হয়। ৬২২ থেকে ৬২৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৬ অথবা ১৭ মাস) জেরুজালেমে ইসলামের কিবলা ছিল। কিন্তু ৬২৪ খ্রীস্টাব্দে রসূলে করীম মদিনার উপকণ্ঠের এক মসজিদে যখন নামাযরত ছিলেন তখন ওহীর মাধ্যমে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ পান। ১৫ই সাবান ২য় হিজরী অর্থাৎ ৬২৪ খ্রীস্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি তিনি যখন দ্বিতীয়বার সিজদায় গিয়েছিলেন, ঠিক তখনই তাঁর উপর 'ওহী' নাজেল হল এই মর্মে যে, বায়তু'ল মুকাদ্দিস থেকে আল-মসজিদুল হারামের দিকে তুমি মুখ ফেরাও এবং নামায আদায় করো। আল্লাহর নির্দেশে তিনি সকল মুসল্লীকে নিয়ে উত্তরদিক থেকে দক্ষিণদিকে মুখ ফেরালেন। এই ঘটনার পর থেকে এই মসজিদকে দুই কিবলাবিশিষ্ট মসজিদ বা 'মসজিদু'ল কিবলাতায়েন' বলা হয়।

কিবলা পরিবর্তনের ফলে মদিনা মসজিদের অঙ্গসৌষ্ঠব ও উপাদানের সামান্য রদবদল করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কা'বা শরীফ ইসলামের কিবলা হিসেবে নির্দিষ্ট হয় এবং বিশ্বের মসজিদের নির্মাণকালে কিবলা নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যকীয় করণীয় হয়ে দাঁড়ায়। কিবলা পরিবর্তনের ফলে মদিনা মসজিদটির অভ্যন্তরীণ উপাদান ও ব্যবস্থাগুলোর রদবদল করতে হয়। লিওয়ানটি উত্তরদিক থেকে দক্ষিণদিকে স্থানান্তরিত করা হয় এবং উত্তরে প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে যেখানে মিহরাব থাকে সেখানে একটি প্রবেশপথ তৈরি করা হয়। বাকি দুটি প্রবেশপথ 'বাবু'ল আতীক' এবং 'বাবু'ল জীবরাইল' অপরিবর্তিত থাকে। এ ছাড়া কাঠামো পরিবর্তন করে আহ্লুল কুফফার আশ্রয়স্থান দক্ষিণ-পশ্চিমদিক থেকে উত্তর-পশ্চিম কোণে স্থানান্তরিত করা হয়।

কিবলা পরিবর্তনের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গুরুত্বের উল্লেখ করে ক্রেসওয়েল বলেন, "Change of direction of prayer meant a new political and moral orientation on the part of Muhammad, the affirmation that Makka, and not Jerusalem was the centre of the world and that the Muslims not the Jews were the keepers of the Truth."[১]

মদিনা মসজিদে আধুনিককালে যে মিহরাব দেখা যায়, সে ধরনের কোনো উপকরণ ব্যবহৃত হয়নি। কিবলা-প্রাচীরের মাঝখানে ইমাম নামায পরিচালনা করার জন্য এই অবতল স্থানে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ান। রসূলে করীম (সঃ) মুসল্লীদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে খেজুরগাছের একটি স্তরে বা স্তম্ভে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন।

মসজিদের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মিহরাব। ৬২২ খ্রীস্টাব্দে মদিনার মসজিদে মিহরাবের ব্যবহার হয়নি। মিহরাব স্থাপত্যের পূর্বে রসুলুল্লাহ (সঃ) একটি খেজুর-

১। E.M.A., p.9.

গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে খুৎবা পাঠ করতেন। অতঃপর তাবারীর মতে, ৬২৯ সালে সর্বপ্রথম মিহরাব ব্যবহৃত হয়। আল-গাবা উপত্যকা থেকে সংগৃহীত উপকরণ দ্বারা এই মিমবার তৈরি করা হয়। তিনধাপবিশিষ্ট এই মিমবার সম্ভবত গ্রীক ছুতারমিস্ত্রী বাকুম তৈরি করেন। এই মিস্ত্রী ছিলেন কোনো আনসার অথবা মুহাজিরের স্ত্রীর ক্রীতদাস। মাতান্তরে মিস্ত্রীর নাম ছিল ইব্রাহীম (বুখারী)। রসূলে করিম সর্বোচ্চ তৃতীয় ধাপে বসে দ্বিতীয় ধাপে পা রাখতেন এবং পরবর্তীকালে দ্বিতীয় ধাপে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং সর্বশেষ প্রথম ধাপে হযরত উমর (রাঃ) বসতেন। প্রথম দুই খলিফা হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকায় তৃতীয় ধাপে বসতেন না।[১] মিমবার ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল সমবেত মুসল্লীগণ যাতে মহানবীর (সঃ) খুৎবা ও বাণী সুস্পষ্টভাবে শুনতে সক্ষম হয়। ইবনুল আছীরের বর্ণনামতে, সাহাবীদের অনুরোধক্রমে মসজিদে একটি মিমবার স্থাপন করা হয়।

মদিনা মসজিদে প্রথমদিকে আযানের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী রসূল এবং তাঁর সাহাবীগণ যখন প্রথম মদিনায় আসেন তখন আযান ছাড়াই নামায আদায় করতেন। ইহুদী ও খ্রীস্টানদের মধ্যে উপাসনালয়ে আমন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এক প্রধান বাদ্যযন্ত্রসহকারে আওয়াজ দেওয়া হত। ইহুদীগণের যে শিক্ষা ব্যবহার তা 'শোফা'র নামে পরিচিত এবং খ্রীস্টান সম্প্রদায় জাতীয় একপ্রকার কাঠের ছড়ি দ্বারা গির্জায় আহ্বান করত। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রাক্-মুসলিম যুগের প্রথার প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং একটি স্বতন্ত্র ও অভিনব পন্থায় মুসল্লীদের মসজিদে নামাযের জন্য আহ্বান করার মনস্থ করেন। হাদীছ অনুযায়ী "হযরত উমর (রাঃ) রসূলকে আযানের ধারণা দেন।" অপর এক হাদীছে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লা ইবনে যায়েদ সর্বপ্রথম রসূলকে আযানের কথা বলেন। আযান অর্থ কোনো উঁচু স্থান থেকে উচ্চস্বরে নির্দিষ্ট বাণী পাঠ করার মাধ্যমে নামাযের ঘোষণা করা এবং মুসল্লীদের নামাযের জন্য মসজিদে আসার আহ্বান জানানো। যাহোক, রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর হযরত বিলালকে মসজিদ সংলগ্ন কোনো উঁচু স্থান থেকে আযান দিতে বলেন। মসজিদের যে স্থান থেকে আযান ধ্বনিত হয় সে স্থানটি মিযা'না ('বহুবচন'), মাযানা ও মিযা'না অর্থাৎ আযান দেয়ার স্থান নামে পরিচিত। পরবর্তী পর্যায়ে মসজিদ-স্থাপত্যের ক্রমবিকাশে মাযানা মিনারে রূপান্তরিত হয়। হযরত বিলাল (রাঃ) ইসলামের প্রথম 'মোয়াজ্জিন' ছিলেন।

মদীনায় রসূলে করীমের প্রতিষ্ঠিত মসজিদে যে সমস্ত অপরিহার্য উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে তা কেবলমাত্র মসজিদেই পরিলক্ষিত হয়, যেমন– লিওয়ান, সাহান, পোর্টিকা মিহরাব, (ইঙ্গিতবহ) মিমবার, মাযানা, ওযুর সুবিধার্থে মসজিদসংলগ্ন একটি কূপও ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বা শরীফকে ইসলামের নিজস্ব কিবলারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। মসজিদ- স্থাপত্যের ইতিহাসে মদিনা মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম এবং পরবর্তীকালে বিশ্বের সমস্ত মসজিদ মদিনা মসজিদ দ্বারা অনুপ্রাণিত। মদিনা মসজিদকে প্রতীকী হিসেবে ধরা হয়।

১। E.M.A p. 9.

গুরুত্ব :

মসজিদ-স্থাপত্যের ইতিহাসে মদিনা মসজিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন লেখক এবং বিশেষজ্ঞ মদিনা মসজিদের গুরুত্বের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। Gottheil বলেন, "We have here in embryo the open sahn and the closed liwan of the later mosques."[১] সনাতনী মসজিদ রীতিকৌশলে সাহনের ভূমিকা অপরিসীম এবং চত্বরবিশিষ্ট মসজিদ সর্বাধিক সমাদৃত ও সার্বজনীনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে মুসলিম বিশ্বে। এ ধরনের আঙ্গিকের উদ্ভাবনে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, মরুভূমির উষ্ণতা ও প্রসারতার প্রভাব রয়েছে। পরবর্তী মসজিদের ক্রমবিবর্তনে মদিনা মসজিদের প্রভাবের উল্লেখ করেন এটিংহাওসেন, রিচমন্ড, সালাদীন ও লেন। এটিংহাওসেন বলেন, "Prophet's simple house in Medina was used as the place of worship by the moslem congregation throughout his life and even in the decades after his death. This very building is a clear proof of how decisively the material conditions in his time influenced the later periods. All later mosques are derivatives of this simple house with its shade like portico for the prayer meetings on one side and its columned shelters on the opposite side of the large courtyard."[২] অতি সাধারণ, অনাড়ম্বর ও জাঁকজমকহীন রসূলের এই মসজিদটিকে Protyotype হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। রিচমন্ডের ভাষায়, "It is and still accepted idea that the mosque of Muhammad (S.M.) at Medina represents, in an elementary form the prototype of the congregational mosques of the first centuries of Islam."[৩] রিচমন্ড কেবলমাত্র ইসলামের প্রথম শতাব্দীর কথা উল্লেখ করেছেন যা সত্য নয়। চৌদ্দ শত বছর ধরে পৃথিবীর সর্বত্র যে সমস্ত মসজিদ নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে ভূমি-নকশার দিক থেকে courtyard type সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং এই রীতিকৌশল রসূলের মদিনা মসজিদকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সালাদীন বলেন, "Here we have in there simplest form the elements of the mosques, a court, porches to shelter the worshippers, the pulpit for the preacher to stand in and the recess or mihrab, the situation of which indicates the qibla or the direction in which one ought to turn in order to have one's face directed towards the central shrine, the Ka'ba of Mecca."[৪]

১। Gottheil, R.J.H., The origin and the History of the Minaret. Journal of American Oriental Society, 1909, p. 133.

২। Ettinghausen, R , Character of Islam Art, in Arab Heritage, pp. 253-4.

৩। Richmond, ibid, p. 10.

৪। Saladin, p 746

নিরলঙ্কার মদিনা মসজিদ সম্বন্ধে লেন মন্তব্য করেন, "The Prophet's Mosque at El-Medina was originally (as built by himself) very small measuring 100 cubits in each direction or as some say less. It was built of crude bricks upon a foundation of stones three cubits high the bricks being laid in alternate courses lengthways and across (Flemish bond) and was neither plastered nor embellished. It had a partly roofed court in the middle of it, the roof which was supported on palm trunks for pillars, being composed of palm sticks plastered over. This mosque thus in the rudest fashion, represents the type of the plan of the most existing mosques."[১]

সংযোজন ও সম্প্রসারণ :

৬৩২ খ্রীঃ ৮ই জুন (একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল আওয়াল) নবী করীমের ওফাতের পর তাঁকে নিজ কক্ষে সমাহিত করা হয়। রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মৃত্যুর পরেও তাঁর বাসস্থান অপরিবর্তিত থাকে এবং ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ) রসূলুল্লার মতোই এখানে বসবাস করতেন। ৬৫৫ খ্রীঃ হযরত উছমান (রাঃ) আততায়ীর হাতে এই স্থানে শহীদ হন এবং যে কক্ষে রসূলে করীমকে সমাহিত করা হয় হযরত উছমান (রাঃ) ঠিক তার পাশের কক্ষে শাহদাতবরণ করেন। ৬৫৮ খ্রীঃ মদিনা থেকে রাজনৈতিক কারণে হযরত আলী (রাঃ) রাজধানী কুফায় স্থানান্তরিত করলেও মদিনার মসজিদের পবিত্র ধর্মীয় স্থানরূপে মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। বিভিন্ন সময়ে মদিনা মসজিদের যে সম্প্রসারণ করা হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

হযরত উমর (রাঃ) সর্বপ্রথম মসজিদু'ন নব্বীর সম্প্রসারণ ও সংস্কার করেন। ৬৩৮ খ্রীঃ তিনি মসজিদটির আয়তনবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে সম্প্রসারণ করেন। এই সম্প্রসারণ করা হয় উত্তরদিকে ৩০ হাত, দক্ষিণদিকে ১০ হাত এবং পশ্চিমদিকে ২০ হাত। ক্রেসওয়েলের মতে, হযরত আব্বাসের বাসস্থান নিয়ে এই সম্প্রসারণের কাজ সমাধা করা হয়। ফলে পরিমাপ দাঁড়ায় উত্তর-দক্ষিণে ১৪০ হাত এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১২০ হাত। সর্বপ্রথম খেজুরগাছের পরিবর্তে কাষ্ঠখণ্ডের স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়, পশ্চিমদিকে দুই সারিবিশিষ্ট কাঠের থাম দিয়ে সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন হয়। পূর্বদিকে হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর রওজা এবং তাঁর স্ত্রী, পরিবার-পরিজনের কুঠরি থাকায় কোনো সম্প্রসারণ করা হয়নি। মসজিদের দেয়াল পূর্বে কেবলমাত্র কাঁচা অর্থাৎ রোদ্রে পোড়া ইট দিয়ে নির্মিত হয়। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) দেয়ালটি মজবুত করে নির্মাণের নির্দেশ দেন। একজন পুরুষের উচ্চতার সমান করে প্রস্তরখণ্ড দিয়ে দেয়ালের নিম্নাংশ গেঁথে প্রাচীর নির্মিত হয়। মুসল্লীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি হতে থাকায়

১। Lane, p 47

প্রবেশপথের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। পূর্বে যেখানে মাত্র তিনটি প্রবেশপথ ছিল, সেখানে আরও তিনটি প্রবেশ পথ তৈরি করা হয়। যে নতুন প্রবেশপথ পশ্চিম ও পূর্বে খোলা হয় তা 'বাবুস সালাম' ও 'বাবু'ন নিসা' নামে পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ বলেন যে, হযরত উমর (রাঃ) যখন লক্ষ করলেন যে, সিজদা দেয়ার সময় মুসলমানগণ কপালে হাত দিয়ে ধোলাবালি মুছার জন্য চেষ্টা করছে, তখন তিনি এক ধরনের পাথরের নুড়ি (flint stone) দিয়ে মেঝে তৈরি করার নির্দেশ দেন। রসূলে করীমের আদি মসজিদটি মাত্র ১৬ বছরের মধ্যে হযরত উমরের (রাঃ) খিলাফতে আঙ্গিক ও অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক দিয়ে একটি নতূন পরিবর্ধিত রূপ গ্রহণ করে।

পরবর্তী খলিফা হযরত উছমান (রাঃ) শাসনভার গ্রহণ করে ৬৪৬-৪৭ খ্রীস্টাব্দে মহানবীর মসজিদটি সংস্কার, পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণের প্রয়াস পান। মসজিদের পরিমাপ বৃদ্ধি করে উত্তর-দক্ষিণে ১৬০ হাত, পূর্ব-পশ্চিমে ১৫০ হাত করা হয়। প্রবেশপথের সংখ্যা বৃদ্ধি করা না হলেও মসজিদের ছাদ সুদৃঢ়রূপে নির্মাণের জন্য সেগুন কাঠের খণ্ড ব্যবহৃত হয়। এই কাঠের টুকরো দিয়ে ১৬০ × ১৩০ বর্গহাত পরিমাণ স্থান ছাদ দিয়ে ঢাকা হয়।

উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দিক থেকেই নয়, সমাজ, সংস্কৃতি ও স্থাপত্য রীতিকৌশলের দিক থেকেও এর অভূতপূর্ব পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই সময়েই মুসলিম স্থাপত্যে বায়জানটাইন প্রভাব অনুভূত হয়। খলিফা আল-ওয়ালিদ ক্ষমতালাভ করে ৭০৭ সালে হিজাযে তাঁর গভর্নর ওমর-ইবন-আবদুল আযীযকে নবী করীমের মসজিদটি ভেঙে সম্পূর্ণ নতুন উপকরণ, গঠনপদ্ধতি ও অলঙ্করণের সাহায্যে পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধার জন্য খলিফা পর্যাপ্ত অর্থ, সাদা পাথর, ৮০ জন বায়জানটাইন ও কপটিক কারিগর এবং প্রধান প্রযুক্তিবিদ সালিহ ইবনে ফাইসালকে প্রেরণ করেন। এই সম্প্রসারণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মসজিদসংলগ্ন ঘরবাড়ি এমনকি পূর্বদিকের নবী করীমের হুজরা ভেঙে ফেলা হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে, বায়জানটাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ন খলিফা আল-ওয়ালিদের নিকট পর্যাপ্ত অর্থ, কারিগর ও অসংখ্য মোজাইক পাথর পাঠান। নির্ভরযোগ্য তথ্য থেকে জানা যায় যে, মিশরীয় কপটিক কারিগরেরা মসজিদের সম্মুখঅংশের নামাজগাহ এবং সিরীয় বায়জানটাইন কারিগরেরা বাকি খোলা অংশের পুনর্নির্মাণকাজে নিয়োজিত ছিলেন। সম্প্রসারণের ফলে পরিবর্ধিত মসজিদের পরিমাপ দাঁড়াল ২০০ বর্গহাতে।

ওয়ালিদ কর্তৃক মদিনায় সম্প্রসারিত মসজিদে মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের প্রধান দুটি উপকরণ সংযোজিত হয়। ওমর-ইবনে-আব্দুল আযীয সর্বপ্রথম সংস্করণের সময় একটি অবতল মিহরাব (concave mihrab) এবং চার কোণায় চারটি মিনার নির্মাণ করেন।[১] আল-ওয়াকিদীর উদ্ধৃতি দিয়ে মাকরীযি এবং ইবনে দুকমাক বলেন যে, তিনিই মিহরাবের উদ্ভাবক। কিবলা- নির্দেশক দেয়ালের কিছু অংশ কেটে অর্ধগোলাকার

১। E. M. A pp. 98-99.

পরিমাপ যে অবতল স্থান থাকে তাকেই মিহ্‌রাব বলে এবং ৭০৭ খ্রীঃ মদিনা মসজিদেই সর্বপ্রথম মিহ্‌রাবের প্রচলন করা হয়। ক্রেসওয়েলের মতে, অবতলাকার মিহ্‌রাব কপটিক কারিগরগণ নির্মাণ করেন এবং সম্ভবত কপটিক গির্জার "হাইকল" (অবতলাংশ) মিহ্‌রাবের পূর্বসূরী ছিল। মতান্তরে অনেকে মনে করেন যে, মিহ্‌রাব খ্রীস্টান গির্জার apse থেকে নেওয়া হয়েছে। Diez বলেন, "The introduction of the niche (mihrab) into the mosque is no doubt rightly ascribed to the Omayyads, who were the first to build mosques of any size under the influence of the Christian architecture of their lands."[১]

মিহ্‌রাব ছাড়া মিনারের প্রবর্তন মদিনা মসজিদকে উমাইয়া আমলে বিশেষ গুরুত্বদান করেছে। আরবী ঐতিহাসিকদের নির্ভরযোগ্য তথ্য থেকে জানা যায় যে, ওমর ইবনে-আব্দুল আযীয মদিনা মসজিদের চার কোণায় চারটি মিনার নির্মাণ করেন। বর্গাকৃতি এই মিনারগুলো প্রস্থে ছিল ৮ হাত এবং উচ্চতায় ছিল ৫০ হাত। অবশ্য অবতলাকার মিহ্‌রাবের মতো মিনার নির্মাণে কোনোপ্রকার নিজস্বতা ও বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করছে না, কারণ ইতিপূর্বে ৬৭৩ খ্রীঃ মুয়াবিয়ার আদেশে মিশরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা মাসলামা ফুসতাতে নির্মিত আমরের মসজিদে সর্বপ্রথম মিনার নির্মাণ করেন। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, আমরের মসজিদের চারটি মিনারের অনুকরণে মদিনায় মসজিদে উমর দ্বিতীয় মিনার সংযোজন করেন।

উমাইয়া যুগে মদিনার সম্প্রসারিত ও পুনর্নির্মিত মসজিদটির একটি তথ্যবহুল বর্ণনা দেন ইবনে যুবায়ের। ১১৮৪ সালে লিপিবদ্ধ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মসজিদের লিওয়ানে (নামাযের স্থান) পূর্ব-পশ্চিমে পাঁচটি, উত্তর রিওয়াকে পাঁচটি এবং পূর্ব রিওয়াকে তিনটি এবং পশ্চিমে চারটি আইল রয়েছে। আব্বাসীয় যুগেও মদিনা মসজিদের সম্প্রসারণ করা হয়। খলিফা মাহ্‌দী এই মসজিদের পরিমাপ বৃদ্ধি করে ৩০০ বর্গহাত করেন ৭৭৫-৮৫ খ্রীঃ। খলিফা মামুন ৮১৩-৩৩ খ্রীঃ এই মসজিদের সংস্কারসাধন করেন। এরপর ১২৫৬, ১২৮৯, ১৪৮৩, ১৪৯৮ ও ১৫৬৬ সালে মদিনা মসজিদের সম্প্রসারণ, সংস্কার ও সৌন্দর্যবৃদ্ধি করা হয়। তুর্কী শাসনামলে এই মসজিদের অঙ্গসৌষ্ঠব এবং অলঙ্করণ বিশেষ তাৎপর্যবহ। রিচমন্ড বলেন, "only a few years after Muhammad's (S.M.) death the primitive mosque that he had founded at Medina gave place to much more architectural and ambitious structures in town and in greater cities as they fell before the Muslim arms."[২]

মদিনার মসজিদ সংস্কার ও পরিবর্ধনের ফলে বর্তমানে এটি অতি সুন্দর ও স্থাপত্যিক দিক থেকে খুবই আকর্ষণীয় মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে। কা'বা শরীফের বায়তু'ল হারামের পরে মদিনার রসূলের মসজিদ প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের

১। Diez, E., Mihrab, in Encyclopaedia of Islam, p. 485.

২। Richmond, Moslem Architecture, London, 1926

আকাঙ্ক্ষিত ও পবিত্র স্থান, যদিও বর্তমানে বিশাল অলঙ্কৃত ও স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল মদিনার মসজিদটিতে অতি সাধারণ ও অনাড়ম্বরতা মসজিদটিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কালের ক্রমবিবর্তনে তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অদ্যাবধি মহানবীর সৃষ্ট ইসলামের প্রথম মসজিদটিতে মসজিদ-স্থাপত্যের অঙ্কুর নিহিত ছিল।

বর্তমান অবস্থা :

৭০৫-৭০৯ খ্রীস্টাব্দে মসজিদু'ন নব্বী মূল ভিত্তির ওপর খলিফা আল-ওয়ালীদ মদিনার যে মসজিদ তৈরি করেন তাতে প্রাচীন কিছু নির্দশন সংরক্ষিত আছে। যে কুঠরিতে রসূলে করীম এবং তাঁর পরবর্তী দু'জন খলিফাকে সমাহিত করা হয় তা দেয়াল দিয়ে ঘেরা হয়েছে এবং মসজিদের একটি অংশ হিসেবে তা এখনও বিদ্যমান। ভক্ত মুসলমানগণ রসূলে আকরামের মাজার জিয়ারত করে পরম তৃপ্তি পান। এমনকি ওমর-ইবনে-আবদুল আযীয কর্তৃক নির্মিত মিহরাবটিও সংরক্ষিত রয়েছে। কাচের মোজাইক দিয়ে মসজিদটির নক্‌শা করা হয়েছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী এই সংস্কার ও অলঙ্করণ অব্যাহত রয়েছে। ১২৫৬ খ্রীঃ অগ্নিদগ্ধ হলে মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে নতুন করে নির্মাণ করতে হয়। কিন্তু ভূমি-পরিকল্পনার কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। ১৪৮১ খ্রীঃ পুনরায় অগ্নিদগ্ধ হলে মামলুক সুলতান কয়েত-বে এই মসজিদটির পুনর্নির্মাণ করেন। মসজিদটিতে একটি বিশাল গম্বুজ নির্মিত হয়। ওসমানী সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের নির্দেশে এই গম্বুজটিকে ১৮৩৯ সালে সবুজ রঙে রঞ্জিত করা হয়। এর পর ১৮৪৮ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত ওসমানী সুলতান আবদুল হামীদ মসজিদটি সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করেন। ১৯৪৮ সালে সৌদি আরবের বাদশা আবদুল আজিজ ইবনে সাউদ এই মসজিদের সম্প্রসারণের একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং এই নক্‌শা অনুযায়ী ১৯৫৩ খ্রীঃ থেকে ১৯৫৫ খ্রীঃ পর্যন্ত মসজিদটির পরিবর্ধন ও সম্প্রসারণ করা হয়। উত্তরদিকে একটি সাহন তৈরি করা হয় এবং এর চারপাশে রিওয়াক নির্মাণে মসজিদটির অসামান্য স্থাপত্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। বস্‌রা মসজিদ, ৬৩৫ খ্রীঃ

মসজিদ-স্থাপত্যের ইতিহাস ইসলামের মূল গতিধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দ্বিতীয় খলিফা হযরত "উমর ইবনু'ল খাত্তাবের শাসনামলকে ইসলামের সম্প্রসারণ যুগ বলা হয়ে থাকে। আরব দেশ থেকে ইসলাম তাঁর সময় আরব দেশে সর্বপ্রথম প্রচারিত হয় এবং সামরিক বিজয়ের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের সামরিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিও সাধিত হয়। ফারগুসন বলেন, "Had the religion been confined to it native land it is probable that no mosques worthy of the name would have been created."[১] ফারগুসন যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে,

---

১। Fergusson quoted by R. P. Spiers in Mahommedan Architecture in Encyclopaedia Britannica, vol. Cambridge, 1910, 11th Edition, p 422.

আরব দেশের মধ্যে যদি ইসলাম সীমাবদ্ধ থাকত এবং আরবভূমির বাইরে সম্প্রসারিত হয়ে বায়জানটাইন ও পারস্য শিল্পকলা ও স্থাপত্যরীতির সংস্পর্শে না আসত তা হলে ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে স্থাপত্য-সৌকর্যের কোনো গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ নির্মিত হত না।

আরব দেশের বাইরে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মিত হয় ইরাকবিজয়ের পর বসরায়। ৬৩৫ খ্রীঃ মুসলমানগণ বসরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে এবং মসজিদকেন্দ্রীক শহর নির্মাণই ছিল তখনকার প্রথা। ঐতিহাসিক বালাজুরীর মতে, কাদেসীয়ার যুদ্ধে জয়লাভের পর বসরা অধিকৃত হলে 'উতবা-ইবনে-গাজওয়ান এই স্থানে একটি অতি সাধারণ ও ক্ষুদ্রাকৃতি মসজিদ নির্মাণ করেন। প্রচলিত অর্থে ইমরাত একটি সুনির্দিষ্ট স্থাপত্য-নিদর্শনকে বোঝায় ; কিন্তু গাজওয়ান এ ধরনের কোনো ইমারত বসরায় নির্মাণ করেননি। তিনি মদিনা মসজিদের রীতি অনুসরণ করে মসজিদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিবেষ্টিত এলাকা নির্ধারণ করেন। এই চিহ্নিত এলাকাটি 'ইখতাতা' নামে পরিচিত। এই পরিবেষ্টিত এলাকাটি একধরনের নলখাগড়া দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কিবলা দক্ষিণমুখী ছিল এবং উত্তরদিকে শাসনকর্তার বাসস্থান বা 'দারুল ইমারা' নির্মিত হয়। ক্রেসওয়েল বলেন যে, সঠিকভাবে সন তারিখ জানা না গেলেও বসরা যে ১৪ হিঃ/৬৩৫ খ্রীঃ মুসলমানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মদিনার মসজিদের পর যে দুটি মুসলিম শহর আরব দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠিত হয় তা হচ্ছে বসরা ও কুফা। কুফা নগরী খলিফার নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত হলেও বসরা নগরীর উত্থান হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুসলিম উম্মার ধর্মীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য।[১]

বসরা মসজিদের পুনর্নির্মাণ করেন সর্বপ্রথম আবু মুসা আল-আশাআরী। ৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে মুসল্লীগণ কোনোরকম ইমারত ছাড়াই খোলা চত্বরে নামায আদায় করতেন। আবু মুসা রোদ্রে পোড়া ইট ও কাদামাটি ব্যবহার করে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের দক্ষিণ বা কিবলার দিকে একটি প্রার্থনাগার বা লিওয়ান তৈরি করেন। মসজিদ ও দারুল ইমারা পুনর্নির্মিত হয়। মসজিদের ছাদ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মজবুত করে তৈরি করা হয় একধরনের গাছের ডাল দিয়ে (উসাব)। মসজিদের সংলগ্ন দারুল ইমারা বা শাসনকর্তার বাসস্থান, কয়েদখানা, খাজাঞ্চিখানা সংযোজিত হলে ধর্মীয় ও ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা মেটানো সম্ভবপর হয় বসরা মসজিদে। 'আবু মুসা বসরার মূল মসজিদের সম্প্রসারণ করে আয়তন বৃদ্ধি করেন। উল্লেখ্য যে, মদিনা মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনার দিকে লক্ষ রেখে বসরা মসজিদের পুনর্নির্মাণ ও সংযোজন করা হয়।

উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মোয়াবিয়ার রাজত্বকালে মসজিদ-স্থাপত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রথম যুগের অতিসাধারণ ও অনাড়ম্বর ইমারতগুলোর পরিবর্তে নতুন ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী নির্মাণ-উপকরণ ও স্থাপত্যশৈলীয় ব্যবহার দেখা যায়। ৬৬৫ খ্রীঃ বসরার গভর্নর নিযুক্ত হয়ে যিয়াদ ইবনে আবিদ বসরার মসজিদের সংস্কারের প্রযোজনীয়তা অনুভব করেন। মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি বসরার মসজিদটির পুনর্নির্মাণ শুরু করেন।

১। Papadopoulo, A. Islam and Muslim Art, Paris, 1976, p. 482, Nos. 608-10.

বালাযুরী উল্লেখ করেন যে, যিয়াদ-ইবনে-আবীহ পোড়া ইট এবং জিপসাম মটার দিয়ে বসরা মসজিদটি সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন। ছাদটি পাঁচসারিবিশিষ্ট মুসাল্লাকে ঘিরে ছিল। স্তম্ভ পাথরের তৈরি ছিল এবং অসংখ্য পাথর আহওয়াজ পাহাড় থেকে সংগৃহীত হয়। মুসল্লীদের নামাযের সময় বিশেষ করে সিজদা দিতে গিয়ে কপালে ধুলাবালি লেগে যেত। এই অসুবিধা দূর করার জন্য যিয়াদ নুড়ি বিছিয়ে মেঝে নতুন করে নির্মাণের আদেশ দেন। নুড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত মেঝে লিওয়ানাটকে নতুন রূপদান করে এবং ক্রমশ মসজিদ-স্থাপত্যের ক্রমবিবর্তনে মদিনার পর বসরা ও কুফা মসজিদ বিশিষ্ট অবদান রাখে। বসরা মসজিদে মিনার স্থাপনের কথা বালাযুরী উল্লেখ করেন। কিন্তু এই তথ্য গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না ; কারণ মাকরীজীর বর্ণনানুযায়ী ইসলামের প্রথম মিনার নির্মিত হয় আমরের ফুসফাত মসজিদে (৬৭৩ খ্রীঃ)।

যিয়াদ বসরা মসজিদের পুনর্গঠনে দারুল-ইমরাকে উত্তর-পূর্বদিক থেকে কিবলার দিকে স্থানান্তরিত করেন। মসজিদের সঙ্গে দারুল-ইমারার সংযোগ করার জন্য একটি প্রবেশপথও নির্মাণ করা হয়।[১]

বসরা মসজিদের গুরুত্ব সম্বন্ধে ক্রেসওয়েল বলেন, "Ziad who was well acquainted with the turbulant spirit of the cities of Iraq, thoroughly realized the political importance of the mosque, that dominating position in which was concentrated at the same time the political and social life of the Arab Empire."[২]

৩। সিরিয়ার প্রাচীনতম মসজিদসমূহ, ৬৩৫-৩৬ খ্রীঃ

উল্লেখ্য যে, ইসলামের প্রথম মসজিদটি বাদ দিলেও বসরা ও কুফাতে যে মসজিদ নির্মিত হয় তা কোনো খ্রীস্টান গির্জার অংশবিশেষ নয় বা গির্জা রূপান্তরিত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ভূমি-নক্শা ও স্থানে বসরা ও কুফা মসজিদ নির্মিত হয়। তবে হযরত উমরের (রাঃ) খিলাফতে ইসলামের সম্প্রসারণ শুরু হলে বায়জানটাইন-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো অধিকৃত হয়। বিশেষ করে হোমস, হামা, আলেপ্পো ও বালাবাক মুসলমানদের দখলে আসে।

খলিফা হযরত উমরের সময় মদিনা প্রজাতন্ত্র বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে এবং সামরিক অভিযানের ফলে ইসলামই আরব দেশের বাইরে প্রসারিতই হল না, সমাজ, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও কায়েমের সূত্রপাত হয়। খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলিমবাহিনী সিরিয়ায় অভিযান করে এবং ৬৩৫ খ্রীঃ দামেস্ক অধিকার করে। এর পর মুসলিম অভিযান দ্রুত ব্যাপকতা লাভ করে এবং পরপর বালাবাক, হিমস্ হামা এবং সিরিয়ায় অন্যান্য শহরগুলো মুসলিম দখলে আসে।

১। Creswell, KAC A, Short Account of Early Muslim Architecture, London,1958 p. 12 (Henceforth referred to as A Short Account.)

২। A Short Account, p. 12

যুদ্ধকালীন অবস্থায় মুসলিম সৈন্যবাহিনীর অগ্রযাত্রার পথে নেহায়েত প্রয়োজনের খাতিরে সিরিয়ায় কতিপয় অমুসলমান বিশেষ করে ভগ্নপ্রায় গির্জার অংশবিশেষ মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, গির্জার অংশবিশেষকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা হল কেন? এর জবাবে বলা যায়, ইমারত নির্মাণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই সম্ভবপর, যুদ্ধকালীন অবস্থায় নয়। দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত গির্জার অংশবিশেষ মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তা প্রায় ক্ষেত্রেই পরিত্যক্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। তৃতীয়ত, যদি কোনো গির্জার অংশবিশেষ নামাযের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাকে মসজিদ না বলে মুসাল্লা বলাই শ্রেয়। চতুর্থত, ক্রেসওয়েলের অভিমত যে, "প্রাথমিক যুগে যখন মুসলমানগণ সিরিয়ার কোনো শহর দখল করেন, তখন তাঁরা গির্জাগুলোর মধ্যে একটিকে দখল করে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করেন অথবা যদি শহরটি বিনা বাধায় দখল করা হয় তখন একটি গির্জাকে বিভক্ত করা হয়।"[১] বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, কারণ, তিনি হিম্‌স, হামা ও আলেপ্পোর গির্জার উল্লেখ করে বলেছেন যে, গির্জার অংশবিশেষ ব্যবহৃত হয়েছিল, সম্পূর্ণ নয়। সুতরাং গির্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করার প্রশ্ন আসছে না। এমনকি পরবর্তীকালে দামেস্কে এবং কর্ডোভাতেও মসজিদ নির্মাণের জন্য কোনো গির্জাকে সম্পূর্ণরূপে দখল করা হয়নি। মুসলমানদের নামায আদায় করা অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য বিধায় প্রয়োজনে এবং নেহায়েত বাধ্য হয়েই কোনো গির্জার অংশবিশেষকে মুসাল্লায় রূপান্তরিত করা হত। ইসলাম পরধর্মসহিষ্ণু এবং অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ নীতিবিরুদ্ধ, সুতরাং দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনায় প্রমাণিত হয় না যে, মুসলমানগণ বলপূর্বক খ্রীস্টানদের ধর্মীয় ইমরাতগুলো দখল করে ব্যবহার করেছেন।

হিমসে মুসলমানগণ সেন্টজন গির্জার এক-চতুর্থাংশে মুসাল্লা নির্মাণ করেন। কারণ গির্জার স্থাপত্যিক গঠন ও নির্মাণকৌশলের সঙ্গে মসজিদের আঙ্গিক ও স্থাপত্যশৈলীর যথেষ্ট ব্যতিক্রম রয়েছে। এ কারণে ইচ্ছা করলেই একটি গির্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা যায় না। বালাযুরীর মতে, আলেপ্পোতে মুসলমানগণ গির্জার অর্ধেক গ্রহণ করে সেখানে নামায আদায় করেন। হিমসের মুসাল্লা নির্মিত হয় ৬৩৬ খ্রীঃ এবং আলেপ্পোতেও একই সময়ে মুসাল্লা গড়ে ওঠে। প্রশ্ন অবশ্য থেকে যায় যে, যেখানে গির্জাগুলো পূর্বমুখী এবং মসজিদের কিবলা দক্ষিণমুখী সেখানে কিভাবে গির্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে মুসলমানগণ প্রয়োজনবোধে জায়া'আতে দক্ষিণে কা'বার দিকে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে গির্জার পশ্চিমদিকের প্রবেশপথ বন্ধ করে উত্তরদিকে প্রবেশ পথ তৈরি করে আইলের (খিলানপথ) বরাবর সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান। ঠিক এ ধরনের ঘটনা গটে ৬৩৬-৩৭ খ্রীঃ হামার মসজিদে।

কূহনেল বলেন যে, ইসলামের সামরিক অভিযান পরিচালনায় এক শতাব্দীর মধ্যে সিরিয়ার বহু গির্জা মসজিদে রূপান্তরিত হয়। সিরিয়ার হামা মসজিদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ইমারতটি খুবই প্রাচীন এবং সম্ভবত একটি পৌত্তলিক মন্দির ছিল। তবে

১। A Short Account, p. 10

তৃতীয় শতাব্দীর এই মন্দিরটি পরবর্তী পর্যায়ে সিরিয়ায় খ্রীস্টান ধর্ম প্রবর্তিত হলে গির্জায় রূপান্তরিত হয়। এই গির্জা নির্মাণের সময় পশ্চিমদিকের প্রাচীর ভেঙে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ নির্মিত হয় এবং পূর্বদিকের খোলা অংশে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। এই পূর্বঅংশেই গির্জার অবিচ্ছেদ্য অংশ apse (অর্ধগোলাকার অবতল মিহরাব)। সুতরাং প্রতীয়মান হবে যে, গির্জাটি প্রাথমিক অবস্থায় একটি পৌত্তলিক মন্দির ছিল যার উপর বায়জানটাইন সম্রাট গির্জা নির্মাণ করেন। ইতিহাসের পরম্পরা বিচারে দেখা যাবে যে, যুগ যুগ ধরে এক-একটি জাতি ধ্বংস হয়েছে এবং এর স্থানদখল করেছে অন্য একটি জাতি। গ্রীক, রোমান, বায়জানটাইন, মুসলিম পর্যায় ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ফল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দামেস্কের জা'মি মসজিদটিও সর্বপ্রথম গ্রীক মন্দির ছিল এবং পরে বায়জানটাইন আমলে খ্রীস্টান গির্জায় পরিণত হয়।[১]

৪। কুফা মসজিদ, ৬৬৮ খ্রীঃ

হযরত উমরের (রাঃ) খিলাফতে ইসলামের যে যুগান্তকারী সম্প্রসারণ শুরু হয় সামরিক অভিযানের মাধ্যমে তার ফলেই আরব ভূখণ্ডের বাইরে বিভিন্ন সময়ে মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে। এই বসতির মূল ভিত্তি ছিল সেনাবাহিনীর ছাউনি বা আল-হিরা। এই আল-হিরার প্রাণকেন্দ্র ছিল মসজিদ। মুসলিম সেনাবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ সা'দ-ইবনে-আবী ওয়াক্কস ৬৩৫ খ্রীঃ কাদেসিয়ার যুদ্ধে পারস্যবাহিনীকে পরাজিত করে পারস্যে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ৬৩৭ খ্রীঃ রাজধানী টেসিফোন বা মা'দাইন সা'দের করতলগত হয়। খলিফার নির্দেশে সা'দইরাকে মুসলিম প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় নির্মিত স্থায়ী বাসস্থান, মসজিদ, সেনাবাহিনীর ছাউনি ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে প্রয়াসী হন।

তাবারীর মতানুসারে, সা'দ সর্বপ্রথম সাসানীয় 'শুভ্র-প্রাসাদে' ('কাসরুল-আবইয়াব') সাময়িকভাবে বসবাস করতে থাকেন। ঐতিহাসিকদের মতে সা'দ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে জুম্মার নামায পড়েন পার্শ্ববর্তী 'কাসরুল আইওয়ানে'। এ দুটি প্রাসাদ পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল, "কাসরু'ল আবইয়াব", মা'দাইনের পুরাতন এলাকায় এবং "কাসরু'ল-আইওয়ান" রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। আব্বাসীয় খলিফা মুকতাফিবিল্লাহ ৯০৫ সালে শুভ্র-প্রাসাদটি ভেঙে নতুন প্রাসাদটির জন্য উপকরণ সংগ্রহ করেন, ফলে উক্ত প্রাসাদটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু অদ্যাবধি সাসানীয় রাজা প্রথম শাহপুর কর্তৃক নির্মিত 'কাসরুল আইওয়ান' (২৪১-৭২ খ্রীঃ)-এর স্থাপত্যকীর্তি ভগ্নাবস্থায়ও অম্লান হয়ে রয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে সা'দ এখানে জুম'আর নামায আদায় করেন, কারণ তখনও মসজিদ নির্মাণ সম্ভবপর হয়নি।

খলিফার নির্দেশে সা'দ হীরার নিকট কুফায় নববিজিত অঞ্চলের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত কুফা নগরীর সুবিধা ছিল

১। Kuhnell, E, The Great Mosque of Hama, in Aus der welt der Islamiche Kunst, Berlin, 1959, pp. 48-49.

নেয়া সম্ভবপর ছিল। সুপরিকল্পিতভাবে নগরী প্রতিষ্ঠার জন্য সা'দ এর প্রাণকেন্দ্র হিসেবে একটি মসজিদ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শহরের সবচেয়ে উঁচু স্থান নির্ধারণ করা হয় এবং খেজুরের দোকানগুলো উঠিয়ে দিয়ে জায়গাটি পরিষ্কার করে এলাকা নির্ধারণ করা হয়।
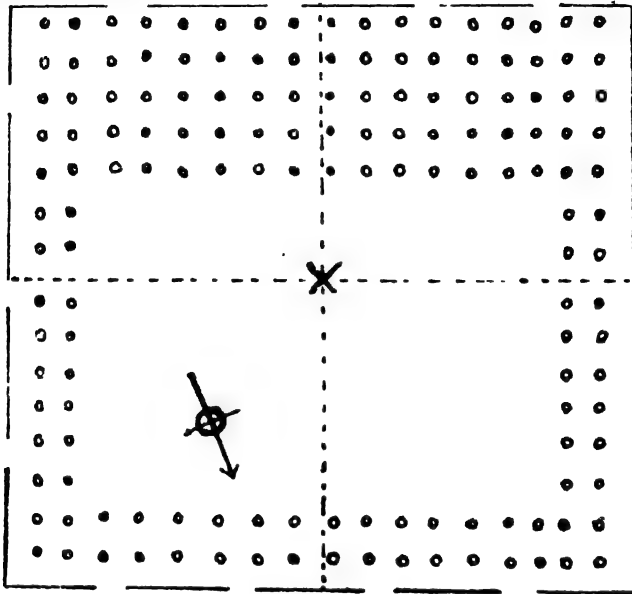
রেখাচিত্র : ৬৭
কুফা, মসজিদ, ভূমি-নক্শা

কুফা মসজিদ ৬৩৮ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। মদিনা ও বসরার মতো এ মসজিদটি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী, কারণ এর সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল এক অদ্ভুত পন্থায়। সা'দ তাঁর একজন বিশ্বস্ত তীরন্দাজকে উঁচু স্থানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে তীর ছুড়তে বলেন। এভাবে প্রতিদিকে দুটি করে তীর ক্ষেপণের দূরত্ব সমানভাবে চিহ্নিত করার ফলে একটি চতুষ্কোণাকার স্থান নির্ধারিত হল। দুটি তীর ক্ষেপণের দূরত্বকে 'গালওয়া' বলা হয়েছে। কুফা মসজিদের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, মদিনা মসজিদের মতো এখানে কোনো প্রাচীর ছিল না। সামরিক প্রথার অনুকরণে কুফা মসজিদের চারিদিকে পরিখা খনন করা হয়। সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে যে, মসজিদটি এক "গালওয়া" অর্থাৎ ২০০ হস্ত পরিমাণ দৈর্ঘ্য। অন্য কথায় সা'দ কর্তৃক নির্মিত কুফা মসজিদের পরিমাণ ছিল ২০০ বর্গহাত।

কুফা মসজিদের একমাত্র উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যিক উপকরণ ছিল দক্ষিণ থেকে ২০০ হাত লম্বা ছাদবিশিষ্ট নামাযঘর, যা 'জুল্লাহ' নামে পরিচিত ছিল। জুল্লাহর নির্মাণকৌশল ছিল খুবই আকর্ষণীয়। খেজুরগাছের কাণ্ডের স্থলে সাদা পাথরের তৈরি স্তম্ভ দ্বারা জুল্লাহ

নির্মিত হয়। বালাযুরীর মতে, পাথরখণ্ড স্থানীয় কোনো পরিত্যক্ত লাখমিদ রাজপ্রাসাদ থেকে আনীত। সম্ভবত আল-হিরার কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারত থেকে উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। জুল্লায় কতটি মার্বেল স্তম্ভের সারি ছিল তা বলা যায় না। তবে মনে হয়, পাঁচটি সারিতে জুল্লাহ বিভক্ত ছিল। তাবারী বলেন যে, জুল্লাহ চারিদিকে উন্মুক্ত ছিল এবং নামাযগাহ থেকে অদূরে "দায়ের হিন্দ" নামে মঠ এবং 'বার জিসয়'[১] নামে শহরের ফটক দেখা যেত।

জুল্লাহর ছাদ কেমন ছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তাবারীর মতে, গ্রীক মন্দিরের মতো ছাদ ছিল। কিন্তু আধুনিক গবেষকরা মনে করেন যে, কুফায় প্রথম মসজিদটি বৈদেশিক কারিগরদের সাহায্য ব্যতিরেকে আরবদের একটি অতি সাধারণ ও অলঙ্কারবিহীন (primitive building) ইমরাত।

অবশ্য ক্রেসওয়েল এই মন্তব্য সমর্থন করেননি। তাঁর মতে, পারস্য কারিগরের নিয়োগ অস্বাভাবিক ছিল না, কারণ প্রাথমিক যুগে আরব দেশের বাইরে গৃহনির্মাণে দক্ষ আরব কারিগরের সংখ্যা খুবই কম ছিল।

ল্যামো বলেন যে, কুফার প্রাথমিক মসজিদটিতে বিশেষ করে ছাদে মোসাইক এবং দেওয়ালচিত্র (fresco) ছিল। ক্রেসওয়েল এই মতের বিরোধিতা করে বলেন যে, কেবলমাত্র ইট এবং পাথরের তৈরি ইমারতেই মোজাইক এবং দেওয়ালচিত্র দ্বারা তৈরি অলঙ্করণ সম্ভবপর। কিন্তু কুফার মসজিদের ছাদ এ ধরনের উপকরণ দ্বারা তৈরি হয়েছিল কিনা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তিনি বলেন যে, সিরিয়ায় অনেক গির্জায় বিশেষ করে এন্টিয়োক এবং আলেপ্পোর মধ্যে অবস্থিত বাসিলিকান গির্জাসমূহের ছাদ নানা ধরনের (gable), অর্থাৎ দীর্ঘ, লম্ব এবং উভয় পার্শ্বে ঢালু কাঠের ছাদ দ্বারা আবৃত ছিল। সুতরাং বলা যায় যে, সা'দ নির্মিত কুফার মসজিদের জুল্লায় ছাদ কাঠের ঢালু 'গ্যাবল' দ্বারা নির্মিত ছিল।

বস্‌রা মসজিদের মতো কিবলার দিকে মসজিদের সংলগ্ন একটি বাসস্থান বা "দারুল ইমারা" নির্মিত হয়। সা'দ-ইবনে-আবী ওয়াক্কাস মসজিদ এবং "দারুল ইমারার" মধ্যবর্তী একটি রাস্তা তৈরি করেন। এই দারুল ইমারার সঙ্গে একটি "বায়তুল মাল" বা কোষাগার ছিল। কোষাগার থেকে ধনসম্পদ চুরি হয়ে গেলে খলিফা উমরের নির্দেশে নিরাপত্তার জন্য মসজিদটি কিবলার দিকে সম্প্রসারণ করে "দারুল ইমারার" সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়।

সা'দের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে কুফা মসজিদের যে নির্মাণকাজ শুরু হয় তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। পারস্য ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম এই মসজিদটি স্থাপিত হয় এবং একথা মনে করা স্বাভাবিক যে, পারস্য কারিগরগণ একাজে নিয়োজিত ছিলেন। নলদেকে যে পারস্য স্থপতির নাম উল্লেখ করেন তিনি হচ্ছেন রুজবিহ ইবনে বুযুর্গমিহর। তিনি হামদানবাসী একজন ভূস্বামী বা দিহকান। সা'দের জন্য তিনি 'দারুল ইমারা' বা শাসনকর্তার বাসস্থান নির্মাণে অংশগ্রহণ করেন এবং মসজিদ ও বাসস্থান দুটি সম্প্রসারণ ও

১। E. M. A. pp. 17-18.

সংযোজনেও তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়। সা'দের বাসস্থান নির্মাণে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগৃহীত হয় হীরার নিকটবর্তী একটি পারসিক ভগ্ন প্রাসাদ থেকে। ধ্বংসপ্রাপ্ত এই প্রাসাদের পোড়া ইট সা'দের বাসভবনে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রেসওয়েল সা'দের কুফা মসজিদ সম্বন্ধে বলেন, "It is important to observe that already at this early date we have a group a square mosque with Governor`s residence built against its qibla side which we still see persisting for more than two centuries although derived from two trivial facts, viz the marking out of the mosque by arrow-casts and a burglary."[১]

যিয়াদ কর্তৃক পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ

৬৩৮ খ্রীঃ সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস কর্তৃক নির্মিত কুফার অতি সাধারণ ও অনাড়ম্বর মসজিদটি উমাইয়া যুগে একটি সম্পূর্ণ নতুন বৃহদাকায় ও অনিন্দ্যসুন্দর ইমারতে রূপান্তরিত হয়। বালাযুরী এবং তাবারী যিয়াদের সম্প্রসারিত কুফা মসজিদের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। ৬৭০ খ্রীঃ শাসনকর্তা যিয়াদ-ইবনে-আবিহ্ বসরার মতো কুফা মসজিদের সংস্কার ও সম্প্রসারণের সূচনা করেন। পরিবর্তিত সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ এবং ক্রমবর্ধমান মুসলিম উম্মার জন্য প্রশস্ত নামাযঘর বা যুল্লাহ প্রয়োজন হয়ে পড়ে, এ কারণে যিয়াদ কুফা মসজিদের পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় কারিগর ও স্থপতিদের ডেকে তাঁর পরিকল্পনার কথা বলেন এবং মসজিদের বর্তমান অবস্থায় ছাদের উচ্চতাবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। তিনি একটি বিশালাকার, সুন্দর ও সুউচ্চ ইমারত নির্মাণের বাসনা প্রকাশ করেন, যা তৎকালীন যুগে হবে অদ্বিতীয়। তাঁর পরিকল্পনায় সাড়া দেন পারস্যের সাসানীয়দের যুগের একজন দক্ষ স্থপতি। এই স্থপতি অবশ্য রিচমন্ড কর্তৃক উল্লেখিত রুজবিহ্ নয়। পারস্যের এই স্থপতি বলেন যে, শাসনকর্তার চাহিদামাফিক মসজিদটি পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারিত হলে অসংখ্য পাথর প্রয়োজন হবে। যিয়াদের নির্দেশে আহওয়াজ পাহাড় থেকে অগণিত প্রস্তরখণ্ড আনা হয়। স্থপতির তত্ত্বাবধানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের মাঝখানে ছিদ্র করে একটির সঙ্গে অপর একটির সংযোগ করা হয় সীসা ও লোহার একধরনের পিনের সাহায্যে। সমগ্র জুল্লাহ ৩০ ফুট উঁচু। এ ধরনের অসংখ্য স্তম্ভ দ্বারা এটি পুনর্নির্মিত হয়। ক্রেসওয়েলের মতে, এ ধরনের নির্মাণকৌশল পিছনে অর্থাৎ উত্তরদিকে এবং দুপাশে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম চত্বরকে ঘিরে পরিলক্ষিত হয়। যিয়াদ গর্বভরে বলেন যে, কুফার পুনর্নির্মিত প্রতিটি স্তম্ভের জন্য খবচ পড়ে ১৮০০ দিরহাম। তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে স্থপতিকে বলেন যে, তিনি ঠিক এ ধরনের ইমারতই চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করতে পারেননি।

কুফা মসজিদটি পরিধি ও সুষমায় অতুলনীয় ছিল এবং এটি দর্শকদের স্তম্ভিত করে দিত। মুকাদ্দেসী[২] বলেন যে,"মসজিদটি পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল এবং সুউচ্চ স্তম্ভরাজি

১। E M. A. p. 18.
২। See EMA, p. 36.

দ্বারা নির্মিত হয় এবং খুবই সুষমামণ্ডিত ছিল।" ১১৮৪ খ্রীঃ স্পেনের বিখ্যাত মুসলিম পরিব্রাজক ইবনে জুবাইর এই মসজিদটি পরিদর্শন করেন এবং একটি নির্ভরযোগ্য ও তথ্যবহুল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর ভাষায়, "এই মসজিদটির কিবলার দিকে পাঁচটি ও অপরদিকে দুটি সারি ছিল। সারিগুলো মাস্তুলের ন্যায় স্তম্ভের উপর ন্যস্ত ছিল। সীসা দ্বারা সংযুক্ত পরপর অসংখ্য পাথরের তৈরি ছিল এই স্তম্ভগুলো। কোনোপ্রকার খিলানের ব্যবহার দেখা যায় না। এই সমস্ত উঁচু স্তম্ভগুলো মসজিদের ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। এত দীর্ঘ অথচ সুউচ্চ ছাদবিশিষ্ট মসজিদ আমি ইতিপূর্বে কোথাও দেখিনি।"[১]

কুফা মসজিদের রিওয়াক নির্মাণ প্রসঙ্গে সুনিশ্চিতরূপে বলা যায় না। সা'দ-এর মসজিদে এ উপকরণ ছিল না এবং যিয়াদ এই মসজিদটি পুনর্নির্মাণকালে এ উপকরণ সংযোজন করেছেন বলেও মনে হয় না। কারণ দ্বাদশ শতাব্দীতে ইবনে জুবাইয়েরের বর্ণনা অনুযায়ী অষ্টম শতাব্দীতে যিয়াদ যে রিওয়াক তৈরি করেন তা যুক্তিসংগত নয়।

কুফা মসজিদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে রিভয়রা বলেন যে, ভূমি-পরিকল্পনা ব্যবহার করে রসূলুল্লাহ মদিনায় যে মসজিদ নির্মাণ করেন তা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে কুফার মসজিদে। এই ধরনের মসজিদে প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গন ও সমান্তরাল ছাদবিশিষ্ট ও উঁচু স্তম্ভের উপর নির্মিত বিশাল জুল্লাহ রয়েছে। ক্রেসওয়েলের মতে, "কুফা মসজিদের সুষমামণ্ডিত ও সুউচ্চ জুল্লাহটি পারস্যের প্রাচীন স্তম্ভসম্বলিত প্রাসাদের (Hall of Columns) অনুকরণে নির্মিত। স্থাপত্যের পরিভাষায় এই পরিকল্পনার নাম apadana. পারস্যের অ্যাকামেনীয় স্থাপত্যরীতির, যা প্যাসিপোলিসে দেখা যাবে, অনুকরণে প্রস্তরস্তম্ভগুলো খুবই উঁচু ও সমান্তরাল এবং কাঠের ছাদকে ধারণ করে রেখেছে।"[২]

কুফার আদি এবং পুনর্নির্মিত মসজিদে কোনো মিনার, মিহরাব অথবা মিমবার ছিল কিনা সঠিকভাবে বলা যায় না। এই কারণে ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে রসূলুল্লাহর মদিনা মসজিদ পরবর্তীকালের অতি সাধারণ অনাড়ম্বর ও চতুষ্কোণাকায় চত্বরবিশিষ্ট (Courtyard type), মসজিদের ক্রমবিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মদিনা ও বসরার মসজিদ দুটির তুলনায় কুফার মসজিদটি কয়েকটি কারণে ব্যতিক্রমধর্মী এই জন্য যে, এখানে সর্বপ্রথম মসজিদটি প্রাচীরের পরিবর্তে পরিখা দ্বার বেষ্টিত ছিল ; ছাদ অপর দুটির ছাদ অপেক্ষা উঁচু ও সে কারণে এটি ছিল স্থাপত্যিক সম্ভাবনাময়। বসরা ও কুফার মসজিদ দুটিতে মুসলিম স্থাপত্যের সূত্রপাত হয়। কারণ পূর্বের ইমারতগুলোতে স্থায়ী উপাদানে নির্মিত হয়নি এবং স্থাপত্যিক রীতিকৌশল, ভারসাম্য, সৃজনশীলতা, কারুশিল্পের দক্ষতা প্রকাশ পায়নি। মার্বেলের ব্যবহার এই দুই মসজিদকে ব্যাপকতা দিয়েছে। লেখক তাঁর এক গ্রন্থে বলেছেন, "The mosque of Kufa is perhaps the earliest known example of the use of materials taken from non-muslim buildings. These included re-used columns of Persepolitan type, taken from the ruins of the Lakhmids at Hira."[৩] বসরা ও কুফা

১। A Short Account, p 13

২। ibid, p. 13.

৩। Hasan, S.M., Mosque Architecture of pre-Mughal Bengal, Dacca, 1970 p 18

মসজিদের গুরুত্ব সম্বন্ধে ক্রেসওয়েল বলেন, "The first mosques to be worthy of the name of architecture are the second Great Umayyad Mosques at Basra (A.D. 665) and Kufa (A.D. 670)."[১]

৫। ফুসতাত মসজিদ, ৬৪২ খ্রীঃ

সিরিয়া ও পারস্যবিজয়ের পর ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের (রাঃ) ইসলামের সম্প্রসারণের নীতি অনুসারে মিশরে অভিযান প্রেরিত হয়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজনেই তিনি সম্প্রসারণের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন আমর-ইবনু'ল আস। ৬৪০ খ্রীঃ হেলিওপলিসের যুদ্ধে বায়জানটাইন সৈন্যবাহিনী মুসলিমবাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করলে ব্যাবিলন ও আলেকজান্দ্রিয়া মুসলিমবাহিনীর অধিকারে আসে। ৬৪১ খ্রীঃ ৮ই নভেম্বর আলেকজান্দ্রিয়া অধিকৃত হলে এই শহর মুসলমানদের একটি শক্তিশালী সামরিক ও নৌবহরের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। মিশরে মুসলিমপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে সেনাপতি আমর ৬৪২ খ্রীঃ বর্তমান কায়রো নগরীর সন্নিকটে আল-ফুসতাত শহরের পত্তন করেন।

সেনাপতি ও মিশরের শাসনকর্তা আমর-ইবনু'ল আল-ফুসতাত নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই শহরের প্রাণকেন্দ্র ছিল একটি জা'মি মসজিদ। এই মসজিদটি সম্পূর্ণ নতুন ভূমির উপর নির্মিত। মদিনা, কুফা ও বসরার আদি মসজিদের মতো এটি অতি সাধারণ ও অনাড়ম্বর ইমারত ছিল। ফুসতাত মসজিদটির কতকগুলো উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রথমত, পূর্বের আদি মসজিদসমূহের মতো ফুসতাত মসজিদটি চতুষ্কোণাকার ছিল না, আয়তাকার ছিল। আয়তনেও ছিল খুব ক্ষুদ্রাকৃতি, পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ৫০ হাত এবং প্রস্থে ৩০ হাত : রোদ্রে পোড়া ইট দিয়ে দেওয়াল তৈরি করা হয়। মদিনা মসজিদের মতো ফুসতাত মসজিদের ছাদ খেজুরপাতা ও কাদামাটি দিয়ে নির্মাণ করা হয়। খেজুরগাছের কাণ্ড মসজিদের ছাদটিকে বহন করছে। মেঝে নুড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। মসজিদে প্রবেশের জন্য কিবলা ব্যতীত অন্য তিনদিকে দুটি করে মোট ছয়টি প্রবেশপথ ছিল। কোনো অবতল মিহরাব ছিল না, তবে অনেক ঐতিহাসিক একটি মিহরাবের কথা উল্লেখ করেন। মসজিদের দেওয়ালে কোনোপ্রকার পলেস্তারা করা ছিল না।

'আমর ইবনু'ল আস-ফুসতাত মসজিদের একটি বাসস্থান নির্মাণ করেন। কুফা ও বসরা মসজিদের মতো এই মসজিদের পার্শে দারুল ইমারা ছিল। মসজিদের উত্তর-পূর্ব প্রাচীরের অদূরে বাসস্থান নির্মিত হয়। ফুসতাত মসজিদ প্রথম যুগের মসজিদ-স্থাপত্যে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

Gertrude Bell বলেন যে, "The primitive mosques of Madina, Basra, Kufa and Fustat as approximating to the primitive Arab unadorned architecture of sun-dried bricks and palm trunks."[২]

১। EMA., p. 33 n 1.2 3.
২। Bell, G. Palace and Mosque of Ukhaidır, Oxford, 1914 p. Intro p. 60.

আমর-এর ফুসতাত মসজিদ আয়তাকার পরিধি, মসৃণ আচ্ছাদিত লিওয়ান, মিহরাবের ব্যবহার প্রভৃতির জন্য মসজিদের ক্রমবিবর্তনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ৬৪২ খ্রীঃ নির্মিত ফুসতাতের অতি সাধারণ, অলঙ্কারবিহীন মসজিদটি পরবর্তী-কালের বিশালাকায় ও সুষমামণ্ডিত মসজিদের একটি ভিত্তিভূমি বা nucleus ছিল।

হযরত উছমানের (রাঃ) খিলাফতে সংস্কার :

ফুসতাতে নির্মিত আদি মসজিদে যুগ যুগ ধরে সংস্কার, পুনর্নির্মাণ, সংযোজন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়। ৬৪১-৪২ সালে আমর যে মসজিদ নির্মাণ করেন তা খুব
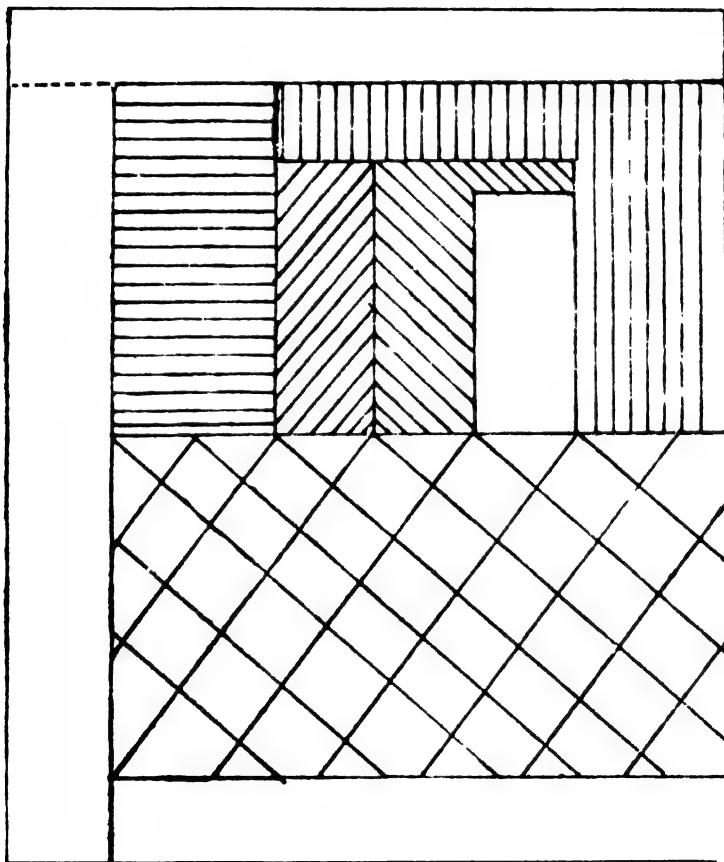
রেখাচিত্র : ৬৮

০ আদি মসজিদ ৬৪২ খ্রীঃ
০ মাসলামার সম্প্রসারণ,৬৭৩ খ্রীঃ
০ আবদুল আজিজের সম্প্রসারণ, ৬৯৬৯৭ খ্রীঃ
০ আল-ওয়ালিদের সম্প্রসারণ, ৭০৮-৯ খ্রীঃ
মাহদীর সম্প্রসারণ, ৭৮৫ খ্রীঃ
আল-মামুনের সম্প্রসারণ, ৮২৭ খ্রীঃ

আকর্ষণীয় না হলেও স্থাপত্যিক উপকরণের প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ইমারত বলা যায়। এই মসজিদে হযরত উছমানের (রাঃ) খিলাফতে একটি মিমবার সংযোজিত হয়। মদিনার মসজিদে মিমবার ছিল এবং এর অনুকরণে ইমামের খুৎবাপাঠের সুবিধার্থে ফুসতাতের মসজিদে মিমবার নির্মিত হয়। নুবিয়ার খ্রীস্টান রাজা মারকানা হযরত উছমানের খিলাফতে মিশরের গবর্নর আবদুল্লাহ ইবনে সা'দকে (৬৪৪–৫৬ খ্রীঃ) উপহারস্বরূপ এই মিমবারটি প্রদান করেন। মিমবারটি ফুসতাত মসজিদে সুষ্ঠুভাবে স্থাপনের জন্য একজন কপটিক দক্ষ কারিগর প্রেরণ করেন। বোকতায় নামে এই কারিগর মিমবার নির্মাণে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, হযরত উমরের (রাঃ) খিলাফতে আমর ইবনে আল-আস ফুসতাত মসজিদে একটি মিমবার স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু খলিফা এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এই মনে করে যে, মিমবার ব্যবহার করার অধিকার থাকবে একজন খলিফার যিনি সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। তা ছাড়া মিমবার বেদী বা সিংহাসন হিসেবে পরিগণিত হয়ে হয়ত রাজতন্ত্রের ঘটনা ঘটতে পারে, একথা চিন্তা করেই হযরত উমর (রাঃ) মদীনা মসজিদের বাইরে মিনবার নির্মাণ নিষিদ্ধ করেন। অবশ্য খলিফা উছমানের (রাঃ) শাসনামলে এই বিধি-নিষেধ না থাকায় আরব দেশের বাইরে ইসলামের প্রথম শতাব্দীতেই মিমবার নির্মিত হয়। এই মিমবার অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে অক্ষত অবস্থায় ছিল, কিন্তু উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালীদের খেলাফতকালে মিশরের শাসনকর্তা কুররা ইবনে শারীক (৭০৯-১৪ খ্রীঃ) এই মিমবারটির স্থলে একটি নতুন মিমবার নির্মাণ করেন। আরব ঐতিহাসিকদের ভাষ্য অনুযায়ী কুরার ঐ মিমবারটি ফুসতাতের একটি গির্জা থেকে আনা হয়। উল্লিখিত মিমবারটি সম্ভবত সাসকারায় কুইবেল কর্তৃক আবিষ্কৃত ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত আপা জেরিমিয়াস মঠের বেদী হিসেবে ক্রেসওয়েল চিহ্নিত করেন।[১]

মাসলামা কর্তৃক পুনর্নির্মাণ, ৬৭৩ খ্রীঃ :

মিশরে নিযুক্ত শাসনকর্তা মাসলামা ফুসতাত মসজিদের পুনর্নির্মাণ, সংযোজন ও পুনর্গঠনে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। উমাইয়া খলিফা মু'য়াবিয়ার শাসনকালে মিশরে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ইসলামের ধর্মীয় ও সামরিক সম্প্রসারণে অনারব এলাকায় মুসলিম সমাজে কৃষ্টি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ হতে থাকে। শাসনভার গ্রহণ করার পর স্থানীয় মুসলমানগণ মাসলামার কাছে আবেদন করেন যে, গত বত্রিশ বছরে ফুসতাত মসজিদের কোনো সম্প্রসারণ হয়নি এবং ক্রমবর্ধমান মুসল্লীদের নামাযের স্থান সংকুলান না হওয়ায় মাসলামা এই মসজিদটির পুনর্নির্মাণের একটি বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। খলিফা মুয়াবিয়ার নির্দেশে এই সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন হয়। প্রথমে মাসলামা মসজিদটির উত্তর-পূর্বে আমরের বাসস্থানের দিকে এবং উত্তর-পশ্চিমে সম্প্রসারণ করেন। সম্প্রসারণ কাজ অগ্রগতির ফলে উত্তর-পশ্চিমদিকে একটি চত্বর (রাহবা) নির্মাণ করেন এবং এটি মসজিদের সংলগ্ন ছিল। ক্রেসওয়েল বলেন যে, আরব ঐতিহাসিকেরা মাসলামার সম্প্রসারিত মসজিদের সম্পূর্ণ পরিমাণ উল্লেখ

১। EMA, p

করেননি; তবে ধারণা করা যায় যে, উত্তর-পূর্বদিকে দার আল-ইমারা থাকায় মাসলামার পক্ষে ঐদিকে সম্প্রসারণ খুব বেশি করা সম্ভবপর হয়নি। এ ছাড়া মাসলামা দেওয়াল পলেস্তারা এবং নুড়ি বিছানো মেঝের উপর মাদুর দিয়ে ঢেকে দেবার নির্দেশ দেন।

দেওয়ালের পলেস্তারা সম্পর্কে করবেট বলেন যে, মাসলামার মসজিদে যে প্রবণতা দেখা যায় তা হচ্ছে খাঁজকাটা একধরনের নক্‌শা যা Stucco নামে পরিচিত। অবশ্য ক্রেসওয়েল অষ্টম শতাব্দীতে মিশরে এ ধরনের Stucco-র ব্যবহার আদৌ হয়েছিল কিনা নিশ্চিত করে বলা যায় না, বলে মন্তব্য করেছেন।[১]

মাসলামা ফুসতাতের মসজিদে সর্বপ্রথম মিনারের প্রবর্তন করেন। মসজিদ স্থাপত্যে মিনারের ব্যবহার অভিনব এবং তাৎপর্যপূর্ণ। মাকরিযি বলেন যে, খলিফা মুয়াবিয়ার আদেশে মাসলামা সর্বপ্রথম ফুসতাতের মসজিদের চার কোণায় চারটি সাওয়ামের (মিনার) নির্মাণ কবেন। তিনি বলেন, "তিনি প্রথম এই মসজিদে সাওয়ামে নির্মাণ করেন এবং তাঁর পূর্বে আর কেউ এ ধরনের উপকরণ ব্যবহার করেননি। ক্রেসওয়েল সাওয়ামেকে মিনার বলে বর্ণনা দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, মাকরিযি মিনারকে "সাওয়ামে" বলেছেন এবং একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, দুটি পৃথক সংস্থা হলেও অর্থ একই। ক্রেসওয়েল মিনারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে বলেন যে, মিনার বা সাওয়ামে আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন আলোকস্তম্ভ "pharos" -এর অনুকরণে নির্মিত হয়নি বরং উমাইয়া মসজিদের প্রাচীন গ্রীক গির্জার চার কোণায় চারটি বুরুজ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ফুসতাতের মসজিদে সাওয়ামে নির্মিত হয়েছে।[২] করবেট বলেন যে, সাওয়ামে প্রহরীদের একধরনের প্রকোষ্ঠের মতো "Sentry box perched on the roof at each corner, the germ of the future gracefully pointing."[৩] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, "সাওয়ামে" ফকির-দরবেশদের চার কোণাকার এক ধরনের চিল্লাখানা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে সিরিয়ার নির্মিত সকল গির্জা এবং মিনার তৈরি হয়েছিল এবং উত্তর আফ্রিকাব যত মিনার নির্মিত হয়েছিল, তার সবই চতুষ্কোণাকার। সিরিয়া থেকে উদ্ভূত চতুষ্কোণাকার মিনার কেবলমাত্র মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় নয়, সুদূর স্পেনেও এর প্রভাব দেখা যাবে। সুতরাং বলা যায় খলিফা মুয়াবিয়ার শাসনকালে ফুসতাত মসজিদের সম্প্রসারণ এবং মসজিদ-স্থাপত্যের নতুন উপকরণ সংযোজন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আবদুল আজিজের সম্প্রসারণ (৬৯৬-৯৭ খ্রীঃ) :

খলিফা আবদুল মালেকের শাসনকালে প্রাদেশিক শাসনকর্তা আবদুল আজিজ প্রয়োজনের খাতিরে ফুসতাত মসজিদের পরিসর বৃদ্ধি করেন। তিনি মসজিদের সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এই সম্প্রসারণ উত্তর-পশ্চিমদিকে করা হয়।

১। EMA, p. 3.

২। Creswell, K.A.C., The evolution of the Minaret with special reference to Egypt, Burlington Magazin No cclxxvi. loe,XLVIII, March, 1926 p 137.

৩। ibid. p. 37.

আল-ওয়ালীদের খিলাফতের সম্প্রসারণ :

খলিফা আল-ওয়ালীদের শাসনামলে ফুসতাত মসজিদের সংস্কার করা হয়। সর্বপ্রথম সংস্কার ও পুনর্নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মালেক। তিনি ৭০৮-৯ খ্রীস্টাব্দে মসজিদের নিচু ছাদ উঁচু করে ইমারতটিকে নতুন রূপ দান করেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ সম্প্রসারণ ও রূপান্তর পরিলক্ষিত হয় ৭১১-১২ খ্রীস্টাব্দে। কুররাহ ইবনে শারীক সম্পূর্ণরূপে নতুন আঙ্গিক ও পরিকল্পনায় ফুসতাতে মসজিদের সম্প্রসারণে ব্রতী হন। তিনি পুরাতন মসজিদটি ভেঙে সম্পূর্ণরূপে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। ৭১১ খ্রীস্টাব্দে ইয়াইয়া ইবনে হানজালার তত্ত্বাবধানে সর্বপ্রথম উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত হয়। এই সম্প্রসারণের কাজ এক বছর ধরে চলে এবং ৭১২ খ্রীস্টাব্দে সমাপ্ত হয়। উত্তর-পূর্বদিকে আমরের বাসস্থান থাকায়, এর কিছু অংশ ভেঙে সম্প্রসারণ করতে হয় এবং ক্রেসওয়েলের বর্ণনা অনুযায়ী, আমরের বংশধরদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এই মসজিদে সর্বপ্রথম দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ করেন কুররাহ ইবনে শারীক। তিনি এই মসজিদে অন্যতম অবদান রেখেছেন একটি সুন্দর নিখুঁতভাবে নির্মিত অবতল মিহরাবে (concave mihrab)। মসজিদ-স্থাপত্যের ইতিহাস কুররাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফুসতাতের অবতল মিহরাবটি দ্বিতীয় উদাহরণ, প্রথমটি ওমর-বিন-আব্দুল আজিজ কর্তৃক মদিনা মসজিদ সম্প্রসারণকালে নির্মিত হয়। কুররাহ মক্কা শরীফের দিকে মসজিদের কিবলা নির্ধারণের যে ভুলত্রুটি ছিল তা সংশোধন করেন। ক্রেসওয়েলের মতে, কুররাহ আমর মসজিদের পূর্বের সমান্তরাল (flat) মিহরাবের সঙ্গে অবতল মিহরাবের পার্থক্য সৃষ্টির জন্য আমরের মিহরাবটির উভয় পাশে অবস্থিত স্তম্ভের শীর্ষ (Capital) সোনা দ্বারা মুড়িয়ে দেন। কুররাহ কর্তৃক সম্প্রসারিত আমরের মসজিদটিতে সর্বমোট এগারোটি প্রবেশপথ ছিল ; উত্তর-পূর্বদিকে চারটি, দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে চারটি এবং উত্তর-পশ্চিমদিকে তিনটি। দক্ষিণ-পূর্বদিকে কিবলা প্রাচীর থাকায় কোনো প্রবেশপথ ছিল না। ৭১৮ সালে ফুসতাত মসজিদে একটি বায়ত আল-মাল নির্মিত হয়। এই কোষাগারের নির্মাতা সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে। কেউ মনে করেন যে, কুররাহ ইবনে শারীক, কেউ বলেন, উসামা ইবনে যায়েদ-আত-তানুখী। ঐতিহাসিকদের ধারণা, দামেস্কের জা'মি মসজিদে যে ধরনের বায়তুল মাল নির্মিত হয় ফুসতাতের মসজিদেও অনুরূপ আকারের একটি কোষাগার তৈরি করা হয়।

আব্বাসীয় যুগের সম্প্রসারণ :

উমাইয়া যুগের পূর্বে আব্বাসীয় খিলাফতের আবির্ভাব হলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ইসলামের নব-দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠিত হলে স্থাপত্যশিল্পের এক যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মাহদীর খিলাফতকালে ৭৮৫ সালে সালেহ ইবনে আলী ফুসতাতের জা'মি মসজিদের সম্প্রসারণ করেন। উত্তর-পশ্চিমদিকে চারসারি স্তম্ভ সংযোজন করে সম্প্রসারণ করা হয় এবং এর ফলে আমরের মূল মসজিদটির আয়তন বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এই সম্প্রসারণ-কাজের সুবিধার্থে উত্তর-পূর্বদিকের দেওয়ালের কিছু অংশ ভেঙে ফেলতে হয়। সম্প্রসারিত অংশে সালেহ

"বাবুল কোহল" নামে একটি নতুন প্রবেশপথ সংযোজন করেন। এর ফলে উত্তর-পূর্বদিকে প্রবেশপথের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচে।

ফুসতাত মসজিদের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হল এর দক্ষিণ-পশ্চিমে বিশাল এলাকা জুড়ে সম্প্রসারণ। খলিফা আল-মামুনের শাসনকালে মিশরের আবদ আলমাছ ইবনে তাহির ৮২৭ সালে মসজিদটির পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেন। মসজিদটিকে একটি অনিন্দ্যসুন্দর ও আকর্ষণীয় ইমারতে পরিণত করা ছাড়াও এর অতুলনীয় সৌষ্ঠব এবং বিশালাকার আয়তন ইসলামী স্থাপত্যকলার একটি অনবদ্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। উত্তর-পশ্চিমদিকে সম্প্রসারণের ফলে পূর্বের তুলনায় ফুসতাত মসজিদের আয়তন দ্বিগুণ হয় এবং পরিমাপ ছাড়াও ১৯০ × ১৫০ হাত। মাকরিযির মতে, ইবনে তাহির কর্তৃক সম্প্রসারিত এলাকায় মসজিদের সর্ববৃহৎ মিহরাবটি নির্মিত হয় এবং স্তম্ভের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭৮টিতে দাঁড়ায়। এই বিশালাকার মসজিদটিতে প্রবেশপথ ছিল মোট তেরোটি এবং ইমাম বা খতিবের প্রবেশের জন্য কিবলার দিকেও একটি ক্ষুদ্র প্রবেশপথ ছিল। ক্রেসওয়েল ফুসতাতের সম্প্রসারিত মসজিদের বর্ণনা দেন, "The Mosque of Amr, as finally enlarged by 'Abd Allah ibn Tahir, consisted of a vast but irregularly marked out area, roughly 110 m (361 ft) wide and 120m (394 ft) deep, surrounded by a brick wall as little over 9m ($29^1/_2$ ft) high."

পরবর্তী পর্যায়ে ৮২৭ থেকে ১১৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে জিয়াদা বা বহিঃচত্বর সংযোজিত হয়। মসজিদ স্থাপত্যশৈলীর ক্রমবিকাশে ফুসতাত মসজিদের অবদান অনস্বীকার্য। ফুসতাত মসজিদে সর্বপ্রথম আয়তাকার ভূমি-পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়। পূর্বের মদিনা, বসরা ও কুফা মসজিদগুলো চতুষ্কোণাকার ছিল; দ্বিতীয়ত, এই মসজিদে সর্বপ্রথম মিনারের সংযোজন দেখা যায়। সিরিয়ার প্রাক্-মুসলিম ইমারতের বুরুজ থেকে অনুপ্রাণিত হলেও মিনার মসজিদ-স্থাপত্যে স্বীয় ঐতিহ্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে চতুষ্কোণাকার মিনারের বিবর্তনে বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলীয় ইসলামী ভূখণ্ডে অসামান্য ভূমিকা পালন করে; তৃতীয়ত, ফুসতাতের মসজিদ একটি ব্যতিক্রমধর্মী ধর্মীয় ইমারত। সাধারণত মসজিদের চত্বরবিশিষ্ট (Courtyard) ভূমি-পরিকল্পনা প্রায় সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত হলেও, ফুসতাতের মসজিদে কোনো চত্বর বা অঙ্গন দেখা যায় না; চতুর্থত, প্রথমযুগে চ্যাপটা (flat) মিহরাব থাকলেও মদিনা মসজিদের মতো অবতল মিহরাব সংযোজন করা হয়। এর ফলে অবতলাকার মিহরাবের বিবর্তনে এবং সম্প্রসারণে ফুসতাত মসজিদ বিশেষ ভূমিকা পালন করে; পঞ্চমত, ফুসতাতের মসজিদ শুধু ঐতিহাসিক ইমারতই নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রমবিবর্তনের স্বাক্ষর বহন করে রয়েছে। এই বিশালাকার মসজিদটির ইতিহাস ৬৪২ থেকে ১২৯৮ খ্রীস্টাব্দে পর্যন্ত সুবিস্তৃত অর্থাৎ মামলুক যুগেও এই মসজিদের সংস্কার, অলঙ্করণ ও রূপান্তর অব্যাহত থাকে।

৩

উমাইয়া যুগ

(৬৬১–৭৫০ খ্রীঃ)

১। কায়রোয়ান মসজিদ (৬৭৪-৭৫ খ্রীঃ) (চিত্র : ১–৫)

উকবার মসজিদ :

উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মু'য়াবিয়ার শাসনকালে উকবা ইবনে নাফি উত্তর আফ্রিকা জয় করেন। রোমানদের পরাজিত করে তিনি তিউনিসের দক্ষিণে ক'য়রোয়ান নামে একটি স্থানে সামরিক ছাউনি স্থাপন করেন। এই সামরিক শহরের প্রাণকেন্দ্র ছিল একটি মসজিদ। সেনাবাহিনী এবং জনসাধারণের নামাযের সুবিধার্থে এই জা'মি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। ৬৭০ সালে কায়রোয়ান শহরের গোড়াপত্তন করা হয় এবং শাসনভার গ্রহণ করার পরেই উকবা মসজিদনির্মাণে উদ্যোগী হন। বালাযুরীর মতে, উকবা মাটির উপর মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনা চিহ্নিত করার পর নতুনভাবে ভিত্তি করে মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয় ৬৭৪-৭৫ খ্রীঃ। উকবা কর্তৃক নির্মিত কায়রোয়ান মসজিদটি ইসলামের প্রথম যুগের মসজিদগুলোর মতো ছিল খুব সাধারণ, অনাড়ম্বর এবং সাদামাটা। ৭০৩ খ্রীঃ বার্বার বিদ্রোহের সময় মূল মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে উকবার আদি ইমারতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না এবং মূল পরিকল্পনা ও উপকরণ কি ছিল তা জানা যায় না। তবে মনে হয় চতুর্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত এবং কিবলামুখী লিওয়ানসম্বলিত একটি মসজিদ থাকাই স্বাভাবিক। প্রথা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কিবলার দিকের বিপরীতে দার-আল-ইমারা নির্মিত হয়।

হাসান বিন-নুমানের সংস্কার :

খলিফা আবদুল মালিকের শাসনকালে বার্বারগণ কেন্দ্রীয় উমাইয়া সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উত্তর আফ্রিকা বিজেতা 'উকবা ইবন নাফি' ৬৮৩ খ্রীঃ হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য আবদুল মালিক জুহাইরের নেতৃত্বে যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন তাও বার্বার ও বায়জানটাইনদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়। শত্রুদের সমুচিত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে খলিফা ৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে হাসান ইবনে নুমানের নেতৃত্বে এক বিশালবাহিনী প্রেরণ করেন। বার্বার বিদ্রোহে উকবা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি বিধ্বস্ত হলে ৭০৩ খ্রীঃ এর পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়। প্রাচীন মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে

ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় হাসান নতুনভাবে ভিত্তিভূমি থেকে নির্মাণ শুরু করেন। কেবলমাত্র কিবলার দিকে স্থাপিত শহরটি অক্ষত অবস্থায় রাখা হয়। হাসান বিন-নুমানের পুনর্নির্মাণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কৃতিত্ব হচ্ছে যে, তিনি মিহরাবের লাল ও পীত রঙের দুটি সুদৃশ্য স্তম্ভ স্থাপন করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এ দুটি স্তম্ভ স্থানীয় কোনো প্রাক্-মুসলিম ইমারত থেকে গ্রহণ করা হয় এবং বর্তমানে যে মিহরাবটি রয়েছে তার সামনের গম্বুজনির্মাণে স্তম্ভ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে।
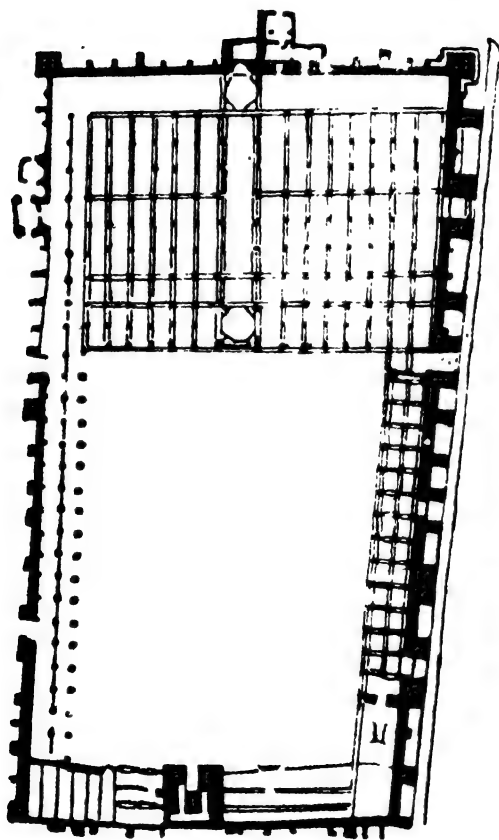
রেখাচিত্র : ৬৯
কায়রোয়ান, মসজিদ ভূমি-নক্শা।

বিশর ইবনে সাফওয়ানের পুনর্নির্মাণ :

উমাইয়া খলিফা হিসামের খিলাফতকালে বিশর ইবনে সাফওয়ান ৭২১ থেকে ৭২৮ পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা ছিলেন। শাসনভার গ্রহণ করে তিনি কায়রোয়ান মসজিদের পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। ৭২৪ খ্রীস্টাব্দে এই পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং চার বছরের মধ্যে অর্থাৎ ৭২৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়। এই নির্মাণকাজের মধ্যে উত্তরদিকে লিওয়ানের সম্প্রসারণ এবং চত্বরে ওজুর জন্য জলাধার নির্মাণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ এবং স্থাপত্যিক গুরুত্ববহ সংযোজন হচ্ছে একটি মিনার। মসজিদের উত্তর দেওয়ালের মাঝখানে নির্মিত এই বিশাল এবং আকর্ষণীয় মিনারটি এখনও বিদ্যমান (চিত্র-৫)।

কায়রোয়ান মসজিদের প্রাচীনতম স্থাপত্য-নিদর্শন বিশরের মিনারটির ভূমি-পরিকল্পনা চতুষ্কোণাকার। মিনারটি তিন স্তরবিশিষ্ট ; প্রথম স্তরটি ঈষৎ হেলানো এবং ৬৫ ফুট ব্যাস, নিম্নাংশে এবং ৩৩^{১}/২ ফুট উপরের অংশে। এই স্তম্ভের উচ্চতা ৬১^{১}/২ ফুট। দ্বিতীয় স্তম্ভটির উচ্চতা ১৬^{১}/২ ফুট এবং তৃতীয়টির ১৪^{১}/৪ ফুট। চূড়া ছাড়া সমগ্র মিনারটির উচ্চতা ১০৩ ফুট। সাহন বা চত্বরের উত্তরদিকের রিওয়াকসংলগ্ন মিনারটির প্রবেশপথ রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। রোমীয় প্রত্নসামগ্রীর ব্যবহার সর্বপ্রথম এই প্রবেশপথে দেখা যাবে। দুটি খাড়া খোদিত রোমীয় পাথরের (Tomb) উপর একটি সমান্তরাল পাথরখণ্ড (lintel) দিয়ে পবেশপথটি ৩^{১}/৪ ফুট প্রশস্ত এবং ৬ ফুট উঁচু। লিনটেলের উপরে ঘোড়ার নালাকৃতির (horse-shoe) একটি প্রকৃত খিলান রয়েছে। এই খিলানটি নিম্নমুখী চাপ বোধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম স্তরের নিম্নাংশে সাতস্তরবিশিষ্ট ভারী পাথরের তৈরি একটি ভিত্তিভূমি দেখা যাবে। মিনারের বাকি অংশ অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট পাথরখণ্ড দিয়ে তৈরি।

মিনারের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য রয়েছে একটি সিঁড়ি। সিঁড়িটি ঠিক মিনারের মধ্যস্থলে নির্মিত হয়নি। এই সিঁড়িটি তৃতীয় স্তর পর্যন্ত উঠে গেছে। প্রবেশপথে আলো প্রবেশের জন্য তিনটি ছোট ছোট জানালা রয়েছে, যা দিয়ে অভ্যন্তরে আলো প্রবেশ করে। চত্বরের সম্মুখে প্রবেশপথের উপরে যে জানালা আছে তার উর্ধ্বভাগেও অশ্বখুরাকৃতি খিলান রয়েছে। এই সমস্ত খিলান জনসাধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা নেই। মিনারের ভিতরে সোপানশ্রেণী মাত্র ৩^{১}/৪ ফুট। সিঁড়িগুলোর স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছানো যায়। এই স্তরের আয়তন প্রথম স্তর অপেক্ষা খুবই কম। মাত্র ১৬^{১}/২ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট দ্বিতীয় স্তরটি চারিদিক প্যারাপেট দ্বারা বেষ্টিত। একটি বারান্দা রয়েছে। এই স্তরের চারিদিকেই অশ্বখুরাকৃতি খিলান দ্বারা শোভিত। দ্বিতলে প্রবেশপথেও এ ধরনের খিলানসম্বলিত প্যানেল রয়েছে এবং অনুরূপ বন্ধ প্যানেল দেখা যাবে প্রবেশপথের দুই পাশে। অপর তিনদিকে প্রবেশপথের স্থলে তিনটি করে অশ্বখুরাকৃতি খিলানের প্যানেল দেখা যাবে। দ্বিতল থেকে ত্রিতলে পৌঁছানো যায় প্যাঁচানো (spiral) সিঁড়ি দিয়ে। সর্বোচ্চ তৃতীয় স্তরটি খুবই আকর্ষণীয়

এবং কারুকার্যমণ্ডিত। প্যারাপেট-ঘেরা বারান্দার চারিপাশে একই ধরনের খিলানের তৈরি প্রবেশপথ রয়েছে, মাঝখানে এবং তার দু'পাশে অনুরূপ আকৃতির বন্ধ খিলানের প্যানেল রয়েছে। প্রবেশপথের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, খিলানটি দুটি পাথরের স্তম্ভ থেকে নির্মিত হয়েছে এবং উপরের দিকে উঠে গেছে। কিন্তু বিশরের মিনারের সর্বাপেক্ষা সুষমামণ্ডিত অংশ হচ্ছে খাঁজকাটা গম্বুজ। এই গম্বুজটি squinch দ্বারা নির্মিত এবং এর চূড়াও খুব আকর্ষণীয়।

রিভয়রা মন্তব্য করেন যে, দ্বিতীয় স্তরটি প্রথম স্তরের পরে নির্মিত হয়েছে এবং কারণ হিসাবে তিনি বলেন যে, এই দুটি স্তরে ব্যবহৃত স্থাপত্যিক উপকরণ একরকম নয়। রিভয়রার মতবাদকে খণ্ডন করে ক্রেসওয়েল বলেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর দুটি সমসাময়িক। যুক্তি দেখিয়ে তিনি মন্তব্য করেন যে, আল-বকরী প্রদত্ত পরিমাপ এই দুটি স্তরের আয়তনের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে; তা ছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর দুটিতে একই ধরনের মালমসলা ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু গম্বুজবিশিষ্ট তৃতীয় স্তরটি নির্মিত হয়েছে ইটের সাহায্যে। উপরন্তু, ক্রেসওয়েল মিনারের squinch-এর ব্যবহার সম্বন্ধে বলেন যে, গম্বুজ তৈরির এই নির্মাণকৌশলটি ১২৯৪ খ্রীঃ নির্মিত সংলগ্ন বাব লাল্লা রেজিনার ইমারতে দেখা যায়। সুতরাং গম্বুজবিশিষ্ট মণ্ডপটি হাফসীদের সময়ে সংযোজিত হয়। মণ্ডপটির চারিদিকে ঘোড়ার নালের আকৃতির খিলান রয়েছে এবং প্রতি খিলানের দু'পাশে বন্ধ খিলানের নক্‌শা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। প্রকৃত খিলানগুলো দুটি সংযুক্ত (engaged) স্তম্ভের উপর ন্যস্ত ছিল, যার বর্ণনা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

রিভয়রা উল্লেখ করেন যে, কায়রোয়ানের শাসনকর্তা হাসান মিনারটি নির্মাণ করেন। আল-বকরীর উদ্ধৃতি দিয়ে ক্রেসওয়েল বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে বিশর ইবনে সাফওয়ানই (৭২৪–২৭ খ্রীঃ) এই মিনারের নির্মাতা। অবশ্য দক্ষিণ-পূর্ব কোণার পোস্তার (buttress) সঙ্গে মিনারটির মাল-মসলার সাদৃশ্য থাকায় তিনি মনে করেন যে, মিনারটির নির্মাণকাল কোনোক্রমেই ৮৩৬ খ্রীঃ পূর্বে হতে পারে না অর্থাৎ জিয়াদাতুল্লাহর (নবম শতাব্দী সংস্করণের সময়ে সম্ভবত এই মিনারটি নির্মিত হয়) আলোচ্য মিনারটি মুসলিম স্থাপত্যের প্রথম যুগের একটি অসামান্য কীর্তি এবং স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যে অতুলনীয়। ফুসতাতের মিনার অপেক্ষা আকর্ষণীয় বিশরের মিনার প্রাচীনতার দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ক্রেসওয়েল বলেন, "এই মিনারটির নির্মাণকাল ৮৩৬ খ্রীঃ হলেও কাসরুল হাইর আস-সারকীর মিনার বাদ দিলে এটিই ইসলামের সর্বপ্রাচীন বিদ্যমান মিনার।"[১] সৌন্দর্য ও আঙ্গিক সৌষ্ঠব, ভারাসাম্য এবং শিল্পকর্মের উৎকর্ষের দিক থেকেও কায়রায়ান মসজিদের মিনারটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। চতুষ্কোণাকার ঈষৎ হেলানো সুউচ্চ গম্বুজবিশিষ্ট মিনারটি সিরিয়ার খ্রীস্টান টাওয়ারের (temenos at Damascus) অনুকরণে মুসলিম স্থাপত্যে ফুসতাত মিনারের পরে ব্যবহৃত হয় এবং অদ্যাবধি এর শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য অম্লান হয়ে রয়েছে।

১। A Short Account, p. 110.

আগলাভী যুগে কায়রোয়ান মসজিদ :

কায়রোয়ান মসজিদটি ৭২২–৮৭ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয়বারের মতো পুনর্নির্মাণ করা হয়। এই সংস্কার ও সংরক্ষণের কাজ সম্পন্ন করেন ইয়াজিদ ইবনে হাতিম। বর্তমান কায়রোয়ান মসজিদটি বিশরের মিহরাব ও মিনার বাদ দিলে আগালাভী যুগের স্থাপত্যিক কীর্তি হিসাবে পরিচিত। এই মসজিদের পুনর্নির্মাণে ও সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখেন আগলাভী বংশের সুলতান জিয়াদাতুল্লা (৮১৬–৩৭ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয় ইব্রাহিম (৮৬২–৬৩ খ্রীঃ)।

বিশর ইবনে সাফওয়ানের তৈরি মিহরাব এবং মিনার ব্যতীত সমগ্র মসজিদটি ভেঙে নতুনভাবে পুনর্নির্মাণের প্রয়াস পান ইয়াজিদ ইবনে হাসিম (৭৭২–৭৪) এবং আগলাভী বংশের তৃতীয় সুলতান জিয়াদাতুল্লাহ ৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে ইয়াজিদের মসজিদটি ভেঙে সম্পূর্ণ নতুন ভূমি-পরিকল্পনা ও আঙ্গিকে নির্মাণের সংকল্প করেন। আল-বকরী বলেন যে, পুরাতন মসজিদের কোনো চিহ্ন রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না জিয়াদাতুল্লাহ। এমনকি তিনি বিসরের মিহরাবটিকে অক্ষত অবস্থায় রাখেন। অবশ্য ঐ মিহরাবটিকে দেওয়াল দিয়ে এমনভাবে চারিদিক ঘিরে দেওয়া হয়েছিল যে, ভিতর থেকে মিহরাব দেখা যায় না। মিহরাব ছাড়াও মিনার অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। ক্রেসওয়েল বলেন যে, ৮৩৬ খ্রীঃ জিয়াদাতুল্লাহ কর্তৃক পুনর্নির্মিত মসজিদটি বর্তমান ইমারতের আয়তন ও আকারের অনুরূপ। আবু ইব্রাহিম আহম্মদ ৮৬২-৬৩ সালে মিহরাবটিকে সাদা মার্বেলের প্যানেল দেওয়াল ও মিনাকরা টালি দ্বারা অলঙ্কৃত করেন এবং একটি সুন্দর মিমবার নির্মাণ করেন এর পরে দ্বিতীয় ইব্রাহিম (৮৭৫–৯০২ খ্রীঃ) এই মসজিদের সম্প্রসারণ করেন। আল-বকরীর তথ্য অনুসারে তিনি লিওয়ানের সারিগুলো দীর্ঘায়িত করেন এবং মিহরাবের সামনে যে ধরনের গম্বুজ রয়েছে (nave), এর শেষ প্রান্তে চত্বরের সম্মুখে অনুরূপ একটি গম্বুজ নির্মাণ করেন। কায়রোয়ান মসজিদের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে হাফসী রাজবংশের আমলে ১২৯৪ খ্রীস্টাব্দে সংস্কার। এই সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায় বার লাল্লা রেজিনা নামক প্রবেশপথে প্রোথিত একটি শিলালিপিতে।

মসজিদের বর্ণনা :

ভূমি-পরিকল্পনা ও গঠনপ্রকৃতির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, কায়রোয়ান মসজিদটি একটি অসম আয়তাকার ক্ষেত্র। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে মসজিদটি কিবলামুখী দক্ষিণ-পূর্বদিকে। এর অভ্যন্তরীণ পরিমাপ হচ্ছে উত্তর-পশ্চিমে ২১৪ ফুট, দক্ষিণ-পূর্বে ২৩০ ফুট, উত্তর-পুর্বে ৩৯৬ ফুট ও দক্ষিণ-পশ্চিমে ৩৯৫ ফুট। মেসোপটেমিয়ার মসজিদগুলোর মতো, বিশেষ করে সামাররা মসজিদ, কায়রোয়ান মসজিদের পরিবেষ্টিত প্রাচীরের সংরক্ষণকল্পে পোস্তা (buttress) ব্যবহার করা হয। তবে প্রভেদ হচ্ছে, মেসোপটেমিয়ার পোস্তাগুলো ইটের তৈরি ও আকারে অর্ধবৃত্তাকার এবং কায়রোয়ান মসজিদের পোস্তাগুলো পাথরের এবং আকারে আয়তাকার।

কায়রোয়ান মসজিদের পোস্তাগুলো বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনমাফিক সংযোজিত হওয়ায় এদের আকৃতি ও সংখ্যা ভিন্নতর। কেবলমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব অর্থাৎ কিবলার দিকের পোস্তাগুলো মোটামুটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। মনে করা হয়ে থাকে যে, এই দেওয়ালটিই জিয়াদাতুল্লাহর সময়ে নির্মিত যা এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব দিকের প্রাচীর অনেক পরে নির্মিত হয়। কায়রোয়ান মসজিদের প্রাচীরের চতুর্দিকে একধরনের অসংখ্য পোস্ত দেখা যায়—যার উপরের অংশ ঢালু বা bevelled off। অবশ্য কিবলা প্রাচীরের পোস্তাগুলো এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী। উত্তর-পশ্চিমদিক থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকের দেওয়াল ঢালু হয়ে গেছে এবং এর কারণে উত্তর-পশ্চিমের দেওয়াল ২৬^{১}/৪ উঁচু এবং দক্ষিণ-পূর্বের দেওয়াল ৩২^{৩}/৪ ফুট উঁচু। কোনো কোনো পোস্তা হেলানো এবং চুনকামের নিদর্শনও দেখা যায় কোনো কোনোটিতে।

কায়রোয়ান মসজিদে প্রবেশপথ রয়েছে ৮টি ; ৪টি দক্ষিণ-পূর্ব এবং ৪টি দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে। দক্ষিণ-পূর্বের প্রবেশপথগুলোর মধ্যে মাত্র একটি গম্বুজবিশিষ্ট ছিল এবং অপর তিনটি প্রবেশপথ ঢালু খিলানাকৃতি নির্মিত হয়। গম্বুজবিশিষ্ট প্রবেশপথটি বার লাল্লা রেজিনা নামে পরিচিত এবং শিলালিপি অনুযায়ী ১২৯৪ খ্রীঃ আবু হাফসী কর্তৃক নির্মিত। খিলানাকৃতি প্রবেশপথের প্রধান উপকরণ দুটি সংযোজিত স্তম্ভ (engaged column) এবং ঢালু খিলান বা recessed arch, দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রাচীরে ২টি গম্বুজবিশিষ্ট, ১টি ক্রসভেল্টের ও অপরটি অতিসাধারণ প্রবেশপথ আছে। এদিকের সকল প্রবেশপথে পর্চ রয়েছে। কায়রোয়ান মসজিদের প্রধান প্রবেশপথ হিসাবে ব্যবহৃত হয় দক্ষিণ-পশ্চিমদিকের শেষপ্রান্তে অবস্থিত প্রবেশপথ। বাব-আস-সুলতান নামে পরিচিত এই প্রবেশপথটিতে পলেস্তারা ও চুনকাম ছিল না।

ক্রেসওয়েলের মতে, দক্ষিণ-পশ্চিমদিকের তৃতীয় দরজায় দক্ষিণে একটি প্রাচীন প্রবেশপথে ছিল এবং উত্তর-পূর্ব প্রাচীরেও ঠিক অনুরূপ প্রবেশপথ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বর্তমানে এই উভয় প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম দর্শনে মনে হবে যে, সম্ভবত কোনো জানালা ছিল এবং এর পাশে একটি ছোট পোস্তা ছিল। কিন্তু আসলে প্রবেশপথই ছিল এবং উত্তর-পূর্ব দিকের প্রবেশপথটি একটি গোলাকার অশ্বনালাকৃতি খিলান দ্বারা ঘেরা ছিল। এ দুটি বন্ধ দরজা এক সময়ে লিওয়ানের সম্মুখেই ছিল এবং সম্ভবত জিয়াদাতুল্লাহই এ দুটির নির্মাতা। কিন্তু পরবর্তীকালে দ্বিতীয় ইব্রাহিম লিওয়ান সম্প্রসারণ করলে প্রবেশপথ দুটি বন্ধ করে দিতে হয়।

কায়রোয়ান মসজিদ আয়তাকার বিধায় সাহন বা চত্বরটিও আয়তাকার ছিল। মেঝে সাদা পাথর দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল। অঙ্গনের পরিমাপ উত্তর-পূর্বদিকে ২২০^{১}/২ ফুট। দক্ষিণ-পূর্বদিকে ১৭২^{১}/২ ফুট, উত্তর-পশ্চিমদিকে ১৬৪^{১}/২ ফুট, দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ২১৯^{৩}/৪। সাহনের চতুর্দিকের রিওয়াকগুলো একধরনের নয়। আকৃতি গঠনে প্রভেদ লক্ষ করা যায়। দক্ষিণদিকের রিওয়াক ছাড়া অপর তিনদিকের রিওয়াকের উচ্চতা একই রকম। দক্ষিণদিকে একটু বেশি। প্যারাপেট পর্যন্ত ২৯ ফুট। উত্তর-পশ্চিমদিকের রিওয়াকে খিলানরাজি। গোলাকার স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে নির্মিত, কিন্তু

অপর তিনদিকে স্তম্ভের পরিবর্তে আয়তাকার পিলার বা পিয়ারের উপর খিলানরাজি স্থাপিত। এই সমস্ত পিয়ারের সম্মুখভাগে দুটি সংলগ্ন ক্ষুদ্রাকার মার্বেলস্তম্ভ রয়েছে। রিওয়াকগুলোতে খিলানসমূহের বিন্যাসও ভিন্নতর এবং সারিবদ্ধ স্তম্ভরাজিও একরকম নয়। উত্তর-পশ্চিমদিকের সমস্ত খিলানসারি দেওয়ালের সঙ্গে সমান্তরালভাবে নির্মিত ; অপরদিকে উত্তর-পূর্বদিকের খিলানসারির পূর্বাংশ লম্বা বা vertical এবং দক্ষিণ-পশ্চিমদিকের খিলানশ্রেণী সমান্তরাল ও লম্বাভাবে স্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের বিন্যাসে প্রতীয়মান হয় যে, খিলান ও স্তম্ভরাজি একসঙ্গে নির্মিত হয়নি। এর ফলে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থাপত্যিক উৎকর্ষ দেখা যায় না।

খিলানের আকৃতিতেও কায়রোয়ান মসজিদ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। এই মসজিদে দুই ধরনের খিলান ব্যবহৃত হয়েছে–কৌণিক এবং গোলাকার ঘোড়ার নালাকৃতি–pointed and round horse shoe arch খিলান। এ ছাড়া আরও বৈপরিত্য লক্ষ করা যায় স্তম্ভের সংযোজনে। চত্বরের চারিদিকে এবং প্রধান আইলে বা "নেভে" একজোড়া স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু লিওয়ানের অভ্যন্তরে মাত্র একটি স্তম্ভ থেকে খিলান নির্মিত হয়েছে।

কায়রোয়ান মসজিদটিকে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রার্থনাগার বা লিওয়ান ; চত্বর বা 'সাহন' এবং রিওয়াক। রিওয়ানটি মসজিদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকা দখল করে আছে। লিওয়ানটি ভূমি-পরিকল্পনার দিক দিয়ে ইংরেজি অক্ষর T-এর আকৃতিতে নির্মিত। কিবলা-প্রাচীরের সমান্তরাল একটি প্রশস্ত জায়গা বা "বে" (bay)-র সঙ্গে প্রার্থনাগারের মধ্যভাগ লম্বালম্বিভাবে 'লেভ'-এর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় T-আকৃতি ধারণ করেছে। এই লিওয়ানটি ১৬টি লম্বালম্বি স্তম্ভ দ্বারা ১৭টি সারি বা আইলে বিভক্ত। চত্বরের দিক থেকে এই সমস্ত স্তম্ভ মিহরাবের দিকে কিবলা-প্রাচীর পর্যন্ত গিয়েছে, যদিও দেওয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়নি। কারণ কিবলা-প্রাচীর এবং যে স্থানে লম্বালম্বি স্তম্ভরাজি এসে থেমেছে তার মধ্যে বেশ ব্যবধান লক্ষ করা যায়। মোট কথা লম্বালম্বি স্তম্ভরাজি আড়াআড়ি খিলানরাজি দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল এবং কিবলা-প্রাচীর এবং আড়াআড়ি খিলানরাজির মধ্যে, ক্রেসওয়েলের বর্ণনা অনুসারে ১৯^{৩}/৪ ফুট প্রশস্ত স্থান রয়েছে। প্রতিটি লম্বালম্বি স্তম্ভসারিতে ৭টি ঘোড়ার নালের আকৃতির খিলান রয়েছে। জিয়াদাতুল্লাহ আমলে নির্মিত এই খিলানশ্রেণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, লম্বালম্বি স্তম্ভরাজির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আড়াআড়ি দুইটি স্তম্ভরাজিও নির্মিত হয়। এই আড়াআড়ি স্তম্ভরাজি দেখা যাবে প্রথম ও দ্বিতীয় এবং চতুর্থ ও পঞ্চম খিলানশ্রেণীর মাঝে। লিওয়ানের মধ্যবর্তী সমস্ত খিলানই অশ্বনালাকৃতি। স্তম্ভগুলোর উচ্চতা ১১^{১}/২ ফুট, ব্যাস ১৩^{১}/২–১৭^{১}/৪ ইঞ্চি। ভিত্তিহীন নক্‌শাকৃতি স্তম্ভগুলোর যে অগ্রভাগ বা ক্যাপিটাল রয়েছে তাতে রোমীয় প্রভাব বিদ্যমান। ক্যাপিটালের উপর থেকে চতুর্দিকে খিলান নির্মিত রয়েছে এবং স্তম্ভগুলোকে সুসংহত ও সংঘবদ্ধ রাখার জন্য কাঠের গ্রন্থী বা tie beam ব্যবহৃত হয়েছে। পরে এইগুলোকে লোহার গ্রন্থী দ্বারা গ্রথিত করা হয়।

কায়রোয়ান মসজিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মধ্যভাগের আইলে মিহরাবের সম্মুখে গম্বুজধারী চতুস্কোণে জোড়া স্তম্ভের ব্যবহার। অপরাপর আইল থেকে

মধ্যবর্তী আইলটি বেশি চওড়া এবং উভয়দিকের জোড়া স্তম্ভ থেকে সমান্তরাল (Transverse) ও লম্বালম্বি (Longitudinal) খিলান নির্মিত হয়। এ ছাড়া আয়তাকার চত্বরের চতুর্দিকে এ ধরনের জোড়া স্তম্ভের ব্যবহারের কথা পূর্বে বলা হয়েছে।

আবু ইব্রাহিম আহ্মদের সংস্কার :

জিয়াদাতুল্লাহ কায়রোয়ান মসজিদের আঙ্গিক, সৌন্দর্য ও স্থাপত্যিক রূপান্তরে যে ভূমিকা পালন করেন তা খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরীগণও কায়রোয়ান মসজিদের পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণে অবদান রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন ইব্রাহিম আহ্মদ (৮৬২-৩ খ্রীঃ)। ইব্রাহিম মূল মিহরাব ও এর অলঙ্করণ, একটি নক্শাকৃত মিমবার এবং মিহরাবের সামনে একটি গম্বুজ নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

কায়রোয়ান মসজিদের কিবলা-প্রাচীরে যে প্রধান অবতলাকার মিহরাবটি রয়েছে তা খুবই আকর্ষণীয়। মিহরাবের কুলুঙ্গীটি (recess) ৬১/২ ফুট চওড়া ও ৫১/৪ ফুট গভীর। মিহরাবটির খিলান অশ্বনালের মতো এবং সামান্য কৌণিক এবং দুপাশে সামান্য পিঙ্গল বর্ণের মার্বেলের একজোড়া স্তম্ভ রয়েছে। মিহরাবের খিলানটি ৯১/২ ফুট থেকে উপরের দিকে উঠে ১৫ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত। মিহরাবটি নির্মাণের সন-তারিখ নিয়ে নানা মতবিরোধ আছে। মারকেস মনে করেন যে, জিয়াদাতুল্লাহ এই মিহরাবটির নির্মাতা কিন্তু ক্রেসওয়েল এ মতবাদ খণ্ডন করে বলেন যে, মিহরাব ৮৬২-৩ খ্রীস্টাব্দে আবু ইব্রাহিম আহমদ কর্তৃক নির্মিত হয়। তিনি মিহরাবের সম্মুখের গম্বুজেরও নির্মাতা।

স্থাপত্যিক অলঙ্করণের দিক দিয়ে বিচার করলে কায়রোয়ান মসজিদের মিহরাবটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। মিহরাবের কুলুঙ্গীতে ৪টি সমান্তরাল প্যানেল রয়েছে, প্রতি প্যানেল ৭টি আয়তাকার ক্ষুদ্র মার্বেলের প্যানেল দ্বারা সুশোভিত। সর্বমোট ২৮টি এ ধরনের মার্বেলের প্যানেল ভিন্ন ভিন্ন নক্শাকৃত এবং কয়েকটিতে জালি অর্থাৎ ছিদ্র দ্বারা নক্শাকৃত (Perforated) লম্বালম্বিভাবে ৭টি প্যানেলকে ৬টি বর্ডার দিয়ে ভাগ করা হয়। প্যানেলগুলোর উপরে একটি সমান্তরাল প্যানেল এবং এর উপরে লজেন্স আকৃতিতে নকশা করা রয়েছে। প্যানেলের উর্ধ্বে মিহরাবের অর্ধগম্বুজাকৃতি অংশে কাঠ দিয়ে আঙুর ফলের নক্শা করা হয়। নানা রঙের বর্ণচ্ছটায় দ্রাক্ষাফলগুলো খুবই উজ্জ্বল মনে হয়।

মিহরাবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে, মিনাকরা টালির ব্যবহার। মিহরাবের সম্মুখভাগ এবং দেওয়ালের অংশ চকচকে টালি দ্বারা আবৃত। ক্রেসওয়েলের মতে প্রায় ২১১/৪ × ৫১/২ ফুট জায়গা জুড়ে বর্ণোজ্জ্বল টালি (Lustre tile) ব্যবহার মসজিদের অলঙ্করণের বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। টালিগুলোর পরিমাপ ৪১/৪ বর্গ ইঞ্চি এবং ১/২ ইঞ্চি মোটা। সর্বমোট ১৩৯টি পূর্ণাঙ্গ টালি এবং ১৬টি আংশিক টালি দেখা যাবে। ক্রেসওয়েলের ভাষায়, "Those forming the frame are placed lozenge-wise, so as to form a chess-board pattern set obliquely but those decorating

the face of the arch are set irregularly"[১] কায়রোয়ান মসজিদে ব্যবহৃত টালি বাগদাদ থেকে আনীত। ইবনে নাজীর মতে, আমীর মিহরাব তৈরী করেন। তিনি কায়রোয়ান জামে মসজিদের মিহরাব দেওয়ালে রঞ্জিত টালি দ্বারা শোভিত করেন। উত্তর আফ্রিকার ইসলামী শিল্পকলায় মেসোপটেমিয়ার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সামাররা এবং বাগদাদে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের অলঙ্করণের উপকরণ ছাড়া টালি নির্মাণের পদ্ধতিও মেসোপটেমিয়া থেকে আমদানী করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ডেভিড টেলবট রাইস বলেন, "Moreover some of the earliest examples of lustre in North Africa, the tiles of the mihrab at Quairwan, dating from 862, are mostly Mesopotamian, even if a few of them are local copies"[২]

আবু ইব্রাহিম আহমেদের অন্যতম প্রধান কীর্তি হচ্ছে মিহরাবের সম্মুখে গম্বুজ নির্মাণ। মিহরাবের সম্মুখে মিহরাব প্রাচীর থেকে একটি এবং তিনপাশে তিনটি ঈষৎ কৌণিক অশ্বনালাকৃতি খিলানের সাহায্যে গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯ ফুট উঁচু থেকে খিলান ৩০ ফুট পর্যন্ত উঠে গিয়াছে। খিলানের শেষপ্রান্তে ছোট গোলাপের আকৃতির (rosette) নক্‌শা দেখা যায়। এই চারটি খিলানের দ্বারা যে চতুষ্কোণ এলাকা সৃষ্টি হয়েছে তা কার্নিশ দ্বারা মণ্ডিত। খিলানের উপর বা দুই খিলানের মাঝে যে ত্রিকোণাকার স্থান রয়েছে তা রুচিসম্মতভাবে কারুকার্যমণ্ডিত। এই কারুকার্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি কুলুঙ্গী এবং দুটি ছোট ছোট রেকাবীর (Saucer) নক্‌শা খিলান এবং কুলুঙ্গী উপরে চার দেওয়ালে ঘিরে একটি পাড়-নক্‌শার সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পাড়-নক্‌শার (border design) নিচে কুফী রীতিতে আরবী লিপি খোদিত আছে। পাড়-নকশার উপরে গম্বুজ সৃষ্টির জন্য স্কুইঞ্চ রয়েছে চার কোণায়। এই স্কুইঞ্চগুলো ঝিনুকের মতো এবং প্রতিটিতে খাঁজকাটা ৯টি করে নকল খিলান রয়েছে। এই স্কুইঞ্চ দু'টি সংলগ্ন স্তম্ভ থেকে উঠে গেছে। দুটি স্কুইঞ্চ-মধ্যবর্তী স্থানে অসংখ্য খাঁজকাটা কৃত্রিম খিলান দেখা যাবে। এই খিলানে ছয়টি খাঁজ আছে এবং ছিদ্র থাকায় জানালার কাজ করছে। চারটি স্কুইঞ্চ এবং দেওয়ালের চারটি খাঁজকাটা খিলান দ্বারা চতুষ্কোণ স্থানকে অষ্টকোণাকার এলাকায় রূপান্তরিত করা হয় যাতে গোলাকৃতি গম্বুজ সহজেই নির্মাণ করা যায়। এই অষ্টকোণাকার এলাকাটি গম্বুজের পিপা বা drum-এর কাজ করছে। এই পিপায় ৮টি জানালা এবং জানালাগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে দুটি করে অর্থাৎ ১৬টি কুলুঙ্গী নির্মিত হয়েছে। কুলুঙ্গী এবং জানালার উপর খোদিত হয়েছে পাড়-নক্‌শা এবং এর উপর গম্বুজের অভ্যন্তর দেখা যায়। গম্বুজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খাঁজকাটা আবরণ (ribbed dome)-অভ্যন্তরে গম্বুজের ২৪টি খাঁজ নির্মিত হয়েছে এবং এই খাঁজগুলো এত দীর্ঘ ও সুচারুরূপে নির্মিত যে অভ্যন্তরের ছাদ বিশাল খাঁজকাটা অবতলাকৃত গহ্বর মনে হয়।

আবু ইব্রাহিম আহমদ কায়রোয়ান মসজিদে যে মিহরাব স্থাপন করেন তা ইসলামী কারুশিল্পের একটি অনবদ্য সৃষ্টি। সেগুন কাঠের তৈরি মিমবারটি ১৩ ফুট প্রশস্ত এবং

---

১. A Short Account, p. 297.

২। Rice, D. T., Islamic Art, London, 1905, p. 10.

১১ ফুট উঁচু। ৮৬২ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এই মিমবারটি খাড়া ও তেরচা কাঠের ফ্রেমে আবদ্ধ এবং এতে মোট ১৪টি সিঁড়ি আছে। বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক এবং লতাপাতা ফুলের নক্‌শা দ্বারা মিমবারটি শোভিত। একদিকে যেমন পামেট, অ্যাকান্থাস, আঙুরলতা রয়েছে অন্যদিকে জ্যামিতিক ছক ও বিভিন্ন নক্‌শা খচিত রয়েছে। মিমবারের কারুকার্যে মেসোপটেমীয় অর্থাৎ আব্বাসীয় শিল্পকলার প্রভাব লক্ষ করা যায়। রাইস বলেন, "The wooden mimber or pulpit at Qairawan was also the work of Mesopotamian craftsmen. Set up in 862, it was therefore made during the period when Samarra was the capital. It is of turned wood and constitutes one of the earliest examples of such wood work that have come down to us : it was a craft when the Islamic world later to exploit with great distinction."[১]

দ্বিতীয় ইব্রাহিমের সংস্কার :

কায়রোয়ান মসজিদের সম্প্রসারণ এবং অলঙ্করণে দ্বিতীয় ইব্রাহিম বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি ৪৭৫ থেকে ৪৯২ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তাঁর শাসনামলে লিওয়ানের সারিগুলো (nave) চত্বরের দিকে প্রলম্বিত হয়। আল-মাক্কারীর বর্ণনা অনুযায়ী, আহমদের পুত্র ইব্রাহিম নামাজগৃহের নেভগুলো দীর্ঘায়িত করেন এবং নেভ এবং শেষপ্রান্তে একটি গম্বুজ নির্মাণ করেন (ডোম অব দি গেট অব দি প্যাভিলিয়ন) যা সুন্দর মার্বেলে তৈরি ৩২টি স্তম্ভ দ্বারা আবৃত। এর অভ্যন্তর অনিন্দ্যসুন্দর অলঙ্করণে শোভিত। জ্যামিতিক নক্‌শাবলী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে খোদাই করা হয়েছে।[২]

দ্বিতীয় ইব্রাহিম যে গম্বুজ তৈরি করেন তা মিহরাবের সম্মুখে নির্মিত গম্বুজের অনুকরণ। একাদশ শতাব্দীতে এই মসজিদে একটি মাকসুরা (মিহরাবের সম্মুখে খলিফা বা শাসকদের জন্য ঘেরা নামাযের স্থান) নির্মিত হয়।

গুরুত্ব :

কায়রোয়ান মসজিদ উত্তর আফ্রিকার অন্যতম প্রধান এবং প্রাচীনতম মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই নয়, মসজিদ-স্থাপত্যের ক্রমবিকাশে এই ইমারত বিশেষ অবদান রেখেছে। কায়রোযান মসজিদে দুটি বিপরীতধর্মী স্থাপত্যকীর্তির সংমিশ্রণ রয়েছে। সিরীয়-ভূমধ্যসাগরীয় উপকরণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মার্বেল স্তম্ভ, চতুষ্কোণী মিনার, যা দামেস্ক মসজিদে দেখা যাবে। এ ছাড়া মিহরাবের সম্মুখে গম্বুজের ব্যবহার সিরীয় মসজিদ, বিশেষ করে দামেস্ক মসজিদ থেকে অনুকরণ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। লিওয়ানে লম্বালম্বিভাবে প্রসারিত স্তম্ভরাজি ও খিলানসমূহের যে কীর্তি কায়রোয়ান মসজিদে দেখা যায় তার পূর্বসূরী হচ্ছে জেরুজালেমের আকসা মসজিদ (৭৮০ খ্রীঃ)। সুতরাং বলা যায় যে, কায়রোয়ান মসজিদে সিরীয়-বায়জানটাইন প্রভাব

১। Rice, p. 44.

২। A Short Account, p. 250.

পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে প্রাচ্যদেশীয় অর্থাৎ মেসোপটেমীয় প্রভাব লক্ষ করা যাবে মিনাকরা টালি ব্যবহারে। আব্বাসীয় যুগে বাগদাদে ও সামাররা প্রাসাদ ও মসজিদসমূহে মিনাকরা টালির যে প্রচলন হয় বিশেষজ্ঞদের মতে সে ধরনের টালি কায়রোয়ান মসজিদের মিহরাব দেওয়ালে ব্যবহৃত হয়েছে। মেসোপটেমীয় ধরনের টালি কায়রোয়ানে তৈরি করা হত না। বাগদাদ থেকে আবু ইব্রাহিম আহমদ অসংখ্য টালি আমদানী করেন। টালি ছাড়াও, রাইসের মতে, সূক্ষ্ম কাঠখোদাই-এর রীতি যা মিহবারে লক্ষ করা যাবে, তাতেও মেসোপটেমীয় প্রভাব রয়েছে।

মোটামুটিভাবে দুটি বিপরীতমুখী প্রভাব এভাবে বিশ্লেষণ করা যায়।

(ক) সিরীয়-ভূমধ্যসাগরীয়-বায়জানটাইন : আয়তাকার ভূমি-পরিকল্পনা, মার্বেলের স্তম্ভ, একান্থাস ক্যাপিটাল, অশ্বনালাকৃতি খিলান, চতুষ্কোণী মিনার, দ্রাক্ষা লতা-পাতার ব্যবহার, মিহরাবের সম্মুখে গম্বুজ, লম্বালম্বি খিলানরাজি, শিরাল গম্বুজ।

(খ) মেসোপটেমীয়-পারস্য : মিনাকরা টালি, কাঠখোদাই, প্লাস্টারের অলঙ্করণ।

Papadopoulo বলেন, "The great mosque of Kairoun is much more luxurious than the mosque in Samarra or that of Ibn Tulun in Cairo. Even aside from its use of stone and its fine entique marble columns there is also the matter of color, since its marble is decorated with polychrome tiles having metallic reflections and its ceiling was enhanced by painting."[১]

২। জেরুজালেম, আল-আক্সা মসজিদ, ৬৯১ খ্রীঃ (চিত্র ৬—৮)

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ)-এর শাসনামলে ইসলামের সম্প্রসারণ শুরু হয় এবং তাঁর নেতৃত্বাধীনে সিরিয়ায় যে অভিযান প্রেরিত হয় তার সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটে। ইয়ারমুকের যুদ্ধে বায়জানটাইন সেনাবাহিনী পরাস্ত হলে সিরিয়ায় ইস্লামের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জয়ের পর মুসলমান বাহিনী আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হয়। জেরুজালেমের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম; কারণ প্যালেস্টাইনের রাজধানী এবং বায়জানটাইন সেনাবাহিনীর ঘাঁটি ছিল সেখানে। বায়জানটাইন সেনাপতি মুসলিমবাহিনীর আক্রমণে শহর পরিত্যাগ করেন এবং স্থানীয় অধিবাসীগণ অবরুদ্ধ জেরুজালেম শহরে আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হন এই শর্তে যে, খলিফা স্বয়ং জেরুজালেমে এসে আত্মসমর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরণ করবেন। খলিফা হযরত উমর (রাঃ) স্বয়ং কষ্ট স্বীকার করে মদিনা থেকে সুদূর জেরুজালেমে আগমন করে। তিনি নগরীর হস্তান্তর-চুক্তিতে স্বাক্ষরদান করেন। অবরুদ্ধ খ্রীস্টানদের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন ধর্মযাজক সাফ্রেনিয়াস। ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে জেরুজালেম মুসলমানদের অধিকারে আসে।

১। Papadopoulo, op. cit., p. 252.
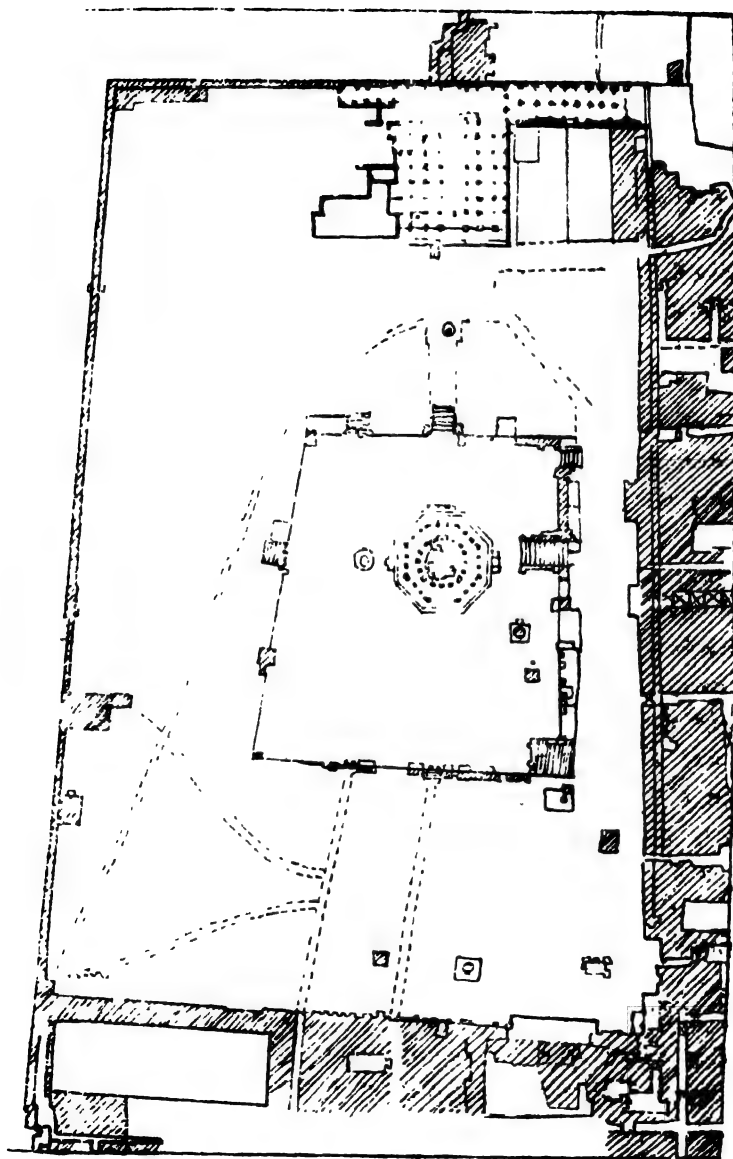
রেখাচিত্র : ৭০
জেরুজালেম, আল-আকসা মসজিদ ও ডোম-অব-দি রক, ভূমি-পরিকল্পনা

জেরুজালেম অধিকৃত হবার পর সেখানে অন্যান্য অধিকৃত শহর যেমন বসরা, কুফা, ফুসতাত-এর মতো কোনো মসজিদ নির্মিত হয়েছিল কিনা তা সঠিকভাবে বলা যায় না। ইসলামের ইতিহাসের গোড়ার দিকে ঐতিহাসিকগণ বিশেষ করে বালাযুরী ও তাবারী হযরত উমর (রাঃ) কর্তৃক কোনো মসজিদ জেরুজালেমে নির্মিত হয়েছিল কিনা তার উল্লেখ করেননি। তবে ক্রেসওয়েল বলেন যে, সমসাময়িক খ্রীস্টান ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের বর্ণনায় নামাযগাহ ধরনের কোনো ইমারত নির্মিত হয়েছিল এরূপ তথ্য পাওয়া যায়। যদিও এসমস্ত তথ্য জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে পরিবেশিত হওয়ায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়।

জেরুজালেমের আদি মসজিদ সম্বন্ধে ৬৭০ খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টান পরিব্রাজক আরকুফ যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

"পবিত্র স্থানের পূর্বদিকে দেওয়াল বরাবর পূর্বে যে অতুলনীয় স্থাপত্যকীর্তির স্বাক্ষর হিসাবে মন্দির ছিল সেখানে স্যারাসেনগণ চতুর্ভুজ আকৃতির একটি নামাযগাহ নির্মাণ করেন। স্থানীয় কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতের কড়িবর্গার সাহায্যে অতিসাধারণ ও অবিন্যস্ত এই নামাযগাহ তৈরি করা হয়। এই গৃহে তিন সহস্র লোকের স্থান সঙ্কুলান হত।"[১]

আরকুফ বর্ণিত নামাযগাহটিই সম্ভবত জেরুজালেমের প্রধান মসজিদ। তিনি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত পুরাকীর্তির কথা বলেছেন তা রাজা হেরোডের তৈরি বিখ্যাত রাজকীয় প্যাভিলিয়ন (Royal Stoa) যা ৭০ খ্রীস্টাব্দে রোমীয় সেনাপতি টাইটাস ধ্বংস কবেন। জোসেফের তথ্যানুযায়ী জেরুজালেমের আক্‌সা মসজিদটি পুরাতন মন্দির এলাকার দক্ষিণপ্রান্তে বিস্তৃত তিন সারিবিশিষ্ট পোর্টিকো। এটি খ্রীস্টান ব্যাসিলিকা[২] ধরনের। ব্যাসিলিকা ভূমি-পরিকল্পনা লম্বালম্বি অসংখ্য স্তম্ভরাজি apse বা অবতলাকৃতি কুলুঙ্গীর দিকে নির্মিত হয়ে থাকে এবং মাঝখানের সারিটিকে নেভ বলা হয় যা পার্শ্ববর্তী সারি অপেক্ষা আয়তনে বড়। উপরন্তু নেভ-এর উচ্চতা পাশের আইল অপেক্ষা বেশি। জেরুজালেমের প্রথম মসজিদটিও অনুরূপভাবে নির্মিত হয় বলে অনেকে মনে করেন। আক্‌সা মসজিদের পাশের আইলগুলো ৩০ ফুট প্রশস্ত এবং ৫০ ফুট উঁচু। নেভ পাশের আইলের চেয়ে প্রশস্ততায় অর্ধেক কিন্তু উচ্চতায় দ্বিগুণ। এ ধরনের ছাদ নির্মাণের যৌক্তিকতা এই যে নেভ-এর ছাদ উঁচু করা হয় যাতে পাশ দিয়ে অভ্যন্তরে আলো প্রবেশ করিতে পারে (clerestory)। লিওয়ানে সর্বমোট ১৬২টি করিন্থীয় স্তম্ভের ব্যবহার দেখা যায়।

আকসা মসজিদের নির্মাণকাল সম্বন্ধে সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে ৬৩৭ সালে হযরত উমরের (রাঃ) জেরুজালেম আগমন এবং ৬৭০ সালে আরকুফের জেরুজালেম পরিদর্শনের মধ্যবর্তী কোনো সময়ে এই মসজিদ নির্মিত হয়েছে। গবেষণা ও তথ্য বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদটি সম্ভবত ৬৪১ বা ৬৪২ সালে নির্মিত হয়। দশম শতাব্দীর পূর্বে কোনো আরব ঐতিহাসিক আরব মসজিদের উল্লেখ করেননি।[২]

১। A Short Account, p. 10.

২। মুকাদ্দেসী (৯৮৫ খ্রীঃ), আল-বাকরী (১০৯১), ইবনে হুবাইশ (১১৮৮)।

উমাইয়া যুগে সম্প্রসারণ :

কুর'আন শরীফে মিরাজ উপলক্ষে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম আল-মসজিদুল হারাম অর্থাৎ মক্কা থেকে মসজিদুল আক্সা অর্থাৎ জেরুজালেমের আক্সা বা দূরবর্তী মসজিদে গমন করেন এবং সেখান থেকে উর্ধ্বগমনে যান। সমস্ত আরব ঐতিহাসিক আল-মসজিদুল আক্সাকে জেরুজালেমের প্রথম মসজিদ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। খলিফা হযরত উমরের শাসনামলে নির্মিত (৬৪১-৪২) আদি মসজিদটি ভেঙে উমাইয়া যুগে একটি সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তিভূমি, আঙ্গিক গঠন এবং স্থাপত্যিক উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়। কতিপয় আরব ঐতিহাসিকের, বিশেষ করে মুকাদ্দাসীর মতে, আবদুল মালিক (৬৮০—৭০৫ খ্রীঃ) এই নির্মাণকাজে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। অপরদিকে ইউটিচিয়াস, ইবনুল আছীর প্রমুখ মনে করেন যে, খলিফা আল-ওয়ালিদের (৭০৫—১৫ খ্রীঃ) শাসনকালে আক্সা মসজিদটি পুনর্নির্মিত ও আবৃত করা হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত Aphrodito Papyrus-এর পাঠোদ্ধার করে জানা যায় যে, আল-ওয়ালিদই ৭১৫ সালে আক্সা মসজিদের পুনর্নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। সমসাময়িক তথ্যে উল্লেখ আছে যে, আক্সা মসজিদের পুনর্নির্মাণে দক্ষ কারিগর ও শ্রমিক নিয়োগ করা হয় এবং তিনজন স্থপতির ১২ মাস অবধি কাজে নিয়োগ করার কথাও বলা হয়েছে।

আল-মসজিদুল আক্সার পুনর্নির্মাণে প্রকৃতপক্ষে আবদুল মালিক এবং আল-ওয়ালিদ উভয়েরই অবদান রয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হারাম শরীফ বা বায়তুল মুকাদ্দিস-এর চারিদিকের প্রাচীরের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে উত্তর-দক্ষিণে ১৫০০ ফুট এবং প্রস্থে গড়ে ৯৬০ ফুট। এই বিশালাকার পবিত্র স্থানের মাঝে কুব্বাতুস সাখরা বা Dome of the Rock এবং দক্ষিণপ্রান্তে আল-মসজিদুল আক্সা রয়েছে। আবদুল মালিক কর্তৃক নির্মিত কুব্বাতুস সাখরা এবং আল-মসজিদুল আক্সা একই অক্ষরেখায় অবস্থিত হওয়ায় মুকাদ্দাসী মনে করেন যে, এই মসজিদটি আবদুল মালিকের কীর্তি। কিন্তু ক্রেসওয়েল Aphrodito Papyrus-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, এই মসজিদটি ৭১৫—১৬ সালে আল-ওয়ালিদ কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়।[১]

আক্সা মসজিদ পরবর্তী যুগে সংস্কার এবং সম্প্রসারণকালে এরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় যে, আল-ওয়ালিদ দ্বিতীয় আল-আক্সা মসজিদের কোনো চিহ্ন নেই বললেই চলে। তবে মুকাদ্দাসী চাক্ষুষ না করলেও তিনি বর্ণনা দেন যে, মসজিদটি অনিন্দসুন্দর ও কারুকার্যশোভিত ইমারত ছিল। ক্রেসওয়েল বলেন যে, গম্বুজের ডানে ও বামে মার্বেল স্তম্ভের উপর খিলানরাজি সম্ভবত আল-ওয়ালিদের সময়ে নির্মিত।

আব্বাসীয় আমলে পুনর্নির্মাণ :

আল-ওয়ালিদের দ্বিতীয় আল-আক্সা মসজিদ বেশিদিন অক্ষত অবস্থায় ছিল না। ৭৪৭-৪৮ সালে মারাত্মক ভূমিকম্পে মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর (৭৫৪—৭৫ খ্রীঃ) এর পুনর্নির্মাণের আদেশ দেন। মুনসুর কর্তৃক পুনর্নির্মিত

১। A Short Account, p. 43, f. n. 1

তৃতীয় আক্‌সা মসজিদ পুনরায় ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হলে ৭৮০ খ্রীস্টাব্দে খলিফা আল-মাহদী মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করেন। এটি চতুর্থ আল-আক্‌সা মসজিদ নামে পরিচিত। ল্যা স্ট্রাঞ্জের মতে, খলিফা মাহদী ৭৮০ সালে জেরুজালেমে গিয়ে আক্‌সা মসজিদে নামায আদায় করেন। আল-মুকাদ্দাসীর তথ্যানুযায়ী এই মসজিদে ২৬টি প্রবেশপথ ছিল। তার মধ্যে উত্তরদিকে ১৫টি এবং পূর্বদিকে ১১টি। উত্তরদিকের প্রবেশপথের মধ্যে মাঝের পথটি ছিল প্রশস্ত এবং মিহরাবের দিকে প্রলম্বিত। মিহরাবে প্রবেশের এই দরজাটিকে বৃহৎ কাঁসার ফটক (Great Brass Door) বলা হয়। উত্তরদিকের দরজাগুলো দিয়ে ১৫টি আইলে প্রবেশ করা যায় এবং মাঝের প্রশস্ত আইলটি নেভ নামে পরিচিত। আইলগুলো প্রচলিত সিরীয় রীতি অনুযায়ী লম্বালম্বিভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে। প্রধান আইলটি চালাছাদ (gable roof) দ্বারা আচ্ছাদিত যা পার্শ্ববর্তী আইলগুলোর ছাদ অপেক্ষা উঁচু। ছাদ কাঠের তৈরি ছিল এবং সীসা দ্বারা মণ্ডিত ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন। মিহরাবের সম্মুখে একটি গম্বুজ নির্মিত হয় যা কায়রোয়ান মসজিদে দেখা যায়। ক্রেসওয়েল মাহদী কর্তৃক পুনর্নির্মিত চতুর্থ আল-আক্‌সা মসজিদের অভ্যন্তরের পরিমাপ সঠিকভাবে নির্ধারণ করেন। লিওয়ানটি দৈর্ঘ্যের প্রায় দেড়গুণ। জেরুজালেমের আল-আক্‌সা মসজিদ স্থাপত্যশিল্পের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত এবং এই ইমারতে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ সংস্কার, সম্প্রসারণ, পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। ১০৩৩ সালে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আল-আক্‌সা মসজিদটির পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফাতেমী খলিফা আজ-জাহির ১০৩৫ সালে আক্‌সা মসজিদের পুনর্গঠনে বিশেষ অংশগ্রহণ করেন। ক্রেসওয়েল আজ-জাহীরের পুনর্নির্মিত আল-আক্‌সা মসজিদের বিবরণ দেন। তাঁর মতে, মসজিদের বহুলাংশে আজ-জাহীরের কীর্তি স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর মসজিদ ৭ আইলবিশিষ্ট এবং কিবলা-প্রাচীর থেকে লম্বালম্বিভাবে স্তম্ভরাজি খিলান-গুলোকে বহন করে রেখেছে। প্রধান আইলের উভয় পাশের স্তম্ভরাজি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত স্তম্ভে ১১টি খিলান নির্মিত হয়েছে। প্রধান কেন্দ্রীয় আইলটি পার্শ্ববর্তী আইলগুলো অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ এবং এর উপরে প্রথম ৭টি বে-কে আচ্ছাদিত করে নির্মিত হয়েছে। চালাছাদ (gable roof) এবং আলো প্রবেশপথ (Clerestory) মিহবারের সম্মুখে আল-মাহদীর সময়ে নির্মিত গম্বুজের অনুরূপ। আজ-জাহীর প্রধান আইলের শেষপ্রান্তে চত্বরের দিকে একটি গম্বুজ তৈরি করেন। গম্বুজ চারটি বৃহৎ খিলানের উপর ভিত্তি করে নির্মিত দুটি লম্বালম্বি এবং দুটি সমান্তরাল।

গুরুত্ব :

মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে আল-মসজিদুল আক্‌সার অবদান অনস্বীকার্য, মসজিদের ক্রমবিবর্তনে এই মসজিদ বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে।

Richmond বলেন, "It would seem then that by the time Abdul Malik had completed the great mosque of Jerusalem the several needs of a muslim place of congregational prayer had all found some form of architectural expression. A walled enclosure gave seclusion,

a roofed sanctuary gave protection from the weather, a pulpit accomodated the preacher : a basin for ablusion anabled the faithful to prepare for prayer : towers enabled the call to prayer to be made from a commanding height, cloisters protected the congreagation from the weather, after entering the open enclosure from the vaulted or arched streets of the town on their way to the roofed sanctuary."[১]

মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় পবিত্রতম স্থান বায়তুল মুকাদ্দিসে অবস্থিত আল-আক্সা মসজিদ। মসজিদ-স্থাপত্যে উপকরণের বিন্যাসে এই ইমারতটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আদি মসজিদের কোনো চিহ্ন না থাকলেও আল-ওয়ালিদের দ্বিতীয় মসজিদটি উমাইয়া স্থাপত্যকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কারণ এই মসজিদের লিওয়ানে স্তম্ভ ও খিলানের যে আকৃতি ও বিন্যাস রয়েছে তা পরবর্তীকালে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে নির্মিত মসজিদগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রেসওয়েল যথার্থই বলেন যে, মার্বেল দ্বারা নির্মিত লম্বালম্বি স্তম্ভবাজি এবং গোলাকার খিলানসমূহের আকৃতি উমাইয়া স্থাপত্যের অন্যান্য ইমারতে পুনরাবৃত্তি হয়েছে। বিশেষ করে ৭৮০ সালে মাহদীর চতুর্থ আক্সা মসজিদে মিহরাবের সম্মুখে গম্বুজের প্রচলন এবং কিবলা-প্রাচীর থেকে চত্বরের দিকে লম্বালম্বি স্তম্ভরাজি পরবর্তীকালে কর্ডোভা মসজিদে (৭৮৭) এবং কায়রোয়ান মসজিদেও (৮৩৬) দেখা যাবে। আক্সা মসজিদে প্রাক্-মুসলিম যুগের ধ্বংসাবশেষ ব্যবহৃত হয়েছে যদিও ক্রেসওয়েলের মতে সেন্ট মেরীর গির্জার কোনো অংশই এ মসজিদে সংযোজিত হয়নি। কারণ খলিফা উমর (রাঃ) যখন জেরুজালেমে আগমন করেন তখন উল্লেখিত গির্জাটির কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট ছিল না। আক্সা মসজিদ উমাইয়া স্থাপত্যের অনুপম সৃষ্টি এবং একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ডোম অব দি রক (কুব্বাতুস-সাখরা) এবং আল-মসজিদুল আক্সায় উমাইয়া স্থাপত্যে প্রাচীনতম স্থাপত্যিক নিদর্শন হিসাবে গ্রীকো-রোমান এবং বায়জানটাইন স্থাপত্যের প্রভাব দেখা যায়, যেমন– মার্বেল স্তম্ভ, করিন্থীয় ক্যাপিটাল, টাইবিম, মোজাইক, দ্রাক্ষা-লতাপাতা ইত্যাদি।

Papadopoulo আল-আক্সা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন–"This is the architype of all mosques aisles perpendicular to the wall of the qibla and with a more conspicuous axial nave and its form was imitated in all most all the Mosques of Western Islam."[২]

৩। জেরুজালেম, কুব্বাতু'স সাখরা (ডোম অব দি রক), ৬৯২ খ্রীঃ (চিত্র ৯–১২)

পটভূমি :

রিচমন্ড বলেন, "The Dome of the Rock is the earliest existing monument of Muslim architecture."[১] জেরুজালেমে (বায়তুল মুকাদ্দিস)

১। Richmond, E.T., Moslem Architecture, 623 to 1517, London, 1926, p. 29

২। Papadopoulo, A. Islam and Muslim Art, London, 1980,p. 483.

৩। Richmond, p. 15.

অবস্থিত এবং আল-মসজিদুল আক্‌সার সঙ্গে একই অক্ষরেখায় নির্মিত কুব্বাতু'স সাখরা অর্থাৎ ডোম অব দি রক অথবা পবিত্র পাথরের উপর তৈরি পবিত্র স্মৃতিসৌধ মুসলিম স্থাপত্যের সুষমামণ্ডিত, অত্যাশ্চর্য এবং অতুলনীয় ঐতিহ্য বহন করে রয়েছে। ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং প্রাচীনতম পাথর ও মোজাইকের নক্‌শায় তৈরি কুব্বাতু'স সাখরা রসুলে করীমের (সাঃ) মিরাজ বা উর্ধ্বাগমনের পবিত্র ধর্মীয় ঘটনায় স্মৃতি বহন করে রয়েছে। আকারে বিশাল, পরিকল্পনায় আকর্ষণীয় এবং অলঙ্করণে উৎকর্ষে স্বাক্ষর বহনকারী এই ইমারতটিকে মসজিদ বলা যাবে না কারণ প্রচলিত অর্থে মসজিদ বলতে যে সমস্ত উপকরণ প্রয়োজন তা এতে ব্যবহৃত হয়নি। এ কারণে কুব্বাতু'স সাখরা একটি অসাধারণ ও অনুকরণীয় ধর্মীয় ইমারত বা স্মৃতিসৌধ (Shrine)। অবশ্য উমাইয়া যুগের এই স্থাপত্যকীর্তি মসজিদ-স্থাপত্যের ক্রমবিকাশে প্রভাব বিস্তার করেছে। নিশ্চিত করে বলা যায় যে, খলিফা আবদুল মালেক ৬৯১ খ্রীস্টাব্দে কুব্বাতু'স সাখরা নির্মাণ করেন। তিনি একটি বৃহদাকার ও অমসৃণ পাথরখণ্ডের উপরে যে মনোরম এবং কারুকার্যখচিত ধর্মীয় ইমারত তৈরি করেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। জেরুজালেমে মুসলমানদের নিকট পবিত্র স্থান এবং ধর্মীয় গুরুত্বের দিক থেকে এর স্থান মক্কা শরীফ ও মদিনা মুনাওয়ারার পরেই।

জেরুজালেম বা বায়তুল মুকাদ্দিসের মাঝখানে রয়েছে একটি বিশালাকার ও অমসৃণ পাথরখণ্ড। প্রকৃতপক্ষে এই পাথরটি মোরিয়া পাহাড়ের শীর্ষদেশ হিসাবে পরিচিত এবং নবী করীম (সাঃ) উর্ধ্বাগমনে যাওয়ার সময় এই পাথরে পদচিহ্ন রেখে যান। পাথরটি দৈর্ঘ্যে ৬০ ফুট এবং প্রস্থে ১৪ ফুট। পাথরের নিচে একটি গুহা আছে। ৬৩৯ সালে মুসলমানদের জেরুজালেম বিজিত হলে হযরত উমর (রাঃ) স্বয়ং এই পবিত্র নগরীতে আগমন করেন। সে সময় জেরুজালেমের পবিত্র হারাম এলাকায় প্রাচীন যুগেব অনেক স্থাপত্যকীর্তি ছিল, যেমন—ডেভিডের বেদী (Altar of David), সোলায়মানের মন্দির ইত্যাদি। খলিফা উমর (রাঃ) জেরুজালেমে প্রবেশ করে প্রথমে হযরত দাউদের স্মৃতিবিজড়িত ইমারতের দিকে যান এবং পবিত্র পাথরটিকে আবর্জনাদির মধ্যে পরিত্যক্ত ও অবহেলিত অবস্থায় দেখতে পান। মুসলমানদের নামায পড়ার সুবিধার্থে হযরত উমর (রাঃ) এই পবিত্র এলাকায় একটি চতুষ্কোণাকার মুসাল্লা নির্মাণ করেন। পূর্ব প্রাচীনে নির্মিত এই মুসাল্লাটি ছিল খুব সাধারণ ও অলঙ্করণবিহীন। ইসলামের সর্বপ্রাচীন ও আদি-মসজিদগুলোর অনুরূপ এই মুসাল্লাটি কাঠ ও অস্থায়ী উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়। ঐতিহাসিকদের মতে, এই ইমারতটি উমরের মসজিদ নামে অভিহিত। কখনও কখনও কুব্বাতু'স সাখরাকে এ কারণে ভুলবশত উমরের মসজিদ বলা হয়ে থাকে।

কুব্বাতু'স সাখ্‌রা নির্মাণের মূলে প্রধানত তিনটি কারণ রয়েছে : (ক) ধর্মীয় (খ) রাজনৈতিক এবং (গ) স্থাপত্যিক। ৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে খিলাফত লাভ করে উমাইয়া বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক আবদুল মালিক একটি প্রতিদ্বন্দ্বী খিলাফতের তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। ৬৮০ সালে কারবালার যুদ্ধে ইমাম হুসাইন শাহাদাৎ বরণ করার পর মক্কা ও মদিনার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে যবাইর স্বীয় ক্ষমতা

সুদৃঢ় করেন। তিনি মক্কায় নিজেকে খলিফা হিসাবে দাবি করেন এবং স্বীয় প্রতিপত্তি আরব উপদ্বীপ ও ইরাকে প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমশ ইবনে যুবাইরের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি ও প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা হিসাবে বিশেষ কয়েকটি সুবিধা ভোগ করতে থাকেন। ধর্মীয় দিক থেকে তিনি ইসলামের দুটি পবিত্রতম স্থান—মক্কা ও মদিনায় রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লাভ করে পবিত্র কাবা শরীফের হিফাজতকারীর ভূমিকা পালন করতে থাকেন। ইসলামের বিধান অনুসারে একমাত্র প্রকৃত ও ক্ষমতাশালী খলিফাই কেবল কা'বা শরীফের নিয়ন্তা ও রক্ষাকর্তা হতে পারেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইবনে যুবাইর অসংখ্য উমাইয়াবিরোধী সমর্থক লাভ করেন। ক্রমশ তাঁর প্রভুত্ব বৃদ্ধি হতে থাকে। উমাইয়া খিলাফতে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ নবী করীমের সময়ে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের মূল ও আদি ইসলামী প্রজাতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সহায়ক ছিল। ইবনে যুবাইর এ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং পবিত্র হজ্ব পালনে আগত সিরীয়া ও মিশরীয়দের মধ্যে তিনি অসংখ্য সমর্থক লাভ করতে থাকেন। অর্থনৈতিক দিক বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, সিরিয়া ও মিশরের উর্বর এলাকা থেকে তিনি বিপুল পরিমাণ রাজস্ব লাভ করতে থাকেন। তার ফলে তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর-এর কার্যকলাপ আবদুল মালিকের স্বার্বভৌমত্বে আঘাত হানে এবং ৬৯২ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ কুব্বাতু'স সাখরা নির্মাণের পর ৬৯২ সালে আবদুল মালিক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে হেজাজের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরের বিরুদ্ধে পাঠান। আরাফাতের যুদ্ধে যুবাইর পরাজিত ও নিহত হন।

খলিফা আবদুল মালিকের অসামান্য কীর্তি হিসাবে কুব্বাতু'স সাখরা ইসলাম স্থাপত্যশিল্পের একটি বিস্ময় বলা যায়। এই পূতপবিত্র ইমারত নির্মাণে তিনি প্রধানত ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হন। ক্ষমতালাভ করে তিনি মক্কা মদিনার উপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান; কারণ পবিত্র কা'বা শরীফের নিয়ন্ত্রণ খলিফার প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য। কিন্তু যুবাইর হেজাজে প্রতিদ্বন্দ্বী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করায় তিনি জেরুজালেমকে ইসলামী বিশ্বের ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রূপান্তরিত করতে চান। আবদুল মালিক বায়তুল মুকাদ্দিসের পবিত্রতা ও প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এই স্থানটি রসুলুল্লাহর (সাঃ) মিরাজের অবিস্মরণীয় ঘটনা হিসাবে ভক্ত মুসলমানদের মানসপটে ভাস্বর হয়ে রয়েছে। এখানকার পাথরটিতে রসুলে করীমের (সাঃ) পদচিহ্ন রয়েছে। উপরন্তু, কুর'আন শরীফে বায়তুল মুকাদ্দিসের উল্লেখ আছে যে, হযরত উমর (রাঃ) জেরুজালেম আগমন করে এই পবিত্র স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং নামায আদায় করেন। এ ছাড়া, রসুলে করীম (সাঃ) জেরুজালেমকে ইসলামের প্রথম কিবলা হিসাবে স্বীকৃতি দেন। অবশ্য পরে কিবলা মক্কাভিমুখী হয়। এ সমস্ত কারণে আবদুল মালিক জেরুজালেমকে পবিত্র স্থানে রূপান্তরিত করতে চান। ইয়াকুবী বলেন যে, "আবদুল মালিক এক আদেশ জারি করে মক্কায় হজ্বব্রত পালন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।" তাঁর ভাষায়, "এই প্রস্তর, যেখানে খোদার রসুল পদচিহ্ন রেখে উর্ধ্বগমনে স্বর্গে যান, কা'বার স্থান দখল করবে। এরপর আবদুল মালিক এই পবিত্র প্রস্তরের উপর একটি গম্বুজ

নির্মাণ করেন এবং জনসাধারণ যেভাবে কা'বা শরীফে তওয়াফ করে সেভাবে এই প্রস্তরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে।" ধর্মীয় দিক থেকে পবিত্র কা'বার "হাজরুল আসওয়াদ" এবং জেরুজালেমের পবিত্র পাথর উভয়ই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ হাজরুল আসওয়াদের সঙ্গে হযরত ইব্রাহিমের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত ; অপরদিকে মিরাজ-এর সঙ্গে কুব্বাতু'স সাখরা নির্মাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উভয় পাথর ঘিরে প্রদক্ষিণ স্থান রয়েছে। আবদুল মালিক কা'বা শরীফের অনুকরণে কুব্বাতু'স সাখরা নির্মাণ করেন যাতে উক্ত মুসলমানগণ জেরুজালেমের পবিত্র হারাম শরীফেই হজ্জব্রত পালন করতে পারে।

উমাইয়াবিদ্বেষী ইয়াকুবীর বর্ণনা সমসাময়িক বিশ্বস্ত সূত্র দ্বারা সমর্থিত নয়। আবদুল মালিকের পুত্র ওয়ালিদ বায়জানটাইন ও সাসানীয় শাসিত অঞ্চলসমূহে ইসলামের প্রসার এবং ইসলামী সভ্যতা ও কৃষ্টি প্রতিষ্ঠায় অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। এ ছাড়া মক্কা ও মদিনার মর্যাদা রক্ষা এবং আল-মসজিদুল হারাম ও মদিনা মসজিদের সৌকর্যসাধনেও যে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন, ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। প্রকৃত ঘটনা হল হজ্জ উপলক্ষে আগত সিরিয়ার অধিবাসীগণকে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য করা হত, এরূপ অভিযোগ পাওয়ার পর আবদুল মালিক সিরিয়ার জনগণকে সাময়িকভাবে হিজাজ ভ্রমণে নিষেধ করেন।

স্থাপত্যকলার দিক দিয়ে বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, আবদুল মালিক একটি অনন্যসাধারণ ও সর্বোকৃষ্ট ইমারত নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে, সিরিয়ায় বায়জানটাইন গির্জার প্রাধান্য থাকায় তিনি এমন এক অত্যুৎকৃষ্ট স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে চান যা স্থানীয় গির্জাগুলোকে স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য, উপকরণের ভারসাম্যতা ও বিন্যাস, অতুলনীয় কারুকার্যের দিক থেকে ম্লান করে দেবে। মুকাদ্দেসীর উদ্ধৃতি দিয়ে ক্রেসওয়েল বলেন, "And in like manner the Khalif 'Abdul Malik noting the greatness of the Church of Holy Sepulchre and its magnificance, was moved lest it should dazzle the minds of the Muslims, and hence erected above the Rock the dome which is now to be seen there."[১]

খলিফা আবদুল মালিক কুব্বাতু'স সাখরা নির্মাণে নিঃসন্দেহে স্থানীয় মনোরম ও কারুকার্যখচিত বায়জানটাইন গির্জাসমূহকে ম্লান করতে চান এব স্থাপত্যিক দিক থেকে ধর্মীয় ইমারত হিসাবে এই সৌধ নির্মাণ করেন। হিট্টি এই ইমারতকে "a living symbol of their faith" বলে অভিহিত করেছেন। স্থাপত্যিক সৌকর্যের দিক থেকে ইসলামী শিল্পকলার অনবদ্য সৃষ্টি কুব্বাতু'স সাখরা, যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার ধারাকে সমন্বিত করেছে। Richmond-এর ভাষায়, "The Dome of the Rock

---

১। A Short Account, p. 18
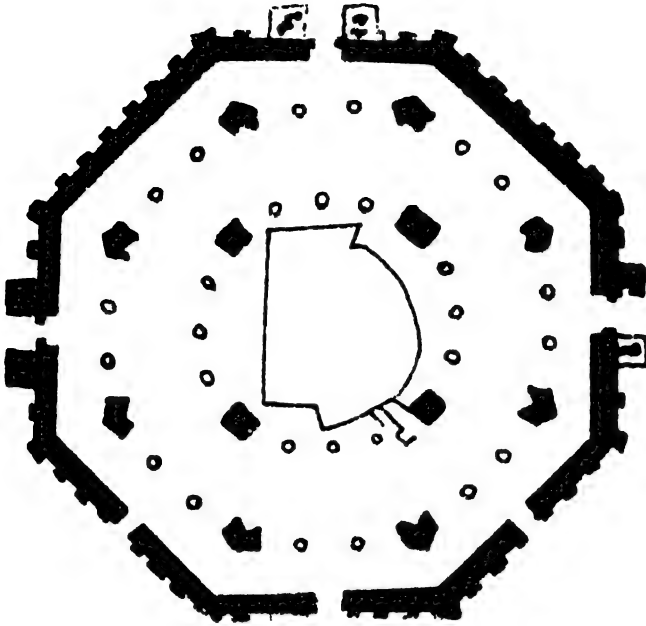
রেখাচিত্র : ৭১
জেরুজালেম, কুব্বাতু'স-সাখরা, ভূমি পরিকল্পনা

affords a good illustration of the increased familiarities brought about by the establishment of Islam between the traditions of stone building and the traditions of brick and its derivatives."[১]

প্রসঙ্গত কুব্বাতু'স সাখরা কি ধরনের ইমারত ছিল সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। কতিপয় ঐতিহাসিক এই ইমারতকে উমরের মসজিদ বলেছেন। ইবনে বতুতা ও অন্যান্যদের ভাষ্য অনুযায়ী কুব্বাতু'স সাখরা ইসলামের খুবই পবিত্র ও সুন্দর মসজিদ। স্থাপত্যিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, এই অপূর্ব মনোরম ও কারুকার্যশোভিত ইমারতটিতে লিওয়ান, মিমবার, রিওয়াক প্রভৃতি উপকরণ নেই। এই ইমারতকে মাযার বলা যাবে না, কারণ এখানে কোনো কবর নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কুব্বাতু'স সাখরা একটি পবিত্র দর্শনের স্থান, জিয়ারতের জায়গা এবং রসুলে করীমের (সাঃ) স্মৃতিবিজড়িত মিরাজের ঘটনার স্বাক্ষী, একটি অনিন্দ্যসুন্দর স্মৃতিসৌধ ও প্রত্নতাত্ত্বিক কীর্তি হিসাবে সমধিক পরিচিত।

১। Hitti, P. K., History of the Arabs, London, 1951, p 264.

ভূমি-পরিকল্পনা :

ইসলামের প্রথম শতাব্দীর সর্বোৎকৃষ্ট স্থাপত্যকীর্তি কুব্বাতু'স সাখরা। আবদুল মালিক কর্তৃক নির্মিত মূল ইমারতটি পরবর্তীকালে সংস্কার সাধিত হলেও আদি ভূমি-পরিকল্পনা অপরিবর্তিত রয়েছে। ইমারতটি ভূমি থেকে প্রায় ১০ ফুট উঁচু চত্বরের (podium) উপর নির্মিত। মসজিদুল আক্সা এবং কুব্বাতু'স সাখরা উভয় ইমারতই একই অক্ষ-রেখায় অবস্থিত। কুব্বাতু'স সাখরায় প্রবেশ করতে হলে প্রশস্ত সিঁড়ি পার হয়ে খিলানরাজির মধ্য দিয়ে প্রবেশদ্বারে আসতে হয়। পাঁচ খিলানবিশিষ্ট এই খিলানশ্রেণী একটি আকর্ষণীয় স্থাপত্যকীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে।

মুসলিম স্থাপত্যের সর্বপ্রাচীন বিদ্যমান কীর্তি কুব্বাতু'স সাখরার ভূমি-পরিকল্পনা মূলত তিন অংশে বিভক্ত, (ক) অভ্যন্তরের মাঝখানে বৃত্তাকৃতি (annular) অংশ, (খ) বৃত্তাকৃতির চারিপাশে প্রথম অষ্টভূজবিশিষ্ট পরিবেষ্টিত এলাকা, (গ) প্রথম অষ্টভূজাকৃতি পরিবেষ্টিত এলাকাকে ঘিরে দ্বিতীয় অষ্টভূজবিশিষ্ট অংশ। একটি গোলাকার এলাকাকে দুটি অষ্টভূজ দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হয়েছে নিখুঁত জ্যামিতিক পদ্ধতিতে ভূমি-নক্শার মাধ্যমে। মস-এর তথ্যানুযায়ী দুটি চতুষ্কোণ তির্যকভাবে একে অপরকে যে বিন্দুতে ছেদ করেছে ঠিক সেই বিন্দু থেকে একটি রেখা সামনের দিকে টানা হয়েছে। এরূপ মোট আটটি ছোট সরলরেখার মাথা থেকে আটটি দীর্ঘ আড়াআড়ি সরলরেখা টেনে আটকোণাকার একটি এলাকা বের হয়েছে। এই অষ্ট কোণাকার এলাকাটি কুব্বাতু'স সাখরার বহিঃপ্রাচীর, দুটি চতুষ্কোণ যে যে বিন্দুতে ছেদ করেছে ঠিক সেই সেই বিন্দু থেকে আড়াআড়িভাবে সরলরেখা টানলে আর একটি অষ্টভুজ পাওয়া যাবে। এই অষ্টভুজটি অভ্যন্তরীণ এলাকাকে দুই অংশে ভাগ করেছে—একটি বাহিরের পরিবেষ্টিত অষ্টকোণাকার এলাকা এবং অপরটি বৃত্তাকারের বাইরের প্রদক্ষিণপথ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, বাইরের অষ্টকোণাকার এলাকার পরিমাপ ভিতরের অষ্টকোণাকৃতি এলাকা অপেক্ষা ছোট মূল পরিকল্পনাটির ভিত্তি হচ্ছে মাঝখানের গোলাকার এলাকা। এই বৃত্তাকার স্থানটিতে পবিত্র পাথর সংরক্ষিত আছে। যে চতুষ্কোণ দুটি পরস্পরকে ছেদ করেছে তার একটি চতুর্ভুজের বিপরীতমুখী কোণদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখা টানলে যে বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করবে ঠিক সেই বিন্দু থেকে একটি বৃত্ত টানা হয়েছে। এই বৃত্তের পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছে কেন্দ্রবিন্দু থেকে পরস্পর যেখানে দ্বিতীয়বারের মতো দুটি চতুর্ভুজ ছেদ করেছে তার দূরত্বের উপর। মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে কুব্বাতু'স সাখরার মতো এরূপ নিখুঁত ভূমি-পরিকল্পনা ইতিপূর্বে কোনো ইমারত দেখা যায়নি।

বৃত্তাকার বেষ্টনী (Annular enceinte)

কুব্বাতু'স সাখরা বা ডোম অফ দি রকের অর্থ পবিত্র পাথরখণ্ডের উপর নির্মিত গম্বুজ। এমতাবস্থায় এই ইমারতের সর্বাপেক্ষা পবিত্রতম এবং মূল অংশই হচ্ছে বৃত্তাকার বেষ্টনী যা পবিত্র পাথরটিকে ঘিরে রয়েছে। এই বৃত্তাকার বেষ্টনী একটি কাঠের গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজটি একটি লম্বা ড্রামের উপর নির্মিত : এই ড্রামে ১৬টি জানালা আছে। গম্বুজটি বৃত্তাকারের ৪টি পিয়ার বা আয়তকার স্তম্ভের পর একটি করে

আয়তাকার স্তম্ভ বা পিয়ার নির্মিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, স্তম্ভরাজি মার্বেলের তৈরি অভ্যন্তরীণ বৃত্তাকৃতি বেষ্টনীর চারিদিকে ১৬টি খিলান আছে। খিলানগুলো ৪টি পিয়ার এবং ১২টি গোলাকার স্তম্ভের উপর থেকে নির্মিত। গোলাকার স্তম্ভের উপরে যে, ক্যাপিটাল (স্তম্ভের অগ্রভাগ) আছে তা থেকে অর্ধবৃত্তাকার খিলান উঠে গেছে। খিলানগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মার্বেলের টুকরো দিয়ে ভূসুয়ার্স অর্থাৎ পরপর বৃত্তাকারে সাজিয়ে নির্মিত হয়েছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মার্বেলগুলো সাদা ও কালো রঙে রঞ্জিত। খিলানগুলো অর্ধবৃত্তাকারে নির্মিত হলেও সুলতান আল-নাসির মোহাম্মদের রাজত্বকালে মার্বেল আচ্ছাদনের (casing) ফলে এগুলো ঈষৎ কোণাকৃত দেখাচ্ছে। প্রথম আটকোণাকার বেষ্টনীতে স্তম্ভরাজির উপর ক্যাপিটালের মাথায় যে ধরনের (impost block) অথবা চতুষ্কোণাকার পাথরখণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে সেরূপ কোনো উপকরণ এখানে দেখা যায় না। কাঠের ছোট ছোট বন্ধনী-থামও (tie beam) স্তম্ভগুলোকে সংযুক্ত করে রেখেছে। এই বৃত্তাকারের খিলানের প্রশস্ততা ড্রামের প্রশস্ততার সমান (৩^{৩}/৪ ফুট)। পবিত্র পাথরটি একটি রোলিং দ্বারা বেষ্টিত।

কুব্বাতু'স সাখরার নির্মাণে মুসলিম স্থপতিগণ অভিনব স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আচ্ছাদনে এই ইমারতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে মুসলিম স্থাপত্যের সর্বপ্রথম পরপর দু'টি গম্বুজ (double dome) ব্যবহৃত হয়েছে। গম্বুজটি একটি ড্রামের উপর অবস্থিত। ছাদের উপর এই ড্রামটির ব্যাস ৬৮ ফুট এবং উচ্চতায় ভূমি থেকে গম্বুজ-সীমান্তরেখা পর্যন্ত প্রায়ই একরূপ অর্থাৎ স্থাপত্যিক ভারসাম্য বজায় থাকায় ইমারতটি সুষমামণ্ডিত হয়েছে। গোলাকার ড্রামটি নির্মাণের জন্য বৃত্তাকারের ৪টি থাম ছাদের দিকে সম্প্রসারিত করে পোস্তার (buttress) সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতি পোস্তার মাঝে ৪টি করে মোট ১৬টি জালির জানালা নির্মাণ করা হয়েছে।

কুব্বাতু'স সাখরার প্রথম আকর্ষণ স্বর্ণমণ্ডিত গোলাকার অপূর্ব সুন্দর গম্বুজ। এটি একটি সাধারণ গম্বুজ নয় কারণ সাধারণ গম্বুজে মাত্র একটি আচ্ছাদন থাকে, কিন্তুএখানে পরপর দুটি আচ্ছাদন থাকায় এটিকে দ্বি-গম্বুজ বা double dome বলা হয়। ৯০৩ খ্রীস্টাব্দে ইবনুল ফাকী এই গম্বুজের চাক্ষুষ বর্ণনা দেন। একই ভিত্তির উপর পরপর দুটি আচ্ছাদন (shell) নির্মিত হয় এবং দুটি আচ্ছাদনের মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশের জন্য একটি ছোট দরজা রয়েছে। ছাদ কাঠের তৈরি এবং ভিতরের ও বাহিরের কাঠের আচ্ছাদনে ৩২টি পঞ্জর (rib) গম্বুজের সৌকর্য বৃদ্ধি করেছে। মেঝে থেকে গম্বুজটি ১১৬ ফুট উঁচু এবং গম্বুজটিতে ব্রোঞ্জের যে চূড়া রয়েছে তা চন্দ্রকলার আকৃতিতে নির্মিত (crescent)। চূড়াটি ১৩^{১}/২ ফুট উঁচু। গম্বুজটির ব্যাস ৬৮ ফুট, কাঠের নির্মিত বর্তমান দ্বি-গম্বুজটি সমসাময়িক নয়। একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ১০২২-২৩ সালে ফাতেমী খলিফা আজ-জাহির এই গম্বুজটি পুনর্নির্মাণ করেন। ক্রেসওয়েলের মতে, চন্দ্রকলার আকৃতির চূড়াটি ১১৮৭ সালের পূর্বে নির্মিত হতে পারে না।
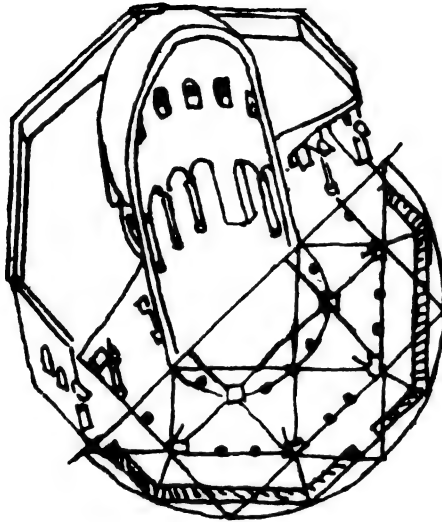
রেখাচিত্র : ৭২
জেরুজালেম, কুব্বাতুস-সাখরা

প্রথম অষ্টকোণাকার বেষ্টনী :

অভ্যন্তরীণ গোলাকৃতি বেষ্টনী এবং আটকোণাকার বহিঃপ্রাচীরের মধ্যে অষ্টকোণাকৃতি খিলানরাজি ব্যবহার করে দুটি প্রদক্ষিণ বেষ্টনী বা Ambulatory সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বেষ্টনী নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাওয়াফ অর্থাৎ পবিত্র পাথরের চারদিকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করা। প্রথম অষ্টকোণাকার খিলানরাজি বা arcade নির্মিত হয়েছে অষ্টভুজের প্রতি কোণায় একটি করে থাম বা পিয়ার এবং থামগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে দুটি করে গোলাকার স্তম্ভের উপর। এভাবে সর্বমোট ৮টি পিয়ার এবং ১৬টি গোলাকার স্তম্ভ বা column খিলানরাজি নির্মাণে সাহায্য করছে এবং ছাদটিকে ধারণ করে রেখেছে। উল্লেখ যে, বৃত্তাকার বেষ্টনী অপেক্ষা প্রথম অষ্টভুজের পিয়ার ও গোলাকার স্তম্ভের সংখ্যা অধিক। বৃত্তাকার বেষ্টনীর স্তম্ভের সঙ্গে প্রথম অষ্টভুজের স্তম্ভের প্রভেদ হল যে, এগুলোতে impost block রয়েছে এবং ক্যাপিটালের উপর স্থাপিত এই পাথরখণ্ড

থেকে খিলান নির্মিত হয়েছে। খিলান এবং impost block এবং মার্বেল বাক্সের অনুকরণে স্তম্ভধার বা base স্তম্ভরাজিকে আকর্ষণীয় করে রেখেছে। কাঠের মোটা বন্ধনী দুটি কাঠের খণ্ডকে জোড়া দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এগুলো ৩০ ইঞ্চি চওড়া এবং ১০১/২ ইঞ্চি উঁচু। এই বন্ধনীগুলো মেঝে থেকে ১৯১/২ ফুট উপরে নির্মিত। স্তম্ভগুলোর শীর্ষদেশ বা capital বিভিন্ন ধরনের, কোনোটি করিন্থীয় অপর কোনোটি মিশ্রিত (করিন্থীয় ও ডোরিক)। বৃত্তাকার বেষ্টনীর পিয়ারের সঙ্গে প্রথম অষ্টভুজের পিয়ারের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। খুব মোটা মার্বেলের এই পিয়ারগুলো ঢালু ছাদ ধারণের জন্য খুবই মজবুত করে তৈরি করা হয়েছে। পিয়ার ও স্তম্ভের উপরে মোট ২৪টি খিলান রয়েছে। এই খিলানগুলো আকৃতিতে বৃত্তাকার বেষ্টনীর খিলানের মতো। প্রথম অষ্টভুজে প্রতি পিয়ারের মাঝে ৩টি করে মোট ২৪টি খিলান নির্মিত হয়। কিন্তু বৃত্তাকার বেষ্টনীতে প্রতি পিয়ারের মাঝে ২টি করে মোট ১৬টি খিলান দেখা যাবে।

দ্বিতীয় অষ্টভুজটি প্রথম অষ্টভুজ এবং বহিঃপ্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত। কুব্বাতু'স সাখরা মূলত একটি গম্বুজবিশিষ্ট অক্ষকোণাকার ধর্মীয় ইমারত। আটদিকের প্রাচীরের প্রতিটির দৈর্ঘ্য ৬৭১/২ ফুট এবং উচ্চতা ২৯১/২ ফুট। দেওয়ালের উচ্চতায় প্যারাপেটের ৮১/২ ফুট উচ্চতাসহ পরিমাপ করা হয়েছে। আটটি দেওয়ালের প্রতিটিতে ৭টি খোপ (panel) আছে। মধ্যবর্তী ৫টি খোপের উপরের দিকে জালি জানালা ও উভয় প্রান্তে ২টি বন্ধ খোপ রয়েছে। গণনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, আটটি দেওয়ালের প্রতিটিতে ৫টি করে মোট ৪০টি জানালা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, দেওয়াল দুই অংশে বিভক্ত রয়েছে। উপরের অংশে মোজাইক দ্বারা অলঙ্কৃত এবং নিম্নাংশ সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি। প্রতি দেওয়ালের লম্বা খাঁজকাটা প্যানেলের গঠন প্রথমে অর্ধগোলাকৃতি থাকলেও ১৫৫২ খ্রীস্টাব্দে সুলতান সোলায়মানের রাজত্বকালে ইমারতের সংস্কারের সময় গোলাকার প্যানেলগুলো কিঞ্চিৎ কৌণিক আকৃতি ধারণ করে। ৯০৩ খ্রীস্টাব্দে ইবনে ফাকীর বর্ণনায় জানা যায় যে, "এই ইমারতের প্রাচীর এবং উপরের ড্রামে ৫৬টি জানালা আছে এবং এগুলো গ্লাস মোজাইক দ্বারা শোভিত।"

প্রাচীরের উপরে প্যানেলের মাথায় প্যারাপেট ব্যবহৃত হয়েছে এবং ১৮৭৩-৭৪ সালে সংস্কারের সময় দেখা যায় যে, প্রতি প্রাচীরের ১৩টি অর্ধগম্বুজাকৃতি কুলুঙ্গী দ্বারা আবৃত। ১৫৫২ সালে সুলতান সোলায়মান প্রাচীরের সংস্কারের সময় এই কুলুঙ্গীগুলো থেকে যায়। অষ্টভুজের প্রতি প্রাচীরের উপরে প্যারাপেটের নিচে ৬টি পানি নিষ্কাশনের নল বা গারগইল (gargoyl) নির্মিত হয়।

কুব্বাতু'স সাখরার প্রধান আকর্ষণ গম্বুজ যা বৃত্তাকার বেষ্টনীর উপর নির্মিত হয়েছে। গম্বুজ ছাড়া আচ্ছাদনে রয়েছে ঢালু ছাদ। কাঠের তৈরি এই ছাদ প্রথম ও দ্বিতীয় অষ্টভুজের উপর নির্মিত।

প্রবেশপথ :

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমদিকের প্রাচীরে নির্মিত চারটি সুদৃশ্য তোরণ বা পর্চ দিয়ে কুব্বাতু'স সাখরার অভ্যন্তরে যাওয়া যায়। পর্চগুলো ২৯১/২ ফুট প্রশস্ত এবং দেওয়াল থেকে ৯ ফুট সামনের দিকে উদ্‌গত। প্রতিটি তোরণের মধ্য দিয়ে প্রবেশপথ ট্যানেল

ভল্টের সাহায্যে নির্মিত। এই ভল্টটি দেওয়ালের দরজা পর্যন্ত ৮১/৪ ফুট বিস্তৃত। প্রধান প্রবেশপথের উভয় পাশে একটি ছোট কুঠুরী রয়েছে। এই কুঠুরীগুলো পরবর্তীকালে ষোড়শ শতাব্দীতে ভাণ্ডারকক্ষ হিসাবে সুলতান সোলায়মান ও সুলতান তৃতীয় মুরাদ নির্মাণ করেন। ভল্টের উপরে চালা ছাদের (gable roof) আচ্ছাদন রয়েছে। পর্চের মধ্য দিয়ে দরজায় পৌছাতে হয় এবং দরজাটি ২.৬০ মিঃ প্রশস্ত ও ৪.৩০ মিঃ উঁচু। প্রত্যেকটি দরজা লিনটেল (lintel) বা দুটি খাড়া স্তম্ভের উপর সমান্তরাল প্রস্তরখণ্ড বা সর্দল দিয়ে তৈরি। লিনটেলের উপরে অর্ধগোলাকার খিলান রয়েছে। কাঠের দরজাগুলো সমসাময়িককালে তৈরি করা হয়নি। সুলতান সোলায়মান তামা বা ব্রোঞ্জের নক্‌শা-করা কাঠের দরজাগুলো স্থাপন করেন।

কুব্বাতু'স সাখরার বৃত্তাকার এলাকার নিচে একটি গুহার মত প্রকোষ্ঠ দেখা যাবে। দক্ষিণ দিকের সিঁড়ি দিয়ে এই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলে একটি মিহরাব লক্ষ করা যাবে। মিহরাবটি খুবই আকর্ষণীয় কারণ সামান্য গভীর, প্রায়-চ্যাপটা এ ধরনের মিহরাব সচরাচর দেখা যায় না। তিনটি খাঁজবিশিষ্ট (trefoil) খিলানসম্বলিত মিহরাবটি দুটি প্যাঁচানো (spiral) স্তম্ভের সাহায্যে নির্মিত। সাধারণত সোলায়মানের মিহরাব নামে পরিচিত এই মিহরাবটি খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নির্মাণকাল :

'কুব্বাতু'স সাখরা' স্থাপত্যশিল্পের অনন্যসাধারণ নিদর্শন এবং সমসাময়িক শিল্পকলায় এর অবদান অসামান্য। আবদুল মালিক কর্তৃক ৬৯১-৯২ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এই অনিন্দ্যসুন্দর ও অত্যুৎকৃষ্ট মুসলিম স্মৃতিসৌধ নির্মাণ অসংখ্য স্থপতি, কারিগর ও কারুশিল্পীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সম্ভবপর হয়। প্রধান স্থপতি কে ছিলেন তা জানা না গেলেও দুজন স্থপতির নাম পাওয়া যায়, যথা রাজা ইবনে হাইওয়া এবং ইয়াজিদ ইবনে সাল্লাম। ষোড়শ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত কারুশিল্পী নিযুক্ত হয়েছিলেন এই ইমারতের টালির অলঙ্করণে তাঁরা হচ্ছেন আবদুল্লাহ তাব্রিজী (১৫৫১ খ্রীঃ) এবং মুহম্মদ দরবীশ (১৮১৭ খ্রীঃ), ইউসুফ আমীন (১৮১৭ খ্রীঃ) ইত্যাদি।

অলঙ্করণ :

কারুকার্যের অভিব্যক্তি ও সৃজনশীলতায়, সূক্ষ্ম শৈল্পিক চাতুর্য, আঙ্গিক সৌষ্ঠব ও বিভিন্ন ধরনের নক্‌শাবলী এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ সাজসজ্জায় 'কুব্বাতু'স সাখরা' মুসলিম স্থাপত্যে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমারত ও বিস্ময়। ভ্যান বেরচাম এই ইমারতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন যে, এর মাহাত্ম্য ও সুষমাপূর্ণ গঠনের জন্য সুনিপুণ অথচ সাধারণ ভূমি-পরিকল্পনা এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য বিশেষভাবে দায়ী। 'কুব্বাতু'স সাখরার' অষ্টভুজ প্রাচীরের নিম্নাংশে মসৃণ সাদা মার্বেল এবং উপরিভাগ নানা রঙের মোসাইক দ্বারা শোভিত ও অলঙ্কৃত ; অষ্টভুজের প্রতি বাহু ও ড্রামের 'জালির' জানালাগুলোতে পরে মিনাকরা টালির ব্যবহার দেখা যায়। পাথরের জালির জানালাগুলোই (grill) বাইরের দিকে মিনাকরা টালি ও নানা রঙের কাচের সাহায্যে সুশোভিত। ইবনে আল-ফাকি বলেন, "এর দেওয়ালে ও ড্রামে ৫৬টি জানালার বিভিন্ন রঙের কাচ দিয়ে মিনাকরা
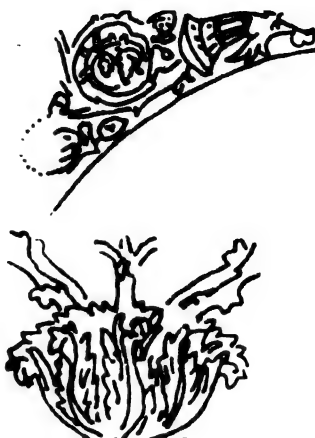
রেখাচিত্র : ৭৩ (ক-গ) :
জেরুজালেম, কুব্বাতুস সাখরা, অলঙ্করণ

হয়।" প্রবেশপথের ভল্টও সোনা ও রঙীন কাচ দিয়ে নক্‌শা করা ছিল। দরজাগুলোর প্রতি সমান্তরাল পাথরখণ্ডের (lintel) নিম্নদিকে (soffit) তামা অথবা সীসার পাত দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। সূক্ষ্ম খোদাই-করা (en-repousse) এই পাতগুলোর নক্‌শাবলীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আঙুরের থোকা। দ্রাক্ষার লতাপাতা ও একান্থাস পাতা।

জেরুজালেমের এই জমকালো ইমারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে কারুশিল্পের উৎকর্ষ লক্ষ করে মুগ্ধ হতে হয়। বিভিন্ন ধরনের মালমসলার সঙ্গে বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপসজ্জার এরূপ অপূর্ব সমাবেশ ও সমন্বয় খুব কমই দেখা যায়। সাধা চকচকে মার্বেল, নানারকমের প্যানেল, মসৃণ স্তম্ভের উপর গিলটি করা অগ্রভাগ (gilt capital), জ্যামিতিক ও লতাপাতার নক্‌শা, নীল, সবুজ, সোনালী ও বহু মূল্যবান পাথর (mother of pearl)-এর কারুকার্য, মিনাকরা টালির ব্যবহার মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করেছে।

স্তম্ভগুলো সাধারণত দুই প্রকারের (ক) করিন্থীয় (খ) বিবিধ, অর্থাৎ করিন্থীয় ও ডোরিক-এর সংমিশ্রণ। থাম ও স্তম্ভগুলোকে সংযুক্ত করে যে কাঠের বন্ধনী রয়েছে দরজার lintel-এর মতো সেগুলো তামা ও সীসার পাত দিয়ে মোড়ানো। বিভিন্ন

ধরনের জ্যামিতিক ও লতাপাতার নক্‌শা করা হয়েছে একই পদ্ধতিতে। শিল্প চাতুর্যের অতুলনীয় প্রকাশ ঘটেছে মধ্যবর্তী একটি কাণ্ড থেকে কুণ্ডলাকৃতি দ্রাক্ষার লতাপাতা ও ঝুলন্ত আঙুরের পুচ্ছে নক্‌শাসম্বলিত বন্ধনীতে। এই ধরনের নক্‌শা পরবর্তীকালে মাসাত্তা, সামাররা ও নাইনে দেখা যাবে। একটি আকর্ষণীয় নক্‌শা হচ্ছে বন্ধনীর উপরে খিলানগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে (spandrel) লতাপাতাসমেত একধরনের গাছ। সাধারণত এটিকে candelabra নক্‌শা বলে মনে করা হয়। খিলানগুলোর সামনে এবং নিম্নভাগে নানা ধরনের নক্‌শার ব্যবহার রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মূল্যবান পাথর ও নানা ধরনের রঙের দ্বারা নক্‌শাবলীর মাধুর্যবৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। খিলানগুলোর উপরে কুফী পদ্ধতিতে শিলালিপির একটি প্রশস্ত ফলক দেখা যাবে।

স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য :

মুসলিম স্থাপত্যকলার অনন্যসাধারণ সৃষ্টি এবং ইসলামের অন্যতম প্রধান প্রতীকী কুব্বাতু'স সাখরার স্থাপত্যিক উপকরণের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যায়। ভূমি-পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন উপাদানের উৎপত্তিস্থল ও বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন গবেষকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন।

De Vogue মত প্রকাশ করেন যে, 'কুব্বাতু'স সাখরা'র ভূমি-পরিকল্পনা বায়জানটাইন স্থাপত্যকলা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বসরা ও ঈযরার বায়জানটাইন গির্জার উল্লেখ করেন এবং একথাও বলেন যে, এই সমস্ত গির্জায় এন্টিওকে নির্মিত অষ্টকোণাকার মঠের অনুকরণ দেখা যায়। এ ছাড়া অবশ্য রোমের সান্টা কস্টানযার গোলাকৃতি সমাধিও উল্লেখ করা যায়। Adler মনে করেন যে, কুব্বাতের ভূমি-নক্‌শায় জেরুজালেমে নির্মিত যীশুখ্রীস্টের সমাধি গির্জা অ্যানাস্টাসিসের প্রভাব রয়েছে; অপরদিকে Dehio এবং Von Bezold বলেন যে, কুব্বাতের ভূমি-নক্‌শা অ্যানাস্টাসিস এবং জেরুজালেমের মাউন্ট অলিভস্‌-এ নির্মিত অ্যাসেনসন গির্জা দ্বারা প্রভাবান্বিত। হাটম্যান মন্তব্য করেন যে, এর পরিকল্পনা ক্লাসিক্যাল যুগের বহুলপ্রচলিত মধ্যবর্তী গম্বুজবিশিষ্ট বৃত্তাকারকে বেষ্টিত করে একটি অষ্টভুজের অনুকরণ। Ashbee বলেন যে, হাড্রিয়ান জুপিটারের সম্মানার্থে যে মন্দির নির্মাণ করেন তার ভূমি-পরিকল্পনা সম্ভবত কুব্বাতের নির্মাণকৌশলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু ক্রেসওয়েল এই মতের বিরোধিতা করে বলেন যে, হাড্রিয়ান আদৌ জুপিটারের মন্দির নির্মাণ করেন কিনা সঠিকভাবে বলা যায় না।

রিভয়রা 'কুব্বাতু'স সাখরা' রোমীয় প্রভাবে সৃষ্ট ইমারত বলে মন্তব্য করেন এবং তাঁর মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য কতিপয় রোমীয় ইমারতের পরিকল্পনার উল্লেখ করেন। রোমীয় সমাধিসৌধের মূল বৃত্তাকার গম্বুজবিশিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে কুব্বাতে'র নির্মাণকাজ সমাধা হয়েছে বলে যে মন্তব্য করেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। রিভয়রা হাড্রিয়ানের বিশালাকার প্যানথিয়ন (দেবদেবীর মন্দির : ১২০–৪ খ্রীঃ) এবং Nymphaeum (২৫৩–৬৮ খ্রীঃ)-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর যুক্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান। অবশ্য তিনি চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত সান্টা কস্টানযারও উল্লেখ করেন।

'কুব্বাতু'স সাখরার' মূল ভূমি-পরিকল্পনার প্রধান উৎস কি তা বিশ্লেষণে ক্রেসওয়েল কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অভ্যন্তরীণ বৃত্তাকার বেষ্টনী পরপর দুটি অষ্টকোণাকার এলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত এরূপ ভূমি-পরিকল্পনার নিকটতম সাদৃশ্য ও পূর্বসূরী নিয়ে গবেষকগণ আলোচনা করেছেন। যে কয়েকটি সম্ভাব্য উদাহরণ উল্লেখ করা যায় তা হচ্ছে :

(ক) রোমে নির্মিত সান্টা কস্টানযার সমাধি (Santa Costanza) (৩২৪–২৬ খ্রীঃ)। এই সমাধিসৌধের ভূমি-নক্‌শা হচ্ছে পরপর দুটি বৃত্তাকারবেষ্টিত এলাকা।

(খ) জেরুজালেমে নির্মিত যীশুখ্রীস্টের পবিত্র সমাধিসৌধের গির্জা (Church of Holy Sepulchre)-এর Anastasis অর্থাৎ সমাধির অংশবিশেষ। সান্টা কস্টানযার মতো এই ইমারতটিতেও পরপর দুটি বৃত্তাকার গম্বুজ রয়েছে।

(গ) জেরুজালেমে নির্মিত অ্যাসেনসন গির্জা (Church of the Ascension) (৩৭৮ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে)। এই ইমারত একটু ব্যতিক্রমধর্মী কারণ প্রথম অভ্যন্তরীণ বৃত্তাকার একটি অষ্টভূজ দ্বারা বেষ্টিত।

(ঘ) বোসরায় নির্মিত গির্জা (Cathedral of Bosra) (৫১২-১৩ খ্রীঃ)। এই গির্জাটি 'কুব্বাতু'স-সাখরার' মতো প্রথমটি বৃত্তাকার এবং দ্বিতীয় বেষ্টনীটি অষ্টভূজাকৃতি কিন্তু 'কুব্বাতের' মতো তৃতীয় বেষ্টনীটি অষ্টভূজের স্থলে বৃত্তাকার।

কুব্বাতু'স সাখরার ভূমি-নক্‌শার ক্রমবিবর্তনে Vincent এবং Abel সান্টা কস্টানযা এবং অ্যানাস্টাসিসের অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কনস্টানটাইন রোমে সান্টা কস্টানযা নামে যে গোলাকার ইমারত নির্মাণ করেন, পরবর্তীকালে তিনিই তার অনুকরণে সিরিয়ার জেরুজালেমে অ্যানাস্টাসিসের সৃষ্টি করেছেন। তিনি মনে করেন যে, রোমে গোলাকার ইমারতের যে ধারা প্রথম প্রবর্তিত হয় সিরিয়ায় তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায় এবং পরবর্তীকালে 'কুব্বাতু'স সাখরায়' এর চরম উৎকর্ষ প্রকাশ পায়। ক্রেসওয়েল এই উক্তির সমালোচনা করে বলেন যে, সিরিয়ার ইমারতে বৃত্তাকার এলাকা এবং গম্বুজের মধ্যে নিখুঁত জ্যামিতিক পরিমাপে সামঞ্জস্য সাধনের প্রচেষ্টা হয়েছে যা রোমের ইমারতে হয়নি। অন্য কথায় অ্যানাস্টাসিসের সঙ্গে কুব্বাতু'স সাখরার সাদৃশ্য রয়েছে বিশেষত দুটি ক্ষেত্রে : প্রথমত, অভ্যন্তরীণ বৃত্তের পরিমিতি কুব্বাতু'স সাখরার পরিমিতি ৬৭ ফুট। অ্যানাস্টাসিসের ৬৭-৬৭১/৫ ফুট এবং প্রসঙ্গত অ্যাসেনসন গির্জার পরিমিতি একই। দ্বিতীয়ত, 'কুব্বাতু'স সাখরা' এবং অ্যানাস্টাসিসের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে ড্রামের পরিমাপে, এই উভয় ইমারতে ড্রামের ভিত্তিভূমি (base) থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত উচ্চতা ব্যাসের সমান। ক্রেসওয়েল বলেন যে, কুব্বাতের পরিকল্পনায় গম্বুজের পরিমিতি এবং ব্যাসের ক্ষেত্রে অ্যানাস্টাসিসের দ্বারা প্রভাবান্বিত ; কিন্তু ভূমি-নক্‌শা ও পরিকল্পনার বিন্যাস বোসরার গির্জার প্রভাব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা খুবই সঙ্গত হবে যে, 'কুব্বাতু'স সাখরার' পূর্বে সিরিয়ার বোসরা গির্জায় সর্বপ্রথম দুটি প্রদক্ষিণ-বেষ্টনী (double ambulatory) ব্যবহৃত হয়েছে। বোসরা গির্জার অভ্যন্তরে বৃত্তাকারটি প্রথমে একটি অষ্টভুজ এবং পরে আর একটি বৃত্তাকার এলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ক্রেসওয়েলের

অভিমত এই যে, 'কুব্বাতু'স সাখরা'র ভূমি-পরিকল্পনায় রোমের সান্টা কস্টানযা অপেক্ষা সিরিয়ার বোসরা গির্জার প্রভাব অত্যধিক। সিরিয়ার বায়জানটাইন নক্‌শা কুব্বাতের বৃত্তাকার বেষ্টনীর (annular rotunda) ক্রমবিবর্তনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে।

তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, কুব্বাতু'স সাখরার দ্বিতীয় অষ্টভুজের পরিমিতি (৫১১/২ ফুট) অ্যাসেনসন গির্জার বহিঃপ্রাচীরের সমান, অর্থাৎ ৫১৩/৪ ফুট। উল্লেখ্য যে, সিরিয়ার সর্বপ্রথম অষ্টভুজাকৃতি ইমারত হচ্ছে অ্যাসেনসন গির্জা। যদিও স্ট্রাইগস্‌কী এবং গাটরুড বেল মনে করেন যে, অষ্টাভুজাকৃতি ইমারতের উৎপত্তি হয়েছে পূর্বদেশীয় অঞ্চলে অর্থাৎ সিরিয়ায় কিন্তু অভ্যন্তরীণ বৃত্তাকারকে বেষ্টিত অষ্টভুজ ইমারত রোমীয় যুগে দেখা যায়, যেমন– সেন্ট র‍্যাভেন্নায় গ্যালো-রোমান অষ্টভুজ মন্দির। কিন্তু কুব্বাতের বৃত্তাকারকে বেষ্টিত করে পরপর দুটি অষ্টভুজাকৃতি প্রদক্ষিণপথের যে নক্‌শা তা রোমে দেখা যায় না। এই পরিকল্পনার মূল উৎস বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হবে যে, রোমের সান্টা কস্টানযা এবং জেরুজালেমের অ্যানাস্টাসিসে পরপর দুটি বৃত্তাকার রয়েছে। অ্যাসেনসন গির্জায় বৃত্তাকারকে ঘিরে অষ্টভূজ রয়েছে এবং একমাত্র বোসরা গীর্জায় বৃত্তাকার অষ্টভুজ ও পরে বৃত্তাকার বেষ্টনী ব্যবহৃত হয়েছে। সবদিক দিয়ে বিচার করলে প্রমাণিত হয় যে কুব্বাতু'স সাখরার সর্বাপেক্ষা নিকটতম সাদৃশ্য হচ্ছে বোসরার গির্জা। কুব্বাতের সঙ্গে অ্যানাস্টাসিসের অপর একটি মিল দেখা যাবে অভ্যন্তরে অমসৃণ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড যার উপর ভিত্তি করে ইমারত নির্মিত হয়েছে। চতুর্থ শতাব্দীতে ইউসেবিয়াস (Eusebius) অ্যানাস্টাসিসের বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, এই ইমারতের মধ্যস্থলে একটি অমসৃণ বিশাল পাথর রয়েছে এবং এর নিম্নাংশে একটি গুহা ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে মালিক আযীয ওসমান কর্তৃক পাথরের চারিদিকে রেলিং এবং লোহার জালি স্থাপনের পূর্বে 'কুব্বাতুস সাখরার' পাথরখণ্ড অ্যানাস্টাসিসের মতোই ছিল। কুব্বাতু'স সাখরার সঙ্গে অ্যাসেনসান গির্জার যে সাদৃস্য দেখা যায় তা পাথরের উপর পদচিহ্নের। কুব্বাতু'স সাখরার পাথরে রসুলে করীম মিরাজ বা ঊর্ধ্বগমনের সময় যে পদচিহ্ন রাখেন তার সঙ্গে অ্যাসেনসন গির্জার মধ্যবর্তী পাথরে যীশুখ্রীস্টের স্বর্গারোহণের সময় পদচিহ্নের মিল রয়েছে।

অ্যানাস্টাসিসের সঙ্গে কুব্বাতের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যগুলোর তুলনামূলক আলোচনায় প্রতীয়মান হবে যে, স্তম্ভরাজি এবং পিয়ারগুলোর বিন্যাসে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। কুব্বাত বৃত্তাকার বেষ্টনীতে ৪টি পিয়ার এবং উভয় পাশে ৩টি করে মোট ১২টি স্তম্ভ আছে। অনুরূপভাবে কুব্বাতের বহু পূর্বে নির্মিত অ্যানাস্টাসিসে পিয়ার এবং স্তম্ভের পরস্পর বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে ৪টি পিয়ারের স্থলে একজোড়া করে মোট ৮টি পিয়ার দেখা যাবে। স্তম্ভের সংখ্যা একইরূপ, অর্থাৎ ১২টি।

ক্রেসওয়েল বলেন যে, কুব্বাতু'স সাখরায় গলিত সীসার উপর স্তম্ভ স্থাপনের পদ্ধতি অতি প্রাচীন এবং বায়জানটাইন স্থাপত্যে বহুলপরিচিত। চয়সী মনে করেন যে, অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের পশ্চিমে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়নি এবং পূর্বাঞ্চলীয় উৎসের কথা উল্লেখ করে কতিপয় উদাহরণ দেন, যেমন– বেথেলহেমের নেটিভিটি গির্জা (Church

of the Nativity) এবং কনস্টানটিনোপলের সারগীয়াস (Sergius), বাক্কাস (Bacchus) এবং সান্টা সোফিয়া (Sancta Sophia)। কুব্বাতু'স সাখরায় স্তম্ভরাজিগুলোও সীসার উপর স্থাপিত হয় এবং যাতে সীসা চাপের ফলে বেরিয়ে যেতে না পারে তার জন্য ধাতুর তৈরি বন্ধনী ছিল। বর্তমানে এ ধাতুর বন্ধনীর কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় অষ্টভুজে স্তম্ভরাজি এবং পিয়ারগুলোর মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী কাঠের বন্ধনীর ব্যবহার কুব্বাতু'স সাখরার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যিক উপাদান। মনে করা হয় যে, রোমের ল্যাটারন ব্যাপটিস্ট্রি (Latern Baptistry)-তে ব্যবহৃত তামার পাত দিয়ে মোড়া বন্ধনী 'কুব্বাতে'র বন্ধনী নির্মাণে প্রভাব বিস্তার করে। রোমের এই ইমারতে স্তম্ভ থেকে স্তম্ভে বন্ধনীর প্রয়োগ ও তার উপরে চাপহ্রাসকারী খিলানরাজির (Relieving arch) সঙ্গে কুব্বাতু'স সাখরায় ব্যবহৃত উপকরণের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। বন্ধনী প্রসঙ্গে গবেষকদের মধ্যে নানারূপ মতবাদ প্রচলিত আছে; ডিভো (De Vogue) মনে করেন যে, এই বৈশিষ্ট্যটি একটি মৌলিক অবদান; সালাদীনের মতে, এর উৎপত্তিস্থল পারস্য; স্ট্রাইগসকী বলেন যে, এটি একটি আরব উপকরণ, কিন্তু ক্রেসওয়েল যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, ইসলামের আবির্ভাবের এক শতাব্দী পূর্বে কনস্টানটিনোপলে নির্মিত সান্টা সোফিয়ায় বন্ধনীর ব্যবহার ছিল। সুতরাং কুব্বাতের বন্ধনী সান্টা সোফিয়ার অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে।

'কুব্বাতু'স সাখরার চারটি প্রবেশপথে অর্ধবৃত্তাকার খিলান ও লিনটেলের যে সমন্বয় দেখা যায় তার পূর্বসূরী সিরিয়ায় বহু গির্জায় রয়েছে। এই সমস্ত উদাহরণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ৩৫৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত নিসিবিনের 'ব্যাপটিস্ট্রি অব মার ইয়াকুব', পঞ্চম শতাব্দীর দাইর সিমানের নির্মিত কালাত সিমানের গির্জা, ৫৫৪ খ্রীস্টাব্দে জুয়ানিয়ার্স নির্মিত সেন্ট স্টিফেনের গির্জা। কিন্তু কুব্বাতের দরজার সঙ্গে সর্বাপেক্ষা নৈকট্য স্থাপন করেছে ৫১২-১৩ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত বোসরার গির্জা এবং ৫১৫-১৬ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এজরার সেন্ট জর্জের গির্জা। সুতরাং দরজার গঠন ও বিন্যাসে সিরীয় স্থাপত্যকলার প্রভাব বিদ্যমান।

পাথরের জালি জানালা কুব্বাতু'স সাখরার অন্যতম প্রধান স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য। এই অপূর্ব উপকরণ সিরিয়ার বহু ইমারতে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে। De Vogue বোসরায় প্রাপ্ত চারটি জালির মার্বেলের সন্ধান পান। এগুলো জানালা হিসাবে (lattice window) ব্যবহৃত হয়। কনস্টানটিনোপলে সান্টা সোফিয়া গির্জায় এ ধরনের জালির জানালা দেখা যাবে। সুতরাং কুব্বাতের জালির মার্বেল জানালাগুলো সিরীয় উদাহরণ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে করা যায়।

জানালাসম্বলিত ড্রামের উপর গম্বুজ নির্মাণপ্রথার উৎস নিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সর্বপ্রাচীন উদাহরণ দেখা যাবে ২৫৩-৬৮ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত Nymphaeum অথবা Minerva Medica এবং রোমের সেন্ট হেলেন্নার সমাধি

১। EMA, pp. 49-50

(Mausoleum of St. Hellina) (চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধে)। সান্টা কস্টানযার সমাধিতেও জানালাসম্বলিত ড্রামের উপর গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। সিরিয়ার অনুরূপ উদাহরণ দেখা যাবে এজরার সেন্ট জর্জের গির্জা (৫১৫ খ্রীঃ) এবং বোসরার গির্জায় (৫১২-১৩ খ্রীঃ)। সুতরাং খুবই স্বাভাবিক যে কুব্বাতু'স সাখরার স্থপতিগণ ড্রাম নির্মাণে সিরিয়ার গির্জা দ্বারা প্রভাবান্বিত হন।

গম্বুজ নির্মাণে কাঠের ব্যবহার কোথায় সর্বপ্রথম প্রচলন হয় তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা দুরূহ হলেও কুব্বাতু'স সাখরার কাঠের গম্বুজের পূর্বসূরী সিরিয়ার গির্জা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত গাযার দেবমন্দির (Marneion), ৩৩৫ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত অ্যানাস্টাসিস এবং কালাত সিমানে পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত সেন্ট সাইমিয়নের গির্জায় কাঠের গম্বুজ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম দুটি উদাহরণে গম্বুজের আকৃতি ঈষৎ কৌণিক (conical) হলেও সাইমিয়নের গির্জায় নির্মিত গম্বুজটি কুব্বাতু'স সাখরার মতো গোলার্ধের অনুরূপ; অবশ্য এ ধরনের গম্বুজ বোসরা এবং এজরার গীর্জায় লক্ষ করা যায়। ক্রেঙ্কার (Krencker) ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে সিমানের ধ্বংসপ্রাপ্ত গির্জায় গবেষণা করে তথ্য আবিষ্কার করে বলেন যে, যদিও ৫২৬ সালে ভূমিকম্পে গির্জাটির গম্বুজ পড়ে যায় তবুও গম্বুজের আকৃতি ও পরিমিতি কুব্বাতু'স সাখরার মত ছিল। যুক্তিস্বরূপ ক্রেঙ্কার বলেন যে, কুব্বাতের গম্বুজের ব্যাস ৬৭ ফুট এবং সাইমিয়নের ৮৮ ১/২ ফুট। ক্রেসওয়েল বলেন যে, গম্বুজ পড়ে গেলেও নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, স্থপতি গির্জার জন্য একটি কাঠের গম্বুজ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন এবং ড্রামের সাহায্যে যে গম্বুজ নির্মাণের প্রয়াস পান দুইশত বছর পরে জেরুজালেমে কুব্বাতু'স সাখরায় তা প্রয়োগ করা হয়।

দ্বি-গম্বুজ নির্মাণের প্রচলন সম্পর্কে বলা যায় যে, অ্যানাস্টাসিসের অভ্যন্তরীণ গম্বুজটি আর একটি বাইরের আচ্ছাদন দিয়ে ঘেরা আছে এবং এই দুটি আচ্ছাদনের (shell) মধ্যে এমন খোলা জায়গা আছে যে, একজন মানুষ চলাফেরা করতে পারে। দ্বি-গম্বুজ নির্মাণের এই প্রথা পরবর্তীকালে কুব্বাতু'স সাখরায় দেখা যাবে। অ্যানাস্টাসিসের গম্বুজের সঙ্গে কুব্বাতের প্রভেদ হচ্ছে যে কুব্বাতের দুটি গম্বুজই অর্ধগোলার্ধের (hemispherical) ন্যায় কিন্তু অ্যানাস্টাসিসের বাইরের গম্বুজের আকৃতি কৌণিক (conical)।

কুব্বাতু'স সাখরার গম্বুজে স্বর্ণদ্বারা অলঙ্করণের প্রথা রোমীয় পদ্ধতির অনুকরণ বলা হয়, যেমন— প্যান্থিয়ন (Pantheon) (১২০–২৪ খ্রীঃ)। রোমীয় উদাহরণে স্বর্ণমণ্ডিত ব্রোঞ্জের পাত দিয়ে মোড়া। কুব্বাতু'স সাখরা নির্মাণের পূর্বে অবশ্য আর একটি সর্বপ্রচীন দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় সপ্তম শতাব্দীতে, খলিফা আবদুল মালিকের ভ্রাতা আবদুল আযীয় ৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে ফুসতাতে স্বর্ণখচিত গম্বুজবিশিষ্ট একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

অলঙ্করণ পদ্ধতি কুব্বাতু'স সাখরাকে একটি অভিনব স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ইতিপূর্বে অপর কোনো মুসলিম ইমারতে বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়নি। এক্ষেত্রে মোসাইকের ব্যাপক ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অভ্যন্তরে বা

বাইরে যে মোসাইকের অলঙ্করণ ইমারতটিকে সুষমামণ্ডিত করেছে তা সিরিয়ায় নির্মিত বায়জানটাইন গির্জার মোসাইকের অনুকরণ। ক্রেসওয়েল[১] বলেন যে, রোমে ৪৫০ খ্রীস্টাব্দে সেন্ট পিটারের গির্জায় মোসাইকের প্রয়োগ দেখা গেলেও মুসলমানগণ বেথেলহেমের Church of the Nativity থেকেই ধারণা লাভ করে। অপর একটি সিরিয়ার উদাহরণ পাওয়া যায় ইয়াকুতের বর্ণনায়। ইবনে বুতলানের উদ্ধৃতি দিয়ে ইয়াকুত বলেন যে, রুসাফায় স্বর্ণমণ্ডিত মোসাইক দ্বারা শোভিত একটি বিশাল গির্জা নির্মিত হয়। মোসাইকের (ফুসাইফিসা) ব্যবহারে যে সিরীয় প্রথার প্রভাব রয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। উমাইয়া স্থাপত্যে বায়জানটাইন প্রভাব থাকা স্বাভাবিক ছিল। খলিফার অনুরোধে বায়জানটাইন সম্রাট মোসাইক-শিল্পী এবং কারিগর সরবরাহ করতেন এবং সিরীয় ও মিশরীয় দক্ষ কারুশিল্পী কুব্বাতের অলঙ্করণে অংশগ্রহণ করেন।

ক্রেসওয়েল বলেন যে, কুব্বাতু'স সাখরার কাঠের বন্ধনীতে ব্রোঞ্জের পাতে যে নক্‌শা দেখা যায় তা বায়জানটাইন-সিরীয়। একই প্রভাব দেখা যাবে গম্বুজের পিয়ারের কার্নিশে। কেন্দ্রবিন্দুতে ছোট কুঁড়িসহ একান্থাসের ব্যবহার ষষ্ঠ শতাব্দীতে আলবারায় নির্মিত পিরামিড আকৃতির একটি সমাধিতে লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া কালা'য়াত সিমিয়ানস্থিত সেন্ট সাইমনের গির্জাতে অনুরূপ অ্যাকান্থাস নক্‌শা রয়েছে। ক্রেসওয়েলের ভাষায়, "The external coating of mosaic unrivalled in design, exceution and conservation are an amalgum of Roman Byzantine decoration motifs and Syrian decorative features in which vine plays a prominent part in Syrian ornament, bearing close resemblance to the decoration on the lid of a Sarcophagus of the Herodian period. This Syrian motif of ornament exercised a prominent influence in the design wrought in bronze and copper covering of the wooden tie beams of the Dome of the Rock."[২] জেরুজালেমে নির্মিত হেরোড ও নাইকোফেরিয়ার সমাধির স্তর শবাধারে দ্রাক্ষালতাভিত্তিক অলঙ্করণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের লতাপাতা, যেমন– cornucopiae (প্রাচুর্যশৃঙ্গ) পুষ্প, দ্রাক্ষা, অ্যাকান্থাস, গ্লাস মোসাইক, কাল্পনিক বৃক্ষ প্রভৃতি বায়জানটাইন অলঙ্করণরীতি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।[৩]

'কুব্বাতু'স সাখরায়' বিভিন্ন অলঙ্করণরীতির সমাবেশ দেখা যায়। ইসলামী পদ্ধতির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অ্যারাবেস্ক বা জ্যামিতিক নক্‌শা, শিলালিপি, যেমন– কুফী ও নস্‌খী। প্রাচীন পারস্য দেশীয় অলঙ্করণের মধ্যে রঙিন টালি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ডানা নক্‌শা, অর্ধচন্দ্র ও তারকার চিত্র সাসানীয় শিল্পকলাকে স্মরণ করিয়ে

১। A Short Account, p. 39.

২। EMA, pp 77–79

৩। হোসেন, এ. বি. এম. আরব স্থাপত্য, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ. ৫৮-৫৯

দেয়। বায়জানটাইন, সাসানীয় কপটিক প্রভাব 'কুব্বাতু'স সাখরাকে অসাধারণ ইমারতে রূপান্তরিত করেছে।

গুরুত্ব :

মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে কুব্বাতু'স সাখরার অবদান অপরিসীম। ইসলামের সর্বপ্রথম এবং সর্বোৎকৃষ্ট ইমারত হিসাবে কুব্বাতের বৈশিষ্ট্যগলি পরবর্তীকালেও প্রভাব বিস্তার করে। কুব্বাত শুধুমাত্র একটি অনন্যসাধারণ স্মৃতিসৌধ ও ধর্মীয় ইমারতই নয়, স্থাপত্যশিল্পের অনবদ্য সৃষ্টি এবং প্রতীক।

রিচমন্ড[১] বলেন, "The Dome of the Rock affords a good illustration of the increased familiarity brought about by the establishment of Islam, between the traditions of stone building and the traditions of brick and its derivatives. The Dome of the Rock is a stone building completely overlaid externally with a derivative of brick building." কুব্বাতু'স সাখরায় পশ্চিম এবং পূর্বদেশীয় স্থাপত্যিক ও অলঙ্করণের সমন্বয় হয়। একদিকে রোমীয়-বায়জানটাইন-সিরীয় উপকরণ অন্যদিকে প্রাচ্যদেশীয় টালির ঐতিহ্য এই ইমারতকে মহত্ত্ব দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, আবদুল মালিকের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সিরিয়ার অতুলনীয় ও কারুকার্যখচিত গির্জাগুলোকে ম্লান করে দিতে পারে এমন একটি সৌধ নির্মাণ করা এবং তিনি তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব রেখে গেছেন এই অত্যুৎকৃষ্ট ইমারতে যা রসুলে করীমের জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মিরাজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত। ডেভিড টালবট রাইস বলেন, "Some of the acanthus designs on the metal covering of the tie-beams are often closer to local than to purely Byzantine forms, while other decorative motifs on these, as well as those of the mosaics are as much to Sassanian Persia as to Byzantine art."[২] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ষোড়শ শতাব্দীতে সুলতান সোলায়মানের রাজত্বে মিনাকরা টালি দ্বারা কুব্বাতের অষ্টভুজাকৃতি বাইরের প্রাচীর আচ্ছাদিত হয়।[৩]

পি. কে. হিট্টি বলেন, "To the Moslems the Dome of the Rock is more than a place of archaelogical interest and artistic value. It is a living symbol of their faith." মুসলিম স্থাপত্যে সর্বপ্রাচীন বিদ্যমান ইমারত অমুসলমান অঞ্চলে ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিজয়ের প্রতীক এবং সেইসঙ্গে স্থাপত্যিক বিস্ময়ও বটে। রসূল করীমের পবিত্র পদচিহ্নের সংরক্ষণার্থে মূলত সৃষ্ট হলেও এই ইমারত মুসলিম জনগণের নিকট মসজিদরূপে সমাদৃত এবং পরবর্তীকালে মুসলিম স্থাপত্যের বিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের

১। Richmond, op. cit, pp. 70–72

২। Rice, D. T., Islamic Art, London, 1965, p. 11.

৩। A Short Account, p. 31.

আকর্ষণীয় ঐতিহ্যসম্বলিত 'কুব্বাত' প্রকৃতপক্ষে এমন একটি ইমারত যার আকৃতি ও বিভিন্ন উপাদান পরবর্তী সময়ে অসংখ্য মসজিদ, মাযার, সৌধ ও প্রাসাদে ব্যবহৃত হয়। প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে (ক) অষ্টাভুজাকৃতি ভূমি-পরিকল্পনা ; (খ) দ্বি-গম্বুজ (গ) খাঁজকাটা গম্বুজ (ঘ) রসূলের পবিত্র পদচিহ্নসম্বলিত পাথরকে কেন্দ্র করে নির্মিত কদম রসূল (ঙ) মোজাইকের ব্যবহার (চ) মিনাকরা টালির ব্যবহার (ছ) দ্রাক্ষা-লতাপাতা-আকান্থাস প্রভৃতি উপাদানের অলঙ্করণ।

'কুব্বাতু'স সাখরার' অনুকরণে পরবর্তীকালে অষ্টভুজাকৃতি ইমারত তৈরি হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কুব্বাতু'স সুলাইবীয়া, সামাররার নির্মিত আব্বাসীয় খলিফা আল-মুনতাসির, আল-মুতায এবং আল-মুহতাদীর সমাধিসৌধ। কুব্বাতু'স সুলাইবিয়াতে পরপর দুটি অষ্টভুজাকৃতি প্রাচীর রয়েছে যা কুব্বাতু'স সাখরার অনুকরণ। অষ্টকোণাকার সৌধ নির্মাণের যে রীতি জেরুজালেমে প্রতিষ্ঠিত হয় তা ভারতবর্ষ, ইরান ও তুরস্কে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ইরানের নাখশিভানে নির্মিত ইউসুফ ইবনে কাছীরের সমাধি (১১৬১-২ খ্রীঃ), সুলতানিয়ায় নির্মিত সুলতান ওলজাইতু খোদাবান্দার সমাধি (১৩০৭–১৩ খ্রীঃ), তুরস্কের ভানে একটি ছোট সমাধি (ত্রয়োদশ শতাব্দী)।[১] ভারত উপমহাদেশের ইসলামী স্থাপত্যকলায় অষ্টকোণাকার সমাধির নজির অসংখ্য রয়েছে। সর্বপ্রাচীন অষ্টকোণাকৃতি ইমারত হচ্ছে মুলতানের রুকুন-ই-আলমের সমাধি (১৩৪০ খ্রীঃ)। তুগলক, সৈয়দ ও লোদী ও মুঘলযুগে অষ্টভুজাকৃতি সমাধিনির্মাণ স্থাপত্যরীতিতে পরিণত হয়, যেমন-- খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীর সমাধি (চতুর্দশ শতাব্দী), মোবারক সাহের সমাধি (চতুর্দশ শতাব্দী), সিকান্দর লোদীর সমাধি (পঞ্চদশ শতাব্দী) ও শের শাহের সমাধি, সাসারাম (ষষ্ঠদশ শতাব্দী)। উল্লিখিত প্রথম তিনটি সমাধিই দিল্লীতে অবস্থিত। অষ্টকোণাকার সমাধি নির্মাণের যে প্রথা প্রচলিত হয় তা মুঘলযুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করে বিশেষ করে, দিল্লীতে নির্মিত বাদশাহ হুমায়ূনের সমাধি (ষষ্ঠদশ শতাব্দী) এবং সম্রাট শাহ্জাহানের অমর কীর্তি আগ্রার তাজমহলে (সপ্তদশ শতাব্দী)।[২]

পরপর দুটি আচ্ছাদনের (shell) উপর দ্বি-গম্বুজ নির্মাণে কুব্বাতু'স সাখরায় সর্বপ্রাচীন জ্ঞাত উদাহরণ প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তীকালে এ ধরনের দ্বি-গম্বুজ নির্মাণের কৌশল মুসলিম স্থাপত্যের বহু ইমারতে ব্যবহৃত হয়েছে। স্থাপত্যিক ভারসাম্য সৃষ্টি এবং ইমারতকে সুষমামণ্ডিত অঙ্গসৌষ্ঠব্য দানের জন্য পরপর দুটি গম্বুজ সৃষ্টি করা হয়। আর্থার উপহাম পোপ বলেন, "Double shell domes were a necessity and were early achieved. One of the noble structures in Islam, the Dome of the Rock in Jerusalem, had a double wooden dome and several shrines in Iraq had double teak wood domes."[৩] দুটি আচ্ছাদনবিশিষ্ট

১। Derek Hill and Oleg Grabar, Islamic Architecture and its decoration, p. 67. big. 375.

২। Grover, S. The Architecture of India, Islamic, New Delhi, 1981, pp. 47, 141, 156.165. 195.

৩। Pope, A.U., Persian Architecture, London, 1965, p. 262.

সেলজুক আমলে দ্বি-গম্বুজের প্রচলন ইরাক, ইরান ও ভারত-উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। চতুর্দশ শতাব্দীতে জিয়ারতে নির্মিত ক্ষুদ্রাকার সমাধিটিতে ইটের তৈরি দ্বি-গম্বুজ রয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে সুলতানিয়ায় নির্মিত ওলজাইতুর সমাধিটি দ্বি-গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। ইরানে দ্বি-গম্বুজের চরম উৎকর্ষ দেখা যাবে তুসের সমাধিতে (চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)। ভারত-উপমহাদেশে দ্বি-গম্বুজ ব্যবহৃত হয়েছে হুমায়ূনের সমাধিতে এবং তাজমহলে।[১]

কুব্বাতু'স সাখরার বাহির এবং ভিতরের গম্বুজের আচ্ছাদন খাঁজকাটা (ribbed) রয়েছে। এ ধরনের খাঁজকাটা গম্বুজের প্রচলন সম্ভবত এই ইমারতে সর্বপ্রথম লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে এর অনুকরণে মুসলিম ইমারতে গম্বুজের নির্মাণে খাঁজ বা rib সৃষ্টি করা হয়। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়, যেমন– নবম শতাব্দীতে পুনর্নির্মিত কায়রোয়ান মসজিদের গম্বুজ, সমরকন্দে নির্মিত আমীর তৈমুরের সমাধি (১৪৩৪ খ্রীঃ) ও দিল্লীর লালকেল্লায় আওরঙ্গজেব নির্মিত মতি মসজিদের গম্বুজসমূহ।

কুব্বাতু'স সাখরা পরবর্তীকালে স্মৃতিসৌধ নির্মাণে দিক্‌নির্দেশকের কাজ করে। পবিত্র পাথরে রসূলে করীমের পায়ের ছাপ থাকায় আব্দুল মালেক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে একটি সৌধ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এই প্রথা কদম রসূল নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে গৌড়ে এবং ঢাকার নিকট নবীগঞ্জে কদম রসূল নামে যে অপূর্ব সুন্দর স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে তা কুব্বাতেরই উত্তরসূরী।

মোজইক বা ফুসাইফিসার ব্যবহারে কুব্বাতু'স সাখরা অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে। বায়জানটাইন প্রভাবে মোসাইকের অলঙ্করণ হয়েছে, যা পরবর্তীকালে অনেক মুসলিম ইমারতেই ব্যবহৃত হয়েছে। Papadopoulo বলেন, "Simply put, the Dome of the Rock as a Muslim monument and the first Muslim example of its type, as well as the first to profit from all the technical and artistic possibilities of Byzantine architecture, will be considered as an archetype and constant lesson in architecture with regard to both its overall plan and its individual elements."[২] মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে কুব্বাতেই সর্বপ্রথম মোজাইকের অলঙ্করণরীতি প্রবর্তিত হয়। এর প্রভাব দেখা যাবে পরবর্তীকালে উমাইয়া যুগের অনেক ইমারতে। গ্লাস মোজাইকের ব্যবহার দেখা যাবে আল-ওয়ালিদের নির্মিত দামিস্কের মসজিদে। এছাড়া জালির জানালার (marble grills) যে প্রয়োগ দামিস্ক মসজিদে লক্ষ করা যায় তাও কুব্বাতুস্ সাখ্‌রার জানালার মত।[৩] দামিস্ক মসজিদের মার্বেলের প্যানেলে কুব্বাতের প্রভাব খুব স্পষ্ট। কুব্বাতু'স সাখরার অলঙ্করণে যে সমস্ত উপাদান ইমারতের জৌলুস সৃষ্টি করেছে তার

১। Grover, p. 213.

২। Papadopoulo, A. Islam and Muslim Art, London, 1980, p. 243.

৩। A Short Account, p. 50.

মধ্যে দ্রাক্ষা লতাপাতা (vine scroll) প্রধান। এই উপাদান পরবর্তীকালে মাসাত্তা, সামাররা, কায়রোয়ান এবং নাইনে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রেসওয়েলের[১] ভাষায়, "Here
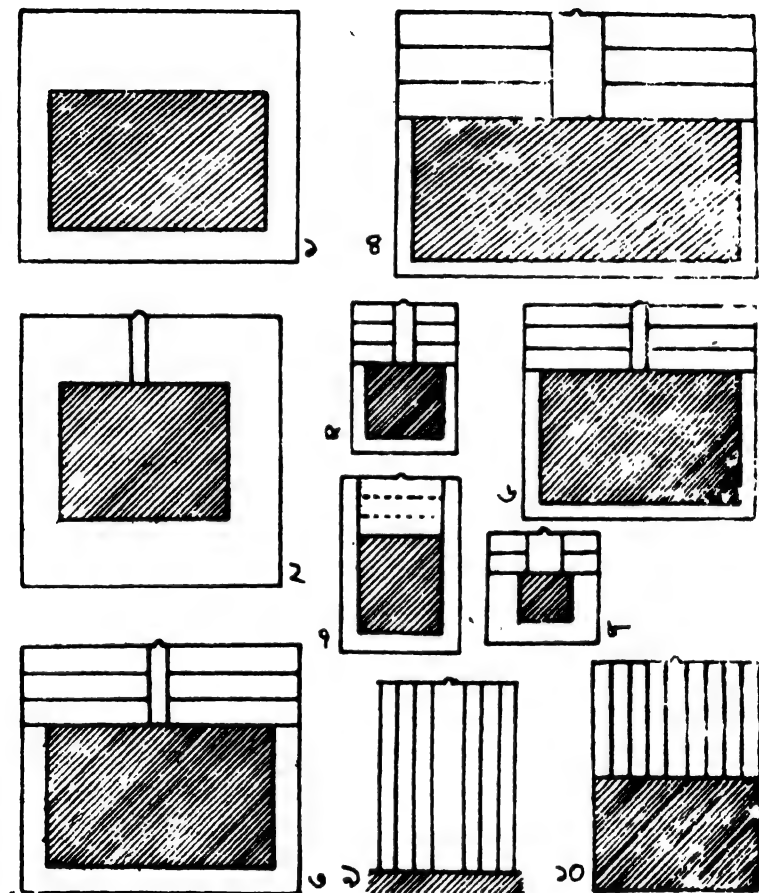
রেখাচিত্র : ৭৪

উমাইয়া আমলের কতিপয় মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনা

১। কুফা ২। মদিনা ৩। হাররান ৪। দামিস্ক ৫। রুসাফা
৬। আলেপ্পো ৭। হামা ৮। বসরা ৯। জেরুজালেম ১০। কর্ডোভা

১। ibid, p. 25.

we have a vine scroll rising out of a vase in the centre and forming loops to right and left each containing one bunch of grapes and one five pointed vine leaf, a motif which we shall find again in the base-moulding at Mshatta, at Samarra, on the ninth century pulpit of Qairawan in the Dayr as-Suryani (A.D. 914) and at Nayin." আঙুরের থোকার সঙ্গে দ্রাক্ষালতার সমন্বয়ে কুব্বাতে যে আলঙ্করণ করা হয়, তার প্রভাব ও পরবর্তী পর্যায়ে কাসর অত তুবা এবং মাসাত্তায় রয়েছে। কুব্বাতের কোনো কোনো লিনটেলে দেবদারু জাতীয় বৃক্ষের মোচাকৃতি ফল (pine cone) দ্বারা যে অলঙ্করণ করা হয়, তারই অনুকরণে দামিস্ক মসজিদ এবং মাসাত্তার দেওয়াল শোভিত হয়। কুণ্ডলাকৃতি লতাপাতা (cornucopia) কুব্বাতে এবং পরবর্তী পর্যায়ে কাসর-অত-তুবায় (৭৪৪ খ্রীঃ) পরিলক্ষিত হয়। স্থাপত্যশৈলী, অলঙ্করণের অভিনবত্ব, বিশালত্ব এবং অপূর্ব মাধুর্যের প্রতীক কুব্বাত'স সাখরা নিঃসন্দেহে মুসলিম স্থাপত্যের একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমরাত।

৪। ওয়াসীত, জা'মি মসজিদ, ৭০৩-৪ খ্রীঃ

ইরাকের কুত-আল-আমারা থেকে ২৫ মাইল দূরে ওয়াসীত নগরী স্থাপিত হয়। বর্তমানে জনমানবশূন্য এই নগরীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ৭০২ খ্রীস্টাব্দে। পূর্বদেশীয় প্রদেশসমূহের গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এই প্রাচীরবেষ্টিত নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। তাই গ্রীস নদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত একসময়ের এই সমৃদ্ধিশালী নগরী দুটি বেষ্টনীপ্রাচীর এবং একটি পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। হাজ্জাজ এই নগরী স্থাপন করে একটি মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন একটি দার আল-ইমারা অর্থাৎ গভর্নরের বাসগৃহ নির্মাণ করেন।[১]

ক্রেসওয়েলের মতে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ৭০৩-৪ খ্রীস্টাব্দে সম্পূর্ণ নূতন ভিত্তিতে ওয়াসীতের মসজিদ নির্মাণ করেন। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে অধিকৃত এই জা'মি মসজিদটির পরিমাপ ছিল ২০০ বর্গহাত অথবা ৩৩০ বর্গ ফুট। মসজিদটির আকৃতি বর্গাকার ছিল। বালাযুরীর মতে, মসজিদের কিবলা-প্রাচীরের সংলগ্ন একটি দারু'ল ইমারা নির্মিত হয় এবং এর পরিমাপ ৪০০ বর্গহাত উল্লেখ করা হয়।

ওয়াসীতের জা'মি মসজিদের এলাকায় সর্বপ্রথম অনুসন্ধান পরিচালনা করে 'মানারা' নামে ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি পুরাতন ইমারতের ভিত্তি পাওয়া যায়। এই ইমারতের প্রবেশপথের দুই পাশে দুটি মিনার স্থাপিত হয়। খননকাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানে পরপর দুটি মসজিদের ভিত্তিভূমির সন্ধান পাওয়া যায়। সর্বপ্রাচীন মসজিদটির ভিত্তির উপর পরবর্তীকালে আর একটি মসজিদ নির্মিত হয়। প্রাচীনতম মসজিদটির কিবলা সঠিকভাবে মক্কা শরীফের দিকে নির্ধারিত হয়নি। কিবলা দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী ছিল। ওয়াসীতের প্রথম জা'মি মসজিদটি, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ৩৬০ ফুট

১। A Short Account, p. 40-41.

পরিমাপের ছিল এবং ইসলামের সর্চপ্রাচীন মসজিদসমূহের মতো, যেমন— মদিনা, বসরা, কুফা, চতুষ্কোণাকৃতি ছিল। লিওয়ানের কুফা মসজিদের অনুরূপ পাঁচটি সমান্তরাল এবং আঠারোটি লম্বালম্বি স্তম্ভরাজি ছিল। লিওয়ানের চারিদিকে একসারিবিশিষ্ট স্তম্ভের রিওয়াক নির্মিত হয়। খননকালে ওয়াসীতে আদি মসজিদের কিবলার দিকে কোনো অবতল মিহরাব পাওয়া যায়নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, ৭০৭—৯ সালে ওয়ালীদের শাসনমালে উমর ইবনে আবদুল আযীয কর্তৃক মদিনা মসজিদ সংস্কারের সময় সর্বপ্রথম অবতল মিহরাব সংযোজনের পূর্বে ওয়াসীতের মসজিদ নির্মিত হয়। বেলেপাথরের কতিপয় স্তম্ভ উদ্ধার করা হয় এবং মনে করা হয় যে, এগুলো আদি মসজিদ থেকে সংগৃহীত হয়ে দ্বিতীয় ওয়াসীতের মসজিদে ব্যবহৃত হয়েছে। এই স্তম্ভগুলোতে সাসানীয় অলঙ্করণের নিদর্শন থাকায় এগুলো সর্বপ্রাচীন বলে মনে হয়। জিয়াদ কর্তৃক কুফা মসজিদের সংস্কার ও সম্প্রসারণে স্তম্ভরাজির যে ব্যবহার দেখা যায় ওয়াসীতের প্রাচীনতম মসজিদে এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। স্তম্ভগুলো লোহার রড দিয়ে সংযোগ করে নির্মিত এবং এই সমস্ত স্তম্ভের ব্যাস ছিল ৩৫ থেকে ৪৩ ইঞ্চি।

প্রথম মসজিদটির ভিত মেঝে এবং দেওয়াল পোড়া ইটের তৈরি এবং লাল রঙের জিপসাপ দিয়ে গাঁথা। ইটগুলোর পরিমাপ ছিল ১২ × ১২ × ২^{১}/২ ইঞ্চি থেকে ২৩ x ২৩ × ৫ ইঞ্চি।। দেওয়ালের প্রশস্ততা ছিল ৭^{১}/২ ফুট এবং ভিত ভিতরের দিকে ৬^{১}/৩ ইঞ্চি এবং বাইরের দিকে ৪ ইঞ্চি পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। দেওয়াল থেকে পোস্তা বা pilaster-এর অংশ দেখা যায়; এই পোস্তার সাহায্যে স্তম্ভরাজি নির্মাণ করা সহজতর হয়। স্তম্ভরাজির ভিত ৫ ফুট চওড়া ছিল এবং এগুলো লম্বালম্বি ও সমান্তরালভাবে প্রসারিত ছিল। এ সমস্ত স্তম্ভ ছোট ছোট এলাকার (grid) সৃষ্টি করেছে, যার পরিমাপ ছিল ১২^{১}/২ × ১১^{১}/২ ফুট।

ওয়াসীতের মসজিদ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, এই স্থানটিতে প্রথমে একটি অতি প্রাচীন মসজিদ নির্মিত হয়। এই মসজিদটি ওয়ালিদের সময়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তৈরি করেন। পরবর্তী পর্যায়ে আর একটি মসজিদ প্রাচীন মসজিদের ভিতের উপর তৈরি করা হয়। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় মসজিদটি প্রথম মসজিদ অপেক্ষা আকারে বড় এবং ঠিক সরাসরি পূর্বের ভিতের উপর নির্মাণ করা হয়নি। কারণ দ্বিতীয় মসজিদটিতে কিবলা ছিল উত্তর-দক্ষিণমুখী। দ্বিতীয় মসজিদের মিহরাব অবতল অর্ধবৃত্তাকার থাকায় ক্রেসওয়েল ৭০৭—০৯ সালের পরে এর সময় নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ মদিনায় উমর ইবনে আবদুল আযীযের মিহরাব নির্মাণের পর দ্বিতীয় মসজিদটি পুনর্নির্মিত হলে মিহরাবের আকৃতি দাঁড়ায় ষষ্ঠভুজে।

প্রথমবার খনন করার ফলে ওয়াসীতের প্রথম মসজিদে কোনো দারুল-ইমারার ভিত পাওয়া যায়নি। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৪২ সালে পুনরায় খনন শুরু হলে মসজিদের কিবলার দিকে দারুল-ইমারার প্রশস্ত প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ৬৮৫ ফুট এবং এককোণে একটি বড় ধরনের বুরুজের ভিত পাওয়া যায়। বুরুজগুলোর আকৃতি ত্রি-চতুর্থাংশ গোলাকার এবং ২৭ বর্গফুট ভিতের উপর নির্মিত। খননকার্য স্থগিত থাকায় দারুল-ইমারার সম্পূর্ণ
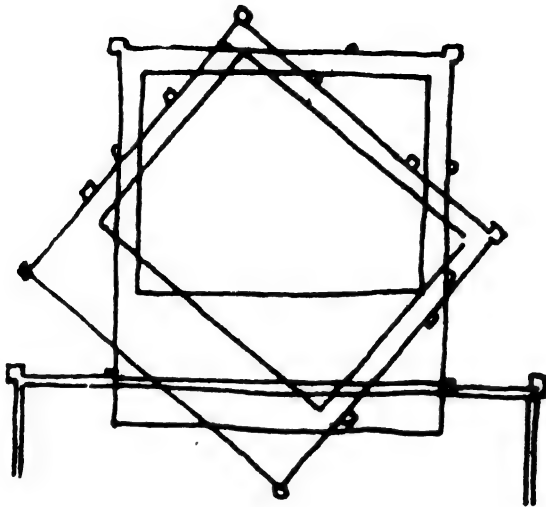
রেখাচিত্র : ৭৫
ওয়াসীত, জা'মি মসজিদ, ভূমি-নক্শা।

ভিত আবিষ্কৃত হয়নি। এতদ্সত্ত্বেও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে দারুল-ইমারার প্রবেশপথের সন্ধান পাওয়া গেছে। ক্রেসওয়েলের মতানুসারে বারোটি অথবা তিনটি আকর্ষণীয় প্রবেশপথ দিয়ে এই ইমারতে প্রবেশ করা যেত।[১] প্রতিটি প্রবেশ পথ ৮০ ফুট প্রশস্ত রাস্তার দিকে খোলা থাকত। বালাযুরীর বর্ণনা অনুযায়ী বিভিন্ন স্থান থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে প্রবেশপথ নির্মিত হয়। দারুল-ইমারার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কারুকার্যখচিত ও জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদটি মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল এবং এই সুরম্য প্রাসাদটি সবুজ গম্বুজবিশিষ্ট থাকায় এর নাম ছিল "কুব্বাত আল খাদবা" ("the Green Dome"।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যথার্থই মন্তব্য করেন যে, ইরাকে নির্মিত ওয়াসীতের জা'মি মসজিদ ইসলামের প্রথম যুগের মসজিদগুলোকে অনুকরণ করে নির্মাণ করা হয়। মদিনা, কুফা ও বাসরার মসজিদগুলো যেমন চতুষ্কোণার সাহানবিশিষ্ট, লিওয়ান স্তম্ভরাজি দ্বারা বিভক্ত, অনুরূপভাবে ওয়াসীতের মসজিদটিও এ ধরনের উপকরণ দ্বারা সমৃদ্ধ। খননের ফলে ইসলামের সর্বপ্রাচীন মসজিদের ভিত্তিভূমির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। মদিনা, কুফা ও বসরার মসজিদগুলো সংস্কার, সম্প্রসারণ ও পরিবর্তনের ফলে মূল ইমারতটি প্রায় বিলীন হয়ে গেছে। ক্রেসওয়েল বলেন যে, ওয়াসীতের মসজিদের

১। A Short Account, p. 42.

অনুকরণে পরবর্তীকালে বাগদাদে আল-মনসুরের গোলাকার প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি মসজিদ (৭৬৫ খ্রীঃ) নির্মিত হয়।

৫। দামিস্ক, জা'মি মসজিদ, ৭০৬–১৫ খ্রীঃ (চিত্র ১৩–১৬)

পটভূমি :

ইসলামের সম্প্রসারণের ইতিহাসে সিরিয়া অভিযান ও দখল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হযরত আবুবকরের (রাঃ) খিলাফতে প্রথম সিরিয়া অভিযানে মুসলমানগণ বিজয়ের সাফল্য অর্জন করেন ৬৩৪ খ্রীস্টাব্দে আজনাদাইনের যুদ্ধে। এই অভিযান হযরত উমরের (রাঃ) সময়ে অব্যাহত ছিল এবং ৬৩৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি মারজ-উস সুফফারে বায়জানটাইন সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে দামিস্ক নগরী অবরোধ করা হয়। ছয় মাস ধরে অবরোধ করার পর সুরক্ষিত দামিস্ক নগরী মুসলমানদের দখলে আসে। দামিস্ক বিজয় ইসলামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ৬৩৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সমগ্র সিরিয়ায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠার পর দামিস্ক রাজধানীতে রূপান্তরিত হয় এবং ৬৩৬ সালে সিরিয়াবিজয়ের পর এখানে যে অল্প পরিসর স্থানে মসজিদ নির্মিত হয় তাতে সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে অধিকসংখ্যক মুসলিম অধিবাসীদের জন্য স্থানসঙ্কুলান সম্ভবপর ছিল না। আরব দেশ থেকে আগত এবং নব-দীক্ষিত মুসলমান জনগণের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। খলিফা আল-ওয়ালীদ ৭০৫ খ্রীস্টাব্দে ক্ষমতা লাভ করে এই সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান করার জন্য একটি নূতন মসজিদ নির্মাণ পরিকল্পনা করেন।

দামিস্ক মসজিদ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত ক্রমবর্ধমান মুসলমানদের নামাজের জন্য পর্যাপ্ত স্থানসম্বলিত একটি নামাজগৃহ তৈরি করা ; দ্বিতীয়ত, তিনি সিরিয়ার বায়জানটাইন গির্জাগুলোকে স্থাপত্যিক কৌশল, উপকরণ বৈশিষ্ট্য এবং অলঙ্করণের মাধুর্য ও চাকচিক্য দ্বারা ম্লান করার প্রয়াস পান। মুকাদ্দেসী বলেন যে, দামিস্ক মসজিদের নির্মাণে মাত্রাধিক অর্থব্যয়ের মূলে ছিল অমুসলমান ধর্মীয় ইমারতগুলো অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ও জাঁকজমকপূর্ণ ইসলামী ইমারত নির্মাণের প্রয়াস। তিনি বলেন, "Al-Walid was right and he was prompted to a worthy work. For he beheld Syria to be a country that had long been occupied by the Christians and he noted herein the beautiful churches still belonging to them, so enchantingly fair and so renowned for their splendour, even as are the Quamama (the Church of the Holy Sepulchre at Jerusalem) and the Churches of Lydda and Edessa. So he sought to build for the Muslims a mosque that should be unique and wonder of the world."[১]

দামিস্কের জা'মি মসজিদ মুসলিম স্থাপত্যের একটি অনন্যসাধারণ কীর্তি এবং আল-ওয়ালীদ এই মসজিদটি নির্মাণ করে অমর হয়ে রয়েছেন। এই অতুলনীয় ও

১। EMA, p. 101.

অনিন্দ্যসুন্দর ধর্মীয় ইমারতটি নির্মাণে ওয়ালীদ বিভিন্ন দেশ থেকে স্থপতি, কারিগর ও শ্রমিক আহরণ করেন। এ ছাড়া রাজমিস্ত্রী, ছুতার, মোসাইকের মিস্ত্রীও বিভিন্ন দেশ থেকে আনা হয়। যে সমস্ত অঞ্চল থেকে শ্রমিক আনা হয় তা হচ্ছে পারস্য, ভারতবর্ষ, বায়জানটাইন, মগরীবী (পশ্চিমাঞ্চল)। দামিস্কের মসজিদ নির্মাণে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়। আরব ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেন যে, সিরিয়া প্রদেশের সাত বছরের ভূমিকর বা খারাজ (মতান্তরে সমগ্র রাজ্যের সাত বছরের ভূমিকর) এই মসজিদ নির্মাণে খরচ হয়। অর্থের পরিমাণেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। ইবনে আশাকির বলেন যে, ছাপ্পান্ন লক্ষ এবং ইবনে জুবায়ের মতে, এগারো লক্ষ বিশ হাজার দীনার। Aphrodito Papyrus-এ উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী খলিফা আল-ওয়ালীদ মিশরীয় সূত্রধর নিযুক্ত করেন। এতে বর্ণিত আছে যে, দামিস্কের মসজিদ নির্মাণে কাঠ ফাড়ার জন্য প্রতি শ্রমিককে পর্যাপ্ত মজুরী দেওয়া হয়। অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, ৪০ জন্য দক্ষ মিশরীয় শ্রমিক এই মসজিদ নির্মাণে নিয়োজিত ছিলেন। Aphrodito Papyrus-এ যে সনের উল্লেখ আছে তা হচ্ছে ৭০৯ খ্রীস্টাব্দে ৩রা নভেম্বর। দামিস্ক মসজিদের নির্মাণ-তারিখসম্বলিত শিলালিপি পাওয়া না গেলেও ৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে আল-মাসুদী এর হুবহু অনুলিপি উল্লেখ করেন। এই শিলালিপি অনুযায়ী দামিস্ক মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেওয়া হয় ৭০৬ খ্রীস্টাব্দে এবং ওয়ালীদের মৃত্যুর বছরে ৭১৪-১৫ খ্রীস্টাব্দে এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়।

পূর্বাবস্থা :

টেমেন্‌স : আরব ঐতিহাসিকদের তথ্য অনুযায়ী দামিস্কের বিশাল উমাইয়া মসজিদটি একটি প্রাচীন দেবালয়ের অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে মসজিদে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত প্রাচীন দেবালয়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলেও অভ্যন্তরীণ ও বহিঃপ্রাচীরের (temenos) অংশ বিদ্যমান ছিল। দেবালয় দুটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। বিশাল ও অসম-আয়তাকার এই এলাকায় দুটি প্রশস্ত প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গন রয়েছে। বহিঃপ্রাচীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে ৪২১ গজ এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে ৩৩৪ গজ। পশ্চিমদিকের মাঝখানে একটি বিশাল পর্টিকো নির্মিত হয়। এই পর্টিকো একটি বিপণীকেন্দ্রের কাজ করে। বহিঃপ্রাচীর-বেষ্টিত অভ্যন্তরীণ প্রাচীরের পরিমাপ ছিল ১৭২ গজ পূর্ব-পশ্চিমে এবং ১০৯ গজ উত্তর দক্ষিণে। এই অভ্যন্তরীণ প্রাচীরবেষ্টিত এলাকার মধ্যে দেবালয় নির্মিত হয়। মন্দির-প্রাচীরের প্রতি কোণায় একটি বুরুজ ছিল ; বুরুজগুলো চতুষ্কোণাকার। দক্ষিণ পশ্চিম দিকের বুরুজ ছাড়া অন্য বুরুজগুলো বহু পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। গ্রীক ধর্মমন্দিরের কেবলমাত্র পশ্চিমদিক অক্ষত অবস্থায় ছিল এবং উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব প্রাচীরের কিয়দংশ এখনও সংরক্ষিত আছে। এ সমস্ত প্রাক্-মুসলিম যুগের ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় যে, দেবালয়টি মসৃণ পাথরে সুচারুরূপে নির্মিত হয় এবং পোস্তা (pilaster) দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল।[১]

১। EMA, p. 104.

বায়জানটাইন সম্রাট থিওডোসিয়াসের সময় গ্রীক ধর্মমন্দিরের আচার-অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এই ইমারতকে একটি গীর্জায় রূপান্তরিত করা হয়। থিওডোসিয়াসের রাজত্বকাল ৩৭৯ থেকে ৩৯৫ খ্রীস্টাব্দ এবং স্বভাবত ৪র্থ শতাব্দীতে গ্রীক দেবালয় খ্রীস্টান গির্জায় পরিণত হয়। অভ্যন্তরীণ বেষ্টনীর মধ্যভাগে দেবমন্দির ভেঙে পশ্চিম প্রান্তে যে গির্জা নির্মাণ করা হয় তা সেন্ট জনের গির্জা (The Church of St. John the Baptist) নামে পরিচিত। ক্রেসওয়েল চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত গীর্জার সন-তারিখ প্রসঙ্গে শিলালিপির উল্লেখ করেন।[১]

মসজিদ নির্মাণ :

প্রাক্-রোমক অর্থাৎ গ্রিক আমলে নির্মিত সূর্যদেবের যে মন্দিরটি বায়জানটাইন যুগে সেন্ট জনের গির্জায় রূপান্তরিত হয় তা ৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে খলিফা আল-ওয়ালীদ দামিস্ক অধিকার করার পর মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করেন। গির্জার প্রাচীরবেষ্টনীর পূর্ব পার্শ্বে মুসলমানগণ একত্রে নামাজ পড়েন। পশ্চিমদিকের অংশ গির্জা হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে–এ ধরনের মতবাদ আরব ঐতিহাসিকগণ পোষণ করেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ইবনে আসাকির (১১৭৬ খ্রীঃ), ইবনে জুবায়ের (১১৮৪ খ্রীঃ) এবং ইবনে শাকির (১৩৬৩ খ্রীঃ)। কিন্তু এ মতবাদ সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ। তাঁদের মধ্যে De' Goeje, Von Kremer এবং ক্রেসওয়েল এ তথ্য নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁদের বিশেষ কতকগুলো যুক্তি ছিল, যেমন, ওয়াকিদী (৭৪৮–৮২৩ খ্রীঃ) বলেন যে, আমি খালিদ ইবনে ওয়ালীদের সম্পাদিত চুক্তি পাঠ করেছি এবং দামিস্কের অধিবাসীদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে কোথাও উল্লেখ ছিল না যে, গির্জাগুলোর কোনো অংশ বলপূর্বক দখল করা হয়। উপরন্তু, বলা হয়েছে যে, পূর্বদিক দিয়ে মুসলিমবাহিনী গির্জায় প্রবেশ করে দখল করে মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করে এবং পশ্চিমদিক গির্জার অংশই রয়ে যায় : এই যুক্তি ভিত্তিহীন কারণ গির্জার বেদী (altar) পূর্বদিকে থাকে, অপরদিকে পশ্চিমদিক যদি মুসলমানদের দখলে আসে এবং পূর্বদিক গির্জা হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে তা হলে পূর্বদিকে রসূলের সাহাবীদের মিহরাব নামে (Mihrab of the Companion of the Prophet) পরিচিত মসজিদের অংশটি থাকত না। আরকুফের যুক্তির উপর নির্ভর করে Caetani এবং ক্রেসওয়েল মত পোষণ করেন যে, দামিস্ক দখলের পর সেন্ট জনের গির্জাকে বিভক্ত করে গির্জা ও মসজিদরূপে ব্যবহারের প্রশ্নই আসে না। ৬৭০ খ্রীস্টাব্দে আরকুফ স্বয়ং দামিস্কের গির্জা পরিদর্শন করেন এবং উল্লেখ করেন যে, এই শহরে সেন্ট জর্জ নামে একটি গির্জা ছিল এবং একই শহরে স্যারাসেনগণ একটি গীর্জা অর্থাৎ মসজিদ নির্মাণ করেন।[২] ক্রেসওয়েল এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, স্যারাসেনগণ বিদ্যমান স্তম্ভরাজি কাদামাটি ইট দিয়ে তৈরি প্রাচীরঘেরা ছিল।

১। A Short Account, p. 50.

২। A Short Account, p. 66.

খলিফা আল-ওয়ালীদ মসনদে আরোহণ করে মুসলমানদের জন্য নামাজের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় প্রাচীন গ্রীক দেবমন্দির থেকে রূপান্তরিত গির্জাকে মসজিদরূপে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। সুতরাং বলা যায় যে, ওয়ালীদ গির্জা জোরদখল এবং বিভক্ত করে মসজিদে রূপান্তরিত করেননি। তাঁর খিলাফতের পূর্বেই মুসলমানগণ প্রাচীন গ্রীক মন্দিরের পূর্বাংশ মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করে আসছে এবং এই ব্যবস্থা প্রায় সত্তর বৎসর (৬৭৩—৭০৬ খ্রীঃ) বলবৎ ছিল। ওয়ালীদ কেবলমাত্র পশ্চিমদিকে সেন্ট জনের গির্জাটি মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য ক্রয় করেন। ইসলামের বিধানে অন্য ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ, কারণ ধর্মসহিষ্ণুতা ইসলামের প্রধান অঙ্গ। সুতরাং ওয়াকিদীর তথ্যানুযায়ী দামিস্ক বিজয়ের পর খ্রীস্টানদের তাদের ধর্মমন্দির বা গির্জা থেকে বঞ্চিত করা হয়নি।
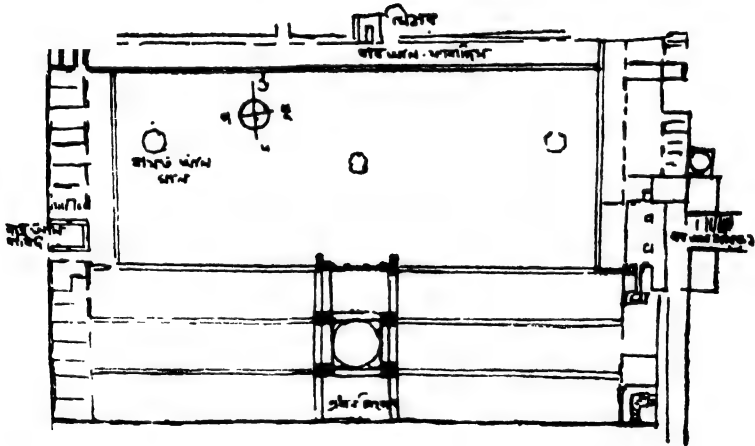
রেখাচিত্র : ৭৬
দামিস্ক, জা'মি মসজিদ, ভূমি-নক্‌শা

খলিফা ওয়ালীদ প্রাচীন টেমেনসের স্তম্ভরাজি ভেঙে দিয়ে নূতন করে মসজিদ-নির্মাণে প্রয়াসী হন। তাঁর সময়ে কেবলমাত্র বেষ্টনীপ্রাচীর এবং চারকোণায় চারটি চতুষ্কোণাকার বুরুজ অক্ষত অবস্থায় ছিল। এই চারটির মধ্যে কেবলমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম কোণার বুরুজটি ছাড়া অপর তিনটিকে ভেঙে নূতনভাবে মিনার তৈরি করা হয়। প্রাচীন

টেমেনসের অভ্যন্তরীণ এলাকা জুড়ে দামিস্কে মসজিদ নির্মিত হয় এবং এর পরিমিতি ছিল অসম আয়তাকার। মসজিদের পরিমাপ হচ্ছে উত্তর-দক্ষিণে ১৬৪ ফুট পূর্ব প্রান্তে এবং ১৫৭ ফুট পশ্চিম প্রান্তে ; পূর্ব-পশ্চিমে ৪০২ ফুট। মসজিদের দক্ষিণদিকে লিওয়ান অবস্থিত এবং এই নামাজঘরের পরিমিতি পূর্ব-পশ্চিমে ৪৪৬ ফুট এবং উত্তর-দক্ষিণে মাত্র ১২১ ফুট। দক্ষিণদিকের প্রাচীর-বরাবর লিওয়ানটি অবস্থিত এবং তিনটি স্তম্ভরাজি নামাজঘরটিতে দেখা যাবে। দুটি অভ্যন্তরীণ খিলানসম্বলিত স্তম্ভশ্রেণী লিওয়ানটিকে তিনটি আইলে অর্থাৎ খিলানপথে বিভক্ত করেছে। তৃতীয় স্তম্ভশ্রেণী সাহান বা চত্বরের সম্মুখে দেওয়ালের কাজ করছে।

লিওয়ানের মাঝখানে একটি প্রশস্ত আইল বা Transept নামাজঘরটিকে দুটি সমান অংশে ভাগ করেছে। পূর্ব ও পশ্চিমদিকের অংশের প্রতি সারিতে দশটি স্তম্ভ রয়েছে এবং স্তম্ভ থেকে খিলান নির্মাণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, নামাজঘরের অভ্যন্তরের গোলাকার মার্বেল স্তম্ভ স্থাপন করা হয়। কিন্তু চত্বরের সম্মুখে যে খিলানসারি রয়েছে তা পিয়ার অর্থাৎ আয়তাকার স্তম্ভের উপর নির্মিত। চতুষ্কোণ ভিত্তির (pedestal) উপর নির্মিত মার্বেল স্তম্ভের সাহায্যে যে খিলান সৃষ্টি করা হয়, সেই সমস্ত মার্বেল স্তম্ভের শীর্ষদেশ (capital) গ্রীক স্থাপত্যরীতিতে অলঙ্কৃত ; আওনিয়ান ও করিন্থীয় ক্যাপিটাল দেখে মনে হয় যে, স্থানীয় কোনো ভগ্নপ্রাপ্ত ইমারত থেকে সংগৃহীত। স্তম্ভরাজির উপরে আর একটি সারি পূর্ব-পশ্চিমে চলে গেছে এবং এই খিলানগুলো প্রকৃত খিলান নয়, যেমন— নিম্নের চাপ বহনকারী প্রকৃত খিলান। ছোট ছোট খিলান পিয়ারের সাহায্যে নির্মিত এবং ক্রেসওয়েল বলেন যে, নিচের প্রতি বড় খিলানের উপরে দুটি ছোট ছোট খিলান নির্মিত হয়েছে। চত্বরের সামনে যে খিলানরাজি রয়েছে তার উপরের খিলানশ্রেণী খুবই আকর্ষণীয়। ১৮৯৩ সালের অগ্নিকাণ্ডের পূর্বে এই সমস্ত ক্ষুদ্রাকৃতি খিলানস্টাকোর জালি দ্বারা বন্ধ ছিল এবং এগুলো জানালা হিসাবে ব্যবহৃত হত। মসজিদের কিবলা-প্রাচীরে ট্রানসেপ্টের উভয় পাশে ২৪টি করে মোট ৪৮টি জানালা রয়েছে। গোবরাটটি (sill) ৩৪ ফুট উঁচু এবং আকার ও অবস্থানে তিনটি স্তম্ভরাজির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রতিটি আইল একটি করে ঢালুছাদ (gable) দ্বারা আচ্ছাদিত।

সাহান থেকে লিওয়ানের মধ্যবর্তী ট্রানসেপ্ট-এ প্রবেশের জন্য তিনটি খিলানসম্বলিত একটি প্রবেশপথ রয়েছে। তেরচাভাবে নির্মিত এই ট্রানসেপ্টটি নির্মাণকৌশলে খুবই অভিনব। এ খিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথটির মাঝখানে দুটি মার্বেল স্তম্ভ রয়েছে। চতুষ্কোণাকার ভিত্তির উপর মার্বেলের তৈরি স্তম্ভ রয়েছে এবং স্তম্ভের শীর্ষভাগ করিন্থীয় রীতিতে নক্শাকৃত। স্তম্ভ দুটি থেকে তিনটি খিলান নির্মাণ করা হয়। এই খিলানগুলোর উপরে ছোট ছোট তিনটি জানালা খিলান রয়েছে। পাশের খিলান অপেক্ষা মধ্যের খিলানটি ঈষৎ বড়। খিলানসম্বলিত সমগ্র প্রবেশপথটি একটি বৃহৎ খিলানবেষ্টনী দ্বারা পরিবেষ্টিত। মূল খিলান এবং জানালা খিলানের আকৃতি অর্ধবৃত্তাকার কিন্তু খিলানের ফ্রেমের যে আকৃতি তা সামান্য কৌণিক এবং ঈষৎ চাপা। প্রবেশপথের দুই পাশে দুটি ভারী পোস্তা (buttress) রয়েছে এবং এই পোস্তা থেকেই ট্রানসেপ্ট সম্মুখভাগ (facade) ৩৩ ফুট পর্যন্ত উপরের দিকে উঠে গেছে এবং মেঝে থেকে

কার্নিশ পর্যন্ত মোট উচ্চতা ৮৪ ১/৪ ফুট। কার্নিশের শেষপ্রান্তে পূর্ব-পশ্চিমদিকে পাথরের ঢালু ছাদ অথবা gable দেখা যাবে। সামনের পাথরের ঢালু ছাদের আকৃতি (triforium) এর পিছনের প্রকৃত ঢালু ছাদ ইটের তৈরি। ট্রানসেপ্টের দুই পাশে প্রতি 'বে'তে অর্থাৎ লম্বালম্বি খিলানপত্র তিনটি করে জানালা আছে।

ট্রানসেপ্টের মধ্যবর্তী চতুষ্কোণাকারে এলাকা অথবা কেন্দ্রীয় 'বে'টি একটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। কিন্তু এই গম্বুজটি যে আসল নয় তা ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের অগ্নিকাণ্ডে প্রমাণিত হয়। ক্রেসওয়েলের মতে, কেন্দ্রীয় 'বে'টি প্রথমে সামান্য আয়তাকার ছিল ; কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মূল পিয়ারের সংলগ্ন আরও চারটি পিয়ার নির্মাণ করে একটি চতুষ্কোণাকার এলাকায় রূপান্তরিত করা হয়, যাতে এর উপর সহজে গম্বুজ নির্মাণ করা যায়। এই চারটি পিয়ারের পরিমাপ ক্রেসওয়েলের মতে, পূর্বে ছিল ১০ ১/২ × ৫ ফুট এবং পরে ১০ ১/২ x ৪ ১/৪ ফুট। কেন্দ্রীয় 'বে'র উপর চারটি পিয়ার থেকে চারটি খিলান নির্মিত হয়েছে এবং স্কুইঞ্চের (Squinch) সাহায্যে চতুষ্কোণাকার এলাকা থেকে প্রথমে অষ্টভুজ এবং পরে গোলাকার এলাকায় রূপান্তরিত করা হয়। গম্বুজটি এই গোলাকার এলাকায় স্থাপিত। আদি গম্বুজটি ১০৬৯ খ্রীস্টাব্দের অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত হলে সেলজুক সুলতান মালিক শাহ ১০৮২-৮৩ খ্রীস্টাব্দে এই গম্বুজটি তৈরি করেন। এ স্থানে প্রাপ্ত চারটি কুফী রীতিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে এ তথ্য জানা যায়।

দামিস্কের মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজটি সম্বন্ধে মুকাদ্দেসী বলেন যে, মূল গম্বুজের চূড়া একটি কমলালেবুর উপর বেদানার আকৃতিতে নির্মিত হয়। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, স্বর্ণের চূড়াসম্বলিত গম্বুজটি কাঠের তৈরি ছিল এবং কায়রোতে নির্মিত ইবনে তুলুনের মসজিদে লাজিন কর্তৃক স্থাপিত কাঠের গম্বুজের অনুরূপ। মালিক শাহ কর্তৃক নির্মিত দামিস্কের মসজিদের গম্বুজটি ১১৮৪ খ্রীস্টাব্দে ইবনে জুবায়ের দেখতে পান এবং তাঁর বর্ণনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, এই গম্বুজটির সঙ্গে কুব্বাতু'স সাখরার গম্বুজের সাদৃশ্য রয়েছে। ইবনে জুবায়ের দামিস্কের গম্বুজটিকে 'কুব্বাতু'স নাসর' বা ঈগলাকৃতির গম্বুজ নামে অভিহিত করেন। কিন্তু ক্রেসওয়েল বলেন যে, মসজিদে কোনো জীবিত প্রাণীর আকৃতিতে নির্মিত চূড়া থাকা খুবই অস্বাভাবিক এবং মন্তব্য করেন যে, আরব ঐতিহাসিক ও পর্যটকগণ ভুলবশত 'গেবল'কে (ঢালু ছাদ) 'ঈগল' নামে উল্লেখ করেন; অর্থাৎ 'কুব্বাত আল জামালুন' বা Dome of the Gable-এর স্থলে 'কুব্বাতু'ন নসর বলে অভিহিত করেন। সুতরাং দামিস্কের গম্বুজটিকে Dome of the Eagle বা ঈগলাকৃতি চূড়াবিশিষ্ট গম্বুজ বলা যাবে না।

দামিস্কের মসজিদের কিবলা-প্রাচীরে সর্বমোট চারটি মিহরাব রয়েছে। প্রধান অর্ধগোলাকার মিহরাবটি নির্মিত হয় ট্রানসেপ্টের শেষ প্রান্তে কিবলা-প্রাচীরের মধ্যভাগে। এর পূর্বদিকের মিহরাবটি 'রসুলের সাহাবীদের মিহরাব' (Mihrab of the Companions of the Prophet) এবং পশ্চিমদিকে সমান দূরত্বে অপর একটি মিহরাব ওয়ালীদের সময়ে অবতলাকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। এর ফলে এই মিহরাবটি তৃতীয় অবতল মিহরাব হিসাবে স্বীকৃতি পায়; প্রথমটি উমাইয়া যুগে মদিনা মসজিদের পুনর্নির্মাণের সময় (৭০৭–৯ খ্রীঃ) সংযোজিত হয় এবং দ্বিতীয়টি কুসাইর আল

হাল্লাবাত-এর মসজিদে নির্মিত হয়। দামিস্কের মসজিদের চতুর্থ মিহরাবটির পশ্চিমদিকের শেষপ্রান্তে নির্মাণ করা হয় এবং এটি অতি আধুনিক।

সাহান ও রিওয়াক :

দামিস্ক মসজিদটিকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়; প্রথমটি কিবলার দিকের লিওয়ান, দ্বিতীয়টি সাহান চত্বর এবং তৃতীয়টি রিওয়াক। কিবলার দিকে সাহানটির পরিমাপ ৪৪৬ × ১২১ ফুট। সাহান বা চত্বরটিকে বেষ্টিত করে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরদিকে রিওয়াক নির্মিত হয়। এই রিওয়াকের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসল্লীদের নির্বিঘ্নে মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশে সহায়তা করা। লিওয়ানের খিলানরাজির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং সমান উচ্চতায় সাহানের তিনদিকে দু'তলাবিশিষ্ট রিওয়াকের অর্থাৎ ছাদবিশিষ্ট পায়ে চলার পথের সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিমদিকে ৯টি খিলান পিয়ার ও স্তম্ভের উপরে শোভা পাচ্ছে। মোট দুটি পিয়ার এবং ৬টি পাতলা মার্বেলের স্তম্ভের সাহায্যে খিলান তৈরি করা হয়েছে। খিলানগুলো পরপর পাথরখণ্ড সাজিয়ে অর্থাৎ ভূসুয়ার্স পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা হয়। স্তম্ভগুলো চতুষ্কোণাকার ভিত্তিভূমিতে স্থাপিত এবং এগুলোতে করিন্থীয় ক্যাপিটাল এবং এর উপর impost রয়েছে। Impost-এর উপর থেকে খিলান নির্মিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণদিকের রিওয়াকের খিলানরাজির উপর একসারি ছোট খিলান ইমারতে ভাবগাম্ভীর্যের সৃষ্টি করেছে। ছাদ উঁচু-করা এবং আলোপ্রবেশের জন্য নিচের প্রতিটি খিলানের উপরে একজোড়া ছোট আকরের খিলান স্থপতি কৌশলে নির্মাণ করেন। উপরের এই খিলানরাজি একটি পিয়ার এবং একটি স্তম্ভের সাহায্যে নির্মিত। লিওয়ানের মতো রিওয়াক ঢালু ছাদ (gable) দ্বারা ঢাকা রয়েছে। কাঠের ছাদ খুব কৌশলে ঢালু করে তৈরি করে সীসা দ্বারা প্রলেপ দেওয়া হয় যাতে অভেদ্য হয়।

উত্তরদিকের রিওয়াকের সঙ্গে লিওয়ানের সাদৃশ্য সহজেই লক্ষ করা যায়। এই রিওয়াকের খিলানবাজির সংখ্যা ২৪টি এবং ২৩টি আয়তাকার পিয়ারের সাহায্যে এই খিলানগুলো নির্মিত হয়েছে। খিলানগুলোর উপরে অন্যান্য রিওয়াকের মতো একসারি ছোট খিলান রয়েছে এবং নিচের বড় খিলানের ঠিক উপরে দুটি ছোট খিলান খুবই চমৎকারভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে। দামিস্ক মসজিদের সাহান থেকে রিওয়াক ও লিওয়ানের চারিপাশে এক অসাধারণ স্থাপত্যকৌশল ও অলঙ্করণের নজির দেখা যাবে। পূর্ব ও পশ্চিমের রিওয়াকেও ছাদের মতো উত্তর রিওয়াকেও ঢালু ছাদ নির্মিত হয়েছে। কাঠের তৈরি ছাদ সীসা দিয়ে মোড়া।

দামিস্কের মসজিদের দুই ধরনের খিলান ব্যবহৃত হয়েছে। লিওয়ান ও রিওয়াকের সর্বত্র গোলাকার অশ্বনালাকৃতি খিলানের বহুল প্রচলন দেখা গেলেও লিওয়ানে ত্রি-খিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথের উপরে খিলান-ফ্রেমটি ঈষৎ কোণাকৃতি। খিলান নির্মাণে প্রচলিত স্থাপত্যরীতির অর্থাৎ ভূসুয়ার্স ব্যবহৃত হয়েছে। গম্বুজটি নির্মাণেও চারটি অশ্বনালাকৃতি খিলানের প্রয়োগ দেখা যায় এবং গম্বুজটি একটি ড্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত। ড্রামটি অষ্টকোণাকার এবং প্রতি বাহুতে দুটি করে কোণাকৃতি জানালা রয়েছে। ইবনে

জুবায়ের বলেন যে, মালিক শাহ গম্বুজটি দ্বি-গম্বুজবিশিষ্ট ছিল। বাহিরের আচ্ছাদন কুব্বাতু'স সাখরার কাঠের গম্বুজের অনুরূপ। বাইরের গম্বুজে সোনালী মোসাইকের প্রলেপ ছিল। বর্তমানের গম্বুজটি পাথরের তৈরি।[১]

দামিস্ক মসজিদের প্রবেশপথ তিনটি। প্রবেশপথগুলো বিভিন্ন নামে অভিহিত; উত্তরের প্রবেশপথটিকে বলা হয় 'বাবুল ফারাদিস', পূর্বেরটি 'বাব জাইরুন' এবং পশ্চিমদিকেরটি 'বাবুল বারীদ' নামে পরিচিত। দামিস্ক মসজিদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে মিনার। গ্রীক দেবালয়ের প্রাচীন চারটি কৌণিক চতুষ্কোণাকার বুরুজ গির্জা এবং মসজিদে রূপান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও অক্ষত ছিল। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, এই চারটি প্রাচীন বুরুজ ইসলামের প্রথম মিনার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইবনে ফাকী যাথার্থই বলেন, "দামিস্ক মসজিদে যে মিনার দেখা যায়, তা আদতে গ্রীক যুগের পর্যবেক্ষণ-বুরুজ (watch tower) ছিল। আল-ওয়ালীদ সমস্ত এলাকাকে মসজিদে রূপান্তরিত করার সময় এই বুরুজগুলো তাদের পূর্বঅবস্থায় রেখে দেন।" একথার প্রতিধ্বনি করে মাসুদী বলেন যে, ওয়ালীদ বুরুজগুলোকে সাওয়ামীতে পরিবর্তিত করেন এবং আজ পর্যন্ত সেগুলো আযানের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। চারটি মিনারের মধ্যে কেবলমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিমের বুরুজটি অক্ষত রয়েছে এবং ১৪৮৮ খ্রীস্টাব্দে 'কয়েত বে' কর্তৃক এর উপর একটি মিনার নির্মিত হয়েছে। অপর তিনদিকের অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্বদিকের বুরুজ বহুদিন আগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কেবলমাত্র দক্ষিণ-পূর্বদিকের ভগ্নপ্রাপ্ত বুরুজের উপর ১৩৪০ খ্রীস্টাব্দে একটি মিনার তৈরি করা হয়। মুকাদ্দেসী বলেন যে, উত্তরদিকের মাঝখানে একটি প্রবেশপথ ৯৮৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই স্থাপন করা হয়; কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এখানে একটি মিনার নির্মিত হয়। দামিস্কে বর্তমানে তিনটি মিনার রয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তরদিকের প্রবেশপথের পাশে। এগুলোর নাম যথাক্রমে 'মাযানাল' ঈশা, 'মাযানাল গারবিয়া' এবং 'মাযানাল আরুশ'।

মসজিদের সাহানে তিনটি ছোট ছোট ইমারত দেখা যাবে, নিঃসন্দেহে এগুলো মসজিদ নির্মাণের সময়কার নয়। অনেক পরে সংযোজিত এই সমস্ত ইমারতের মধ্যে বিশেভাবে উল্লেখযোগ্য গম্বুজকৃতি বায়তু'ল মাল। আটটি মার্বেলস্তম্ভের উপর আট-কোণাকার 'বায়তুল মাল'টি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। মসজিদে বায়তু'ল মাল-এর সংযোজন আশ্চর্যের কিছু নেই; কারণ ফুসতাতের মসজিদে (৭১৭-১৮ খ্রীঃ) দশটি স্তম্ভের উপর বায়তু'ল মাল তৈরি করা হয়। ধনসম্পদের সংরক্ষণের জন্য মসজিদের মতো পবিত্র স্থানে বায়তু'ল মাল নির্মিত হয়। দামিস্ক মসজিদে যে ইমারত চত্বরটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় তা পাথর এবং ইটের সাহায্যে অত্যন্ত কৌশলে স্থপতি নির্মাণ করেন। আটটি স্তম্ভের শীর্ষদেশে করিন্থীয় প্রভাব বিদ্যমান। আল-মুকাদ্দেসী বলেন, "সাহানের ডাইনে (পশ্চিমদিকে) আটটি স্তম্ভের উপর নির্মিত একটি বায়তু'ল মাল' রয়েছে। এটি খুবই পরিপাটির সাথে অলঙ্কৃত এবং এর দেওয়াল মোসাইক দ্বারা

১। Papadopoulo, p. 234.

শোভিত।" ইবনে যুবাইর মন্তব্য করেন, "It stands as tall as a tower on eight columns of marble, ornamented with polychrome mosaic as beautiful as a garden, and it is surmounted by dome made of lead. They say that is was originally the treasury of the mosque."[১]

দামিস্ক মসজিদের সাহানের মাঝখানে চতুষ্কোণাকার একটি ছোট প্যাভিলিয়ন রয়েছে। ছয়টি স্তম্ভের উপর নির্মিত এই ক্ষুদ্র ইমারতটি ঢালু ছাদ দ্বারা আবৃত এবং এর চারপাশে ঢালু প্যারাপেট দেখা যাবে। ওজু করার একটি জলাধার মসজিদের অপরিহার্য অঙ্গ। এই ক্ষুদ্র ইমারতটি পূর্বদিকের ইমারতের মতো খুবই আধুনিক।

অলঙ্করণ :

আল-মুকাদ্দেসীর[২] মতে, অলঙ্করণের দিক দিয়ে বিচার করলে দামিস্কের মসজিদ বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট ইমারত। তাঁর ভাষায়, "The Great Mosque of Damascus is the most beautiful thing the Muslims have to show in our day, and nowhere else does one see such vast riches all in one place." দুই শতাব্দী পরে অর্থাৎ দশম শতাব্দীতে মুকাদ্দেসীর বর্ণনার পর দ্বাদশ শতাব্দীতে আল-ইদ্রিসী বলেন, "In Damascus there is a mosque that has no equal in the world, not one with such fine proportions nor one so solidly constructed, nor one vaulted so securely, nor one more marvellously laid out, nor one so admirably decorated in gold mosaics and arrayed with the richest ornaments of a marvellous art. Its mihrab is one of the wonders of Islam for its beauty and excellence of its decoration it sparkles all over with gold...the qibla of this blessed mosque, the three cupolas adjoining it, the brilliant light shed through the gilded and polychromed grilled windows, the sunbeams that stream down to become transformed into reflections of divers colour dazzling the eye with their iridescent rays all this stretching across the entire south wall to form a marvellous ensemble that defies description : no words can match ever a tiny part of the effect its form makes on the mind of the visitor."[৩]

স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য এবং অলঙ্করণের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের দিক দিয়ে বিচার করলে মুসলিম স্থাপত্যের আদিপর্বে 'ডোম অব দি রক' বা কুব্বাতু'স সাখরার পরেই দামিস্কের মসজিদের স্থান। মুসলিম বিশ্বে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর্য এবং জাঁকজমকের বাহুল্যে সর্বাধিক

১। A Short Account, p. 59.

২। A Short Account, p. 259

৩। Papadopoulo, p. 235

যে সমস্ত ইমারত বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ও পবিত্রতম তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান দখল করে আছে মক্কা মোয়াজ্জেমার কা'বা শরীফ, দ্বিতীয় স্থান মদিনা মুনওয়ারার রসূলে করীমের (সাঃ) মসজিদ ও মুকবারা। সম্মান ও পবিত্রতার দিক দিয়ে তৃতীয় স্থান জেরুজালেমের বায়তু'ল মুকাদ্দাসে নির্মিত আল-মসজিদুল আকসা। দামিস্কের উমাইয়া জা'মি মসজিদ নিঃসন্দেহে চতুর্থ স্থান দখল করে রয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই মসজিদ নির্মাণে সিরিয়ার ভূমিকর বা খারাজের সাত বছরের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করা হয় বিদেশী স্থপতি, রাজমিস্ত্রী, কারিগর, ছুতার, মোসাইক মিস্ত্রী, শ্রমিক ছাড়াও অসংখ্য ব্যক্তির অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। ৭০৬ থেকে ৭১৫ অর্থাৎ দীর্ঘ নয় বছর ধরে দামিস্কের অতুলনীয় ও প্রাসাদোপম ধর্মীয় ইমারতটির নির্মাণ সম্পন্ন হয়। আবদুল মালিকের মতো তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র আল-ওয়ালীদ মসনদে আরোহণ করে পিতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বায়জানটাইন, কপটিক, ভারতীয়, মগরীবী প্রভৃতি অঞ্চলের স্থপতি ও কারুশিল্পী সংগ্রহ করেন। লক্ষণীয় যে, কুব্বাতু'স সাখরার মতো দামিস্কের মসজিদের অলঙ্করণে বায়জানটাইন প্রভাব প্রকট। Papadopoulo বলেন, "Let us imagine the Great Mosque as it once was, in all the splendour of its refined Byzantine decorations; antique columns with Corinthian or Composite capitals, revetment of priceless marble to a height of thirteen feet, marble inlays, sculpted and gilded marble and wood work and especially its mosaics with landscapes of trees and architecture against a gold ground parts of which survive, fortunately in and on the porticoes around the court."[১]

মুসলিম বিশ্বের চতুর্থ শ্রেষ্ঠ ইমারত হিসাবে স্বীকৃত দামিস্কের মসজিদের সুনাম কেবলমাত্র স্থাপত্যকলায় নয়– অলঙ্করণের অভিনবত্ব, চাকচিক্য ও বৈচিত্র্যে। আল-মুকাদ্দেসী বলেন যে, এই মসজিদে মোসাইক এক অনন্যসাধারণ রূপলাবণ্য ও সৌকর্য লাভ করে। এই মোজাইকে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট বৃক্ষলতা ও পাতা, স্থাপত্যের নিদর্শন, জ্যামিতিক এবং আরবী শিলালিপির এক অপূর্ব সমন্বয় হয়। মসজিদে ব্যবহৃত মসৃণ সাদা মার্বেলের স্তম্ভরাজির শীর্ষদেশ বা ক্যাপিটাল দুই ধরনের ছিল; করিন্থীয় এবং কমপোজিট বা মিশ্রণ। দেওয়াল এবং মেঝেও সাদা এবং রঙিন মার্বেল দ্বারা সুশোভিত। মার্বেল প্যানেলের প্রাচুর্য ছাড়াও সর্বাধিক অলঙ্করণরীতি প্রয়োগ দেখা যায় মোজাইকে। স্বভাবত সর্বাধিক অলঙ্করণ ব্যবহৃত হয়েছে লিওয়ানের দেওয়ালে। ক্রেসওয়েলের বর্ণনায়, দুইজন মানুষের উচ্চতার সমান সাদা মার্বেল দ্বারা আচ্ছাদিত। এর উপরে রয়েছে বিখ্যাত সোনালী দ্রাক্ষালতার নকশা, যা ইবনে আশাকীরের ভাষায় 'কামা'।[২] অলঙ্করণের এই অংশে কেবলমাত্র দ্রাক্ষালতা ও আঙুর ছিল না। অ্যাকান্থাস

১। Ibid, p. 235.

২। A Short Account, p. 57.

জাতীয় গুল্মলতার সংমিশ্রণও দেখা যাবে মোজাইকের অলঙ্করণে। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের নক্শার প্রয়োগ কুব্বাতু'স সাখরার অলঙ্করণরীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আল-মুকাদ্দেসী বলেন যে, স্তম্ভের শীর্ষদেশ সোনালী রঙ দ্বারা মণ্ডিত ছিল। বর্তমান মসজিদের অভ্যন্তরে যে মার্বেল প্যানেল রয়েছে তা ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে পুনর্নির্মিত ও সংযোজিত হয়। তবুও বিভিন্ন স্থানে মূল মোসাইকের নক্শা এখনও বিস্ময়ের সৃষ্টি না করে পারে না। পশ্চিমদিকের পোর্টিকোর খিলানের এবং ট্রানসেপ্টের অভ্যন্তরে খিলানের উপরিভাগে সর্বপ্রাচীন আকর্ষণীয় মোসাইক দেখা যাবে। এই সমস্ত মোজাইক প্যানেলের মূল নক্শা প্রধানত লতাপাতা, বনানী এবং কখনও কখনও ক্ষুদ্রাকৃতি সৌধ। পশ্চিম রিওয়াকের মোসাইকে স্থাপত্যকীর্তি প্রাধান্য পেয়েছে। ইমারতে প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়; মধ্যবর্তী এলাকায় স্তম্ভের উপর একটি প্রাসাদ যার ছাদ ঢালু; ছাদের উপর শীর্ষ রয়েছে। আরও দূরবর্তী স্থানে মসজিদ এবং মিনারের নক্শা সহজেই চোখে পড়ে। দালানের পাশে কতিপয় বুরুজের নক্শা বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। পটপ্রেক্ষিতবিহীন এই মোসাইকচিত্র বায়জানটাইন রীতির প্রতিফলন। এই চিত্ররীতিটি 'বারদা' প্যানেল নামে অভিহিত। ১১৩ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ২৪ ফুট প্রস্থ এই অতুলনীয় মোসাইক প্যানেলটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নক্শাটির নিম্নাংশে প্রবাহিত দামিস্কের অতিপরিচিত বারদা নদী। এর প্রধান গুরুত্ব হচ্ছে স্থাপত্য ও বনানীর সংমিশ্রণে সৃষ্ট প্যানেল। এতে বিভিন্ন জাতের বিশটি বৃক্ষসম্বলিত একটি মনোরম দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। যে সমস্ত গাছ অতিপরিচিত তা হচ্ছে জলপাই, ঝাউ, পপলার, খুবানী, আখরোট, ডুমুর, নাসপতি বা আপেল।

দামিস্ক মসজিদের মোসাইক প্রথমে ১০৬৯ খ্রীস্টাব্দে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেলজুক আমলে সুলতান মালিক শাহ (১০৮২-৮৩ খ্রীঃ) সংস্কার করেন। গম্বুজের নিচে স্থাপিত দুইটি লিপি থেকে এ ধারণা করা হয়। ১৮৯৩ সালে অগ্নিকাণ্ডে পুনরায় মোসাইক ধ্বংস হলে পরের বছর ১৮৯৪ সালে আপেরী (Apery) সংস্কার করেন। লিপিমালা থেকে জানা যায় যে, সাহানের পশ্চিমদিকে মোসাইক মামলুক সুলতান বাইবার্স সংস্কার করেন। অবশ্য আল-ওয়ালীদের সময়ের মোসাইক পরবর্তীকালের অলঙ্করণের তুলনায় উচ্চমানের। উত্তর রিওয়াকের বেশির ভাগ মোসাইকই পুনর্নির্মিত এবং সম্ভবত সেলজুক আমলের শিল্পকর্মের পরিচায়ক। কুফীরীতিতে উৎকীর্ণ মালিক শাহের ভ্রাতা টুটুশ (১০৮৯-৯০ খ্রীঃ) নূতনভাবে মোসাইকের সাজসজ্জা দ্বারা মসজিদের শ্রীবৃদ্ধি করেন। মোসাইকের বিষয়বস্তুর মধ্যে অবশ্য কোনো প্রভেদ নেই, কারণ লতাপাতা, আকান্থাস ও স্থাপত্য প্রাধান্য পেয়েছে। লিপিমালা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নুরুদ্দীন জঙ্গী ১১৫৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে রিওয়াকের মোসাইকের সংস্কার করেন।

মোসাইকের ব্যাপক এবং বৈচিত্র্যময় ব্যবহার দামিস্ক মসজিদকে সুষমামণ্ডিতই করেনি, প্রাচীন বায়জানটাইন অলঙ্করণরীতির সুষ্ঠু প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ অবদান সৃষ্টি করেছে। মসজিদের সাহানে নির্মিত বায়তু'ল মাল যে একসময়ে রঙিন মোসাইক দ্বারা শোভিত ছিল তার নিদর্শন এখনও এই ক্ষুদ্র ইমারতের দেওয়ালে দেখা যাবে। মোসাইকের বিষয়বস্তু একই ধরনের অ্যাকান্থাস লতা, প্রবহমান, নদী, ফল-মূল,

নক্‌শা, বৃক্ষ ইত্যাদি। জ্যামিতিক নক্‌শার উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত মার্বেলের জালি জানালা ব্যবহৃত হয়েছে তা খুবই আকর্ষণীয় এবং রসোত্তীর্ণ শিল্প। ক্রেসওয়েল গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, রোমীয় যুগ থেকে জ্যামিতিক অলঙ্করণ ব্যবহৃত হলেও এর পূর্ণ বিকাশ ঘটে ইসলামের আবির্ভাবের পর। পশ্চিম রিওয়াকে চারটি মার্বেলের জাফরী-জানালা জ্যামিতিক নক্‌শায় প্রতিভাত। বলাই বাহুল্য যে, চতুষ্কোণ, বৃত্ত, অষ্টকোণ, ষষ্ঠকোণ প্রভৃতির সমন্বয়ে কারিগর এরূপ অপূর্ব মাধুর্যপূর্ণ জাফরীর জানালা সৃষ্টি করেছেন যা মুসলিম স্থাপত্য অলঙ্করণে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ পরবর্তী পর্যায়ে এ ধরনের নক্‌শা বহু মুসলিম ইমারতে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রেসওয়েল যথার্থই বলেন যে, কায়রোর ইবনে তুলুনের মসজিদে নবম শতাব্দীতে এবং সুলতান কালাউনের সমাধিতে (দ্বাদশ শতাব্দী) দামিস্ক মসজিদের অনুরূপ জ্যামিতিক নক্‌শার বহুল প্রয়োগ দেখা যাবে।

গুরুত্ব : (চিত্র ১১–১৪)

আল-ওয়ালীদের জা'মি মসজিদ ধর্মীয় গুরুত্বের বিচারে মুসলিম স্থাপত্যে মক্কা, মদিনা এবং জেরুজালেমের পরই চতুর্থ স্থান অধিকার করে রয়েছে। আল-মুকাদ্দেসী বলেন যে, বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত কারিগরেরা নিয়োজিত ছিল ইসলামের অতুলনীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নির্মাণে। ইবনে যুবাইর মন্তব্য করেন যে, ক্ষমতা লাভ করে খলিফা আল-ওয়ালীদ বায়জানটাইন সম্রাটের নিকট থেকে ১২,০০০ দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগর সংগ্রহ করেন। দামিস্কের জা'মি মসজিদ নির্মাণের কাজ তদারক করেন জায়েদ ইবনে ওয়াকিদ।

দামিস্কের জা'মি মসজিদের গুরুত্ব বিচার করা যায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে : ধর্মীয়, রাজনৈতিক, স্থাপত্যিক, আলঙ্কারিক। রিচমন্ড[১] বলেন, "The great Umayyad mosque of Damascus, placed forth in order of dignity by the Moselm world, those of Mecca, Madina and Jerusalem, taking precedence was from the first regarded as one of the wonders of architecture." আরব ঐতিহাসিকগণ ইয়াকুবী, ইসতাখারী, ইবনে হাওকাল একবাক্যে প্রশংসা করেছেন যে, দামিস্কের মসজিদ ইসলামের একটি সর্বোৎকৃষ্ট এবং জমকালো ইমারত। অনেকে এই মসজিদকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় স্বর্গপুরী বলেও বর্ণনা করেন। ইসলামের ধর্মীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে দামিস্কের মসজিদকে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ও সুষমামণ্ডিত মসজিদ বলা যায়। মদিনা, কুফা, বসরা, জেরুজালেম ও ফুসতাতের আদি মসজিদগুলোকে স্থাপত্যের পরিভাষায় সঠিকভাবে ইমরাত বলা যাবে না যদিও মসজিদ স্থাপত্যের ক্রমবিবর্তনে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও পূতপবিত্র স্থান হিসাবে দামিস্ক মসজিদ বিশেষভাবে আকর্ষণীয়, কারণ ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিশালাকার এবং সমস্ত উপকরণের সমন্বয়ে উমাইয়া

১। Richmond. pp. 30–32.

মসজিদ নির্মিত হয়। এই মসজিদের স্থান সম্পূর্ণ নূতন না হলেও একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, আল-ওয়ালীদ এই অতুৎকৃষ্ট ইমারত নির্মাণে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। আল-ওয়ালীদ বলপূর্বক সেন্ট জনের গির্জাকে দখল করেন নি। কারণ খ্রীস্টানদের জন্য তিনি একটি নূতন স্থান নির্ধারিত করে তাদেরকে প্রকৃত মূল্য দিয়ে মসজিদের জন্য গির্জার অংশ ক্রয় করেন। উল্লেখ থাকে যে, প্রাক্-উমাইয়া যুগে গ্রীক দেবমন্দিরের পূর্বাংশে নামায পড়ার ব্যবস্থা ছিল। বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে যে, এই মসজিদেই সর্বপ্রথম বিভিন্ন উপাদানের সমাবেশ হয়, যেমন– লিওয়ান, সাহান, রিওয়াক, মিহরাব, মিমবার, মিনার, ওজুর স্থান এবং পরবর্তী পর্যায়ে মাসকুরা।

Papadopoulo বলেন, "By addressing himself to Byzantine for help al-Walid raised Muslim religious architecture to the height of the great traditions that had come down from classical antiquity and had been continued and modified by Byzantium : thus acquiring for Islam as prestigious a heritage in this domain."[১] দামিস্কের মসজিদকে হিট্টি "fourth sanctuary of Islam" বলে অভিহিত করেন।

দামিস্কের মসজিদ নির্মাণে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। খিলাফত লাভ করে আল-ওয়ালীদ পিতা আবদুল মালিকের মতো বায়জানটাইন প্রভাবে নির্মিত স্থানীয় গির্জাসমূহের স্থাপত্য-কৌশল এবং অলঙ্করণ পদ্ধতিকে ম্লান করে দিয়ে এক অত্যাশ্চর্য ও সুশোভিত মসজিদ রাজধানী দামিস্কে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মু'য়াবিয়া রাজধানী দামিস্ক প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতীকস্বরূপ কোনো অতুলনীয় সৌধ নির্মাণ করেননি। আবদুল মালিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল জেরুজালেমে এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় কুব্বাতু'স সাকরা ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থানে পরিণত হয়। কুব্বাতু'স সাখরা নির্মাণে আবদুল মালিকের রাজনৈভিক উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। আল-ওয়ালীদ ক্ষমতালাভের পর ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে ইসলামী সাম্রাজ্যে ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যরীতি সৃষ্টির মানসে দামিস্কে মসজিদ নির্মাণ করেন। ক্রেসওয়েল যথার্থই বলেন যে, আবদুল মালিক এবং আল-ওয়ালীদ উভয়েই সিরিয়ার খ্রীস্টান গির্জাসমূহকে বিশেষ করে Holy Sepulchre স্থাপত্যরীতি ও অলঙ্করণে ম্লান করার জন্য কুব্বাতু'স সাখরা এবং দামিস্কের মসজিদ তৈরি করেন। তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। বায়জানটাইন কারিগর দ্বারা বায়জানটাইন স্থাপত্যের অনন্যসাধারণ কীর্তিগুলোর তুলনায় অধিকতর অঙ্গসৌষ্ঠব ও ভারসাম্য সৃষ্টিকারী ইমারত নির্মাণে আল-ওয়ালীদ অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি কেবলমাত্র দামিস্ক মসজিদের পুনর্নির্মাণ (৭১৫–১৬ খ্রীঃ), মদিনায় রসূলের মসজিদের পুনর্গঠন, সংস্কার এবং অবতল মিহরাব সংযোজন করে বায়জানটাইন রীতি, কৌশল ও নক্শার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। রিচমন্ড[২] বলেন, "The object of Walid in lavishing all this magnificence and splendour on Mosque

১। op. cit, p. 235.
২। Richmond, p. 33.

of Damascus was to eclipse the finest churches of Syria and Palestine i. e. the Holy Sepulchre of Jerusalem."

মসজিদ-স্থাপত্যের ক্রমবিবর্তনে দামিস্কের মসজিদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। রিচমন্ড বলেন, "The great mosque at Damascus offers the first example of the completed form of congregational mosque in Muslim architecture." ৬২২ খ্রীস্টাব্দে মদীনায় রসূলে করীম (সাঃ) কর্তৃক ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মিত হয় এবং এর একশত বছর পরে বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও বিবর্তনের মাধ্যমে মসজিদের সমস্ত অপরিহার্য উপাদানসমূহ দামিস্কের মসজিদে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হয়। রিচমন্ড মসজিদ-স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের আলোচনায় বলেন যে, মদিনায় একটি অতি নগণ্য ও সাধারণ ইমারত থেকে শুরু করে কুফা, ফুসতাত এবং জেরুজালেমের মসজিদসমূহের মাধ্যমে দামিস্কে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ মসজিদ নির্মাণ পর্যন্ত প্রায় তিন যুগ পার হয়ে গেছে।

মসজিদের নির্মাণে মূলত কয়েকটি উদ্দেশ্য থাকে এবং প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ উদ্দেশ্যাবলীর তাগিদেই সংযোজন করা হয়। প্রধানত একটি মসজিদ তিনটি বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে পারে : (ক) বাহ্যিক, (খ) ধর্মীয় আচার এবং (গ) রাজনৈতিক। ইসলামে নামায একটি অবশ্যকরণীয় বিধান এবং নামাযের সহজ ও সাবলীল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই মসজিদ খুবই সাধারণ এবং অনাড়ম্বরভাবে নির্মিত হয়েছে। রসূলে করীমের (সাঃ) সময়ের পর থেকে দামিস্কের মসজিদের কার্য সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত প্রায় ইসলামের এক শতাব্দী পরে মুসলিম-স্থাপত্যে পূর্ণ অবয়ব এবং সকল উপকরণে সমৃদ্ধ মসজিদের প্রতিষ্ঠা হয়। সাধারণভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, মসজিদ একটি চতুষ্কোণাকার এলাকা যার এক পাশে থাকে চত্বর (সাহান), সাহান ঘিরে পোর্টিকা (রিওয়াক), রিওয়াক সমান্তরাল ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত ('সাকাফ') এবং পাথর ('হাজর') অথবা ইটের ('লিবন') স্তম্ভের (রুকুন) সাহায্যে নির্মিত খিলানরাজি ('তাক') ছাদটির ভার বহন করে রয়েছে।

মসজিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কিবলা নির্ধারণপূর্বক লিওয়ান নির্মাণ। মুসলিম বিশ্বের যে স্থানেই মসজিদ নির্মিত হোক না কেন মুসলমানদের কিবলামুখী অর্থাৎ কা'বা শরীফের দিকে ফিরে নামায আদায় করতে হবে। এমতাবস্থায় মসজিদ নির্মাণের পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রথমে কিবলার দিক নির্ভুলভাবে স্থির করা এবং প্রাচীর দ্বারা সেদিক চিহ্নিত করা। কুর'আন শরীফের সুরা-২, আয়াত ১৩৯-তে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে, কিবলামুখী হয়ে নামায পড়তে হবে। প্রাচীরঘেরা এলাকার কিবলার দিকে স্তম্ভরাজি দ্বারা নির্মিত নামাযের নির্দিষ্ট স্থানকে বলা হয় 'আল-লিওয়ানুল কিবল' অর্থাৎ কিবলামুখী লিওয়ান। এই কিবলা-প্রাচীরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মিহরাব। মিহরাব দুটি উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়, প্রথমটি কিবলা-প্রাচীরের মধ্যস্থলে অবতলাকৃতি কুলুঙ্গী সৃষ্টি করে কা'বা শরীফের দিকে দিক্‌নির্দেশ করা হয় এবং স্থপতি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে এই মিহরাব স্থাপন করেন যাতে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার হিসাবে নিখুঁতভাবে কিবলামুখী দিক্‌নির্দেশ করা যায়। উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুল কিবলা

স্থাপনের জন্য মসজিদের পরিকল্পনার পরিবর্তন করে নূতনভাবে মসজিদ স্থাপন করতে হয় ; এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ওয়াসিতের মসজিদের নাম করতে হয়। দ্বিতীয়ত, কিবলাদিকে মুখ রেখে ইমাম বা নামায পরিচালনাকারী অবতল মিহ্রাবে জামাতের নামায পরিচালনা করেন। কিবলা-প্রাচীরে মিহ্রাবসংলগ্ন যে কাঠ বা পাথরের সিঁড়িবিশিষ্ট মঞ্চ অথবা উপকরণ রয়েছে তা মিমবার নামে পরিচিত। মিহ্রাবের সামনে কখনও কখনও কাঠের চতুষ্কোণাকার বাক্স ধরনের উপাদান দেখা যাবে। ঐতিহাসিকগণের মতে, এই উপাদানের নাম মাকসুরা। ইবনে খালদুনের[১] মতে, মাকসুরা হচ্ছে "The enclosure in which the Sultan stands during public prayers is an enelosure which includes the mihrab (praying niche) and its neighbourhood. The First maqsura was established by Muawiya as a result of the attempt of the Kharijites who had struck him with a sword." মাকসুরা অথবা সুলতানদের নামাজগাহে নিরাপত্তার জন্য নির্মিত হয়। সম্ভবত খলিফা মুয়াবিয়াই প্রথম মসজিদের এ ধরনের একটি কাঠের কাঠামো স্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে, খোলাফায়ে রাশেদুনের মধ্যে দুই জন খলিফা হযরত উছমান ও হযরত আলী মসজিদেই আততায়ীর হাতে নিহত হন। এ কারণে মু'য়াবিয়া ৬৬৪ তারিখের পূর্বেই অর্থাৎ সিরিয়ার শাসনকর্তা থাকাকলীন দামিস্কের মসজিদে সর্বপ্রথম মাকসুরা নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে মাকসুরার বহুল প্রচলন হয় এবং উমাইয়া, আব্বাসীয়, স্পেনের উমাইয়া, ফাতেমীগণ মসজিদে মাকসুরা সংযোজন করেন। মসজিদের অপর একটি অপরিহার্য অংশ হচ্ছে নামাযে যোগদানের অন্য ভক্ত মুসল্লীদের উচ্চ স্থান থেকে আযানের মাধ্যমে আহ্বান করা। যে স্থান থেকে মুয়াজ্জীন আযান দেন তাকে মিনার বা সাওয়ামী বলে। মিনারকে "visible outward sign of the mosque" অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান মসজিদের চিহ্ন বলা হয়েছে। নামায আদায়ের পূর্বে ওজু অবশ্যকরণীয় বিষয়ে সকল মস্‌জিদে ওজুর ব্যবস্থা রাখা হয়। চৌবাচ্চা বা basin-কে মিদা বলা হয়।

মসজিদ-স্থাপত্যের ইতিহাসে এই পটপ্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম মদিনা মসজিদের কথা আসে। এই মসজিদটিকে পরবর্তী মসজিদসমূহের একটি মডেল হিসাবে ধরা হয় কারণ একটি পরিবেষ্টিত এলাকায় লিওয়ান, সাহান, মাজিনা, মিহ্রাব, কিবলানির্দেশক প্রস্তরখণ্ডে ওজুর স্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, "It is an old and still accepted idea that the mosque of Muhammad at Medina represents in an elementary form the prototype of the congregational mosques of the first centuries of Islam." বসরা মসজিদ আবু মুসা আল-আশায়ারী লিওয়ান নির্মাণ করেন এবং পরিবেষ্টিত মসজিদটিতে অনেক উপকরণ না থাকলেও মদিনা মসজিদের মতো চতুষ্কোণাকার ঘেরা এলাকায় নামাযগাহ নির্মিত হয়েছে। মসজিদ স্থাপত্যের ক্রমবিকাশে কুফা মসজিদ বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১। A Short Account, p. 11.

পরিবেষ্টিত প্রাচীর না থাকলেও কুফা মসজিদেও লিওয়ান বা যুল্লা ছিল। অবশ্য এতে সাহান, ওজুর ও আযানেব ব্যবস্থা থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আদি মসজিদে কোনো মিহরাব, মিনার বা মিমবার ছিল বলে জানা যায় না। ইসলামের চতুর্থ মসজিদ নির্মিত হয় কায়রোর সন্নিকটে ফুসতাতে। মসজিদ-স্থাপত্যের ইতিহাসে ফুসতাতে মসজিদ একটি ব্যতিক্রম এইজন্য যে এখানে সর্বপ্রথম আয়তাকার এলাকায় সাহানবিহীন ইমারত তৈরি করা হয়। লিওয়ান ছিল কিন্তু কোনো মিমবার এবং মিহরাব ছিল কিনা জানা যায় না। ফুসতাত মসজিদের সর্বাধিক গুরুত্ব হচ্ছে যে এই ইমারতে ইসলামের সর্বপ্রথম সাওয়ামী বা মিনার নির্মিত হয়।

ইতিপূর্বে অন্য কোনো মসজিদে আযান দেওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। খোলাফায়ে রাশেদুনের পর উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আরবে ইসলাম সর্বপ্রথম অনারব প্রভাবের বিশেষ করে বায়জানটাইন আওতায় পড়ে। মু'য়াবিয়ার খিলাফতে দামিস্কের মসজিদে সর্বপ্রথম মাকসুরা সংযোজিত হয় এবং তারই আমলে মিশরের গভর্নর আমর ইবনে আল-আস ফুসতাতের মসজিদে সাওয়ামী অর্থাৎ মিনার নির্মাণ করেন। দামিস্কের মসজিদের প্রাচীন গ্রীক টাওয়ারের অনুকরণে ফুসতাতের মসজিদের চার কোণায় চারটি চতুষ্কোণাকার মিনার নির্মিত হয়। উপরন্তু, স্থাপত্য ছাড়া অলঙ্করণের দিক থেকে মুসলিম শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধিত হয়, কারণ ৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে মাসুদীর তথ্যানুযায়ী ইসলামী ইমারতে সর্বপ্রথম মোসাইক ব্যবহৃত হয় বিধ্বস্ত কা'বাগৃহের সংস্কারে। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর এই সংস্কারে গ্রাস মোসাইক ব্যবহার করেন এবং ক্রেসওয়েলের মতে, এই ধর্মীয় ইমারতে কুব্বাতু'স সাখরার সাত বছর পূর্বে সর্বপ্রথম এ ধরনের অলঙ্করণের প্রয়োগ দেখা যাবে। আবদুল মালিক কর্তৃক নির্মিত কুব্বাতু'স সাখরা ইসলামের সর্বপ্রথম গম্বুজবিশিষ্ট ইমারত, যা পরবর্তীকালে মুসলিম-স্থাপত্যের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়। জেরুজালেমে নির্মিত প্রথম আল-আকসা মসজিদটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আয়তন ও স্থাপত্যশৈলীর দিক দিয়ে। ৩৬০টি করিন্থীয় স্তম্ভ দ্বারা লিওয়ান বিশালাকারে নির্মিত হয়, যাতে একসঙ্গে তিন হাজার মুসল্লী নামায পড়তে পারেন।

মুসলিম-স্থাপত্যের ইতিহাসে এবং বিশেষভাবে মসজিদরীতির ক্রমবির্তনে আল-ওয়ালীদ বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। ৭০৭-৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর খিলাফতে হেজাজের গভর্নর ওমর ইবনে আবদুল আযীয মদিনার মসজিদে সর্বপ্রথম অবতলাকৃতি মিহরাব স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এ ধরনের মিহরাব মসজিদের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। ওয়ালীদের সময়ে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কর্তৃক নির্মিত ওয়াসীতের মসজিদের (৭০৩-৪ খ্রীঃ) পুনর্নির্মাণে একই ধরনের অবতল মিহরাব সংযোজিত হয়। উল্লেখ্য যে, প্রথম এবং দ্বিতীয় ওয়াসীতের মসজিদটি প্রথম যুগের মসজিদগুলোর মতো চতুষ্কোণাকার লিওয়ান ও সাহানসম্বলিত। খননের ফলে আবিষ্কৃত ওয়ালীদের ওয়াসিত মসজিদটি ক্রেসওয়েলের মতে, "Oldest mosque in Islam of which remains have come down to us."[১] আল-ওয়ালীদের অসামান্য কৃতিত্ব বহন করে রয়েছে

১। A Short Account, p. 42

দামিস্কের জা'মি মসজিদ। মদিনা মসজিদ থেকে মসজিদ-স্থাপত্যের সূচনা হয় এবং পরবর্তী মসজিদসমূহে অত্যাবশ্যকীয় উপকরণসমূহের বিবর্তনের ফলে দামিস্কের মসজিদে ইসলামের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ও সর্বপ্রকার উপাদানসমৃদ্ধ মসজিদের রূপ পরিগ্রহ করে। এই মসজিদে নামায পড়ার ধর্মীয় উপাদানের সুষ্ঠু সমাবেশ হয়, যেমন– মিহরাব, মিমবার, মিনার, ওজুর স্থান; শারীরিক অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্তে এই মসজিদে একটি লিওয়ান ও রিওয়াক নির্মিত হয়, লিওয়ানে জামাতে নামায পড়ার ব্যবস্থা থাকে এবং রৌদ্র-বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় নিরাপদে মসজিদের অভ্যন্তরে লিওয়ানে পৌঁছবার জন্য রিওয়াকের সৃষ্টি। দামিস্ক মসজিদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও তাৎপর্যপূর্ণ। রিচমন্ডের ভাষায়, এই মসজিদ কুব্বাতু'স সাখরার মতো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছিল। আল-ওয়ালীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যে অতুলনীয় ধর্মীয় সৌধ নির্মিত হয় তার মূলে ছিল খ্রীস্টান জগতে চমক সৃষ্টি করা, "by a Majesty and symmetry of plan and a splendour of ornament which would by rivalling and by surpassing the architecture of the conquered Christian civilization in the provinces of the Byzantine Empire which had been overrun."[১]

দামিস্ক মসজিদ নিঃসন্দেহে একটি পূর্ণাঙ্গ মসজিদ যা পরবর্তীকালে আয়তাকার ভূমি-পরিকল্পনাবিশিষ্ট এবং সকল উপাদানে সন্নিবেশিত মসজিদসমূহকে প্রভাবান্বিত করেছে। এই মসজিদের পূর্বে অন্য কোনো ধর্মীয় ইমারতে সকল উপাদানের সুষ্ঠু সমন্বয় হয়নি। অথবা রিচমন্ডের ভাষায়, "there was no sanctuary wholly knit together into a symmetrical architectural whole." এ কারণেই দামিস্কের মসজিদকে আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য মসজিদ বলে অভিহিত করা হয়। হয়তো এজন্যই রিচমন্ড মন্তব্য করেন : "The great mosque of Damascus offers the first example of the completed form of congregational mosque in Muslim architecture."[২] দামিস্ক মসজিদকে জা'মি মসজিদের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই মসজিদের প্রভাব কেবলমাত্র ধর্মীয় আচারের পরিপূরক হিসাবেই দেখা যায় না। স্থাপত্যিক বিন্যাস ও ভারসাম্যরক্ষায় এই মসজিদের অবদান অসামান্য। পরবর্তীকালে ইরান, তুরস্ক ও ভারত উপ-মহাদেশে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে দামিস্কের মসজিদের প্রভাবে। Papadopoulo বলেন, "In the great Mosque built in Damascus by the Caliph al-Walid at almost the same time as the one in Medina, the various archetypal symbolic forms created in the mosque of Medina and the principles underlying its overall organization were developed further and received their decorative architectural formulation."[৩] বিভিন্ন মুসলিম দেশে দামিস্কের মসজিদের

১। Richmond,pp. 29–33.

২। Ibid, p.34.

৩। Papadopoulo, p. 231

অনুকরণে যে মসজিদ নির্মিত হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় শিলালিপিতে। জলবায়ু, স্থাপত্য-উপকরণ ও রীতির তারতম্য বিভিন্ন মুসলিম দেশে মসজিদের রূপান্তর হয়েছে সত্য তবে দামিস্ক মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনা, নিখুঁত অনুপাতসম্পন্ন উপকরণের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় শতাব্দী ধরে আদর্শ হিসাব পরিগণিত হয়। এ কারণে Van Berchem বলেন, "The style and methods of construction were modified during the course of time particularly as to the choice of materials, gateways, facades and minarets, profile outline of the interior arches and decoration but the general plan of the mosque remains the same until the Ottoman conquest."[১]

প্রভাব :

দামিস্কের মসজিদের স্থাপত্যিক প্রভাব ছিল অপরিসীম। মধ্যযুগীয় মুসলমানগণ যে মসজিদকে পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য হিসাবে মনে করতেন সেই ইমারতটি বিভিন্ন কারণে মসজিদ-স্থাপত্যের ক্রমবিকাশ ও উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এই অবদান প্রধানত পাঁচটি ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়, যথা : (ক) তিন অক্ষপ্রান্তে নির্মিত প্রবেশপথ, (খ) প্রধান 'নেভ' বা ট্রানসেপ্ট, (গ) তিন আইলবিশিষ্ট লিওয়ান, (ঘ) পর্যায়ক্রমে পিয়ার ও গোলাকার স্তম্ভের বিন্যাস, (ঙ) গোলাকৃতি খিলান, (চ) স্তম্ভশ্রেণীর সাহায্যে নির্মিত বায়তুল-মাল।

(ক) দামিস্কের মসজিদের অনুরূপ কসর আল-হাইরের জা'মি মসজিদে (৭২৮-২৯ খ্রীঃ), হাররানের মসজিদে (৭৪৪-৫০ খ্রীঃ) এবং হামার আদি জা'মি মসজিদে (৬৩৬-৩৭ খ্রীঃ) তিন অক্ষপ্রান্তে নির্মিত প্রবেশপথের ব্যবহার দেখা যায়। প্রবেশপথের এই বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য লাভ করে এবং আয়তাকারের মসজিদে সার্বজনীন রূপ ধারণ করে। এর দৃষ্টান্ত রয়েছে কায়রোতে নির্মিত হাকিমের মসজিদে (৯৯০-১০১৩ খ্রীঃ), আস-সালিহ তালাই-এর মসজিদে (১১৬০ খ্রীঃ), প্রথম বায়বার্সের মসজিদ (১২৬৬-৬৯ খ্রীঃ), আল-বাকলীর মসজিদ (ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধ), আল মারিদানীর মসজিদ (১৩৩৯-৪০ খ্রীঃ), যইনুদীন আল-বুলাকের মসজিদ (১৪৪৮-৪৯ খ্রীঃ) এবং এযবেকের মসজিদ (১৪৪৭-৭৫ খ্রীঃ) ইত্যাদি। ভারতীয় ইসলামী স্থাপত্যকলায় মসজিদনির্মাণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং প্রথম যুগের মসজিদগুলো তিন অক্ষপ্রান্তে নির্মিত প্রবেশপথ দেখা যাবে। পুরাতন দিল্লীর 'কুওয়াতুল ইসলাম' মসজিদের যে অংশে ইলতুৎমিশ সম্প্রসারণ করেন সেখানে তিনটি অক্ষপ্রান্তে প্রবেশপথ নির্মিত হয়। এ ছাড়া জৌনপুরের প্রায় সকল মসজিদেও এ ধরনের প্রবেশপথ দেখা যাবে, যেমন— অতলা দেবী মসজিদ, জা'মি মসজিদ। চাম্পানীরের জা'মি ও দিল্লীর খিড়কী মসজিদও বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য যে, এই সমস্ত মসজিদ চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়।[২]

১। Van Bercham, Architecture (Encyclopaedia of Religions and Ethics), vol I. 1908, p. 757

২। Grover S. The Architecture of India, Islamic, 727–1707 A.D. Delhi, 1981, pp. 14, 43, 55.

(খ) লিওয়ানের মধ্যভাগে লম্বালম্বি 'নেভ' বা ট্রানসেপ্ট প্রার্থনাগারকে দুটি অংশে ভাগ করে। দামিস্কের মসজিদ সম্ভবত প্রথম ইমারত যেখানে প্রার্থনাগারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অনুরূপ ট্রানসেপ্ট পরবর্তীকালে অনেক মসজিদে লক্ষ করা যায়। যেমন--দিয়ারবকরের জা'মি মসজিদ (একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ), কাসরুল হাইর আল-শরকীর মসজিদ। দেরা'রা এবং এফিসাসের মসজিদ। এ ছাড়া কায়রোর আজহার (৯৭০–৭২ খ্রীঃ), হাকিমের মসজিদ (৯৯০–১০১৩ খ্রীঃ) এবং প্রথম বায়বার্সের মসজিদ ট্রানসেপ্টের ব্যবহার অব্যাহত থাকে।[১] এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য যে, আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় লিওয়ানের ট্রানসেপ্ট প্রাক্-মুঘল যুগের বাংলার স্থাপত্যশিল্পে পরিলক্ষিত হয়। নিদর্শনস্বরূপ মালদা জেলার হযরত পাণ্ডুয়ায় নির্মিত আদিনা মসজিদ (১৩৭৪-৭৫ খ্রীঃ) এবং গৌড়ের গুনমন্ত মসজিদ (১৪৮৪), দারাসবাড়ী মসজিদ (১৪৭৯) ও ছোট সোনা মসজিদের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) নাম উল্লেখ করা যায়।[২]

(গ) তিন আইলবিশিষ্ট লিওয়ানের রীতি দামিস্কের প্রতিফলিত মসজিদ থেকে প্রভাবান্বিত হয়ে পরবর্তীকালে যে সমস্ত মসজিদে স্থাপিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কাসরুল হাইয়েরের মসজিদ, কুসাইর আল-হাল্লাবাতের মসজিদ, রাক্কার মসজিদ, দেরা'র মসজিদ এবং দিয়ারবকরের মসজিদ। তিন খিলানবিশিষ্ট লিওয়ানের প্রচলন সুদূরপ্রসারী প্রাক্-মুঘল যুগের বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে কতিপয় মসজিদ দামিস্কের অনুকরণে নির্মিত হয় তিন খিলানবিশিষ্ট লিওয়ান এবং ট্রানসেপ্টের ব্যবহারে। এ প্রসঙ্গে গৌড়ের গুনমন্ত মসজিদ, দারাসবাড়ী মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ ও ছোট সোনা মসজিদের উল্লেখ করা যায়।

(ঘ) সাহানের চতুর্দিক বিশেষ করে রিওয়াকে গোলাকার স্তম্ভ এবং চতুষ্কোণাকার পিয়ারের পর্যায়ক্রম সন্নিবেশন দামিস্কের মসজিদে রিওয়াকে একটি পদ্ধতিগত প্রথায় পরিণত করে। পরবর্তী পর্যায়ে কাসর আল-হাইয়ের মসজিদ, হামা ও কর্ডোভার মসজিদেও এই প্রথার প্রয়োগ দেখা যায়। অবশ্য ক্রেসওয়েলের মতে, ৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের পর অর্থাৎ প্রথম আবদুর রহমানের পর থেকে তৃতীয় আবদুর রহমানের সময়ের মধ্যে সম্ভবত স্তম্ভের বিন্যাস সম্পন্ন করা হয়। আল-মুকাদ্দেসীর তথ্য অনুযায়ী, জেরুজালেমের হারাম শরীফে স্তম্ভ ও পিয়ারের পর্যায়ক্রম ব্যবহার পশ্চিমদিকে অবশ্যই ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা দেখা যায় না।

(ঙ) দামিস্কের জা'মি মসজিদে ব্যবহৃত গোলাকার অশ্বনালাকৃতি খিলান পশ্চিম-দেশীয় ইসলামী স্থাপত্য-শৈলীতে পরিণত হয়। স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় এ ধরনের খিলানের বহুল প্রচলন দেখা দেয়। ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, দামিস্কের মসজিদের খিলানের আকৃতি কর্ডোভা মসজিদ এবং উত্তর আফ্রিকায় কায়রোয়ান মসজিদে খিলানরাজিকে প্রভাবান্বিত করেছে; কিন্তু এই ধরনের খিলানের উৎস সন্ধান করে ক্রেসওয়েল প্রমাণ করেন যে, স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকার গোলাকার

১। A Short Account, p. 81.

২। Hasan, S.M., Mosque Architecture of pre-Mughal Bengal, Dacca, 1979 pp. 146-48, 155-57, 160-62.

অশ্বনালাকৃতি খিলানের আদি জন্মস্থান অবশ্য সিরিয়ার নিসিবিনে মার ইয়াকুবের মঠে (৩৫৯ খ্রীঃ) যেখানে সর্বপ্রথম এ ধরনের খিলান ব্যবহৃত হয়েছে।

(চ) স্তম্ভের উপর নির্মিত মসজিদের সাহায্যে বায়তুল মাল দামিস্কের একটি আকর্ষণীয় ইমারত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের স্থাপত্যকীর্তি লক্ষ করা যাবে। ইস্‌তেখারী বলেন যে, আজারবায়জানের জা'মি মসজিদে দশম শতাব্দীতে নয়টি স্তম্ভের উপর 'বায়তুল মাল' নির্মিত হয়। আল-মুকাদ্দেসীর বর্ণনা অনুযায়ী রাজধানী দামিস্কের অনুকরণে প্রত্যেক প্রাদেশিক মসজিদের অভ্যন্তরে স্তম্ভের উপর বায়তুল মাল স্থাপন করা হয়। এ ছাড়া ফুসতাত, হামা এবং হাররানেও বায়তুল মাল নির্মিত হয়।

দামিস্কের মসজিদের প্রভাবের ব্যাপকতা আলোচনা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। স্থাপত্যশৈলী অলঙ্করণের মোটিভ, নির্মাণকৌশলের অভিনবত্ব, উপাদানের সুষ্ঠু বিন্যাসে ইমারতের ভারসাম্য রক্ষায় উমাইয়া মসজিদ একটি অত্যুৎকৃষ্ট ইমারত।

৬। জাবাল সাইজ, মসজিদ ৭০৫–১৫ খ্রীঃ

দামিস্কের ৬৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে জাবাল সাইজ অবস্থিত। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কৃত জাবাল সাইজের ধ্বংসাবশেষ থেকে কতিপয় ইমারতের ভিত্তিভূমি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রাসাদ-মসজিদ ও স্নানাগার। উমাইয়া যুগে নির্মিত প্রাসাদ মসজিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পরিলক্ষিত হবে জাবাল সাইজে।

বর্গাকার মসজিদটি প্রাসাদের পশ্চিমে প্রায় ২২৯ ফুট দূরে অবস্থিত। এর পরিমাপ ৩১ ফুট উত্তর-দক্ষিণে এবং ৩০১/২ ফুট পূর্ব-পশ্চিমে। সম্পূর্ণ ঢাকা প্রাসাদ-মসজিদটির অভ্যন্তরে দুটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান দেখা যাবে। এই খিলান দুটি পূর্ব-পশ্চিমে স্থাপিত এবং মসজিদকে দুই অংশে ভাগ করেছে। খিলান দুটি দেওয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত চারকোণা স্তম্ভ থেকে উঠে গিয়ে মাঝের আর একটি দেওয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত চারকোণা স্তম্ভের উপর গিয়ে মিশেছে। জাবাল সাইজের মসজিদের কিবলা-প্রাচীরে অবতলাকার মিহরাব স্থাপিত হয়। মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এই মিহরাবটি প্রস্থে ৩১/২ ফুট এবং ভিতরে ৪১/৪ ফুট। এই মসজিদটির দুটি প্রবেশপথ রয়েছে–একটি উত্তর দেওয়ালের মাঝে এবং অপরটি পূর্বদিকের খিলানরাজির সামান্য দক্ষিণে। উপকরণের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে মসজিদটির নিচের দিক বাসাল্ট এবং উপরের দিক ইট দ্বারা নির্মিত। অতি সাধারণ ও কারুকার্যবিহীন মসজিদটি কাঠের ছাদ দ্বারা আবৃত ছিল। অবতলাকার মিহরাব থাকায় এই মসজিদের নির্মাণকাল ৭০৭–৯ খ্রীস্টাব্দের পরে হবে। সঠিকভাবে সন-তারিখ বলা না গেলেও শিলালিপি থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, জাবাল সাইজ প্রাসাদ ওয়ালীদ কর্তৃক নির্মিত হয়। সুতরাং মসজিদের নির্মাণকাল হবে ৭০৫–১৫ খ্রীস্টাব্দ। আল-ওয়ালীদের রাজত্বের অবসানে পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ এই মসজিদ ব্যবহার করেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তীকালের উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে।

৭। কাসরু'ল মিনিয়া, ৭০৫–১৫ খ্রীঃ

১৯৩২ সালে টাইবেরিয়াস হ্রদের ৬৫২ ফুট উত্তর-পূর্বে এবং তাবগা শহরের ১ মাইল পশ্চিমে কাসরু'ল মিনিয়ার ধ্বংসাবশেষ প্রথম আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে খননকার্য

পরিচালনা করে এ স্থানে একটি বিশাল উমাইয়া প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। ১৯৩৭-৩৯ খ্রীস্টাব্দে শ্লাইডার এবং পুটিশ রেনিয়ার (Schnlider and Puttrich Riegnand) প্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় একটি মসজিদের অংশ আবিষ্কার করেন।

কাসরু'ল মিনিয়ার মসজিদটি আয়তকার : পরিমাপ ৪৩ ফুট চওড়া ও ২৮ ফুট গভীর। আয়তনের অনুপাত ৩ : ২। এই মসজিদে প্রবেশের পথ রয়েছে একটি হলঘরের মধ্য দিয়ে। হলঘর থেকে তিনটি দরজা দিয়ে প্রথমে একটি আয়তাকার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে হয়। মসজিদটিতে পূর্ব-পশ্চিমে তিনটি স্তম্ভরাজি রয়েছে। প্রতিটি স্তম্ভসারিতে তিনটি স্তম্ভ স্থাপিত। এভাবে সমগ্র মসজিদের লিওয়ান চার ভাগে বিভক্ত। স্বভাবত মিহরাবটি কিবলা অর্থাৎ দক্ষিণদিকে অবস্থিত। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে এই মিহরাবটি আবিষ্কৃত হয়।

খননকালে শ্লাইডার প্রবেশদ্বারের 'সিলে' কুফীরীতিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কাসরু'ল মিনিয়ার নির্মাতা ছিলেন উমাইয়া স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক আল-ওয়ালীদ। এই শিলালিপিতে সন-তারিখ উল্লেখ নেই; কারণ বহু পূর্বেই তা ভেঙে গেছে।

৮। আনজার, মসজিদ, ৭১৪-১৫ খ্রীঃ

সিরিয়া ও লেবাননের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত আনজারের প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলেই প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ইমারত হচ্ছে প্রাসাদটি। বিশাল এলাকা নিয়ে নির্মিত এই প্রাসাদে কাসরুল মিনিয়ার মতো একটি মসজিদ রয়েছে। ২৩২ ফুট উত্তর-দক্ষিণে এবং ১৯৪$^{১}/_{২}$ ফুট পূর্ব-পশ্চিমে পরিমিতি-সম্বলিত প্রাসাদটির মাঝে খোলা চত্বরের চারদিকে বারান্দা নির্মিত হয়। বারান্দার পিছনে প্রাসাদকক্ষগুলো বিন্যস্ত ছিল। উত্তর হলের পূর্ব দিকে যে দরজা রয়েছে তা দিয়ে প্রাসাদের উত্তরে অবস্থিত ক্ষুদ্রাকার মসজিদে প্রবেশ করা যেত।

আনজার মসজিদটি কাসরু'ল মিনিয়ার মসজিদের মতো আয়তাকার ছিল; পরিমাপ ছিল উত্তর-দক্ষিণে ৯৮ ফুট গভীর এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৫৩$^{৩}/_{৪}$ ফুট প্রশস্ত। এই মসজিদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে দুইটি আইল রয়েছে; কিন্তু উত্তর প্রান্তে মাত্র একটি আইল নির্মিত হয়। সাধারণতঃ মিহরাব কিবলা-প্রাচীরের মধ্যস্থলে স্থাপন করা হয়; কিন্তু আনজার মসজিদে মিহরাবটি দক্ষিণ প্রাচীরের পূর্বদিকে সরিয়ে নির্মাণ করা হয়। আর একটি ব্যতিক্রম হচ্ছে যে, সাধারণত কিবলা-প্রাচীরে প্রবেশ পথ থাকে না; কিন্তু এক্ষেত্রে মিহরাবের দুই পাশে দুটি প্রবেশপথ রয়েছে। মনে করা হয়ে থাকে যে, প্রধান প্রবেশপথ ছিল উত্তরদিকে।

প্রাসাদ-মসজিদগুলো সাধারণত নির্মাতার ব্যবহারের জন্যই স্থাপিত হত এবং এর প্রমাণ পাওয়া যায় মিহরাবের পশ্চিমদিকের প্রবেশপথের সঙ্গে প্রাসাদের দ্বিতীয় প্রবেশ-দ্বারের একই অক্ষরেখায় নির্মাণে।

৯। রামলা, মসজিদ, ৭১৫–১৭ খ্রীঃ

ক্রেসওয়েলের মতে, রামলার নির্মাতা উমাইয়া খলিফা সোলাইমান। তিনি এই নূতন শহরে একটি প্রাসাদ এবং মসজিদ নির্মাণ করেন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পূর্বেই। খিলাফত লাভ করে তিনি প্রাসাদটির নির্মাণ সম্পন্ন করতে পারলেও মসজিদের নির্মাণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মসজিদের পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযীযের সময়ে। ১০৩৩ খ্রীস্টাব্দে মসজিদটি ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পূর্বে আল-মুকাদ্দেসী এর বর্ণনা দেন। তাঁর ভাষায়, মসজিদটি অনিন্দ্যসুন্দর ইমারত ছিল ; মার্বেলপাথরের স্তম্ভদ্বারা এই মসজিদটি নির্মিত হয় এবং মেঝেও মার্বেল পাথরে আচ্ছাদিত ছিল। তিনি এই মসজিদটিকে জা'মি আল-আবইয়াব অর্থাৎ সুভ্র মসজিদ হিসাবে অভিহিত করেন। এর কারণ সার্বজনীনভাবে নির্মাণকাজে মার্বেলপাথরের ব্যবহার। রামলার মসজিদের চারকোণায় চারটি মিনার ছিল। ১০৩৩ খ্রীস্টাব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ১০৪৭ খ্রীস্টাব্দে এই মসজিদটি পূনর্নির্মিত হয়। নাসির-ই-খসরু পুনর্নির্মিত মসজিদটি দেখতে পান।

১০। আলেপ্পো, মসজিদ, অষ্টম শতাব্দী

উমাইয়া খলিফা সোলায়মান আলেপ্পোয় একটি সুন্দর ও কারুকার্যখচিত মসজিদ নির্মাণ করেন। ইবনু'ল আছীরের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে আস-শিহনা বলেন যে, সোলায়মান আলেপ্পোর প্রথম জা'মি মসজিদ স্থাপন করেন। তাঁর ভাষায়, "আলেপ্পোর প্রধান মসজিদ মার্বেল ও মোজাইকের অলঙ্করণের দিক দিয়ে বিচার করলে দামিস্কের মসজিদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। আমি শুনতে পেয়েছি যে, আবদুল মালিকের পুত্র সোলায়মান এই মসজিদটি এমনভাবে নির্মাণ করেন যাতে তাঁর ভ্রাতা কর্তৃক দামিস্কের প্রধান মসজিদটির সমকক্ষ হতে পারে।"

উমাইয়া খিলাফতের পতনের পর আব্বাসীয়গণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁদের বিজয়সাফল্যের পর তাঁরা আলেপ্পো মসজিদ থেকে মার্বেলপাথর এবং আসবাবপত্র নিয়ে আনবারের মসজিদকে সুষমামণ্ডিত করেন। ৯৬২ খ্রীঃ পর্যন্ত এই মসজিদটির ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। সে বছর বায়জানটাইন সম্রাট নাইসিফোরাস আলেপ্পো দখল করেন এবং সমগ্র মসজিদটি অগ্নিকাণ্ডে ভস্মিভূত হয়। জঙ্গী বংশের সুলতান সাইফ আদ-দৌলা মসজিদটির পুনর্নির্মাণ করেন ৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে। পরবর্তী পর্যায়ে মসজিদটি কয়েক দফায় পুনর্নির্মিত হয়। সর্বশেষ সংস্কার করেন সেলজুক সুলতান মালিক শাহ।

১১। বুসরা, মসজিদ, ৭২০ খ্রীঃ

সীটযেন (Seetzen) সর্বপ্রথম উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বুসরা মসজিদের অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৩৮-৩৯ সালে সিরিয়া সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ খননকাজ শুরু করে মসজিদটির সম্বন্ধে তথ্য উন্মোচন করে। বুসরা মসজিদের পরিমাপ অসম আয়তাকার ; উত্তর বাহুর পরিমিতি ১১০৩/৪ ফুট, দক্ষিণ বাহু

১০৬^{১}/২ ফুট, পূর্ব বাহু ১০১^{১}/২ ফুট এবং পশ্চিম বাহু ৯৪^{৩}/৪ ফুট। এর ফলে উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মসজিদের পরিমাপ সমান নয়। উত্তর থেকে দক্ষিণে ৪^{১}/২ ফুট সরু এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে ৭ ফুট সরু। মসজিদটির বহুলপ্রচলিত নাম হচ্ছে উমারী মসজিদ অর্থাৎ উমরের মসজিদ। এই ইমারতে অবস্থিত দুটি শিলালিপির সন-তারিখ থেকে জানা যায় ৭২০ এবং ৭৪৫ খ্রীস্টাব্দ। বুসরার মসজিদটির নির্মাতা শিলালিপি অনুযায়ী দ্বিতীয় ইয়াজিদ। তিনি ৭২০ খ্রীস্টাব্দে এই ইমারত স্থাপন করেন; কিন্তু ক্রেসওয়েল মনে করেন যে, এক বছরে মসজিদের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর নয় এবং যেহেতু মসজিদটি উমারী মসজিদ নামে অধিক পরিচিত সেহেতু প্রতীয়মান হয় যে, বুসরা মসজিদটি নির্মাণ শুরু করেন উমর বিন আবদুল আজিজ। ৭৪৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এই মসজিদটি দ্বিতীয় মারওয়ান সংস্কার করেন।

আয়তনের দিক থেকে বিচার করলে বুসরা মসজিদ একটি ব্যতিক্রমধর্মী মসজিদ; কারণ অনিয়মিত মাপের প্রাচীর খুব বেশি লক্ষ করা যায় না। কায়রো মসজিদেই সম্ভবত এই অসম বাহু দ্বারা পরিবেষ্টিত এলাকা দেখা যাবে। বুসরা মসজিদ অঙ্গনবিশিষ্ট (Courtyard type) মসজিদ অর্থাৎ একটি চত্বর বা সাহান রয়েছে। এর দক্ষিণ দিকে স্থাপিত হয়েছে লিওয়ান বা নামাযগাহ। লিওয়ানে তিনটি স্তম্ভশ্রেণী রয়েছে এবং মর্মর পাথরের তৈরি স্তম্ভগুলো খিলান নির্মাণে সহায়তা করছে। সর্বমোট তিনটি খিলানশ্রেণী কিবলার দিকে লিওয়ানে নির্মিত হয়। সর্বশেষটি কিবলা-প্রাচীরের সঙ্গে সংলগ্ন। এর ফলে লিওয়ানে মাঝের স্তম্ভরাজি দ্বারা দুইটি আইলের সৃষ্টি হয়েছে। অপর স্তম্ভশ্রেণীর চত্বরের সম্মুখে লিওয়ানের প্রাচীরের কাজ করছে। এক-একটি স্তম্ভরাজিতে সাতটি খিলান দেখা যাবে এবং মধ্যের খিলানটি অপেক্ষাকৃত বড়। মধ্যের খিলানটির আকৃতি কৌণিক। ২২ ফুট চওড়া এবং ৫ ফুট উঁচু থেকে নির্মিত। পাশের খিলানসমূহ অর্ধবৃত্তাকার এবং ৯^{৩}/৪ ফুট চওড়া। মসজিদ-স্থাপত্যের সুনির্দিষ্ট রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী এই মসজিদেও রিওয়াক রয়েছে– উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে। উত্তরদিকে কি ধরনের রিওয়াক ছিল তা সুষ্ঠুভাবে বলা যায় না, তবে পূর্ব ও পশ্চিমদিকের রিওয়াক খিলানরাজি দ্বারা গঠিত। পূর্বদিকের রিওয়াকে উত্তর-দক্ষিণে তিনটি খিলান দেখা যাবে এবং এই লম্বালম্বি খিলানশ্রেণী আড়াআড়িভাবে দুটি খিলানবিশিষ্ট স্তম্ভরাজি দ্বারা বিভক্ত। পশ্চিমদিকের রিওয়াকে পূর্বদিকের রিওয়াকের মতো স্তম্ভ ও খিলানের বিন্যাস দেখা যাবে। উত্তরের রিওয়াক সম্বন্ধে বাটলার অভিমত প্রকাশ করেন যে, এখানেও পশ্চিম ও পূর্ব রিওয়াকের মতো দুই আইলবিশিষ্ট রিওয়াক ছিল; কিন্তু উত্তরদিকে খননের ফলে মাত্র একসারি তিনটি চতুষ্কোণাকার স্তম্ভের ভিত পাওয়া যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উত্তর রিওয়াকে মাত্র একসারি স্তম্ভ ছিল।

বুসরা মসজিদের কিবল-প্রাচীরে একটি অবতলাকৃতি মিহরাব নির্মিত হয়। মিহরাবটি ৩ ফুট চওড়া, ২ ফুট গভীর এবং ৮^{১}/২ ফূট উঁচু। মসজিদের প্রাচীর কালো ব্যাসল্ট পাথরে তৈরি। এই মসজিদে প্রবেশপথ রয়েছে মোট নয়টি। তিনটি উত্তরে, চারটি পূর্বে এবং দুটি পশ্চিমে। প্রবেশদ্বারের উপরে লিনটেল বা সর্দল ব্যবহৃত হয়েছে।

উত্তর-পূর্বে সিরিয়ার প্রতিষ্ঠিত রীতিমাফিক একটি চতুষ্কোণাকার মিনার রয়েছে। বাহিরের দেওয়াল থেকে কিঞ্চিৎ দূরে নির্মিত এর মিনারটির উপরে যাওয়ার জন্য চৌষট্টিটি সিঁড়ি আছে। আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য সিঁড়ির মাঝে মাঝে ছোট ছোট জানালা দেখা যাবে। মিনারটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় কারণ এর শীর্ষদেশে একটি ছোট প্রকোষ্ঠ রয়েছে। $১২^{১}/৪$ উঁচু এই প্রকোষ্ঠের চারিদিকে জোড়া জানালা নির্মিত হয়। এই জোড়া জানালা মধ্যবর্তী একটি প্যাঁচানো নক্‌শার স্তম্ভ থেকে উঠে গেছে।

গুরুত্ব :

বুসরা মসজিদ সিরিয়ায় নির্মিত উমাইয়া যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ। দামিস্কের জা'মি মসজিদ নির্মিত হওয়ায় এর সমকক্ষ কোনো মসজিদ নির্মাণের প্রয়াস রাজধানী দামিস্কের দেখা যায় না। এই কারণে দামিস্কের বাইরে বিভিন্ন শহরে ইমারত নির্মাণ বিশেষভাবে কৃতিত্বের দাবিদার। এই সমস্ত মসজিদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে বুসরা মসজিদ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সমান্তরাল খিলানরাজি দামিস্ক মসজিদের অনুকরণে নির্মিত হলেও এই মসজিদে মধ্যবর্তী খিলানটি পার্শ্ববর্তী খিলানের দ্বিগুণ বলে প্রতীয়মান হয়। এরূপ নিদর্শন প্রাক্-মুসলিম যুগের ইমারতে বিশেষ করে সিরিয়ার গির্জায় পরিলক্ষিত হয়, যেমন—সাক্কা তাফহা এবং নিমেরেহস্থিত খ্রীস্টান উপাসনালয়সমূহ। ছাদ নির্মাণের কৌশল ও সিরিয়ার হাওরানে অবস্থিত বিভিন্ন গির্জা থেকে অনুকরণ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়– জুলিয়ানের গির্জা (৩৪৫ খ্রীঃ), সেন্ট জর্জের গীর্জা, (৫১৫ খ্রীঃ) ইত্যাদির নাম। দামিস্কের মসজিদের চতুষ্কোণার মিনারের অনুরূপ বুসরা মসজিদে মিনার নির্মিত হয় এবং সিরিয়ার অসংখ্য গির্জায় এ ধরনের চতুষ্কোণাকার মিনার লক্ষ করা যাবে উম্ম আল-জিমানস্থিত সেনাছাউনির মিনারে (আনুমানিক ৪১২ খ্রীঃ), উম্ম আল-সুরাবস্থিত সেন্ট সার্জিয়াস ও ব্যাক্কাসের গির্জার মিনারে। চতুষ্কোণাকার মিনার নির্মাণের রীতি সিরিয়াতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বুসরা মসজিদের অবতল মিহরাবের দৃষ্টান্ত সম্ভবত প্রাচীনতম যা অদ্যবধি বিদ্যমান রয়েছে।

১২। কুসাইর আল-হাল্লাবাত, মসজিদ, ৭০৭-৭৯ খ্রীঃ

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বাটলার ও লিটম্যান কুসাইর আল-হাল্লাবাত নামে একটি প্রাচীন তৃতীয় শতাব্দীতে নির্মিত রোমীয় দুর্গের ৪৯ ফুট দক্ষিণ-পূর্বে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। পরিমাপে মসজিদটি আয়তাকার $৩৫^{১}/৪$ x $৩৮^{৩}/৪$ ফুট। পূর্ব-পশ্চিমে দুইসারি খিলান দ্বারা লিওয়ান তিনটি আইলে বিভক্ত ছিল। খিলানগুলো পিয়ার্সের সাহায্যে নির্মিত হয়। বর্তমানে খিলান ও পিয়ার্স অবলুপ্ত। কুসাইর আল-হাল্লাবাতের মসজিদে প্রবেশের জন্য ছিল তিনটি তোরণ। উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশপথ নির্মাণ করা হয়। এক্ষেত্রে দামিস্কের মসজিদের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ করা যাবে। অক্ষপ্রান্তে নির্মিত প্রবেশপথের দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালে অনেক মসজিদে পাওয়া যায়। লিওয়ানকে বেষ্টিত করে তিনদিকে অর্থাৎ

দক্ষিণ কিবলার দিক ছাড়া পোর্টিকো বা রিওয়াক নির্মিত হয়। এই পোর্টিকোর গভীরতা ছিল ১০ ৩/৪ ফুট।
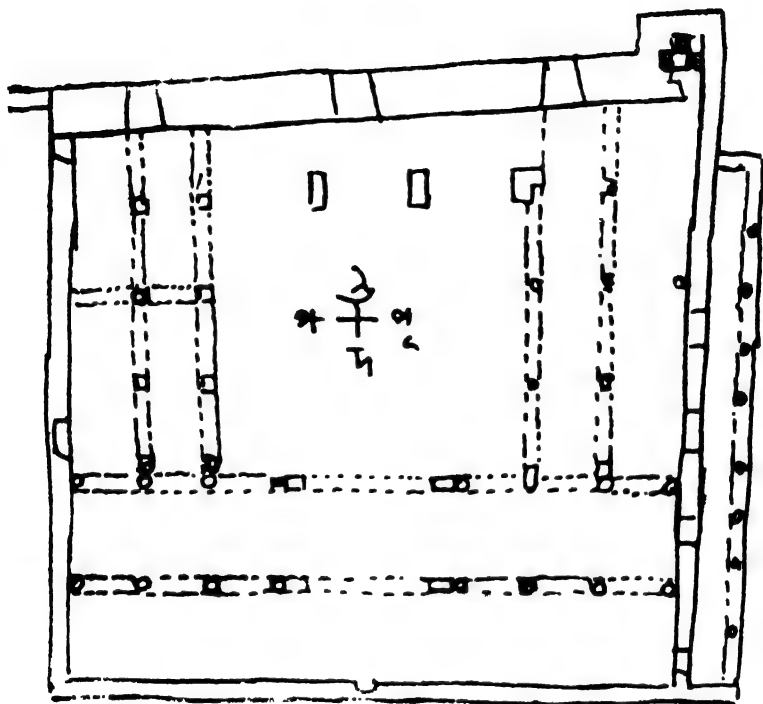
রেখাচিত্র ৭৭

বুসরা, জা'মি মসজিদ, ভূমি-নক্শা

কুসাইর আল-হাল্লাবাত মসজিদের লিওয়ান ও রিওয়াক ঢালু ছাদ দ্বারা আবৃত ছিল। লিওয়ানের পাঁচটি খিলানের উপর পৃথক পৃথকভাবে আইলে ঢালু ছাদ বা টানেল ভল্ট নির্মাণ করা হয়। মসজিদের লিওয়ানের মতো পোর্টিকো ঢালু ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত। দেওয়াল চুনাপাথর দিয়ে তৈরি এবং ৩২ ১/২ ইঞ্চি চওড়া। মিহরাবটি

কিবলা-প্রাচীরের মধ্যভাগে স্থাপিত হয় এবং প্রশস্ত ছিল ৪ ফুট। অবতলাকৃতি মিহরাবটি ছিল খুবই সুন্দর কিন্তু বর্তমানে ভগ্নপ্রাপ্ত। মিহরাবের উপরে স্থাপিত হয় বৃষচক্ষু আকৃতির জানালা। আইলগুলোর শেষ প্রান্তেও অনুরূপ গোলাকার খিলানাকৃতি জানালা দেখা যায় এবং এর উপর নির্মিত হয় বৃষচক্ষুআকৃতির জানালা। ক্রেসওয়েলের মতে, কুসাইর আমরা এবং হাম্মাম-আস-সারখের সঙ্গে স্থাপত্যিক উপকরণ এবং ভল্ট নির্মাণের কৌশলের সঙ্গে কুসাইর আল-হাল্লাবাতের মসজিদের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায় আলোচ্য মসজিদটি উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালীদের খিলাফতে নির্মিত বলে ধারণা করা হয়। এতে অবতলাকৃত মিহরাব থাকায় অবশ্যই ৭০৭-৯ খ্রীস্টাব্দের পর এর নির্মাণকাল হতে হবে, কারণ মদিনার মসজিদে উমর বিন আব্দুল আজিজ সর্বপ্রথম অবতলাকৃতি মিহরাব স্থাপন করেন।

১৩। খান আয-যেবীব, মসজিদ, অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম ট্রিস্টরাম খান আয-যেবীবের মসজিদের সন্ধান পান। পরবর্তী পর্যায়ে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রুন্নো এবং ভন ডোমাশেভস্কি মসজিদটি সম্বন্ধে তথ্য পরিবেশন করেন। তারা বলেন যে, মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও ভূমি-পরিকল্পনার দিক দিয়ে এটি আয়তাকার পাথর দিয়ে নির্মিত। এই মসজিদটি সিরিয়ার অপরাপর মসজিদের অনুরূপ। পরিমাপে উত্তর-দক্ষিণে ৩৬^{৩}/৪ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩৪ ফুট। প্রবেশপথ নির্মিত হয়েছে উত্তর ও পূর্ব প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে। দক্ষিণ বা কিবলা-প্রাচীরের মাঝখানে একটি অবতলাকার মিহরাবের নিদর্শন এখনও পাওয়া যাবে। এই মিহরাবটি ৪^{৩}/৪ ফুট প্রশস্ত এবং ৬ ফুট গভীর। লিওয়ানটি দুটি খিলানরাজি দ্বারা তিনটি আইলে বিভক্ত। প্রতি খিলানরাজিতে তিনটি করে খিলান ছিল। মধ্যকার খিলানটি বুসরা জা'মি মসজিদের মতো অন্যান্য খিলান অপেক্ষা বড়। টানেল ভল্ট দ্বারা মসজিদটি আবৃত ছিল।

১৪। উম্ম আল-ওয়ালীদ, মসজিদ, অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ

ট্রিস্টরাম খান আয-যেবীবের মসজিদের মতো উম্ম আল-ওয়ালীদের মসজিদটিও প্রথম আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে ১৮৯৭ সালে ব্রুন্নো এবং ভন ডোমাশেভস্কি এই মসজিদের অবস্থান ও তথ্য সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। উভয় মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনা একই রূপ। স্তম্ভরাজি, খিলানশ্রেণী, চালা ছাদ, প্রবেশ পথ, উপকরণ প্রভৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, উম্ম আল-ওয়ালীদের মসজিদটি খান আয-যেবীব এবং কুসাইর আল-হাল্লাবাতের মসজিদের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রেখেছে। এ কারণে এর নির্মাণকালও অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ হবে।

১৫। কাসরু'ল হাইর আশ-শারকী, মসজিদ, ৭২৮-২৯ খ্রীঃ

পালমাইরার ষাট মাইল উত্তর-পূর্বে এবং রুসাফার ৪০ মাইল অদূরে অবস্থিত কাসরু'ল হাইর আশ-শারকীর দুটি পৃথক অংশ রয়েছে। এই দুটি অংশে ভগ্ন প্রাসাদের

নিদর্শনাদি এখনও পরিব্রাজকদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, বিশেষ করে স্থাপত্যিক গুণাগুণ বিচারে। পূর্বদিকের প্রাসাদ পশ্চিমদিকের প্রাসাদ অপেক্ষা অনেক বড়। ক্রেসওয়েল এই দুই অংশকে অর্থাৎ প্রাসাদকে 'বৃহত্তর এলাকা' (Greater enclosure) এবং পূর্বদিকের প্রাসাদকে (Lesser enclosure) বলেছেন।

ভগ্নাবস্থায় বৃহত্তর প্রাসাদ এলাকাটি স্থাপত্য ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে রয়েছে। এই প্রাসাদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। কালের কবলে পতিত হয়ে কাসরু'ল হাইর আশ-শারকীর মসজিদটির অভ্যন্তরে কোনো প্রকার ইমারত নেই বললেও চলে। কেবলমাত্র দক্ষিণ-পূর্বদিকের ভগ্নাবশেষ যত্নসহকারে সংস্কার করে মোটামুটি একটি কাঠামো তৈরি করেছেন গবেষকগণ। পুনঃগঠন এবং সংস্কারের ফলে এই মসজিদের রূপরেখা সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভবপর হয়েছে। আপাতদৃশ্যে মনে হয় যে, এটি দামিস্কের মসজিদের অনুকরণে আয়তাকার চত্বরবিশিষ্ট পদ্ধতিতে নির্মিত। সাহানের দক্ষিণদিকে লিওয়ানের ভগ্নাবশেষ দেখা যাবে। লিওয়ানটি দামিস্কের মসজিদের মতো একটি ট্রানসেপ্ট দ্বারা বিভক্ত। এই ট্রানসেপ্ট উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত এবং পিয়ারের উপর তিনটি খিলান দ্বারা নির্মিত। ট্রানসেপ্টের অভ্যন্তরে পিয়ারগুলো ইংরেজি অক্ষর T-এর অনুরূপ। এর ডানে ও বামে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমে দুইসারি স্তম্ভ দ্বারা তিনটি আইলে বিভক্ত। আইলগুলো মার্বেলপাথরের স্তম্ভের উপর নির্মিত এবং প্রতিটি স্তম্ভরাজিতে তিনটি খিলান ছিল। কিবলাদিকের প্রাচীর বহুদিন পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কেবলমাত্র পশ্চিমদিকে সামান্য অংশ দেখা যাবে। ক্রেসওয়েল মনে করেন যে, কিবলার দিকে একটি অবতলাকৃত মিহরাব ইমামের নামায পরিচালনায় সহায়ক ছিল।

ভগ্নাবস্থা থেকে পুনর্গঠন করে গবেষকগণ কাসরু'ল হাইর আল-শারকী মসজিদের যে ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছেন তাতে বলা যায় যে, এই ইমারতটি ঐতিহ্যবাহী মসজিদস্থাপত্যের ধারা বহন করে রয়েছে। মসজিদটি পোড়ামাটির ইট দ্বারা বেষ্টিত ছিল; উচ্চতা ছিল ১৩ ফুট এবং আইলের খিলানরাজি উপরের দিকে উঠে গেছে, এর ফলে দামিস্কের মসজিদের মতো আলো প্রবেশের একটি পথ বা Clerestorey সৃষ্টি হয়। সাহানের তিনদিকে রিওয়াক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে কারণ দক্ষিণদিকের প্রাচীরে ইংরেজি অক্ষর L-এর ধরনের পিয়ার এখনও বিদ্যমান। ক্রেসওয়েল কর্তৃক পুনর্গঠিত মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনায় একসারি স্তম্ভবিশিষ্ট রিওয়াক দেখানো হয়েছে। দামিস্কের মসজিদের অনুকরণে রিওয়াকে একটি গোলাকার স্তম্ভের পর একটি পিয়ার ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রেসওয়েল সাহানের পরিমাপ ৯১/৪ বর্গফুট বলেছেন। লিওয়ানের প্রধান আকর্ষণ ছিল বিশাল সুউচ্চ মধ্যবর্তী খিলান, যার প্রশস্ততা ছিল ১৫৩/৪ ফুট।

কাসরু'ল হাইর আল-শারকী মসজিদে তিনটি প্রবেশপথ ছিল। উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমে আক্ষিক প্রবেশপথ (axial entrance) ছিল বলে ধারণা করা হয়। ট্রানসেপ্টের অভ্যন্তরের খিলানগুলো ঈষৎ চাপা (stilted) এবং খুব সামান্য কৌণিক, অপরদিকে লিওয়ানের প্রাচীরের প্রধান খিলানটি সামান্য কৌণিক; কিন্তু চাপা নয়। ভগ্নাবশেষ

থেকে প্রাপ্ত একটি শিলালিপির ভিত্তিতে এই মসজিদের নির্মাতা উমাইয়া খলিফা হিশাম। উবাইদ-পুত্র সোলামান কর্তৃক ৭২৮-২৯ খ্রীস্টাব্দে এটি নির্মিত হয়।
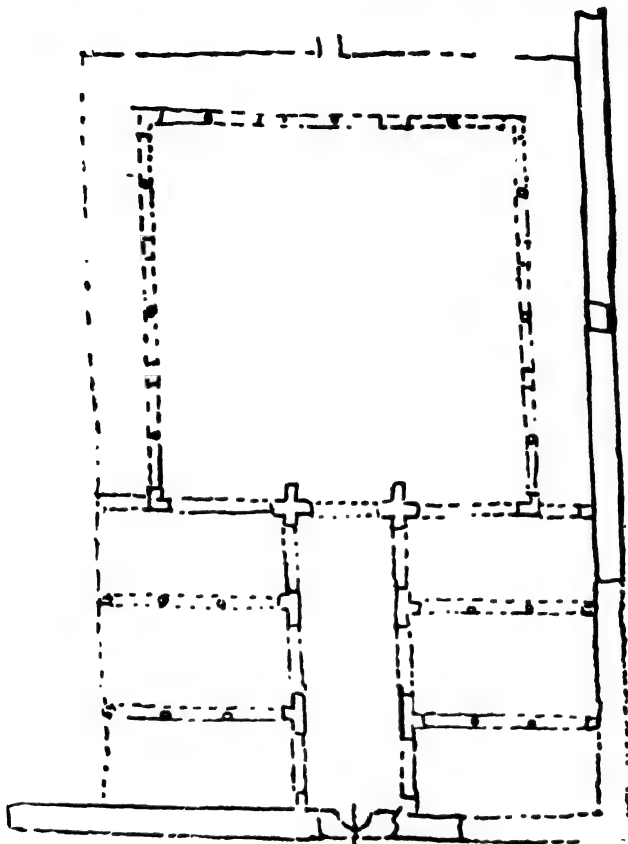
রেখাচিত্র ৭৮
কাসরু'ল হাইর আশ-শারকী জা'মি মসজিদ, ভূমি-নক্‌শা

কাসরু'ল হাইর আশ-শারকীর দুটি প্রাসাদের মধ্যবর্তী স্থানে একটি মিনারের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। ৯৩/৪ বর্গফুট চতুষ্কোণাকার এই টাওয়ারটি এখন মাত্র ৩৩ ফুট উঁচু অবস্থায় কালের স্বাক্ষী হয়ে রয়েছে। এই টাওয়ারটির উর্ধ্বাংশ বহুদিন পূর্বে অবলুপ্ত হয়েছে। দক্ষিণদিকে একটি প্যাঁচালো সিঁড়ি রয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দুটি প্রাসাদের তুলনায় টাওয়ারটি ছিল অনেক উঁচু। ক্রেসওয়েল বলেন যে, প্যারাপেট প্রাচীরের তুলনায় বুরুজটি অন্তত ১০/১২ ফুট অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট। এই টাওয়রটি কি উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল তা নিয়ে গবেষকগণ নানাবিধ মত প্রকাশ করেন। কেউ কেউ

মনে করেন যে, দুটি প্রাসাদের মধ্যবর্তী অবস্থানের মূল উদ্দেশ্য ছিল পর্যবেক্ষণ (Observation tower)। অবশ্য মসজিদের সংলগ্ন চতুষ্কোণাকার টাওয়ারটি সিরীয় টাইপ এবং অভ্যন্তরীণ সিঁড়িবিশিষ্ট টাওয়ারটি মাজিনা বা আযানের জন্য যে নির্মিত হয় তাতে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

১৬। খিরবাতু'ল মাফজার, মসজিদ, ৭৪৩ খ্রীঃ

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জেরিকো নগরীর পূর্বদিকে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন এবং কোন্ডার খিরবাতু'ল মাফজারের প্রাসাদ সম্বন্ধে তথ্য সর্বপ্রথম সুধীমহলে পরিবেশন করেন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে পর্যন্ত এই স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ পরিচালিত হয় এবং তাত্ত্বিক গবেষণার ফলে স্থানটি গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে একটি অতুলনীয় সৌধের ভূমি-নক্শা ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের সন্ধান পাওয়া যায়।

মূল প্রাসাদের দক্ষিণ প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বর্গাকার বুরুজের ভিত খননকালে আবিষ্কৃত হয়। উমাইয়া যুগে সিরীয় পদ্ধতিতে মসজিদের যে চতুষ্কোণাকার মিনার লক্ষ করা যায়, খিরবাতু'ল মাফজারেও অনুরূপ বুরুজ নির্মিত হয়েছে বলে প্রত্ন-তাত্ত্বিকগণ মত প্রকাশ করেন। এই বুরুজটির উপরে একটি অবতলাকার মিহরাব পাওয়া যায়। খননকারীগণ এই অবতলাকার মিহরাবের চিহ্ন থেকে মনে করেন যে, এটি মসজিদের মিহরাব। প্রকৃতপক্ষে উমাইয়া প্রাসাদে এ ধরনের অবতলাকৃতি মিহরাব পূর্বেই দেখা গেছে; যেমন—কাসরু'ল হাইর, কুসাইর আল-হাল্লাবাত ইত্যাদি ক্ষুদ্রাকার এই প্রাসাদ-মসজিদটিতে কাসরু'ল মিনিয়ার মতো লম্বালম্বি স্তম্ভশ্রেণী ছিল। লিওয়ানটি চারটি স্তম্ভরাজি দ্বারা পাঁচটি আইলে বিভক্ত। এই মসজিদটি প্রাসাদ নির্মাণকালেই স্থাপিত হয়।

পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, উমাইয়া খলিফা হিশাম স্থাপত্যকলার অনুরাগী ও একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁরই উদ্যোগে খিরবাতু'ল মাফজারের নির্মাণকাজ শুরু হয় তাঁর রাজত্বকালের শেষভাগে। কিন্তু ৭৪৩ সালে হিশামের মৃত্যু হলে নির্মাণ-কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

১৭। মাশাত্তা, মসজিদ, ৭৪৩-৪৪ খ্রীঃ

উমাইয়া খলিফাদের নির্মিত প্রাসাদসমূহের মধ্যে মাশাত্তা নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। লেয়ার্ড আম্মান শহরের ২০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত মাশাত্তা সর্বপ্রথম ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে সুধীমহলের দৃষ্টিগোচর করেন। পরবর্তীকালে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে সুলয (Schulz) এখানে খননকাজ পরিচালনা করে উমাইয়া প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পুনরুদ্ধারের প্রয়াস পান। এই বিশালাকায় প্রাসাদটির দক্ষিণদিকে মূল প্রাসাদ রয়েছে, যা বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। মাশাত্তা দ্বিতীয় ওয়ালিদ কর্তৃক নির্মিত হয় এবং তিনি তাঁর রাজত্বকালে (৭৪৩-৪৪ খ্রীঃ) নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে পারেননি; কারণ তিনি ৭৪৪ সালে ইন্তেকাল করেন। মাত্র এক বছরে অতুলনীয় প্রাসাদের ভূমি-নক্শা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়নি।

মূল প্রাসাদ এলাকায় সুউচ্চ প্রবেশপথের উত্তরে যে হলঘর আছে তার দুই পাশেও ছোট দুটি কক্ষ পরিলক্ষিত হয়। পূর্বদিকের ছোট কক্ষ পার হয়ে একটি লম্বালম্বি আয়তাকার কক্ষে প্রবেশ করা যায়। এই কক্ষের পরিমাপ ৪৪ ফুট প্রশস্ত এবং ৯২ ফুট গভীর। আয়তাকার কক্ষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, দক্ষিণ প্রাচীরে একটি অবতলাকার মিহরাব রয়েছে। অর্ধগোলাকৃতি এই মিহরাবের সঙ্গে পূর্ববর্তী অবতলাকার অর্ধগোলাকৃতি মিহরাবের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এই মিহরাব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নির্মাতা প্রাসাদ নির্মাণকালে ব্যক্তিগত ও পরিবার-পরিজনদের ব্যবহারের জন্য একটি প্রাসাদ-মসজিদ স্থাপন করেন।

১৮। হাররান, মসজিদ, ৭৪৪-৭৫০ খ্রীঃ

সর্বশেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান ইরাকের উত্তরে হাররান নামক স্থানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। আব্বাসীয়দের বিরোধিতা মোকাবেলা করার জন্য তিনি দামেস্ক থেকে স্বীয় রাজধানী তথায় স্থানান্তরিত করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ৭৪৪ থেকে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুতে উমাইয়া বংশের পতন হয়। ক্রেসওয়েল হাররান সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে, এই অতি প্রাচীন শহর সেবিয়ানদের সময়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং যেহেতু সেবিয়ানগণ বিধর্মী (pagan) ছিল সেহেতু উমাইয়া খিলাফতের গোড়ার দিকে কোনো খলিফা এখানে কোনো মসজিদ নির্মাণের প্রচেষ্টা করেননি। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক কারণে হাবরানে দ্বিতীয় মারওয়ান একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন।

হাররান মসজিদটি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চদশকে ডেভিড স্টর্ম রাইস এই মসজিদটির ভিত আবিষ্কার করেন এবং ইমারতটির একটি নিখুঁত বর্ণনা দেন। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হলে খননকাজ বন্ধ হয়ে যায়। রাইসের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের পূর্বে মাত্র উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকের প্রাচীরের অংশ দেখা যেত। বর্তমানে উমাইয়া যুগের শেষভাগে নির্মিত হাররান মসজিদ সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, ১১৮৪ খ্রীস্টাব্দে ইবনে যুবাইর মসজিদটি যে অবস্থায় দেখেন ঠিক সেই অবস্থায় এর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন।

উমাইয়া স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি দামেস্কের মসজিদের চত্তরবিশিষ্ট মসজিদের রীতির প্রতিফলন হাররান মসজিদে লক্ষ করা যাবে। অবশ্য দামেস্ক মসজিদের মতো এর পরিমিতি আয়তাকার নয়। হাররান মসজিদের নক্শা বর্গাকার; এক-একদিকে দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার অথবা ৩২৭ ফুট। উন্মুক্ত অঙ্গনের দক্ষিণে লিওয়ান এবং সাহানের তিনদিকে অবিন্যাস্তভাবে সাজিয়ে নির্মিত হয়েছে। পূর্বদিকের প্রাচীর অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এই মসজিদে প্রবেশের জন্য একটি চমৎকার তোরণ নির্মিত হয় উত্তরদিকের প্রাচীরে। লিওয়ানের ঠিক উল্টোদিকে উত্তর দেওয়ালের মাঝখানে নির্মিত এই ফটকটি দামেস্কের মসজিদের উত্তরদিকের প্রবেশপথের অনুরূপ। পশ্চিমদিকের প্রাচীর প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু এই প্রাচীরের মধ্যবর্তী একটি প্রবেশদ্বার ছিল। পশ্চিমদিকের প্রবেশপথের সঙ্গে আক্ষরিক মিল রেখে পূর্ব প্রাচীরেও একটি প্রবেশদ্বার নির্মিত হয়। উল্লেখ্য যে, পূর্ব ও পশ্চিমদিকের প্রবেশপথ দামেস্ক মসজিদের মতো দেওয়ালের মাঝখানে নির্মিত হয়নি।

হাররান মসজিদের নামাজগাহ্ বা লিওয়ানটি চার আইলবিশিষ্ট এবং পূর্বদিকের ভগ্নপ্রাপ্ত দেওয়াল থেকে পিলাস্টারের সাহায্যে এবং গোলাকার স্তম্ভ ও পিয়ারের উপর তিনসারি খিলান নির্মিত হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যায়। মসজিদের অভ্যন্তর কি রূপ ছিল তাঁর বর্ণনা দেন ইবনে যুবাইর। তাঁর ভাষায়, "This blessed mosque is roofed with wooden beams and arches. Its beams are massive and long on account of the width of the aisles which is fifteen paces...Now-here have I seen a mosque with arches of greater span. The wall of the mosque next to the sahn, through which entry is made into the mosque itself is pierced with doorways. Their number is nineteen, nine right and nine left and the nineteenth is a lofty door in the middle of these of which the arch occupies the whole height of the facade, of very beautiful aspect and well executed like the gate of some large city. All these openings are closed with wooden doors of fine workmanship, covered with carved ornament which makes them resemble the doors of the audience hall of a palace. We have been astonished, at the quality of the workmanship of this mosque."[১]

ইবন যুবাইরের বর্ণনার সঙ্গে পরবর্তীকালে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের তুলনামূলক আলোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, উনিশটি খিলান ঠিকই ছিল; প্রধান মধ্যবর্তী খিলানের দুই পাশে নয়টি করে আঠারোটি এবং প্রধান খিলান নিয়ে উনিশটি। কিন্তু আইলের সংখ্যা তিনি ভুল বলেছেন, কারণ প্রকৃপক্ষে চারটি আইল ছিল। প্রধান প্রবেশপথের খিলানটি কৌণিক ছিল এবং ২৭১/৪ ফুট দূরত্বে দুটি পিয়ারের উপর নির্মিত। প্রধান খিলানের উভয় পাশে আঠারোটি জোড়া খিলান রয়েছে; নিচের খিলানটি পিয়ারের উপর নির্মিত এবং উপরেরটি সংলগ্ন স্তম্ভের (engaged column) উপর থেকে উঠে গেছে। সংলগ্ন স্তম্ভের উপর থেকে যে খিলান নির্মিত তা ঈষৎ অশ্বনালাকৃতি।

হাররান মসজিদের অভ্যন্তরে স্তম্ভের সংখ্যা অনিয়মিত ও অবিন্যস্তভাবে স্থাপিত। কিবলা-প্রাচীরের নিকটবর্তী স্তম্ভশ্রেণীতে মোট আটাশটি স্তম্ভের নিদর্শন পাওয়া যায়। পরবর্তী তিনটি সারিতে যথাক্রমে তেত্রিশটি, তেইশটি এবং আঠারোটি স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা না থাকায় এবং অবিন্যাস্তভাবে স্থাপিত হওয়ায় খিলানের প্রশস্ততাও ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। যেমন— প্রধান খিলানের ব্যাস ২৭১/২ ফুট হলেও এর পরবর্তী খিলানটি ১৯৩/৪ ফুট এবং সর্বশেষ খিলানটি ১০৩/৪ ফুট। হাররান মসজিদে মিহরাব কিবলা-প্রাচীরের মধ্যস্থলে অবস্থিত নয়, মধ্যস্থল থেকে পশ্চিমদিকে ১৬ ফুট দূরে স্থাপিত। প্রধান খিলানশ্রেণী অক্ষ রেখা থেকে এজন্য পশ্চিমদিকে সরে গেছে। বিদ্যমান ভগ্নাবশেষ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মিহরাবটি অবতলাকৃতি ছিল।

দামেস্কের মসজিদের অনুকরণে হাররান মসজিদের সাহানে তিনদিকে রিওয়াক ছিল। এক আইলবিশিষ্ট রিওয়াকের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। এই মসজিদে প্রবেশের জন্য তিনটি প্রবেশপথ ছিল। উত্তরদিকের প্রবেশপথের পূর্বে একটি

১। A Short Account. p 153.

চুতষ্কোণাকার মিনার নির্মিত হয়। বর্তমানে এর নিচের অংশ কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে।[১] দামেস্কের মসজিদের মতো হাররানের মসজিদের সাহানে একটি অষ্টভুজাকার জলাধার স্থাপিত হয়। জলাধারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সম্ভবত গম্বুজ দ্বারা আবৃত ছিল। ক্রেসওয়েল মনে করেন যে, কেবলমাত্র গম্বুজই ছিল না বরং গম্বুজ দ্বারা আবৃত একটি প্রকোষ্ঠও নির্মিত হয়। এই প্রকোষ্ঠটি দামেস্কের মসজিদের অনুরূপ বায়তুল মাল হিসাবে ব্যবহৃত হত।

গুরুত্ব :

ক্রেসওয়েল মন্তব্য করেন যে, অপরাপর উমাইয়া মসজিদের মতো হাররানের জা'মি মসজিদটিতে বিভিন্ন প্রভাবের সংমিশ্রণ দেখা যায়। এর স্থাপত্যিক উপাদানে উত্তর মেসোপটেমীয় অর্থাৎ উত্তর সিরীয় বায়জানটাইন প্রভাব রয়েছে, খিলানের স্তরবিশিষ্ট বহিরাংশ গ্রীক ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্য বহন করে আছে, কিন্তু চতুষ্কোণাকার ভূমি-পরিকল্পনা ইরাকের আদি মসজিদগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়। লিওয়ানের দিকের প্রাচীর পিয়ারের সঙ্গে যে সমস্ত সংলগ্ন গোলাকার স্তম্ভ রয়েছে তার ব্যবহার ১১১৬ থেকে ১১৬৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত দিয়ারবকরের জা'মি মসজিদের অনুরূপ।
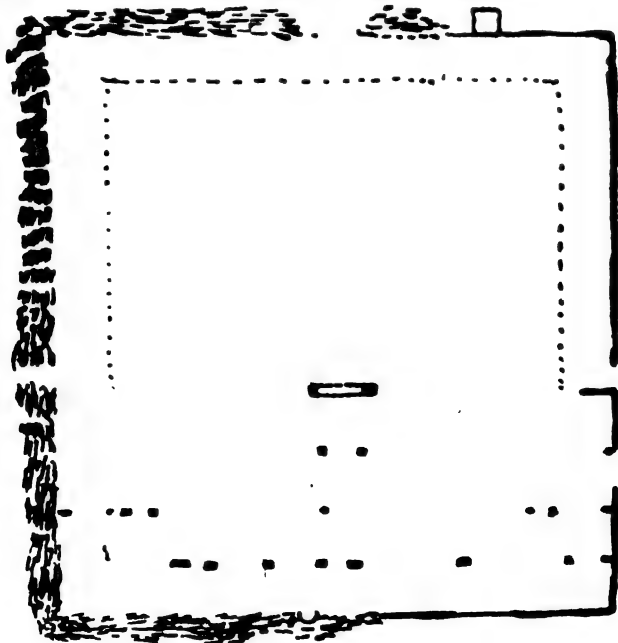
রেখাচিত্র : ৭৯
হাররান, জা'মি মসজিদ, ভূমি নক্শা

১। A Short Account. p. 352 বহিপ্রাচীরের একটি বাহুর ব্যস ১৭১/২ ফুট এবং অভ্যন্তরীণ ১২১/২ ফুট অর্থাৎ ৫ ফুট মোটা গাঁথুনি ছিল।

১৯। দে'রা, মসজিদ, অষ্টম শতাব্দী

বর্গাকার সাহানবিশিষ্ট এবং সনাতনী পদ্ধতিতে নির্মিত অধিকাংশ উমাইয়া মসজিদের অনুরূপ অপর একটি মসজিদ নির্মিত হয় দে'রায়। কালো পাথরের ব্যবহার বিচিত্র নয়, কারণ পূর্বেও বুসরা মসজিদে লক্ষ করা যায়। মসজিদটির পরিমাণ উত্তর-দক্ষিণে ১৪৪½ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৩৮ ফুট। লিওয়ানের তিনটি আইল উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে প্রসারিত একটি প্রশস্ত ট্রানসেপ্ট দ্বারা বিভক্ত। ট্রানসেপ্টের উভয় পাশের দুটি স্তম্ভের প্রতিটিতে চারটি খিলান রয়েছে। ট্রানসেপ্টের প্রবেশপথে ত্রি-খিলানবিশিষ্ট যে তোরণ রয়েছে তা দামেস্কের মসজিদকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই খিলানপথ পাশের খিলান অপেক্ষা অনেক চওড়া ও উঁচু। খিলানগুলো স্বভাবত কৌণিক এবং দক্ষতার সাথে নির্মিত। কিবলা-প্রাচীরের ট্রানসেপ্টের শেষ প্রান্তে একটি অবতলাকার মিহরাব দেখা যাবে। মিহরাবটির উপরের অংশ অর্ধগম্বুজাকৃতি (half dome), করবেল পদ্ধতিতে নির্মিত ছাদ সমতল ছিল। অন্যান্য উমাইয়া মসজিদের মতো দে'রার মসজিদে রিওয়াকের ব্যবহার দেখা যায়। সাহানের তিনদিকে দুই আইলবিশিষ্ট রিওয়াক মুসল্লীদের মসজিদে আসতে সাহায্য করে। গোলাকার স্তম্ভের উপর নির্মিত খিলানসমূহ খুবই আকর্ষণীয়। সাহানের কোণায় চতুষ্কোণাকার স্তম্ভ বা পিয়ার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবেশের জন্য তিনটি দরজা তৈরি করা হয় উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমে। প্রবেশপথসমূহ উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম অক্ষপ্রান্তে স্থাপিত। সিরীয় ধরনের চতুষ্কোণ মিনার নির্মিত হয় উত্তর-পশ্চিম কোণে।

হাররান মসজিদের সঙ্গে দে'রার মসজিদের সাদৃশ্য থাকায় মনে করা হয় যে, উমাইয়া রাজত্বের শেষে এই মসজিদটি নির্মিত হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে নানাবিধ সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা খুব বিচিত্র ছিল না।

২০। (ক) উমাইয়া এবং আব্বাসীয় স্থাপত্যকলার মধ্যে প্রভেদ

ভূমিকা :

পি. কে. হিট্টি উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতের মধ্যে বৈষম্য নির্ণয় করেন। তাঁর মতে, উমাইয়াগণ রাজ্য বা 'মূলক' প্রতিষ্ঠা করে; অন্যদিকে আব্বাসীয়গণ সাম্রাজ্য বা দৌল্লাহ প্রতিষ্ঠা করে, যা সুদূর মধ্য-এশিয়া থেকে উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এর ফলে আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্পকলা, সাহিত্য ব্যাপকতা লাভ করে। বলাই বাহুল্য যে উমাইয়া আমলে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পকলার মূল উৎস ছিল গ্রীকো-রোমান, বায়জানটাইন ; অপরদিকে প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মেসোপটেমীয় বাগদাদ প্রতিষ্ঠা হলে ব্যাবিলনীয় প্রাচীন পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার প্রভাব আব্বাসীয় আমলে লক্ষ করা যায়।

প্রভেদসমূহ

উমাইয়া এবং আব্বাসীয় যুগে মুসলিম স্থাপত্যকলার যে ধারা প্রবর্তিত হয় তা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। ক্রেসওয়েল বলেন, "with the fall of the Umayyad dynasty the seat of the Khalifate changed from Damascus to Baghdad. The effect

was similar to the change which took place when the capital of the Roman Empire was transferred from Rome to Constantinople. "In both the cases the centre of gravity of the empire was changed and the mental and artistic atmosphere became more oriental. In the case of Islam the Hellenistic influences of Syria were replaced by the still surviving influences of Sassanian Persia and Iraq, which profoundly modified the art and architecture and thus gave birth to art of Samarra, the influences of with of extended in one direction to Egypt where the mosque of Ahmed Ibn Tulun bears witness to it and in the opposite direction to Bahrain and to Nishapur and Afrasiyab (near Samarqand) where stucco ornament in Samarra style has been found by excavation."

বঙ্গানুবাদ : উমাইয়া বংশের পতনের পর খিলাফতের কেন্দ্রবিন্দু দামেস্ক থেকে বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে রোমীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম থেকে কনস্টানটিনোপলে স্থানান্তরিত হলে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, এক্ষেত্রে তা-ই হয়েছিল। রাজনৈতিক ভারসাম্য পরিবর্তিত হল এবং সামরিক ও শৈল্পিক রীতিকৌশলের আমূল পরিবর্তন দেখা দিল–যা মূলত বায়জানটাইন না হয়ে প্রাচ্যদেশীয়। ইসলামের ক্ষেত্রে সিরিয়ার হেলেনিস্টিক প্রভাবের স্থলে পারস্য ও ইরাকের প্রভাব প্রাধান্য বিস্তার করে, যার ফলে মুসলিম শিল্পকলা ও স্থাপত্যের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং সামররা শিল্পকলার উদ্ভব হয়। এ শিল্পরীতি (সামররা) একদিকে মিশরে ইবনে তুলুনে দেখা যাবে। অন্যদিকে বাহরাইন থেকে নিসাপুর এবং আফরাসিয়াব (সমরকন্দ) পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে।"

দ্বিতীয়, উমাইয়াগণ বায়জানটাইন ঘেঁষা থাকায় স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রে তারা গ্রীকো-রোমান ও বায়জানটাইন স্থাপত্য-কৌশল ব্যবহার করত– মার্বেল স্তম্ভ, করিস্থিয়ান ক্যাপিটাল, গোলাকার খিলান, পেডিমেন্ট, মোসাইক প্রভৃতি উমাইয়াগণ বায়জানটাইন শিল্পরীতি থেকে গ্রহণ করে;

তৃতীয়ত, উমাইয়া খলিফাগণ বায়জানটাইন স্থপতি ও কারিগর নিয়োগ করেন; এর ফলে তাদের মাধ্যমে প্রতীচ্যের প্রভাব উমাইয়া স্থাপত্য ও অলঙ্করণে পড়ে।

চতুর্থত, উমাইয়া স্থাপত্যের নিদর্শনসমূহ পাথরের তৈরি, যেমন– কুববাতুস সাখরা, এমনকি কুব্বাতু'স সাখরার ভূমি-নক্শাও বায়জানটাইন গির্জার অনুকরণে করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অন্যদিকে মেসোপটেমীয় অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বাগদাদে আব্বাসীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হলে পাথরের পরিবর্তে পোড়ামাটির ইটের ব্যবহার প্রচলিত হয়–যা ব্যাবিলনীয় (উর) ঐতিহ্য প্রকাশ করে। মনসুরের গোলাকার বাগদাদ দুর্গ ও মসজিদ, সামাররার মসজিদ, আবু.দুলাফের মসজিদ, রাক্কার মসজিদ শুধুমাত্র ইটের তৈরিই নয়, ইটের নক্শা অলঙ্করণ, মিনাকরা টালি প্রভৃতি পারস্যরীতি ও কৌশলের পরিচায়ক।

পঞ্চমত, ইটের পাশাপাশি কাঠের ব্যবহার পারস্য স্থাপত্যের প্রভাবে প্রচলিত হয়। ক্রেসওয়েল যথার্থই বলেন, "পারস্যরীতির প্রভাবে কাঠের স্তম্ভ দিয়ে আপাদানা বা হলঘর সৃষ্টি করে মসজিদ নির্মিত হয়, যেমন কুফা, ওয়াসিত, সামাররা ও বাগদাদ। এ সমস্ত মসজিদে খিলানের ব্যবহার ছিল না।

ষষ্ঠত, পারস্য স্থাপত্যকলার প্রভাবে বিশালাকার মসজিদের সৃষ্টি হয়, যেমন– সামাররার জা'মি মসজিদ, চতুষ্কোণে ভূমি-পরিকল্পনার (কুফা, ওয়াসিত) পরিবর্তে আয়তাকার মসজিদ নির্মিত হয়, যেমন– সামররা আবু দুলাফ, যা পারস্যের পার্সিপলিসে অ্যাকেমেনীয় প্রাসাদের আপাদানার অনুকরণ বলে মনে হয়।

সপ্তমত, আব্বাসীয় খিলাফতে ভল্টের ব্যবহার ব্যপকতা লাভ করে। অবশ্য উমাইয়া যুগে কুশাইর আমরায় টানেল ভল্ট ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু সাসানীয় বিশালাকার ভল্টের ছাদবিশিষ্ট ইমারত আব্বাসীয় যুগে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে বিভিন্ন দুর্গ-প্রাসাদ ও মসজিদে। উদাহরণস্বরূপ উখাইদিরের মসজিদ এবং পারস্যের দামগণ মসজিদের উল্লেখ করা যায়। উমাইয়া আমলে গম্বুজ (কুব্বাতু'স সাখরা) ব্যবহৃত হলেও আব্বাসীয় আমলের মতো এত ব্যপক আকার ধারণ করেনি ; যেমন ইসফাহানে সেলজুক আমলে নির্মিত জা'মি মসজিদ।

অষ্টমত, মিনার নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, উমাইয়া আমলে মিনার চতুষ্কোণাকার ছিল, যাকে সিরীয় টাইপ বলা হয়ে থাকে; যেমন– দামেস্কের মসজিদের মিনার, কায়রোয়ান মসজিদের মিনার, কর্ডোভা মসজিদের মিনার; অন্যদিকে আব্বাসীয় যুগে মিনারগুলো ছিল গোলাকৃতি। যেমন– সামররার মালবিয়া মিনার, আবু দুলাফের মিনার, যার প্রভাব পারস্য ও ইন্দো-মুসলিম মিনারে পড়েছিল।

নবমতঃ উমাইয়া আমলে কোনো সমাধি-সৌধ নির্মিত হয়নি, কারণ খলিফাদের গোপনীয়ভাবে সমাহিত করা হয়। এমনকি কথিত আছে যে, আল-মনসুরকে সমাহিত করার জন্য একশত কবর খনন করা হয় এবং লুকিয়ে একটিতে দাফন করা হয়। তবুও আব্বাসীয় আমলেই সর্বপ্রথম সমাধি-সৌধ যেমন কুব্বাতু'স সুলাইবিয়া (আল-মুনতাসিরের সমাধি, সামররা) নির্মিত হয় ৮৬২ খ্রীস্টাব্দে।

দশমতঃ, খিলান নির্মাণের ক্ষেত্রে কৌণিক খিলান উমাইয়াদের অবদান। দ্বি-কেন্দ্রীক খিলান কিন্তু আব্বাসীয় যুগে চার-কেন্দ্রবিন্দু সৃষ্ট চতুঃবলয় খিলান (four-centred arch) প্রথম ব্যবহৃত হয় রাক্কার দুর্গের বাগদাদ ফটকে। (ক্রেসওয়েল বলেন, "A new type of pointed arch appears, the four-centred arch. This arch. although it is usually called Persian, first appeared at Ragga in 772 A.D."

বঙ্গানুবাদ : চতুঃবিন্দুবিশিষ্ট যে নূতন কৌণিক খিলান প্রচলিত হয়েছে তা সাধারণভাবে পারসিক বলা যায়, যা রাক্কায় বাগদাদ ফটকে ৭৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ব্যবহৃত হয়।" খিলানের রকমফের উমাইয়া আমল অপেক্ষা আব্বাসীয় যুগে বহু খাঁজবিশিষ্ট খিলান বেশি দেখা যায়। ইবনে তুলুনের মসজিদের বাইরের প্রাচীরে এরূপ

খিলান দেখা যাবে। অবশ্য স্পেনের কর্ডোভা মসজিদটিতে বিভিন্ন ধরনের খিলান ব্যবহৃত হয়েছে।

একাদশ, মিনাকরা টালি (lustre tiles) আব্বাসীয় যুগে প্রাধান্য লাভ করে যা ইরাক, পারস্য, এমনকি উমাইয়া আমলে কুব্বাতু'স সাখরায় দেখা যায়। ক্রেসওয়েল বলেন, "One of the most important innovations was the introduction of lustre tiles which were first made in Iraq, the earliest definitely datable examples of this technique, which was destined to have a wonderful future, being the lustre tiles brought from Iraq in 248 H. (862-63), which now surround the mihrab of the Great Mosque of Qairawan" differently datafe examples of this technique which was destined to have a wonderful future being lystre tiles brought from Iraq in 298 H. (862-63), which now surround the mihrab of the great mosque of Qairawan."

বঙ্গানুবাদ : "ইরাকে অবস্থিত মিনাকরা টালি অলঙ্করণরীতির ক্ষেত্রে বিশেষ অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছে। এধরনের নিশ্চিতরূপে গ্রহণযোগ্য ইরাকী টালির ব্যবহার কায়রোয়ান মসজিদের (৮৬২-৮৩ খ্রীঃ) মিহরাবে স্পষ্টত লক্ষ করা যায়।"

আব্বাসীয় যুগে ইটের নক্‌শা ব্যাপকতা লাভ করে, যেমন ক্রেসওয়েল সামারার বুলকুয়ারা প্রাসাদে "হাযাবার" নামে এক ধরনের অলঙ্করণের কথা বলেন।

উপসংহার উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে ইসলামী শিল্পকলার দুটি বিপরীতমুখী কলা-কৌশলের ধারা ও ঐতিহ্য প্রচলন করেছে। প্রথমটি গ্রীকো-রোমান বায়জানটাইন; দ্বিতীয়টি মেসোপটেমীয়, পারস্য ও মধ্য-এশিয়।

(খ) উমাইয়া এবং আব্বাসীয় মসজিদের একটি তুলনামূলক আলোচনা কর।

ভূমিকা :

মুসলিম স্থাপত্যের একটি স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান হিসেবে মসজিদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মসজিদ-স্থাপত্যের উৎপত্তি হচ্ছে সাজাদা থেকে যেমন সালাত থেকে মুসাল্লা নামাজঘর। কুর'আনে বলা হয়েছে আকিমুস সালাত ওয়া আতুজ যাকাত, অর্থাৎ নামাজ কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। ইসলাম ধর্মের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে সালাত এবং জুম্মার জামাতে নামাজসহ নামাজ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে প্রত্যেক বয়স্ক মহিলা ও পুরুষকে দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়তে বলা হয়েছে। যে স্থলে সিজদা দেওয়া হয় মূলত সেটিই মসজিদ। মদিনায় রসূলের মসজিদ নির্মিত হবার পূর্বে নবী করীম কা'বা শরীফের নিকট নির্মিত একটি মুসাল্লায় নামাজ পড়তেন। অবশ্য এটিকে মসজিদ বলা যাবে না। কারণ একটি পূর্ণাঙ্গ মসজিদের কতকগুলো অঙ্গ রয়েছে; যেমন লিওয়ান (নামাজঘর), সাহান (চত্বর), মিহরাব, মিমবার, মিনার, রিওয়াক বা দক্ষিণপথ। রসুলে করীম মক্কায় মুসাল্লায় নামাজ পড়তেন।

প্রথমত, উমাইয়া এবং আব্বাসীয় স্থাপত্যকলার প্রতিফলন হয় মসজিদসমূহে। উমাইয়া যুগের প্রথমার্ধে গির্জাকে রূপান্তরিত করে মসজিদ নির্মিত হয় ; যেমন– দামেস্কে জা'মি মসজিদটি পূর্বে ছিল সেন্ট জনের গির্জা (Church of St-John) প্রথমে এর কিছুটা অংশ দখল করে মুসলিমবাহিনী নামাজ পড়তে শুরু করে, কারণ তখন সম্পূর্ণ আলাদা মসজিদ তৈরি করা সম্ভবপর হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে সম্পূর্ণ গির্জা ক্রয় করে গীর্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। ফলে প্রথমদিকে মসজিদে ব্যাসিলিকাঠের নক্শা প্রাধান্য পায়, যদিও দামেস্কের মসজিদকে বায়জানটাইন ইমারত বলা যাবে না। অবশ্য রাইস বলেন যে, "দামেস্কে রাজধানী স্থাপন করে উমাইয়াগণ যে সংস্কৃতি ও শিল্পকলার উদ্ভাবন করে তা মূলত সিরো-বায়জানটাইন"। এর কারণ মুসলিম স্থপতি বায়জানটাইন ধরনের পাথরের স্তম্ভ, সংযোগরক্ষাকারী কাঠের বীম, লিনটেনল এবং অর্ধ-বৃত্তাকার প্রবেশপথ, স্তম্ভের ওপর ব্যবহৃত আওনিক, ডোরিক ও ক্যরিন্থীয় যা মূলত গ্রীক স্থাপত্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে তা বায়জানটাইন প্রভাবে। এমনকি গোলাকার অশ্বনালাকৃতির যে খিলান দামেস্কে ব্যবহৃত হয়েছে তা সিরিয়ার নিসিবিনে অবস্থিত Babtistry of Mar Yaqub থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া স্থাপত্যিক অলঙ্করণের দিক থেকে মার্বেলের আচ্ছাদন এবং 'ফুসাইফিসা' বা মোসাইক বায়জানটাইন শিল্পরীতি থেকে এসেছে।

উমাইয়া খিলাফত থেকে আব্বাসীয় খিলাফতে উত্তরণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে কূহনেল বলেন, "ইসলামী পাশ্চাত্য যখন চূড়ান্তভাবে আব্বাসীয় খিলাফতের যা তের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং প্রাচ্য রাজধানী দামেস্ক থেকে পূর্ব দিকে প্রাচীন ইরানী শহর টেসিফোনের নিকট নবপ্রতিষ্ঠিত বাগদাদে নীত হয়। তখন এই স্থানান্তরকার্য শিল্পসহ সংস্কৃতির সকল শাখার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয়ত, সিরিয়ার মসজিদগুলোর সঙ্গে ইরাকের মসজিদগুলো তুলনা করলে দুটি ভিন্নমুখী স্থাপত্যরীতির ধারা সহজেই নজরে পড়বে। আব্বাসীয় খিলাফতের বহু পূর্ব থেকে এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে নির্মিত মসজিদসমূহের পারস্য স্থপতি ও স্থাপত্যেরীতির ছাপ রয়েছে। ডিস বলেন, যে, ইরাক বিজিত হলে সামরিক ছাউনী নির্মাণে স্থানীয় স্থপতিগণ অংশগ্রহণ করেন। সাদ ইবনে আলী ওয়াক্কাস মাদাইন (টেসিফোন) দখল করে প্রাচীন সাসানীয় প্রাসাদে 'তাক-ই-কিসরা' অর্থাৎ খসরুর প্রাসাদে জামাতে নামাজ পড়েন। স্ট্রেক বলেন যে নূতন মসজিদ নির্মিত হবার পূর্বে ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত এ সাসানীয় হলঘরটি মসজিদরূপে ব্যবহৃত হয় এবং এখানে জীবজন্তুর ছবি থাকা সত্ত্বেও নামাজের কোনো বাধা হয়নি। পারস্য প্রভাব উমাইয়া আমলে অনুপ্রবেশ করে যখন যিয়াদ ইবনে আবিহ পারস্য স্থপতি রুজবিহকে কূফা মসজিদ নির্মাণে নিয়োগ করেন। ক্রেসওয়েল বলেন, "It is obvious that its roofing system resembled that of an Apadana or Hall of Colmns of the persian kings"। এমনকি কুব্বাতু'স সাখরায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মিনাকরা যে টালির ব্যবহার দেখা যায় তা পারস্যদেশীয়।

তৃতীয়ত, বায়জানটাইন ভূমি-নক্‌শায় মসজিদ তৈরি না হলেও আয়তাকার খিলান-সম্বলিত হলঘর মসজিদের নির্মাণে প্রভাব ফেলেছিল। মূলত উমাইয়া আমলের অধিকাংশ মসজিদই আয়তাকার, যেমন দামেস্কের মসজিদ কায়রোয়ানের মসজিদ কিন্তু কুফা মসজিদটি ছিল চতুষ্কোণাকার, যা মদিনার নবীজী'র মসজিদের অনুকরণে নির্মিত। আব্বাসীয় আমলে চতুষ্কোণাকার ভূমি-নক্‌শা প্রাধান্য লাভ করে, যেমন–বাগদাদ দুর্গের অভ্যন্তরে আল-মনসুর কর্তৃক নির্মিত জা'মি মসজিদে দেখা যাবে।

চতুর্থত, আব্বাসীয় খেলাফতে পারস্য সভ্যতার উপাদান– স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য, মাল-মসলা, রীতি-কৌশল অসামান্য প্রাধান্য বিস্তার করে। অঞ্চলে অর্থাৎ ইরাক, ইরান, অর্থাৎ মেসোপটেমীয় এবং সাসানীয় যুগে পাথর ও মার্বেলের স্থলে রৌদ্রে ও অগুনে পোড়া ইটের ব্যবহার দেখা যায়। এ অঞ্চলে ইটের তৈরি অসংখ্য মসজিদ ও অন্যান্য ইমারত brick building tradition দ্বারা প্রভাবান্বিত ; অন্যদিকে উমাইয়া যুগে পাথর বা stone building tradition প্রাধান্য পায়। প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতার বেলাভূমিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হলে ইসলামী সাম্রাজ্যের পারসিকরণ শুরু হয়। মনসুরের রাজত্বকালে নির্মিত বাগদাদ দুর্গ ও মসজিদ এবং রাক্কার দুর্গে পারস্য প্রভাব প্রকটভাবে দেখা যায়। মার্ভে যে 'দারুল মুমারা' নির্মিত হয়েছে তা সাসানীয় আইওয়ান দ্বারা প্রভাবান্বিত, রৌদ্রে পোড়া ইট এবং আগুনে পোড়া ইট, খিলান, ভল্ট, লম্বালম্বি খিলানরাজি (সমান্তরাল নয়) গম্বুজ, প্রভৃতি সাসানীয় প্রাসাদ তাক-ই-কিসরা, কসর,-ই-খারানা ও কসর-ই-শিরিনে দেখা যাবে। এ ছাড়া আব্বাসীয় মসজিদ ও ইমারতে কৌণিক খিলান, দেওয়ালের অভ্যন্তরে খোদিত খিলান, ক্রাস এবং টানেল ভল্ট, হাজাব মফ নামে জ্যামিতিক নক্‌শায় সাসানীয় প্রভাব রয়েছে।

পঞ্চমত, নির্মাণ-উপকরণের বৈচিত্র্য মেসোপটেমীয় শিল্পরীতিতে যা প্রতিভাত, আব্বাসীয় যুগেও তা-ই দেখা যাবে। উমাইয়া যুগের পাথরের স্থান দখল করে ইট এবং ইটের প্রয়োগ শুধু স্থাপত্যেই নয়, অলঙ্করণে দেখা যাবে; যেমন– স্টাকো, "টেরকোটা মিনাকরা টালি।

ষষ্ঠত, প্রাচীন পারস্য রীতি আপাদানা অর্থাৎ সমান্তরাল ছাদ খিলান ছাড়াও কাঠের অথবা ইটের স্তম্ভের উপর সরাসরি নির্মিত হয়, অনুরূপ কৌশল দেখা যাবে কুফা, ওয়াসিত রাক্কা ও আবু দুলাফের মসজিদে। উল্লেখ্য যে, পাথরের স্থাপত্যকলার অঞ্চল মিশরে ও ইবনে তুলুনের মসজিদে মেসোপটেমীয় রীতিতে ইটের ব্যবহার দেখা যায়।

সপ্তমত, উমাইয়া যুগে পাথরের গোলাকার স্তম্ভের ব্যবহার ছিল কিন্তু আব্বাসীয় যুগে চতুষ্কোণাকার পিয়ারের প্রয়োগ দেখা যায়। সিরো-বায়জানটাইন এবং মেসোপটেমীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে রাক্কার মসজিদ নির্মিত হয়।

৪
আব্বাসীয় যুগ
(৭৫০–১২৫৮ খ্রীঃ)

১। আল-মনসুরের গোলাকৃতি বাগদাদ নগরী

ভূমিকা :

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আল-মনসুর ৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম হাশিমীয়াতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু হাশিমীয়ায় অত্যধিক মশার উপদ্রব থাকায় এবং অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার দরুন তিনি একটি নূতন স্থানে নূতন পরিকল্পনায় রাজধানী প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। আরব ঐতিহাসিকদের মতে, বাগদাদ নগরীর নির্মাণ কাজ ৭৬২ খ্রীস্টাব্দে শুরু হয় এবং সমাপ্ত হয় ৭৬২ খ্রীস্টাব্দে। মনসুর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে শিল্পী, স্থপতি কারিগর সংগ্রহ করেন। সিরিয়া, ইরাক, পশ্চিম পারস্য থেকে প্রকৌশলী, স্থপতি ও কারিগর, আনা হয় এবং নির্মাণকাজ শুরু হয়। ইয়াকুবীর মতানুসারে প্রায় এক লক্ষ লোক গোলাকার বাগদাদ নগরী আরব্যোপন্যাসের স্বর্নপূরী নির্মাণে নিয়োজিত ছিল। নির্মাণব্যয় হয়েছিল চল্লিশ লক্ষ দিরহাম। বাগদাদ ছিল একটি দুর্গ-প্রাসাদ এবং এটি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। যেমন– 'মদিনার আল-মনুসর' বা 'মনুসরের নগরী', মদীনাত-আস-সালাম, বা শান্তির নগরী, বা 'মদিনা-আল-মুদাওয়ায়' বা গোলাকার নগরী।

স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য

বর্তমানে আল-মনসুরের বাগদাদ নগরী বহুপূর্বে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। লেখক ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদ গিয়ে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীর ও কয়েকটি কক্ষ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। প্রতিষ্ঠাতা আল-মনসুর ভূমির ওপর চুনা দিয়ে এর পরিকল্পনা স্থির করেন এবং বলা হয়ে থাকে যে, বিখ্যাত জ্যোতিষী নওবখতের নক্শা অনুযায়ী সময়-ক্ষণ নির্ধারণ করে এটির ভিত স্থাপিত হয়। বৃত্তাকৃতি বহিঃপ্রাচীরের পরিধি, আল-খাতিবের মতে, ১৬,০০০ হাত ছিল। এই বহিঃপ্রাচীর থেকে প্রায় ৬০ হাত অভ্যন্তরে শহরের মূল প্রাচীর নির্মিত হয়। অর্থাৎ গোলাকার বাগদাদ নগরী দুটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এ দুই প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানটিকে ফাসিল বলা হয়ে থাকে। দুর্গ-প্রাসাদটিকে বহিঃশত্রুর আগ্রাসন থেকে রক্ষার জন্য একটি পরিখা (moat) নির্মিত হয় এবং বাইরের প্রাচীরে চারটি ফটক ছিল। এ ফটকগুলো যে যে শহরের দিকে নির্মিত হয়, সে সে শহরের নামে তা অভিহিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমদিকের তোরণটির

নামকরণ হয় কুফা তোরণ, দক্ষিণ-পূর্ব দিকেরটি বসরা তোরণ, উত্তর-পূর্ব দিকেরটি খোরাসান তোরণ এবং উত্তর-পশ্চিম দিকের তোরণটি দামেস্ক তোরণ নামে পরিচিত ছিল। একটি তোরণ থেকে অন্য একটি তোরণের দূরত্ব ছিল ৪০০০ হাত। প্রত্যেক তোরণে দুটি দরজা ছিল–একটি বাইরের দিকে, অন্যটি ভিতরের দিকে। কিন্তু নিরাপত্তার জন্য তোরণের দরজা দুটি এমনভাবে নির্মিত হয় যাতে সহজে প্রবেশ করা না যায় অর্থাৎ এ দুটি একই কক্ষে নির্মিত হয়নি; বরং বাঁকানো বা bent-entrance হিসেবে নির্মিত হয়। বাইরের দরজাটি বহির্গত অংশের বামপাশে কিন্তু অন্দর বা ভিতরের দরজাটি তোরণের পশ্চাৎ-দেওয়ালের মধ্যবর্তী অংশে নির্মিত হয়েছিল। দুটি তোরণের মধ্যবর্তী স্থানে খিলান ছাদবিশিষ্ট একটি আয়তকার দিহলীয় বা প্রবেশকক্ষ অবস্থিত ছিল। প্রবেশ কক্ষটির পরিমাপ ছিল ৩০ হাত × ২০ হাত। বাইরে থেকে তোলা সেতু বা araw bridge-এর সাহায্যে দুর্গে প্রবেশ করতে হত। সোজাসুজি প্রবেশ করা যেত না। বক্রাকারে দরজা দুটি অবস্থিত ছিল। এজন্য বাগদাদের দুর্গের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল bent-entrance।

নির্মাণসামগ্রী

বাগদাদ নগরী নির্মাণে রৌদ্রে পোড়া এবং আগুনে পোড়া (burnt brick) উভয় প্রকারের ইট ব্যবহৃত হয়েছে। বাইরের প্রাচীরে শুষ্ক ইট ব্যবহৃত হলেও ভিতরের কক্ষের খিলান-ছাদ বা গম্বুজে আগুনে পোড়া ইট ব্যবহৃত হয়েছে। ইটগুলোর পরিমাপ ছিল এক বর্গহাত। ইটের সাথে নলখাগড়া দিয়ে বন্ড সৃষ্টি করে মজবুত করা হত। শহরের প্রধান বা দ্বিতীয় প্রাচীরটি অপেক্ষাকৃত মজবুত ছিল। এটি তিনধাপে নির্মিত হয়। বুরুজ নির্মাণ করে প্রাচীর সুদৃঢ় করা হয়। দুটি তোরণের মধ্যবর্তী অংশে আটাশটি বুরুজ ছিল। প্রধান প্রাচীরের উচ্চতা ছিল ৩৫ হাত। এর উপর প্রাচীর আরও ৫ হাত পর্যন্ত উঁচু করে নির্মাণ করা হয়। প্রাচীর দুটি ছিল প্রশস্ত।

বক্রাকারে তোরণ পার হয়ে প্রধান প্রাচীরস্থিত মূল ফটকে যেতে হত। দু'ফটকের মধ্যবর্তী অংশে ৬০ হাত দীর্ঘ এবং ৪০ হাত প্রশস্ত একটি অঙ্গন ছিল। অঙ্গনের দু'পাশে প্রথম ফাসিলের উভয়দিকে প্রবেশ করার জন্য দুটি দরজা ছিল। দরজা শহরের চারটি প্রবেশপথের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করত। ফটকের সম্মুখভাগে দুই প্রান্তে গোলায়িত বুরুজের আকারে নির্মিত হয় এবং এর প্রবেশপথ ২০ হাত দীর্ঘ এবং ১২ হাত প্রশস্ত ছিল। প্রবেশপথটি খিলানছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। এ গম্বুজটি ছিল খুবই সুদৃশ্য এবং সোনালী প্রলেপ দ্বারা শোভিত ছিল। গম্বুজের মাথায় গিল্টি করা ছিল এবং এর উপরে weather cock বা দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র ছিল। ফটক দুটি মজবুত করার জন্য লোহার দরজা ব্যবহৃত হয়। এ সমস্ত লোহার ফটক বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা হয়।

অভ্যন্তর

প্রধান ফটকের পশ্চাতে ২০ হাত দীর্ঘ এবং ২০ হাত প্রশস্ত আরও একটি অঙ্গন ছিল। এ মধ্য দিয়ে দুটি দরজার সাহায্যে দ্বিতীয় ফাসিলে যাওয়া যেত। এটি ২৫ হাত পর্যন্ত

বিস্তৃত ছিল। অঙ্গনের পিছনের দরজা দিয়ে খিলানপথে বা তাকত-এ প্রবেশ করা যেত। এ খিলানপথটি ২০ হাত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এক খিলান থেকে অন্য খিলানের দূরত্ব ছিল ১৫ হাত। দুর্গরক্ষাকারী প্রহরীদের জন্য খিলানপথের উভয় দিকে কক্ষ নির্মিত হয়। সর্বমোট ৫৪টি প্রহরী-কক্ষ ছিল। প্রহরী-কক্ষগুলো পার হয়ে তৃতীয় ফাসিল বা গম্বুজাকৃতি এলাকায় যাওয়া যেত। উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফাসিলের পার্শ্ববর্তী দরজা সমগ্র গোলাকার নগরীতে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হত। তৃতীয় ফাসিল পার হলে প্রাসাদ এলাকায় প্রবেশ করা যেত। প্রাসাদ ও মসজিদ পাশাপাশি ছিল।

প্রাসাদ

এ বি এম হোসেন মনসুর প্রাসাদটি সম্বন্ধে বলেন, "প্রাসাদটি বর্গাকৃতি ছিল। এক-একটি দিকের পরিমিতি ছিল ৪০০ হাত। প্রাসাদের একদিকে ২০ হাত প্রশস্ত এবং ৩০ হাত গভীর একটি ওয়াল ছিল। এই ওয়ালের পশ্চাতে ২০ হাত বর্গাকার এবং ১০ হাত উঁচু একটি কক্ষ ছিল। এটিও গম্বুজাকৃত ছিল। এই শেষোক্ত গম্বুজ পর্যন্ত প্রাসাদের সর্বমোট উচ্চতা ছিল ৮০ হাত। গম্বুজটি বহুদূর থেকে গোচরীভূত হত এবং সমসাময়িক স্থাপত্যে অত্যন্ত বিখ্যাত গম্বুজ বলে পরিগণিত ছিল। গম্বুজের শীর্ষে বর্ষা হাতে অশ্বারোহী একটি মানুষের মূর্তি শোভা পেত এবং এটি বাতাসের সাথে ঘুরত। গম্বুজের নামানুসারে প্রাসাদটির নামকরণ করা হয়েছিল "কুব্বাতু-আল-খাদরা" বা সবুজ গম্বুজ। সবুজ রঙের মোজাইকের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল বলে এটির নাম এরূপ হয়। প্রাসাদটি 'কসর আয-যাহাব স্বর্ণপ্রাসাদ বলেও অভিহিত হয়।

বাগদাদের দুর্গ-প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। এটি আল-মনসুরের মসজিদ নামে অভিহিত হয়।

স্থপতি

বিশালাকার অনিন্দ্যসুন্দর বাগদাদের রাজপ্রাসাদে সমসাময়িক ইসলামী দুর্গ স্থাপত্যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তীকালে দুর্গ বিভিন্ন শহরে নির্মিত হয়। যেমন রাক্কা, উখাইদির ও সমাররার বুলকাওয়ারা প্রাসাদ। বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠায় যাঁদের অবদান সর্বাধিক তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আবদ আল্লাহ ইবনে মুহরিয, হাজ্জাজ বিন আবতাত, রাবাহ, ইমরান ইবনে আল-ওয়ায়যাহ, শিহাব ইবনে কাছীর এবং বিশার ইবনে মায়মুনা। কথিত আছে যে, হানাফী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রখ্যাত আইনজ্ঞ আবু হানিফাকে একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়।

তুলনামূলক আলোচনা

বাগদাদের গোলাকার নগর পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে অভিনব; বিশেষ করে ইসলামী স্থাপত্যকলায় ইতিপূর্বে দুটি প্রাচীরবেষ্টিত বক্রাকার প্রবেশপথসম্বলিত দুর্গ নির্মিত হয়নি। অনেকে গ্রীকো-রোমান-বায়জানটাইন স্থাপত্যরীতি থেকে এর উদ্ভাবন হয়েছে বলে ধারণা করলেও ক্রেসওয়েল যথার্থই বলেন যে প্রাচ্যদেশীয় প্রভাব এর ভূমি-

নক্‌শায় প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বলেন, "সর্বপ্রাচীন দুইপ্রাচীরবেষ্টিত যে শহরটি রয়েছে তা হিটাইটদের (খ্রীঃ পূঃ ২০০০–১২০০) আমলে নির্মিত।" এর নাম সিঞ্জারলী শহর বা দুর্গ। এ ছাড়া মেদীয়দের (mediaus) দ্বারা নির্মিত হাগমাতানা (খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দী) পার্থীয় (Parthian) শাহের টেসিফোন (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হাত্তরা (Hatra) (খ্রীঃ পূঃ ১ম–২য় শতাব্দী), হাররান, দারাবজার্দ এবং সাসানীয় শহর গূর (২২৪ খ্রীঃ) ও ইসফাহান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুটি প্রাচীরবেষ্টনী, চারটি প্রবেশ তোরণ, তোরণগুলোর পাশ দিয়ে শহরে বেষ্টনী সড়ক, দুটি প্রাচীরের মধ্যবর্তী অংশে আবাসিক এলাকা দরবরাজের ভূমি-নক্‌শাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

২। মার্ভ, মসজিদ, ৭৪৮–৫৫ খ্রীঃ

উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে আব্বাসীয় রাজত্বের সূচনা হয়। ৭৪৭ খ্রীস্টাব্দে মার্ভ এবং হিরাত থেকে উমাইয়া সেনাবাহিনী বিতাড়িত হয় এবং সমগ্র পারস্য আব্বাসীয়দের দখলে আসে। আব্বাসীয় বংশের শক্তি ও প্রতিষ্ঠায় আবু মুসলিমের অবদান রয়েছে। তিনি আব্বাসীয় বংশের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন। খোরাসানের উমাইয়া শাসনকর্তা নসর ইবনে সাইয়ার যখন কিরমানে খারিজী বিদ্রোহদমনে ব্যস্ত, তখনই আবু মুসলিম আব্বাসীয়দের পক্ষে কালো পতাকা উত্তোলন করে প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। আবু মুসলিমের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে খোরাসানের রাজধানী মার্ভ অধিকৃত হয়। আরব ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মার্ভ দখল করে আবু মুসলিম সেখানে একটি বাসস্থান বা দারু'ল-ইমারা এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ইসতেখারী[১] বলেন, "Among the buildings of Abu Muslim is the Dar al-Imara and it is at the back (zahr) of the mosque."

দারু'ল-ইমারা মসজিদের পিছনেই নির্মিত হয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বসরা, কুফা ও ফুসতাতের আদি মসজিদ যেভাবে মসজিদ ও 'দার'আল-ইমারা' অর্থাৎ গভর্নরের বাসস্থানের এটি পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তার ঐতিহ্য অব্যাহত থাকে। আবু মুসলিম সুদূর মার্ভেও অনুরূপ পরিকল্পনায় উভয় ইমারত নির্মাণ করেন। মসজিদের কোনো চিহ্ন নেই তবে মনে করা যায় যে, চিরাচরিত রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী চতুষ্কোণাকার অঙ্গনবিশিষ্ট ইমারত ছিল। এই মসজিদের নির্মাণকাল সঠিকভাবে নির্ধারণ না করা গেলেও প্রতীয়মান হয় যে, আবু মুসলিম উমাইয়া যুগের শেষার্ধে এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে এবং নির্মাণকাজ ৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে নিহত হবার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

৩। বাগদাদ, আল-মনসুরের জা'মি মসজিদ, ৭৬২-৬৬ খ্রীঃ। (চিত্র-১৭)

আবুল আব্বাস আস-সাফফার ৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু হলে তাঁর ভাই আবু জাফর আল-মনুসর আব্বাসীয় খিলাফতের উত্তরাধিকারী হন। ক্ষমতা দখল করে তিনি হাসেমিয়া

১। A Short Account, p. 10.

থেকে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৭৬২ খ্রীস্টাব্দে আব্বাসীয় খিলাফতের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। টাইগ্রীস নদীর পশ্চিম তীরে প্রতিষ্ঠিত এই শহর বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন– 'মদিনাতুল মুদাওয়ার' অর্থাৎ গোলাকার নগরী, 'মদিনাতুস সালাম' অর্থাৎ শান্তির নগরী।

গোলাকার নগরী বাগদাদের মধ্যস্থলে আল-মনসুর একটি সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সবুজ গম্বুজবিশিষ্ট এই প্রাসাদটি 'কুব্বাতু'স সাখরা নামে পরিচিত ছিল। লক্ষণীয় যে, মার্ভে আবু মুসলিম কর্তৃক নির্মিত দারু'ল ইমারার সঙ্গে আল-মনসুরের প্রাসাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে; এমনকি এই উভয় প্রাসাদসংলগ্ন মসজিদ নির্মিত হয়। বাগদাদের প্রাসাদের উত্তর-পূর্বদিকে আল-মনসুর একটি মসজিদের নির্মাণকাজে আত্মনিয়োগ করেন। আরব ঐতিহাসিক আল-খতিবের বর্ণনা অনুযায়ী মসজিদটি রোদ্রেপোড়া ইট এবং কাদামাটি দিয়ে তৈরি করা হয়। আয়তনে বর্গাকার এবং পরিমাপ ২০০ বর্গহাত। লিওয়ানে কাঠের তৈরি জোড়াস্তম্ভ ব্যবহৃত হয়। ষোলোটি লম্বালম্বি
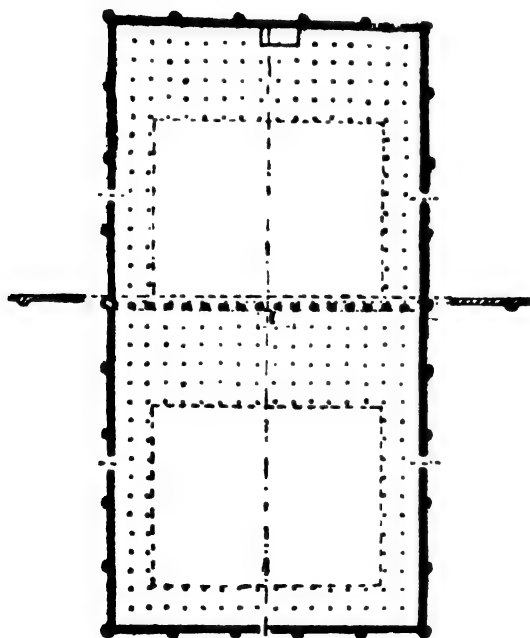
রেখাচিত্র : ৮০
বাগদাদ, জা'জামি মসজিদ, ভূমি নক্‌শা

স্তম্ভসারি লিওয়ানকে সতেরোটি আইলে বিভক্ত করেছে। পূর্ব ও পশ্চিমদিকের আইলগুলো রিওয়াকের দিকে প্রসারিত। উত্তর দিকে কোনো রিওয়াক ছিল না। সেগুন কাঠের স্তম্ভ সমান্তরাল ছাদের ভার বহন করত। মসজিদ-স্থাপত্যের অন্যতম উপাদান সাহান বাগদাদের মসজিদে বিদ্যমান ছিল। পূর্ব ও পশ্চিমে প্রবেশপথ নির্মিত হয়।

খলিফা হারুন'র রশীদ মসনদে আরোহণ করে নানাবিধ স্থাপত্যকর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ৮৯০ খ্রীস্টাব্দে তিনি আল-মনসুরের মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে সংস্কারের নির্দেশ দেন। প্রাচীন মসজিদটি ভেঙে একটি নতুন ইমারত নির্মাণ করা হয়। আল-মনসুরের মসজিদে পোড়ামাটির ইট এবং কাদামাটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু হারুন'র রশীদ সর্বপ্রথম আগুনে পোড়া ইটের ব্যাপক প্রচলন করেন। এ ছাড়া জিপসাম মাল-মশলা বা mortar হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ক্রেসওয়েলের ভূমি-পরিকল্পনা থেকে অনুমিত হয় যে, মসজিদটির বহির্প্রাচীর অর্ধগোলাকার বুরুজ (half round towers) ছিল। কোনো সুনির্দিষ্ট মিহরাব কিবলা-প্রাচীরে ছিল বলে মনে হয় না। মসজিদে গ্রথিত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, হারুনর রশীদ এই মসজিদের পুনর্নির্মাতা এবং স্থাপত্য ও সূত্রধরের নাম এবং পুনর্নির্মাণের তারিখ এই লিপিতে উল্লেখ আছে। ইবনে রুসতা 'আজুর' বা আগুনে পোড়া ইট এবং 'জিস' বা জিপসাপ দ্বারা পুনর্নির্মাণের কথা বলেন।[১]

বাগদাদের বিখ্যাত মসজিদটি স্থাপত্যকলার ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এখানে দুটি সাহান দেখা যাবে। দুই সাহানবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ সম্ভবত এখানেই প্রথম দেখা যাবে। আর-মনসুর কর্তৃক নির্মিত এবং হারুনর রশীদ কর্তৃক পুনঃনির্মিত মসজিদটি পরবর্তী পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়। অধিকসংখ্যক মুসল্লীর স্থানসঙ্কুলান না হওয়ায় আল-মনসুরের মসজিদটি আল-মুতা'দিদের রাজত্বকালে ৮৯৩-৪ খ্রীস্টাব্দে পুনঃগঠিত ও সম্প্রসারিত হয়। আরব ঐতিহাসিকদের তথ্য অনুযায়ী মুসল্লীগণ যখন মূল মসজিদ ছাড়াও প্রাসাদ এলাকায় বা "দার আল-কিত্তানীতে" নামায পড়তে থাকেন, তখন খলিফা মুতাদিদ রাজপ্রাসাদের দিকে মসজিদটি সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন। এর ফলে কিবলা-প্রাচীর ভেঙে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে মূল মসজিদের সংলগ্ন এলাকায় সম্প্রসারণ-কাজ পরিচালিত হয়। পুরাতন কিবলা-প্রাচীরে খিলান সৃষ্টি করে সংযোগ স্থাপন করা হয়। মূল মসজিদ এবং মুতাদিদের সম্প্রসারিত মসজিদ দুটির ভূমি-নক্শা এবং স্থাপত্যিক বিন্যাস একই রূপ। দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে কিবলার দিকে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে সতেরোটি আইল তৈরি করা হয়। তেরোটি আইল সাহানের দিকে লম্বালম্বিভাবে প্রসারিত এবং বাকি চারটি দুটি দুটি করে উভয়পাশে পুরাতন মসজিদের রিওয়াকের আইলের সঙ্গে মিশে গেছে। আল-মনসুরের মূল মসজিদের কিবলা থেকে মিহরাব, মিমবার এবং মাকসুরা নতুন মসজিদের কিবলাতে স্থানান্তরিত হয়। আসল এবং পরবর্তী মসজিদ দুটির মধ্যে পার্থক্য করার জন্য আল-খাতিব পূর্ববর্তী মসজিদের চত্বরকে "আস-সাহান আল-আতিক" (প্রাচীন) এবং সম্প্রসারিত মসজিদের অঙ্গনকে "আস-সাহান আল-আওয়াল" (প্রথম) বলে অবিহিত করেন।

১। Creswell, The Great Mosque of Al-Mansur, Iraq, Vol I. 1934. p. 106.

গুরুত্ব :

প্রাচ্যের সুরম্য গোলাকার নগরী এবং হারুনর রশীদের আরব্যরজনীখ্যাত বাগদাদ আল-মনসুরের অমর কীর্তি। তাঁর মসজিদটিও রাজপ্রাসাদের মতো স্থাপত্যকলার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে দেওয়ালসংলগ্ন মসজিদটিকে প্রাসাদ-মসজিদ বলা যায় এবং বাসস্থানের সঙ্গে মসজিদের সহঅবস্থান হযরত উমরের (রাঃ) সময়ে প্রচলিত হয়। কুফা, বসরা ও ফুসতাতে দারু'ল ইমারা বাগদাদের সবুজ গম্বুজবিশিষ্ট প্রাসাদের পূর্বসুরী। আল-মনসুরের মসজিদটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুটি সাহান। আল-মাকদ্দেসী বলেন যে, বাগদাদের মসজিদের অনুকরণে প্রায় এক শতাব্দী পরে ফারসে ফাসার মসজিদে পরপর দুটি সাহান দেখা যাবে। ক্রেসওয়েল যথার্থই বলেন যে, দুটি সাহানের অবস্থান ইতিপূর্বে কোনো মসজিদে দেখা যায়নি এবং নিঃসন্দেহে ফাসার উদাহরণটি বাগদাদের অনুকরণে নির্মিত। মসজিদটির মূল পরিমাপ
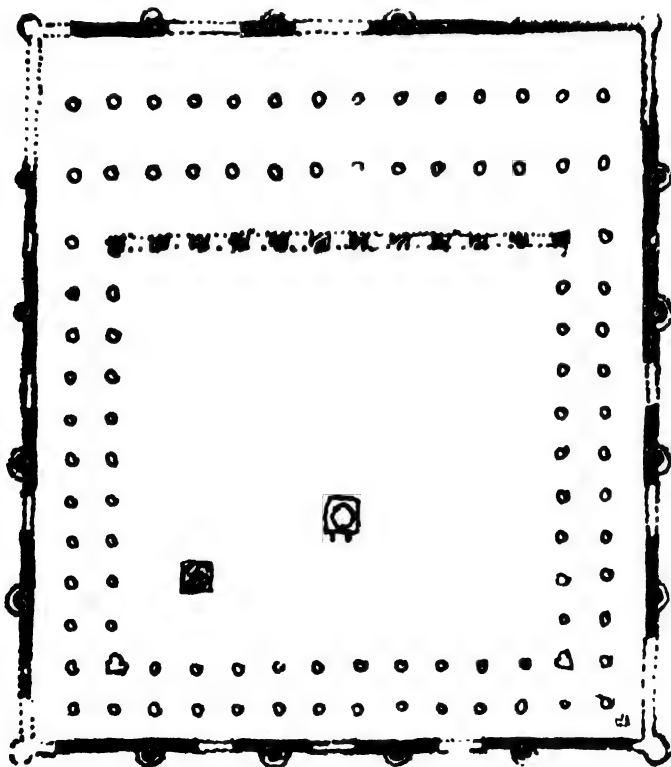
রেখাচিত্র : ৮১
রাক্কা, জা'মি মসজিদ, ভূমি নক্শা।

২০০ বর্গহাত ছিল কিন্তু মুতাদীদের সময়ে এর পরিমাপ দাঁড়ায় ৩২৮ ফুট × ৬০৭ ফুটে।[১] বাগদাদের মসজিদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, খিলানবিহীন সমান্তরাল ছাদের ভারবহন করছে সেগুনকাঠের স্তম্ভরাজি। স্তম্ভ দুটি কাঠ জোড়া দিয়ে নির্মিত হলে ছাদের উচ্চতা অনেক বৃদ্ধি পায়। জিয়াদ ইবনে আবিহ কর্তৃক কুফা ও বসরা মসজিদেও এ ধরনের প্রক্রিয়া দেখা যায় কিন্তু এখানে প্রস্তরখণ্ড ব্যবহৃত হয়। খিলানবিহীন স্তম্ভসারি দ্বারা ছাদ নির্মাণ অনেকটা প্রাচীন পারস্য অ্যাকামেনীয় আপাদানার অনুকরণ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আব্বাসীয় আমলে অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইরাক ও পারস্য অঞ্চলে খিলান-বিহীন স্তম্ভ দ্বারা সমান্তরাল ছাদসম্বলিত অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারত উপমহাদেশের সিন্ধু প্রদেশের মানসুরার মসজিদ (৭৭৫ খ্রীঃ), বাইরাইনের মানামা মসজিদ (৭৫৪ খ্রীঃ) ইত্যাদি।

৪। রাক্কা, মসজিদ, ৭৭২ খ্রীঃ

আলেপ্পো শহরের নিরানব্বই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে আল-মনসুর অপর একটি প্রাসাদ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। ইউফ্রেটিস নদীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এই শহরটির নাম রাক্কা। 'রাক্কা' শব্দের অর্থ জলাভূমি। আল-মনসুর এই শহরের নাম দেন 'রাফিকা' অর্থাৎ সঙ্গী। ৭৭২ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত রাক্কায় পরবর্তী পর্যায়ে হারুনর রশীদ ৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে বসবাস শুরু করেন। মনসুরের মূল প্রাসাদটি বহু পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কেবলমাত্র বাগদাদ ফটক নামে একটি সুদৃশ্য তোরণ, বুরুজের কিছু অংশ এবং জা'মি মসজিদটি আব্বাসীয় স্থাপত্যের কীর্তি বহন করে রয়েছে।

রাক্কা নগরীর পরিমাপ বাগদাদের মতো গোলাকার নয়; কারণ দক্ষিণদিকের প্রাচীর সমান্তরাল এবং অন্যান্য দিকের প্রাচীর একটি অসম ও ঈষৎ কৌণিক অশ্বনালাকৃতি খিলানের সৃষ্টি করেছে। উত্তরদিকের চত্বরে মনসুর একটি জা'মি মসজিদ নির্মাণ করেন। ভূমি-পরিকল্পনায় মসজিদটি বাগদাদের মসজিদের মতো বর্গাকার ছিল না। আয়তাকার পরিমাপের মসজিদটি ৩০৫ ফুট চওড়া এবং ৩৫০ ফুট গভীর ছিল অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম অপেক্ষা দীর্ঘ ছিল। ক্রেসওয়েলের মতে, দেওয়ালের দৈর্ঘ্যের অনুপাত ৬ : ৭। রৌদ্রে পোড়া ইট দিয়ে দেওয়াল নির্মিত হয় এবং প্রাচীর অর্ধ-গোলাকার বুরুজ দ্বারা সংরক্ষিত ছিল। কোণায় চারটি বুরুজ ছাড়া প্রতিদিকে চারটি করে মোট বিশটি বুরুজ স্থাপিত হয়। দেওয়ালের প্রশস্ততা ৫১/২ ফুট ছিল বলে বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করেন। রাক্কার মসজিদে ১৭ ইঞ্চি মাপের ইট ব্যবহৃত হয় এবং পূর্বদিকে চারটি, পশ্চিমদিকে চারটি এবং উত্তরদিকে তিনটি করে মোট এগারোটি প্রবেশপথ দিয়ে মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যেত। বর্তমানে মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত।

১। Papadopoulo. p. 489.

রাক্কার মসজিদে সাহান ছিল। সাহানের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে নামাযগাহ বা লিওয়ানের সম্মুখে এগারোটি খিলান দেখা যাবে। এগুলো মনসুরের আমলে নির্মিত হয়, পরবর্তীকালে ১১৬৬ খ্রীস্টাব্দে নূরুদ্দীন এগুলো স্থাপন করেন। খিলানশ্রেণীর মধ্যবর্তী যে অংশটি রয়েছে ঠিক তার উপরে গ্রথিত একটি শিলালিপি থেকে রাক্কা মসজিদের পুনর্নির্মাণে নূরুদ্দীনের অবদানের কথা জানা যায়। খিলানরাজি আগুনে পোড়া ইট দ্বারা নির্মিত হয়। এর বর্তমান উচ্চতা ৩৪^{১}/২ ফুট, নির্মাণের সময় ছিল ৪২^{৩}/৪ ফুট। এগারোটি খিলান দশটি আয়তাকার পিয়ারে সংযুক্ত সংলগ্ন গোলাকার সরু স্তম্ভ থেকে উঠে গেছে। এই সমস্ত খিলান সামনের লাইন থেকে কিছু পিছনে স্থাপিত এবং খিলানসমূহ মসজিদের অভ্যন্তরে স্থাপত্যিক বিন্যাস সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা দেয়। আয়তাকার পিয়ারের নিম্নভাগে সম্মুখের দিকে ছোট কুলুঙ্গী রয়েছে। ইটের তৈরি সংযুক্ত স্তম্ভের শীর্ষদেশ স্টাকো দ্বারা অলঙ্কৃত। ক্রেসওয়েল এখানের অলঙ্করণের সঙ্গে মসুলে নূরুদ্দীন কর্তৃক নির্মিত মসজিদের বীণা শীর্ষদেশের (Lyre Capitals) সাদৃশ্য লক্ষ করেন। লিওয়ানের ওপর নির্মিত ঢালু ছাদও যে নূরুদ্দীনের কীর্তি তা শিলালিপি থেকে জানা যায়। মনসুর রাক্কা মসজিদ নির্মাণ করেন কিন্তু তাঁর সময়ের কোনো চিহ্ন বর্তমানে মসজিদে নেই। লিওয়ানের এগারোটি খিলান এবং ঢালু ছাদ নূরুদ্দীনের (১১৬৫-৬৬) আমলের। এগারোটি খিলানরাজির পাশে লিওয়ান ও সাহানের কোণায় দুটি অদ্ভুত ধরনের পিয়ার আছে। এতে সংলগ্ন কোনো ছোট গোলাকার স্তম্ভ ছিল না বরং সাহানের দিকে অর্ধগোলাকার ছিল, যার ব্যাস ৫^{৩}/৪ ফুট। ক্রেসওয়েলের মতে, শেষের পিয়ার দুটি নূরুদ্দীনের পূর্বে নির্মিত হয় এবং লিওয়ানের সম্মুখে সম্ভবত আদি অংশের সামান্যতম বিদ্যমান চিহ্ন। উপরন্তু, নূরুদ্দীনের শিলালিপিতে মাত্র দশটি পিয়ারের সংস্কারের কথা উল্লেখ আছে।

রাক্কা মসজিদটির লিওয়ান দুটি গোলাকার স্তম্ভরাজির সারি দ্বারা তিনটি আইলে বিভক্ত। প্রতি সারিত চৌদ্দটি স্তম্ভের উপর পনেরোটি খিলান নির্মিত হয়। তিনটি আইল পাশাপাশি তিনটি ঢালু ছাদ দ্বারা আবৃত। সাহানের পরিমাপ ২০৫ ফুট গভীর এবং ২২৫ ফুট চওড়া। লিওয়ানের খিলানরাজির দুই পাশে যে ধরনের পিয়ার দেখা যায় তারই অনুকরণে উপরদিকের রিওয়াকের শেষ প্রান্তে দুটি পিয়ার নির্মিত হয়। এই আইলবিশিষ্ট রিওয়াক উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমদিকে সাহানকে ঘিরে রেখেছে। রিওয়াকের পূর্ব ও পশ্চিমদিকে নয়টি পিয়ারের উপর থেকে দশটি খিলান উঠে গেছে। উত্তরদিকের খিলানের সংখ্যা অবশ্য এগারোটি, দক্ষিণদিকের মতো। মসজিদের সাহানের মাঝখানে একটি সমাধি এবং পশ্চিমদিকে একটি চতুষ্কোণাকার মিনার স্থাপিত। মিনারটি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয় এবং ক্রেসওয়েলের মতে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত।

মসজিদ-স্থাপত্যের ইতিহাসে রাক্কা মসজিদ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। Creswell যথার্থই বলেন, "This mosque, which stands on the dividing line between Syria and Mesopotamia, provides an interesting example of the blending of two types. The nearly square plan of the mosque and the sahn, the bastioned walls and the large number of entrances (instead

of the three axial ones usual in Syria) is Mesopotamian, likewise the combination of material-mud brick for the walls and burnt brick for the arcades– a combination found in the Nestorian churches of Hira, but the triple aisled sanctuary and the parallel gable roofs which covered it (in contrast to the flat roofs of 'Iraq) are Syrian features which we have already met with at Damascus and Qasr al Hair.We have also met with a sanctuary roofed in exactly the same way at Harran, a region which belongs architecturally to Syrai."[১] রাক্কার বাগদাদ তোরণ ও জা'মি মসজিদে পারস্য স্থাপত্যের প্রভাব পরিস্ফুট ছিল, বিশেষ করে চারটি বিন্দু থেকে উত্থিত খিলান বা four-centred arch, ইটের অলঙ্করণ ইত্যাদি। ক্রেসওয়েলের মতে, রাক্কায় সর্বপ্রথম four-centred arch-এর যে ব্যবহার দেখা যায় তা পারস্যরীতির প্রভাবে সম্পন্ন হয়। গাটরুড বেল বলেন যে, রাক্কা মসজিদ সাদ ইবনে আমীর ইবনে হুদায়েম নির্মাণ করেন।[২] একারণে "রাক্কার জামি মসজিদ সিরীয় ও মেসোপটেমীয় স্থাপত্য কলার সংমিশ্রণ বলা হয়।"

৫। উখাইদির প্রাসাদ, মসজিদ, ৭৭৮ খ্রীঃ

বাগদাদ থেকে প্রায় ১২০ মাইল দক্ষিণে ওয়াদী উবায়েদে সুরক্ষিত কাসর উখাইদির প্রাসাদ অবস্থিত। খাদরা বা সবুজ থেকে উখাইদির-এর উৎপত্তি। সুতরাং উখাইদির অর্থ 'ক্ষুদ্র সবুজ' প্রাসাদ। ১৬২৫ খ্রীস্টাব্দে পর্যটক পিয়েত্রো দ্যালা ভা-লে'র ভ্রমণ-কাহিনীতে সর্বপ্রথম উখাইদিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও এই প্রাসাদটি সুরম্য ও সুরক্ষিত ছিল।

উখাইদির প্রাসাদটি এক সুউচ্চ ও সুরক্ষিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মূল প্রাসাদটি উত্তরদিকের প্রাচীরসংলগ্ন। উত্তরদিকের আকর্ষণীয় তোরণটি পার হয়ে একটি আয়তাকার ছোট ভল্ট দ্বারা আবৃত কক্ষে পৌছতে হয়। এই কক্ষের ডানে ও বামে দুটি ছোট অন্ধকার কুঠরী রয়েছে। ভল্টদ্বারা আবৃত প্রবেশকক্ষটি পার হয়ে খিলানপথ দিয়ে প্রবেশ করতে হয় ছোট একটি কক্ষে। এই কক্ষটি চতুষ্কোণাকার এবং গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। এই কক্ষের দক্ষিণদিকে যে খিলান নির্মিত হয় তার মধ্য দিয়ে একটি বৃহত্তর ভল্টের ছাদবিশিষ্ট হলে পৌছানো যায়। এই হলের ডান এবং বামে খিলানের দ্বারা কুলুঙ্গী সৃষ্টি করা হয়েছে। ডানদিকে এই সমস্ত কুলুঙ্গীর পাশে জানালাবিহীন ভাণ্ডার রয়েছে। ডানদিকে এই ভাণ্ডার পার হয়ে একটি মসজিদের নিদর্শন সহজেই লক্ষ করা যায়।

গাটরুড বেল মেসোপটেমিয়ার মসজিদ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, "The Mosque builders were guided by a scheme of extreme simplicity, the details

১। A Short Account, p.190.

২। Bell, G.L, Ukhaidir, Oxford, 1914, p. 153.

of which were executed according to the nature of the building materials which was available."[১] উখাইদিরের প্রাসাদ-মসজিদ বাগদাদ ও রাক্কার প্রাসাদের মতো কারণ প্রাসাদ ও মসজিদ সংলগ্ন ও সংযুক্তভাবে নির্মিত। খলিফার ব্যবহারের জন্যই নির্মিত এই মসজিদ আদর্শ মসজিদের সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতীক। আয়াতাকার পরিমিতিসম্বলিত এই ক্ষুদ্র মসজিদটি পূর্ব-পশ্চিমে ৭৯১/২ ফুট এবং উত্তর-দক্ষিণে ৫১১/২ ফুট। এই মসজিদে প্রবেশ করতে হয় পশ্চিমদিকের দীর্ঘ সমান্তরাল করিডোরের মধ্য দিয়ে। উত্তরদিক থেকে দুটি প্রবেশপথ দিয়ে মসজিদের সাহানে যাওয়া যায়। মসজিদটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলে ইরাক সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ আবর্জনা পরিষ্কার করে। এর ফলে মসজিদের কিবলার দিকে মাত্র একটি আইল-বিশিষ্ট লিওয়ান উন্মুক্ত হয়। লিওয়ানের দিকে সাহানের সামনে পাঁচটি খিলান নির্মিত হয়। এই খিলানগুলো এখন সম্পূর্ণরূপে ভেঙে গেছে, তবে ভিত্তিভূমি দেখে মনে হয় যে এগুলো গোলাকার স্তম্ভের উপর নির্মিত হয়। স্তম্ভগুলি অবিন্যাস্ত খণ্ড খণ্ড পাথরের টুকরোর সন্নিবেশে (rubble) গঠিত এবং প্রতিটির ব্যাস ৩১/৪ ফুট। লিওয়ানটি ভল্ট দ্বারা আবৃত ছিল, ভল্টটি সাধারণ টানেল বা নলাকৃতি। লিওয়ানের পাঁচটি খিলান চারটি স্তম্ভের উপর থেকে উত্থিত, শেষপ্রান্তে স্তম্ভ দুটিতে বৈপরিত্য লক্ষ করা যায়। কোণার স্তম্ভ দুটি গোলাকার স্তম্ভের সঙ্গে একত্রে সন্নিবেশিত করে নির্মিত হয়েছে এবং কৌণিক অংশ লিওয়ানের দিকে সম্প্রসারিত। কাঠের টাইবীম স্তম্ভগুলোকে সংযুক্ত করেছে।

লিওয়ানের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী সাহানের পূর্ব ও পশ্চিমে রিওয়াক নির্মিত হয়। এই রিওয়াকগুলোর পরিমাপ ১০ × ৩৩ ফুট। উত্তরদিকে কোন রিওয়াক ছিল না। ক্রেসওয়েলের মতে, সাহানের পরিমিতি ছিল ৫৩১/৪ × ৩৩৩/৪ ফুট। উখাইদির মসজিদের কিবলা-প্রাচীরের মধ্যস্থলে একটি আয়তাকার মিহরাব ছিল। এই মিহরাবের গভীরতা ছিল ১৩/৪ ফুট এবং প্রশস্ততা ৩১/২ ফুট। মিহরাবের উপরে অর্ধগোলাকার ছাদ (Semi-dome) রয়েছে এবং সমান্তরাল ব্রাকেটের সাহায্যে এই ছাদ তৈরি করা হয়। ক্রেসওয়েল উখাইদির মসজিদের প্রভাবের উল্লেখ করে বলেন, "Mihrabs, rectangular instead of semi-circular in plan are a distinctive feature of the Persian Mesopotamian area in early times, e.g. the Tarikh Khana at Damghan, the Great Mosque at Samarra and Abu Dulaf, Nayin, etc." গার্টরুড বেল এই মসজিদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করেন এবং মন্তব্য করেন যে, "Ukhaider is the only example of which remains to us of a mosque in which the riwaqs were covered with a vault." তাঁর মন্তব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, পূর্ববর্তী সকল আব্বাসীয় প্রাসাদ-মসজিদে কাঠের ছাদ ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু উখাইদিরে সর্বপ্রথম পারস্য স্থাপত্যের প্রভাবে টানেল ভল্ট নির্মিত হয়েছে।

১। Bell, op. cit, p. 160.

উখাইদিরের নির্মাতাকে সঠিকভাবে জানা না গেলেও গবেষকগণ মনে করেন যে, আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ইসা ইবনে মুসা ৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

৬। সুসা, রিবাত মসজিদ, ৮২২ খ্রীঃ

ভূমধ্যসাগরের গ্যাবস উপসাগরের তীরে অবস্থিত সুসা সাধারণভাবে কাসর আর রিবাত অথবা রিবাতের দুর্গ নামে পরিচিত। রিবাতের ব্যাখ্যা দিয়ে ক্রেসওয়েল বলেন যে, এটি একটি ছোট সুরক্ষিত সামরিক ছাউনি। সুসায় নির্মিত রিবাত বর্গাকৃতি এবং বুরুজ দ্বারা সুরক্ষিত প্রাচীর নির্মিত হয় এই সামরিক ছাউনিতে। বিশাল এবং অপূর্ব স্থাপত্যিক কৌশলের পরিচায়ক সুসার রিবাত।

সুসার রিবাতটি দ্বিতল। উপরে যাওয়ার জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় সোপান নির্মিত হয়। দ্বিতলের উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমদিকে নিচের কক্ষসমূহের ন্যায় অসংখ্য কুঠরী তৈরি করা হয়। দক্ষিণদিকে যে সমস্ত কুঠরী ছিল সেগুলোকে পরিবর্তিত করে মসজিদ স্থাপিত হয়। মসজিদটি দ্বিতলে অবস্থিত হলেও খুবই নিখুঁতভাবে নির্মিত এই ইমারতে দশটি লম্বালম্বি খিলানরাজি রয়েছে। কিবলার দিকে প্রসারিত এই খিলানরাজির প্রত্যেকটিতে দুটি খিলান রয়েছে। দশটি খিলানরাজি লিওয়ানকে এগারোটি আইলে বিভক্ত করেছে। অর্থাৎ লিওয়ানের মধ্যবর্তী পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত অপর একটি খিলানশ্রেণী সমান্তরালভাবে প্রসারিত হওয়ায় লিওয়ানটি মোটামুটিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত। খিলানগুলো অর্ধগোলাকার এবং খর্বাকৃতি ক্রুশাকার পিয়ারের উপর থেকে উঠে গেছে। উত্তর-দক্ষিণে এগারোটি টানেল ভল্ট ছাদকে আবৃত করে রেখেছে। কিবলা-প্রাচীরে একটি অর্ধগোলাকার অবতল মিহরাব স্থাপিত হয়েছে। ক্রেসওয়েল সুসার রিবাতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদে ব্যবহৃত ভল্টের গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেন, "We have here exactly the same vaulting system as that we have just seen in the Cistern of Ramla and exactly as we shall find later in the Mosque of Bu Fatata and the Great Mosque of Susa."[১]

উখাইদির ও বাগদাদের মসজিদে কোনো মিনার ছিল না; কিন্তু রাক্কার মতো সুসার রিবাত মসজিদে আযানের জন্য মিনার নির্মিত হয়। সুসার মিনারটি প্রাসাদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। ১৫১/২ ফুট ব্যাসের গোলাকার বুরুজটি ৫০১/২ ফুট উঁচু। মিনার প্রবেশপথের উপরে প্রোথিত কুফী রীতিতে যে শিলালিপি উৎকীর্ণ রয়েছে তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুসায় নির্মিত রাবাতের মসজিদটি জিয়াদাতুল্লাহর কীর্তি। এর নির্মাণকাল ৮২১-২২ খ্রীস্টাব্দ। আগলাভী বংশের তৃতীয় সুলতান, যিনি কায়রোয়ান মসজিদের সংস্কারে বিশেষ অবদান রেখেছেন, এই মসজিদের নির্মাতা।

১। A Short Account, p. 232.

৭। সুসা, বূ ফাতাতা মসজিদ, ৮৩৮-৪১ খ্রীঃ

সুসার দক্ষিণ তোরণ পার হয়ে উত্তরদিকে অগ্রসর হলে একটি ছোট অপরিচিত মসজিদের মুখোমুখি হওয়া যাবে। উত্তরদিকের প্রাচীরে যে দরজা আছে তা পার হলেই উত্তরদিকের মসজিদ-প্রাচীর নজরে পড়ে। এই দেওয়ালে কুফী রীতিতে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, আগলাব ইবনে ইব্রাহিম এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।

বূ ফাতাতা মসজিদের সম্মুখে দুটি পিয়ারের উত্তর থেকে তিনটি অশ্বনলাকৃতি খিলান নির্মিত হয়েছে। পিয়ারগুলো ৩৫ ১/২ ইঞ্চি উঁচু, সম্মুখপ্রাচীরের উচ্চতা ১৬ ফুট। উত্তরে অবস্থিত এই রিওয়াক থেকে মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। রিওয়াকটি টানেল ভল্ট দ্বারা আবৃত। ৭ ১/২ ফুট প্রশস্ত এই রিওয়াকটির ডানদিকে আধুনিককালে একটি মিনার তৈরি করা হয়েছে। রিওয়াকের দক্ষিণদিকের দরজা দিয়ে লিওয়ানে প্রবেশ করা যায়। প্রবেশপথটি সর্দল (lintel) দ্বারা তৈরি এবং সর্দলের উপরে একটি চাপ লাঘবকারী খিলান (relieving arch) রয়েছে। লিওয়ানের পরিমাপ হচ্ছে ২৫ ১/৪ ফুট প্রশস্ত এবং ২৫ ৩/৪ ফুট গভীর। লিওয়ানটি দুটি খিলানরাজি দ্বারা তিনটি আইলে বিভক্ত। খিলানগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে প্রসারিত। লম্বালম্বি খিলানগুলো আড়াআড়িভাবে দুটি খিলান দ্বারা পুনরায় বিভক্ত। এর ফলে অভ্যন্তরে নয়টি খিলান দেখা যাবে। খিলানগুলো আটটি মোটা পিয়ারের উপর থেকে উত্থিত। বৃহদাকার পিয়ারের দুই পাশে খিলানগুলোকে নির্মাণের জন্য সহায়তা করছে সংলগ্ন ক্রশাকৃতি ক্ষুদ্রাকার পিয়ারগুলো। লম্বালম্বি খিলানগুলো অর্ধবৃত্তাকার কিন্তু সমান্তরাল খিলানগুলো ঈষৎ চাপা। পূর্বেরগুলো ১০ ১/৪ ফুট উঁচু এবং পরেরগুলো ১২ ফুট উঁচু। লম্বালম্বিভাবে
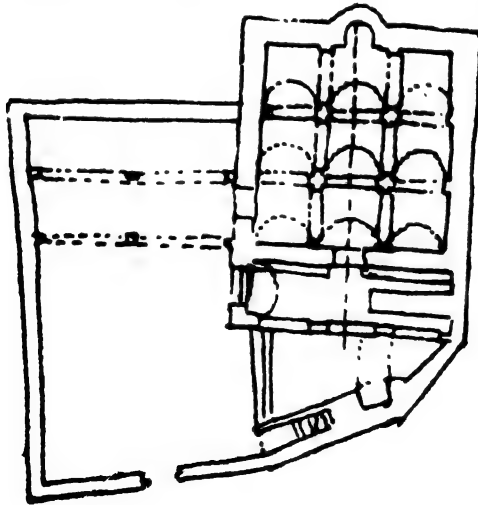
রেখাচিত্র : ৮২
সুসা, বূফাতাতা মসজিদ, ভূমি নক্শা

তিনটি আইলের উপর তিনটি পৃথক টানেল ভল্টের ছাদ রয়েছে। কিবলা-প্রাচীরে অর্ধগোলাকার অবতল মিহরাব স্থাপিত হয়েছে।

গুরুত্ব :

ক্ষুদ্রাকৃতি হলেও বূ ফাততা মসজিদ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যে প্রতিভাত এই মসজিদ-উপাদানগুলো সুষ্ঠু বিন্যাস হয়েছে। ক্রেসওয়েল বলেন যে, "The vaulting system of this mosque is the third example of its kind in Islam, the first being the Cistern of Ramla 172 H. (789), the second the mosque on the upper floor of the Ribat of Susa, 206 H (821-2), and we shall see that it was employed again, some ten years later (Great Mosque of Susa, 850-51)."[১] ভল্টের ব্যবহার ছাড়াও বূ ফাতাত মসজিদটি বিশেষ কয়েকটি কারণে মসজিদ-স্থাপত্যে অবদান রেখেছে। প্রথমত, এই মসজিদটি উত্তর আফ্রিকার দ্বিতীয় প্রাচীনতম মসজিদ। কায়রোয়ান মসজিদের পর মসজিদটি উত্তর আফ্রিকায় তার নিজস্ব কাঠামো ও ভিত্তিভূমি বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয়ত, কুব্বা'তুস সাখরার পরে এই মসজিদটিই প্রথম যাতে লিপি ও অলঙ্করণের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছে। তৃতীয়ত, ইতিপূর্বে কেবলমাত্র উত্তরদিকে একটিমাত্র রিওয়াকের ব্যবহার দেখা যায়নি। কিন্তু বূ ফাতাতা মসজিদে লিওয়ানের সম্মুখে রিওয়াকের ব্যবহার আকর্ষণীয় যা বিশেষ অলঙ্করণের সৃষ্টি করেছে। ক্রেসওয়েল একে Portico in antis বলে অভিহিত করেন। কায়রোতে নির্মিত আস-সালিহ্ তালাই'র মসজিদ ব্যতিরেকে বূ ফাতাতা মসজিদের রিওয়াক খুব সম্ভবত প্রথম নিদর্শন। লিওয়ানের সম্মুখে যে রিওয়াক দেখা যায় তার প্রচলন হয়েছে তুরস্কে এবং ভারত উপমহাদেশের স্থাপত্যে। প্রাক্-মুঘল বাংলার ইমারতে বিশেষ করে গৌড়ের রাজবিবি, চামকাটি ও লোটান মসজিদে লিওয়ানের সম্মুখে যে রিওয়াক দেখা যায় তা বারান্দা বা করিডর নামে পরিচিত।

৮। সুসা, জা'মি মসজিদ, ৮৫০ খ্রীঃ

সুসা নগরীর উত্তর-পূর্ব কোণে বাব আল-বাহ্রের কাছে প্রখ্যাত জা'মি মসজিদটি অবস্থিত। স্থাপত্যকৌশল, বিশালতা ও অলঙ্করণ-নৈপুণ্যের দিক থেকে সুসুর জা'মি মসজিদ একটি অসামান্য কীর্তি।

আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদের চৌহদ্দী একটি অসম বহুভুজবিশিষ্ট এলাকা, যার পরিমাপ হচ্ছে ১৯৭ × ২৯৫ ফুট। ভালভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, আসলে মূল মসজিদটি একটি সমবাহুসম্বলিত আয়তাকার। এই ইমারতের পরিমিতি হচ্ছে উত্তর-দক্ষিণে ১৮৭ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৬২ ফুট। মূল মসজিদ-প্রাচীরের বাইরে ডানে ও বামে কয়েকটি অসম পরিমাপের এলাকা যিয়াদা (annexe)

১। A Short Account, p. 208.

সংযোজিত হয়েছে। পশ্চিমদিকের যিয়াদা ২৬^{১}/৪ ফুট প্রশস্ত এবং ১৪১ ফুট দীর্ঘ। এই যিয়াদা পার হয়ে মসজিদের পশ্চিমদিকের রিওয়াকে প্রবেশ করতে হয়। তিনটি প্রবেশপথ নির্মিত হয়েছে সর্দল ও চাপ লঘুকারী খিলান বা relieving arch-এর সাহায্যে। অনুরূপভাবে পূর্বদিকের রিওয়াকে দুটি এবং উত্তরদিকের রিওয়াকে মাত্র একটি প্রবেশপথ দ্বারা সাহানে প্রবেশ করা যায়। সাহানের পরিমাপ ১৩৫ × ৭৩ ফুট। এই সাহানের তিনদিকে, দক্ষিণদিক ব্যতীত, অশ্বনালাকৃতি খিলানের উপর একসারি আইলবিশিষ্ট রিওয়াক নির্মিত হয়। খিলানগুলো T-আকৃতির পিয়ারগুলোর উপর থেকে উত্থিত এবং এই পিয়ারগুলো সাহানের সামনে প্রোথিত। T-আকৃতির পিয়ার সৃষ্টির মূলে রয়েছে উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম থেকে লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি খিলান নির্মাণের প্রচেষ্টা। উত্তর-দক্ষিণে ছয়টি করে এবং পূর্ব-পশ্চিমে রিওয়াকে এগারো খিলান দেখা যাবে। কিন্তু দক্ষিণ অর্থাৎ কিবলাপ্রান্তের খিলানগুলো পিয়ারের স্থলে গোলাকার স্তম্ভের উপর স্থাপিত এবং ঈষৎ কোণাকৃতি। মূল মসজিদে সাহানের দক্ষিণে কোনো রিওয়াক ছিল না কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে এদিকে একটি রিওয়াক স্থাপিত হয়।

সুসার জা'মি মসজিদের লিওয়ান বারোটি খিলানসম্বলিত স্তম্ভরাজি দ্বারা তেরোটি আইলে বিভক্ত। প্রতিটি খিলানসারিতে ছয়টি খিলান রয়েছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত এই খিলানসারিগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী আইলটি পার্শ্ববর্তী আইলগুলোর চেয়ে প্রশস্ত। এই আইলটি সাহান থেকে কিবলা-প্রাচীরের প্রধান মিহরাবের দিকে চলে গেছে। লম্বালম্বি আইলসমূহ আবার আড়াআড়িভাবে পূর্ব-পশ্চিমে ছয়টি অংশে (বে) বিভক্ত। পূর্ব থেকে পশ্চিমে সমান্তরালভাবে প্রসারিত স্তম্ভরাজিগুলো এবং লম্বালম্বি স্তম্ভসমূহ পরস্পরকে ছেদ করেছে। উল্লেখ্য যে, লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি খিলানসমূহ যে স্থানে ছেদ করেছে, সেখান থেকে খাটো ক্রশাকৃতি পিয়ারের সাহায্যে এই সমস্ত খিলান উঠে গেছে। সমস্ত খিলানই অশ্বনালাকৃতি কিন্তু আড়াআড়ি খিলানগুলো অন্যান্য খিলান অপেক্ষা উচ্চতর অর্থাৎ ৪^{১}/২ ফুটের স্থলে ৯^{১}/৪ ফুট। সাহানের সম্মুখে প্রথম তিনটি সারির ('বে') উচ্চতা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত খিলানশ্রেণীর চেয়ে অধিক কিন্তু পশ্চাতের তিন সারি আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি খিলানসারির উচ্চতার সমান। প্রথম তিনটি সমান্তরাল খিলানসারি টানেল ভল্ট দ্বারা আবৃত, ঠিক যেমনভাবে বূ ফাতাতা মসজিদে দেখা যাবে। এই সমস্ত টানেল ভল্ট নির্মাণে বিশেষ ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়। প্রথমে খাটো খিলান সৃষ্টি করে তার উপরে উঁচু করে সমান্তরাল খিলান নির্মাণ করা হয়, যাতে ভল্টটি স্থাপনে কোনো বিঘ্ন না হয়।

মসজিদের লিওয়ানের দক্ষিণ অথবা কিবলাপ্রান্তে প্রথম তিনটি খিলানসারির ('বে') পর অপর তিনটি সারি ক্রস ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত। এই সারির ছাদের উচ্চতা পূর্ববর্তী সারির ছাদ অপেক্ষা অধিক। গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে প্রতীয়মান হয় যে, সুসা মসজিদের লিওয়ানের বিভিন্ন সময়ে সংস্কার ও সংযোজন করা হয়। প্রথম তিনটি সারির উপর টানেল ভল্টের ব্যবহার শেষের তিনটি সারিতে না থাকায় অনেকে মনে করেন যে, পরবর্তীকালে এই ছাদ নির্মিত হয়। লিওয়ানের তৃতীয় এবং ষষ্ঠ সারিতে

মধ্যবর্তী যে আইল পরস্পরকে ছেদ করেছে সেস্থানে দুটি গম্বুজ স্থাপিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে কাঠ দিয়ে এই গম্বুজ দুটির তলদেশ আচ্ছাদিত করা হয়; কিন্তু বর্তমানে কাঠ সরিয়ে ফেলায় তা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। ক্রেসওয়েলের মতে, প্রথম তিনটি সারি ও তৃতীয় সারির মধ্যবর্তী গম্বুজ এবং গম্বুজের সামনের আসল মিহরাবটি সুসার জা'মি মসজিদের মূল উপকরণ, কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে দক্ষিণদিকে সম্প্রসারণের ফলে পরবর্তী তিনটি সারি সংযোজন করা হয়। মূল কিবলা-প্রাচীর ভেঙে সম্প্রসারিত হয় এবং মূল গম্বুজের অনুকরণে অপর একটি গম্বুজ নির্মিত হয়। এ প্রসঙ্গে কর্ডোভা মসজিদের উল্লেখ করা যায়। কিবলার সামনের গম্বুজটি স্কুইঞ্চ খিলান দ্বারা নির্মিত।

সুসা মসজিদের অর্ধগোলাকার অবতল মিহরাব দেখা যাবে। মিহরাবের ডাইনে একটি দরজা আছে এবং এই দরজা দিয়া একটি কুঠরীতে প্রবেশ করা যায়। ক্রেসওয়েল এই কুঠরীতে চাকাবিশিষ্ট একটি মিমবার দেখতে পান। এই মিমবারটি যদি মসজিদের সমসাময়িক হয় তবে কুঠরী যে মিমবার রাখার জন্য ব্যবহৃত হত তা সুষ্ঠুভাবে প্রতীয়মান হয়।

সুসার জা'মি মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি সুউচ্চ বুরুজ অতি সহজেই নজরে পড়ে। গোলাকার এই বুরুজটিতে প্রথমে একটি মঞ্চ সৃষ্টি করা হয় এবং এখান থেকে মুয়াজ্জীন আযান দিতেন। পরবর্তী পর্যায়ে এর উপর অষ্টভুজাকৃতি একটি প্যাভেলিয়ান নির্মিত হয়। গম্বুজবিশিষ্ট এই প্যাভেলিয়ানটির আট বাহুতে জানালা আছে। পূর্ব ও উত্তর রিওয়াকের ছাদ থেকে এই মিনারে যাওয়া যায়। উত্তর-পূর্ব কোণের মিনারের মতো দক্ষিণ-পূর্ব কোনোও একটি বুরুজ ছিল। অবশ্য এতে গম্বুজবিশিষ্ট কোনো প্যাভেলিয়ান নির্মিত হয়নি।

মসজিদের সাহানে রিওয়াককে ঘিরে কুফীরীতিতে উৎকীর্ণ একটি প্রশস্ত শিলালিপি অলঙ্করণের কাজ করছে। একসময় এই শিলালিপি রিওয়াক ছাড়াও লিওয়ানের দিকেও প্রসারিত ছিল। এই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, আমির আবুল আব্বাস ৮৫০ খ্রীস্টাব্দে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। আবুল আব্বাস আল-আগলাবের পুত্র ছিলেন।

৯। সামাররা, জা'মি মসজিদ, ৮৪৮-৫২ খ্রীঃ (চিত্র : ১৮-১৯)

আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাসিম ৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদ থেকে ষাট মাইল উত্তরে তাইগ্রিস নদীর পূর্বতীরে সামাররায় "সুররা মানরা" অর্থাৎ দর্শনে আনন্দদায়ক শহরেই স্থানান্তরিত করেন। আল-মুতাসিম নব-প্রতিষ্ঠিত রাজধানীতেও "জাওসাক আল-খাকানী" নামে একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। মুতাসিমের মৃত্যুর পর আল-ওয়াছিক খলিফার মর্যাদা লাভ করেন। ওয়াছিকের মৃত্যু হলে ৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে আল-মুতাওয়াক্কিল সামাররায় খিলাফতের মসনদে আরোহণ করেন। আরব ঐতিহাসিকগণ মুতাসিম কর্তৃক নির্মিত সামাররার জা'মি মসজিদের যে উল্লেখ করেন তা আবিষ্কৃত হয়নি। বর্তমানে সামাররায় যে বিশাল ভগ্নাবস্থায় মসজিদটি কালের স্বাক্ষর বহন করে রয়েছে তা মুতাসিমের পুত্র আল-মুতাওয়াক্কিল নির্মাণ করেন। এই মসজিদটির নির্মাণ শুরু হয় ৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে এবং সুসম্পন্ন হয় ৮৫২ খ্রীস্টাব্দে।

আর্নেস্ট কূহনেল বলেন, "আয়তনের দিক থেকে সে যুগে সব থেকে আকর্ষণীয় ছিল সামাররার মুতাওয়াক্কিলের বড় মসজিদ (৮৪৬-৫২ খ্রীঃ)। এই আয়াতাকার মসজিদটির দৈর্ঘ্য ছিল ২৬০ মিটার এবং প্রস্থ ছিল ১৮০ মিটার। এতে এক লক্ষ নামাযীর স্থানসঙ্কুলান হত। এর সমতল ছাদটিতে কোনো খিলান ছিল না। একটি চতুষ্কোণী
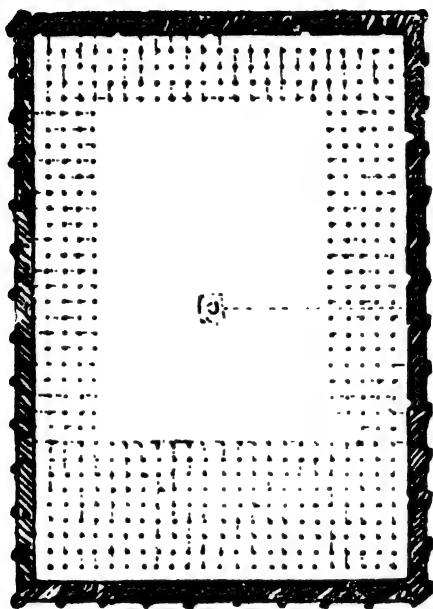
রেখাচিত্র : ৮৩
সামাররা, মসজিদ, ভূমি নক্‌শা

ভিতের উপর অষ্টকোণী পিয়ার, যার চারকোণায় ছোট মার্বেলপাথরের সংলগ্ন স্তম্ভ রয়েছে, দ্বারা সরাসরি এই মসজিদের ছাদ নির্মিত হয়। এর বহিঃপ্রচীর গোলাকার পোস্তার সাহায্যে সুদৃঢ় করা হয়। এগুলো আজও সেনাবাহিনীর ছাউনি মসজিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই প্রাচীরের বাইরের পৃথকভাবে নির্মিত হয়েছিল প্যাঁচানো আকৃতির মালবীয়া টাওয়ার, যার ঢালু প্যাঁচানো অংশটি ছিল বাইরের দিকে। ব্যাবিলনের সোপানযুক্ত স্তম্ভ (জিগুরাত) এবং চীনের তাং আমলের দালান থেকে এই

ধরনের স্তম্ভের উৎপত্তি হয়।”[১] ডেভিড টলবট রাইসের মতে, “From the archaeological point of view, Samarra is of the greatest significance, because it was inhabited for so brief a space of time from 838 until soonafter 883.”[২]

সামাররার জা'মি মসজিদ বিশ্বের সর্ববৃহৎ মসজিদ হিসাবে স্বীকৃত। স্থাপত্য ও অলঙ্করণের সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় সমাবেশে সৃষ্ট আব্বাসীয় স্থাপত্যের অনন্যসাধারণ কীর্তি সামাররার মসজিদের পরিমাপ হচ্ছে একটি বিশাল আয়তাকার এলাকা। মোট পরিমিতি ৪৫,৫০০ বর্গগজ অথবা চল্লিশ একরের কাছাকাছি। এই বিশালাকার মসজিদটি নির্মাণে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ দিরহাম খরচ হয় এবং কুহনেলের মতে, এখানে এক লক্ষের বেশি মুসল্লী একত্রে নামায আদায় করতে পারতেন। আগুনে পোড়া ইট দ্বারা বেষ্টনিপ্রাচীর মসজিদকে ঘিরে রেখেছে এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত এই ইমারতের পরিমাপ উত্তরে ৭৮৪ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৫১২ ফুট। অভ্যন্তরের পরিমাপ অনুযায়ী অনুপাত ৩ : ২। দুঃখের বিষয় যে, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এই মসজিদটি কালক্রমে একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। কেবলমাত্র মসজিদের প্রাচীর এবং মালবীয় টাওয়ারটি অক্ষত অবস্থায় কীর্তির স্বাক্ষর বহন করে রয়েছে। অভ্যন্তরে স্তম্ভশ্রেণী এবং ছাদ বহু আগেই বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমান ইরাক সরকার মসজিদটির সংস্কারসাধন করে নিয়মিতভাবে নামায আদায়ের সুব্যবস্থা করেছে।

মসজিদের প্রাচীর ৮ ৩/৪ ফুট চওড়া এবং লাল ইটের তৈরি। ইটের পরিমাপ ৯ ৩/৪ × ১০ ১/২ x ২ ৩/৪ ইঞ্চি। দেওয়াল ঘনঘন বুরুজ দ্বারা সুদৃঢ় করা হয়েছে। অর্ধগোলাকার বুরুজগুলোর ব্যাস ১১ ৩/৫ ফুট এবং দেওয়াল থেকে ৭ ফুট পর্যন্ত প্রসারিত। প্রতিটি বুরুজের দূরত্ব ৪৯ ১/৩ ফুট। সামাররার মসজিদের চারকোণায় চারটি কৌণিক বুরুজ রয়েছে; উত্তর ও দক্ষিণদিকে আটটি করে এবং পূর্ব ও পশ্চিমে বারোটি করে বুরুজ নির্মিত হয়েছে। ফলে সর্বমোট বুরুজের সংখ্যা দাঁড়ায় চৌচল্লিশটি। গোলাকার বুরুজগুলো আয়তাকার ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এগুলো দুই কিংবা তিনসারি ইট দ্বারা নির্মিত।

সামাররা মসজিদে প্রবেশের জন্য সর্বমোট ষোলোটি দরজা ছিল। উত্তরদিকের মাঝখান ব্যতীত অন্যান্য দিকের দরজার উপরের অংশ বহুদিন পূর্বেই ভেঙে গেছে। তবুও ক্রেসওয়েল পরীক্ষা করে মন্তব্য করেন যে, দরজার উপরে কাঠের বীম ছিল এবং বীমের উপরে চাপ লঘুকারী খিলান (Relieving arch) ব্যবহৃত হয়। প্রবেশ-তোরণগুলোর বিন্যাস আকর্ষণীয় : উত্তরদিকে তিনটি, দক্ষিণে দুটি, পূর্বে পাঁচটি এবং পশ্চিমে ছয়টি। দরজাগুলো একই আকৃতিতে স্থাপিত নয়।

বুরুজগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে ক্রেসওয়েল যথার্থই বলেন যে, এগুলো খুবই সাদামাঠা এবং প্রতি দুটি বুরুজের মধ্যবর্তী প্রাচীরের উপরের অংশে ছয়টি কুলুঙ্গী-

---

১। ইসলামী শিল্পকলা ও স্থাপত্য, অনুবাদ বুলবন ওসমান, এপ্রিল ১৯৭৮, ১৯৭৮, পৃ. ২৫।

২। Islamic Art, p. 36.

বিশিষ্ট চতুষ্কোণের একটি করে ফ্রিজ বা প্যানেল দেখা যাবে। উল্লেখ্য যে, এই ফ্রিজগুলো সৃষ্টির সময় চারপাশ কেটে গভীরতর করা হয়েছে। দক্ষিণদিকে ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়, এখানে ছয়টির পরিবর্তে পাঁচটি কুলুঙ্গী রয়েছে। প্রত্যেক চতুষ্কোণের অভ্যন্তরে একটি সসার (saucer) বা থালার মতো চ্যাপ্টা অংশ দেখা যাবে। এগুলো ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত গভীর। কোনো কোনো অংশে স্টাকোর অলঙ্করণের চিহ্ন খুবই স্পষ্ট। মসজিদ-প্রাচীরের উচ্চতা ৩৪ ১/২ ফুট। প্রাচীরের কোনো কোনো অংশে খাড়া ছিদ্র দেখা যাবে এবং এই ছিদ্রে পানি নিষ্কাষণের জন্য একধরনের নল (gutter pipe) গেঁথে দেওয়া হত। সমান্তরাল ছাদ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়।

মুতাওয়াক্কিলের মসজিদের দক্ষিণ প্রাচীরের উপরের অংশে চব্বিশটি জানালা আছে। দেওয়ালের উপরে যে প্যানেল রয়েছে, তার নিচে এগুলো অবস্থিত। লিওয়ানের পঁচিশটি আইলের উত্তর-দক্ষিণ প্রান্তের বরাবর এই জানালাগুলো স্থাপিত। মিহরাবের উপর জানালা না থাকায় সর্বমোট চব্বিশটি জানালা দেখা যাবে। লিওয়ানের পূর্ব ও পশ্চিমে আরও দুটি করে জানালা নির্মিত হওয়ায় সর্বমোট জানালার সংখ্যা দাঁড়ায় আটাশটি। বাইরের দিক থেকে এই সমস্ত জানালাকে শরনিক্ষেপের উপযুক্ত ছিদ্রের মতো আয়তাকার ক্ষুদ্র গবাক্ষ বলে মনে হবে। কিন্তু অভ্যন্তরে আয়াতাকার ফ্রেমের মধ্যে পাঁচটি খাঁজবিশিষ্ট শামুকাকৃতি খিলান দেখা যাবে (five-lobed, scalloped arch) এই খিলানের আকৃতির জানালা দুটি সংলগ্ন স্তম্ভ থেকে উত্থিত।

সামাররার মসজিদের অভ্যন্তরের লিওয়ানটি চব্বিশটি স্তম্ভসারি দ্বারা পঁচিশটি আইলে বিভক্ত। প্রত্যেকটি আইল ১৩ ৩/৪ ফুট প্রশস্ত ছিল এবং জানালার অক্ষরেখার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেবলমাত্র মধ্যের আইলটি পাশের আইলগুলোর চেয়ে সামান্য প্রশস্ত। লিওয়ানের ছাদ স্তম্ভের উপর সরাসরিভাবে ন্যস্ত ছিল এবং পার্শ্ববর্তী দেওয়ালে কোনো প্লাস্টার না থাকায় প্রতীয়মান হয় যে, কোনোপ্রকার খিলান ব্যবহার করা হয়নি। মূল নামাযগৃহের প্রতি সারিতে নয়টি করে মোট ৯ × ২৪ = ২১৬টি স্তম্ভ ছিল। কিবলা-প্রান্তের উল্টোদিকে অর্থাৎ উত্তরদিকে অনুরূপ চব্বিশটি স্তম্ভ ছিল কিন্তু এই রিওয়াকে নয়টির স্থলে প্রতি সারিতে মাত্র তিনটি স্তম্ভের ব্যবহার দেখা যায়। পূর্ব ও পশ্চিমে রিওয়াকের সৃষ্টি হয়েছে লিওয়ানের পাশের চারটির সারি সম্প্রসারিত করে। এই রিওয়াকেও চব্বিশটির স্থলে বাইশটি স্তম্ভের সারি ছিল। এভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে যে সমস্ত মসজিদটিতে সর্বমোট ৪৬৪টি স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছে। ৬ ১/২ বর্গফুট ভিতের উপর অষ্টভূজাকৃতি স্তম্ভদণ্ড (shaft) স্থাপিত হয়; ভিত ও দণ্ড ইটের তৈরি হলেও স্তম্ভের চারকোণায় ছোট সংলগ্ন গোলাকার স্তম্ভগুলো ছিল মার্বেলপাথরের। ছাদ উঁচু করার জন্য স্তম্ভগুলো অনেক লম্বা করে তৈরি করতে হয় এবং সংলগ্ন মার্বেলের ছোট স্তম্ভগুলো তিন খণ্ডের সংযোগে নির্মিত। খণ্ডগুলো ধাতুর গোঁজ ও সীসার সাহায্যে সংযুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, বিচ্ছিন্ন পাথরখণ্ড সংযোগ করার এই পদ্ধতি কুফা ও ওয়াসীতের মসজিদেও দেখা যায়। ইটের তৈরি স্তম্ভগুলো পলেস্তারা করা হয়। কিন্তু মার্বেলপাথরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে ইটের উপর মার্বেল রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। সমতল ছাদ এই স্তম্ভরাজি বহন করত। বর্তমানে ছাদ না থাকলেও পণ্ডিত ও গবেষকগণ মনে করেন যে, ভূমি থেকে ছাদের উচ্চতা ছিল ৩/৪ ফুট।

সামাররার জা'মি মসজিদের প্রধান মিহরাব কিবলা-প্রাচীরের মধ্যস্থলে স্থাপিত হয়। সিরিয়ার মসজিদে অর্ধগোলাকার মিহরাব দেখা যায় কিন্তু মেসোপটেমীয় মসজিদে আয়াতাকার মিহরাব বহুলপ্রচলিত। উখাইদিরের মসজিদের মিহরাবও ছিল আয়তাকার। অবশ্য অবতলাকৃতির কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। এই ধরনের মিহরাব
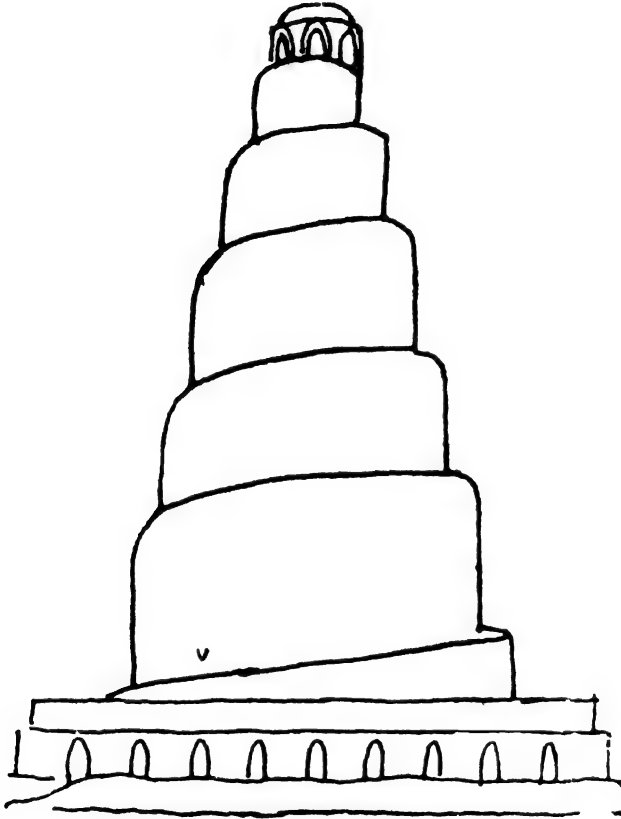
রেখাচিত্র : ৮৪
সামাররা, মসজিদ, মালবীয়া মিনার

ইতিপূর্বে ইরাক ও পারস্যের অনেক মসজিদে দেখা গেছে। মিহরাবটি ৮ ১/২ ফুট প্রশস্ত এবং ৫ ৩/৪ ফুট গভীর। কেন্দ্রীয় মিহরাবের দুই পাশে দুটি গোলাপী রঙের মার্বেল-পাথরের স্তম্ভ স্থাপিত হয়। এই পাথরের স্তম্ভের ভিত এবং শীর্ষদেশ (capital) খুবই আকর্ষণীয়। এই স্তম্ভ দুটি থেকে মিহরাবের উপরে দুটি খিলান নির্মিত হয়েছে এবং খিলানসমূহ একটি আযাতাকারের ফ্রেমের মধ্যে পরিবেষ্টিত ছিল। আয়তাকার ফ্রেমের উচ্চতা মসজিদের উচ্চতার সমান ছিল। ক্রেসওয়েল বলেন যে, খিলানের পাশে

(spandrel) সোনালী মোসাইকের নিদর্শন পাওয়া যায়। হারজফেল্ড খননকাজ পরিচালনা করে সামাররা মসজিদে ব্যবহৃত অসংখ্য গ্লাস মোসাইকের সন্ধান পান।

উযুর ব্যবস্থার জন্য মসজিদের চত্বরে একটি ফোয়ারা ছিল। এই জলধারটি 'কসর-ই ফিরাউন' নামে সমধিক পরিচিত। হারজফেল্ড খননকাজ পরিচালনা করে যে অবিন্যস্ত মার্বেল স্তম্ভের দণ্ড (shaft) দেখতে পান তা থেকে মনে হয় স্তম্ভের উপর নির্মিত ফোয়ারাটি ছাদ দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল। মূল মসজিদের বাইরে বিশেষ করে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমদিকে প্রাচীরবেষ্টিত জিয়াদা মসজিদটিকে মহিমামণ্ডিত করে। দক্ষিণদিকের প্রাচীর থেকে পূর্ব ও পশ্চিমে প্রাচীরের যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় তা থেকে জিয়াদার অবস্থান সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যায়। ক্রেসওয়েল মনে করেন যে, পরিবেষ্টিত প্রাচীরে কুলুঙ্গীর খিলান (blind arcade) উখাইদিরের 'কোর্ট অব অনার'-এর অনুরূপ অলঙ্করণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই প্রাচীরের বাইরে আর একটি প্রাচীর দ্বিতীয় জিয়াদার এলাকাকে ঘিরে রেখেছে। দ্বিতীয় প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, মসজিদের চারদিক পরিবেষ্টিত করে এই প্রাচীরটি ইমারতটিকে সর্ববৃহৎ মসজিদেই পরিণত করেনি বরং অপরূপ সৌন্দর্য এবং বিশালত্ব দান করেছে। ইটের তৈরি জিয়াদার প্রাচীরগুলো বহু পূর্বেই ধ্বংস হয়েছে। বাইরের বেষ্টনীর পরিমাপ ১,২৩০ × ১,৪৫৫ ফুট। যিয়াদার ব্যবহার ফুসতাতের আমরের মসজিদে এবং কায়রোর ইবনে তুলুনের মসজিদে দেখা যাবে। অলঙ্করণ প্রসঙ্গে রাইস বলেন, "The outer walls may have been decorated with mosaics, as tesserae were found in the course of excavations, but nothing survivies in situ."[১]

মুসলিম স্থাপত্যকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যমান কীর্তি আজও সামাররা মসজিদের উত্তরদিকে স্বীয় গৌরবে দণ্ডায়মান। স্থাপত্যকৌশলে ও অভিনবত্বে অতুলনীয় এই কীর্তিটি হচ্ছে মানারা আর-মালবীয়া। মিনার কথাটি সহজবোধ্য বিশেষ করে আযান দেওয়ার স্থান হিসাবে কিন্তু পূর্বে মালবীয়া অর্থাৎ প্যাঁচানো শব্দের ব্যবহার দেখা যায়নি। এই নামের মধ্যেই নিহিত আছে স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য। মুতাওয়াক্কিল সামাররার জা'মি মসজিদে যে মিনার নির্মাণ করেন তাই মানারা আল-মালবীয়া নামে পরিচিত। এই মিনারে প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এটি মূল মসজিদভবন থেকে অসংলগ্ন বা কিছু দূরে পৃথকভাবে নির্মিত। অবশ্য কসর আল-হাইর আস-শরকীর মসজিদে এ ধরনের চতুষ্কোণাকার অসংলগ্ন মিনার দেখা যাবে, তবে মালবীয়ার মতো সুউচ্চ স্থাপত্যরীতি ও কৌশলে পুষ্ট ও গোলাকার নয়। উত্তরদিকের দেওয়াল থেকে ৮৯ ফুট দূরে এই বিচ্ছিন্ন মিনারটি (detached minaret) ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। মসজিদের সঙ্গে মালবীয়া মিনারের সংযোগ স্থাপন করছে একটি সেতু (ridge)। সেতুটির দৈর্ঘ্য ৮২ ফুট, প্রস্থ ৩৯½ ফুট এবং উচ্চতা ১০ ফুট। মিনারটি একটি চতুষ্কোণাকার ভিতের উপর স্থাপিত। ভিতটি ১০৯ বর্গফুটের একটি বিস্তীর্ণ পাদপীঠ, এর উপর নির্মিত হয়েছে গোলাকার মিনারটি। ভিতের উচ্চতা ১০ ফুট থাকায় মিনারটির উচ্চতাও বৃদ্ধি

১। Rice, p. 35.

পেয়েছে। মিনারটির বেশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সাধারণ চতুষ্কোণাকার অথবা গোলাকার মিনারের পরিবর্তে এই মিনারটি প্যাঁচানো (spiral)। সেতুটির শেষপ্রান্ত থেকে একটি প্যাঁচানো পথ সমগ্র মিনারটি ঘিরে উপরের দিকে উঠে গেছে। বামদিকে পাঁচবার সম্পূর্ণভাবে প্যাঁচানো এই মিনারটি ব্যতিক্রমধর্মী স্থাপত্য-নিদর্শন। ইতিপূর্বে মুসলিম স্থাপত্যে এ ধরনের মিনার দেখা যায়নি। প্যাঁচানো পথটি ৭১/২ ফুট চওড়া এবং সর্বোচ্চ শিখরে একটি গোলাকার চূড়ায় মিশেছে। প্যাঁচানো পথ শেষ হয়েছে একটি দরজায়, যেখান থেকে মিনার আরও উপরে উঠে গেছে। দক্ষিণদিকে কুলুঙ্গীটি আসলে প্রবেশপথ এবং এখান থেকে প্রথমে খাড়া এবং পরে আর একটি প্যাঁচানো সিঁড়ির সাহায্যে মিনারের সর্বোচ্চ তলায় যাওয়া যায়। ভিত থেকে শীর্ষ পর্যন্ত মিনারটি ১৬৪ উচু। গোলাকার শীর্ষদেশের চারপাশে আটটি ছিদ্র রয়েছে। হারজফেল্ড মনে করেন যে, মিনারটির উপরে একটি প্যাভেলিয়ান ছিল এবং একটি আটটি কাঠের স্তম্ভের উপর নির্মিত হয়। আছ-ছা'লিবির বর্ণনা অনুযায়ী খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল একটি গাধার পিঠে চড়ে প্যাঁচানো সিঁড়ি দিয়ে মিশরের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতেন।

গুরুত্ব :

আল-মুতাওয়াক্কিল কর্তৃক নির্মিত সামাররার জা'মি মসজিদের স্থাপত্যিক গুরুত্ব অপরিসীম। আব্বাসীয় যুগের মসজিদ-স্থাপত্যে এই মসজিদের প্রভাব অনস্বীকার্য। আল-মুতাওয়াক্কিল তাঁর নির্মিত শহর আল-মাহুসায় (পরবর্তীকালে জা'ফারীয়া নামে পরিচিত) আবু দুলাফ নামে যে মসজিদ স্থাপন করেন, তাতে সামাররার জা'মি মসজিদের অনুকরণ সুস্পষ্ট। ভূমি-পরিকল্পনা, স্তম্ভের বিন্যাস, দেওয়ালে বুরুজের ব্যবহার, অধিকসংখ্যক দরজা, রিওয়াক, সাহান ছাড়াও মিনারনির্মাণে আবু দুলাফের স্থপতি সামাররার মালবীয়া মিনারকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। মালবীয়া মিনারে প্যাঁচানো সিঁড়ির উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষকগণের অভিমত হচ্ছে যে, এই স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য প্রাচ্যদেশীয় স্থাপত্যরীতির নিজস্ব প্রকাশ এবং ব্যবিলনীয় যিকুরাত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যিকুরাত অথবা টাওয়ার অব ব্যাবল পরপর ধাপবিশিষ্ট একটি বর্গাকার মন্দির। এ ধরনের ইমারতের বৃহত্তর বর্গাকার ভিতের উপর পরপর কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার চত্বর ক্রমশ উপরের দিকে উঠে গিয়ে যেখানে শীর্ষে পৌছেছে সেখানে পিরামিডের আকারে একটি মন্দির নির্মিত হয়। খোরসাবাদের যিকুরাতটি বহুতলাবিশিষ্ট ও ধাপে ধাপে সিঁড়িসম্বলিত একটি মন্দির। প্লেস তিনতলাবিশিষ্ট ইমারত দেখতে পান; ৪র্থ তলা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় বহু পূর্বে। সুমেরীয় ও ব্যবিলনীয় সভ্যতায় যিকুরাত বিশেষ অবদান রেখেছে।[১] হেরোড়টাস উল্লেখ করেন যে, ব্যবিলনের বেবেল মন্দিরের যিকুরাত নির্মিত হয় এবং এটি সাততলাবিশিষ্ট ছিল। ক্রেসওয়েলের মতে, মেসোপটেমিয়ায় নির্মিত প্রাক্-মুসলিম যুগের ধাপবিশিষ্ট যিকুরাতের অনুকরণে মালবীয়া মিনার স্থাপন করা হয়।[২] কেবলমাত্র প্রভেদ ছিল এই যে, প্রাচীন যিকুরাতের চারিধারে চতুষ্কোণাকার

১। Mellresh, H.E.L., Archaeology, 1966. p. 105.

২। A Short Account, p 279.

সিঁড়ি ছিল এবং মালবীয়া মিনারে ছিল গোলাকার প্যাঁচানো সিঁড়ি। সামাররার মিনার পরবর্তীকালে আবু দালাফের মসজিদের মিনারের নির্মাণে প্রভাব বিস্তার করে। এ ছাড়া বাগদাদে কুব্বাত আল-হীমার নামে আল-মুকতাফী যে মিনার স্থাপন করেন তাও সামাররার আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত। লক্ষণীয় যে প্যাঁচানো পদ্ধতিতে মিনারের সিঁড়ি নির্মাণের যে প্রচলন মেসোপটেমিয়ায় দেখা যায় তা সুদূর কায়রোতে নির্মিত ইবনে তুলুনের মসজিদের মিনারের একটি অংশেও প্রতিভাত।[১]

১০। সামাররা, বালকুওয়ারা প্রাসাদ, মসজিদ, ৮৪৯–৫৯ খ্রীঃ

আল-মুতাওয়াক্কিল তাঁর রাজত্বকালে অনেকগুলো প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এসমস্ত অতুলনীয় স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শনসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বালকুওয়ারা প্রাসাদ, কসর আল-আশিক এবং জা'ফারীরয়া। সামাররার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বালকুওয়ারা প্রাসাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু খনন এবং অনুসন্ধানের ফলে এই প্রাসাদের ভূমি পরিকল্পনা ও স্থাপত্য উপকরণ ও বিন্যাস সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

বিশাল এলাকা জুড়ে বালকুওয়ারা প্রাসাদটির সামনে ও পিছনে রয়েছে মনোরম উদ্যান। মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। এই প্রাসাদে অসংখ্য কুঠরী, উদ্যান ও বিভিন্ন ধরনের ইমারত নির্মিত হয়। মূল প্রাসাদে মধ্যবর্তী অংশে একটি জলাধার দেখা যাবে। এই সমস্ত ইমারতের মধ্যে বিশেষ করে দুটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চাৎ অঙ্গনের ডানদিকে একটি এবং অপরটি বামে রয়েছে। ডানদিকের মসজিদটির লিওয়ান তিনটি আইলে বিভক্ত এবং আগুনে পোড়া ইটের তৈরি। মসজিদটির পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ৪৯১/২ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১১৫১/২ ফুট। দুটি স্তম্ভসারি মসজিদটিকে তিনটি আইলে বিভক্ত করেছে এবং প্রতি স্তম্ভ সেগুনকাঠের বা মার্বেলপাথর দিয়ে তৈরি ছিল বলে হারজফেল্ড মনে করেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত এই মসজিদের মিহরাবের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না তবে অপরাপর প্রাসাদ-মসজিদের মতো এখানেও মিহরাব ও মিমবার ছিল। বামদিকের মসজিদটি ডানদিকের মসজিদ অপেক্ষা অধিক সংরক্ষিত। রৌদ্রে পোড়া ইট দিয়ে নির্মিত এবং ক্ষুদ্রাকার মসজিদটির পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ২৫১/২ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩৪১/৪ ফুট। এই মসজিদে প্রবেশের জন্য উত্তরদিকে তিনটি দরজা আছে। একটি অবতলাকার মিহরাব কিবলার দিকে স্থাপিত।

১১। সামাররা, জা'ফারীয়া, আবু দুলাফের মসজিদ, ৮৫৯–৬১ খ্রীঃ

সামাররার জা'মি মসজিদ নির্মাণের পর খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল সামাররার উত্তরে আল-মাহুসা নামক স্থানে আর একটি নূতন শহর নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। ৮৫৯-৬০ সালে নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ৮৬১ সালে নির্মাণ সম্পন্ন হলে তিনি এই নূতন শহরে বসবাস আরম্ভ করেন। এই শহরটির নামকরণ হয় আল-জাফারীয়া। আল-মুতাওয়াক্কিল এই শহরে আবু দুলাফের মসজিদ স্থাপন করেন।

১। Mandel, G., How to recognize Islamic Art, Milan, 1979, p 16

সামাররার জা'মি মসজিদ এবং জা'ফারীয়ার আবু দুলাফের মসজিদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। উভয় মসজিদের নির্মাতা একই ব্যক্তি খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল। সামাররা মসজিদ আবু দুলাফের পূর্বসূরী হলেও এ দুটি ইমারতের বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। সামাররা মসজিদের বহিঃপ্রাচীরের নিদর্শন এখনও দেখা যায়, কিন্তু আবু দুলাফের মসজিদের বহিঃপ্রাচীর বহু পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত। সামাররা মসজিদের অভ্যন্তরীণ স্তম্ভরাজি ও অংশসমূহ বহু পূর্বেই বিলীন হয়ে গেছে, কিন্তু আবু দুলাফের মসজিদের অভ্যন্তরের খিলানগুলোর চিহ্ন এখনও দেখা যাবে। আবু দুলাফের মসজিদের উত্তরদিকের দেওয়ালের অংশ ভগ্নাবস্থায় রক্ষিত আছে। এই দেওয়ালের উচ্চতা বর্তমানে ১৬১/২ থেকে ২৩ ফুট। ধ্বংসপ্রাপ্ত দেওয়ালের মূল কারণ এই যে, আবু দালাফের বহির্প্রাচীর রোদৌ পোড়া ইট দিয়ে তৈরি ছিল কিন্তু সামাররা মসজিদের দেওয়াল আগুনে পোড়া ইট দিয়ে নির্মিত ছিল। ইয়াকুবী বলেন যে, আল-মুতাওয়াক্কিল আল-জাফারীয়ায় নয় মাস বসবাস করেন এবং ৮৬১ সালে এই প্রাসাদে নিহত হলে তাঁর উত্তরাধিকারী মোহম্মদ আল-মুনতাসির জা'ফারীয়া ত্যাগ করে সামাররায় চলে যান। তিনি সমস্ত বাসিন্দাকে জা'ফারীয়া থেকে সামাররায় চলে যাবার আদেশ দেন এবং বিদ্যমান ইমারতসমূহ ভেঙে মালমশলা সামাররায় স্থানান্তরের নির্দেশ দেন। এর ফলে নবনির্মিত আবু দুলাফের মসজিদটির কাজ স্থগিত থেকে যায় এবং নির্মাতা আল-মুতাওয়াক্কিলের আকস্মিক মৃত্যুতে এই মসজিদ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

সামাররা মসজিদের অনুকরণে নির্মিত হলেও আবু দুলাফের মসজিদ আয়তনে ছোট; অভ্যন্তরীণ পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ৬৯৯ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৪৪৩ ফুট। চিরাচরিত সাহান ও রিওয়াকসম্বলিত ভূমি-নক্‌শা এই মসজিদে বিদ্যমান। সাহানের পরিমাপ ৬১১ × ৩৪০ ফুট এবং দক্ষিণদিক ছাড়া অপর তিন দিকেই রিওয়াক রয়েছে। রিওয়াক ও লিওয়ানের স্তম্ভগুলো সামাররা মসজিদের মতো উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে প্রলম্বিত। বহির্প্রাচীর সামাররার মতো অর্ধগোলাকার বুরুজ দ্বারা সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু আগুনে পোড়া ইটের স্থলে রৌদ্রে পোড়া ইট ব্যবহৃত হওয়ায় কেবলমাত্র উত্তরদিকের প্রাচীর ছাড়া অপর তিন দিকের দেওয়াল বহু পূর্বেই ভেঙে গেছে। উত্তর দিকের বিদ্যমান প্রাচীর ৫১/৪ ফুট মোটা থাকায় প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদটির বেষ্টনী-দেওয়াল বেশ মজবুত করে নির্মাণ করা হয় কিন্তু উপাদানের ভঙ্গুরতার জন্য মসজিদের বহু অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত। সামাররার বুরুজের ন্যায় আবু দুলাফের বুরুজ ১০ ফুট ব্যাস এবং দেওয়াল থেকে ৪ ফুট উদ্‌গত। বুরুজগুলো রোদ্রে পোড়া ইটের তৈরি হলেও রাক্কার অনুরূপ আগুনে পোড়া ইট দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল। দেওয়াল পলেস্তারা করা ছিল। ক্রেসওয়েলের মতে, আবু দুলাফের মসজিদের চার কোণায় চারটি, পূর্ব ও পশ্চিমদিকে এগরোটি, উত্তর দেওয়ালে আটটি এবং দক্ষিণদিকে সম্ভবতঃ চারটি বুরুজ নির্মিত হয়। সর্বসাকুল্যে বুরুজের সংখ্যা দাঁড়ায় আটত্রিশটিতে। এক-একটি বুরুজের মধ্যবর্তী দেওয়াল (curtain wall) ৪৬ ফুট দীর্ঘ। সামাররা মসজিদের বেষ্টনী-প্রাচীরে পানি নিষ্কাশনের জন্য যেমন নল ব্যবহৃত হয় আবু দুলাফ মসজিদেও অনুরূপ উপকরণ দেখা যাবে। নল স্থাপনের ছিদ্রগুলো এখন সুস্পষ্ট ও দৃশ্যমান এবং ৮ ইঞ্চি গভীর ও ৭ ইঞ্চি প্রশস্ত।

আবু দুলাফ মসজিদে প্রবেশের জন্য সর্বমোট পনেরোটি দরজা ছিল। বুরুজের মধ্যবর্তী দেওয়ালে নির্মিত এই সমস্ত দরজাগুলোতে আগুনে পোড়া ইটের ব্যবহার দেখা যাবে। উত্তরদিকে তিনটি, পূর্ব ও পশ্চিমে ছয়টি করে মোট পনেরোটি প্রবেশপথ রিওয়াকের খিলানের আক্ষিক প্রান্তে নির্মিত হয় এবং পূর্ব ও পশ্চিমের দরজাগুলো সমান্তরাল প্রান্তে অবস্থিত ছিল। সামাররা মসজিদের মতো এই মসজিদেও যিয়াদা ইমারতকে বিশালত্ব দিয়েছে এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। উভয় মসজিদেই পরপর দুটি যিয়াদা দেখা যাবে। সারে এবং হারজফেল্ডের প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আবু দুলাফ মসজিদের অনেক তথ্য জানা যায়। মসজিদের বাহির অঙ্গনকে যে বিশাল এলাকা বেষ্টিত করে রেখেছে তার পরিমাপ ১,১৫০ × ১,১১৭ ১/২ ফুট।

আবু দুলাফ মসজিদের দক্ষিণে লিওয়ান অবস্থিত। সামাররা মসজিদের মতো খিলানরাজি লম্বালম্বিভাবে লিওয়ানটিকে বিভক্ত করেছে। ষোলোটি খিলানরাজি নামাজগাহকে সতেরোটি আইলে বিভক্ত করেছে। প্রতিটি খিলানরাজিতে পাঁচটি খিলান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সামাররা মসজিদে কোনো খিলান ছিল না, ছাদ সরাসরি স্তম্ভের উপর ন্যস্ত ছিল। খিলানসারিগুলোর মধ্যে ১০ ১/৪ ফুট প্রশস্ত আইল নির্মিত হয়, কিন্তু মধ্যবর্তী আইলটি পার্শ্ববর্তী আইলসমূহ অপেক্ষা ঈষৎ চওড়া ছিল। লিওয়ানে স্তম্ভরাজির বিন্যাস আবু দুলাফের মসজিদে সামাররা মসজিদের তুলনায় বৈপরিত্য লক্ষ করা যায়। সামাররায় লম্বালম্বিভাবে স্তম্ভগুলো কিবলা-প্রাচীর পর্যন্ত প্রসারিত; কিন্ত আবু দুলাফের স্তম্ভসারি কিবলাপ্রান্ত পর্যন্ত না গিয়ে T-আকৃতির পিয়ার পর্যন্ত গিয়েছে। এই T-আকৃতির পিয়ার থেকে সতেরোটি সমান্তরাল খিলান নির্মিত হয়। এই সমান্তরাল খিলান্সারি কিবলা-প্রাচীর থেকে ৩৪ ১/৪ ফুট দূরত্ব বজায় রেখেছে। কিবলা-প্রাচীর এবং T-আকৃতির পিয়ারের উপর থেকে উত্থিত সমান্তরাল খিলানরাজির মধ্যবর্তী স্থানের একটি সমান্তরাল খিলানসারি দেখা যাবে। এই খিলানসারি আয়তাকার পিয়ার থেকে উঠে গেছে অথচ লিওয়ানের পিয়ারগুলো বর্গাকৃতি। আড়াআড়ি এই খিলানশ্রেণী খুবই অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রতীয়মান হয় পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে।

দক্ষিণদিকে T-আকৃতির পিয়ার থেকে বারোটি স্তম্ভশ্রেণী উত্তরে সাহানের সম্মুখের দিকে, আর একসারি T-আকৃতির পিয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরদিকের খিলানসারিতে মোট তেরোটি সমান্তরাল খিলান রয়েছে। এই খিরানসারি সাহানের উত্তরদিকের সম্মুখভাবে (facade) হিসাবে চিহ্নিত। মধ্যবর্তী খিলানগুলোর পরিমাপ ১৩ ৩/৪ ফুট; স্বভাবত মধ্যবর্তী আইল সামান্য বড় থাকায় খিলানের বিস্তৃতি ১৭ ফুট। সমান্তরাল খিলানরাজিসহ লিওয়ানের গভীরতা ৯৬ ফুট। এর সঙ্গে কেবলার সম্মুখের স্থানটি যোগ করলে সমগ্র নামাযগাহের গভীরতা দাঁড়াবে ১৩০ ফুটে। ক্রেসওয়েল বলেন যে, কিবলার সম্মুখের আইলটি ১২ ১/২ × ৫ ফুট পরিমাপের আয়তাকার পিয়ার দ্বাব দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল, এক-একটি অংশ ১৪ ফুট প্রশস্ত।

লিওয়ানের দুই পাশে দুটি লম্বালম্বি খিলানশ্রেণী উত্তরদিকের মসজিদের প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর ফলে পূর্ব ও পশ্চিমদিকে ৪৬ ফুট গভীরতাবিশিষ্ট দুই আইলের রিওয়াকের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি সারিতে আঠারো ফুট আয়তাকার পিয়ারের উপর উনিশটি

খিলান নির্মিত হয়। প্রতিটি খিলানের মধ্যে দূরত্ব ছিল ১৩^{১}/২ ফুট এবং এই দূরত্ব লিওয়ানের খিলানের মধ্যে দূরত্বের সমতুল্য। পূর্ব ও পশ্চিমদিকের আয়তাকার পিয়ারের পরিমাপ ১৩^{১}/৪ x ৫^{১}/৪ ফুট। উল্লেখ্য যে, লিওয়ান এবং উত্তরদিকের পিয়ারগুলো প্রায় বর্গাকার; ৭ × ৫^{১}/২ ফুট এবং ৭^{১}/৪ × ৫ ফুট কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমদিকের রিওয়াকের অভ্যন্তরের পিয়ারগুলো আয়তাকার ছিল। পিয়ারগুলো আগুনে পোড়া ইট দিয়ে নির্মিত হয়।

উত্তরদিকের রিওয়াক ব্যতিক্রমধর্মী। দক্ষিণ অর্থাৎ কিবলাপ্রান্তের মতো এখানেও সাহানের সম্মুখে T-আকৃতির পিয়ার দেখা যাবে এবং ষোলোটি খিলানশ্রেণী ছিল। কিন্তু লিওয়ানের সারিতে পাঁচটি খিলান ছিল এবং উত্তর রিওয়াকের প্রতি সারিতে তিনটি খিলান রয়েছে। লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত এই খিলানসারিগুলোর মধ্যে দূরত্ব ছিল ১০^{১}/৪ ফুট এবং এগুলো উত্তর প্রাচীরে মিশে গেছে। লক্ষণীয় যে, উত্তর রিওয়াকের মধ্যবর্তী আইল এবং রিওয়াকের মধ্যবর্তী আইলের প্রশস্ততা সমান, অর্থাৎ ২৪ ফুট এবং অন্যান্য আইলগুলো ২০ ফুট চওড়া। ক্রেসওয়েলের মতে, সামাররা মসজিদের তুলনায় আবু দুলাফ মসজিদের ইটের গুণগত মান ছিল খুব নিম্ন এবং আবু দুলাফে ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ১০ থেকে ১১^{১}/২ বর্গইঞ্চির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ৩ ইঞ্চি মোটা ছিল। সামাররা মসজিদের মতো আবু দুলাফ মসজিদের ছাদ সমান্তরাল ছিল এবং ২৬^{১}/৪ ফুটের বেশি উঁচু ছিল না।

আবু দুলাফ মসজিদের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ক্ষুদ্রাকৃতি মালবীয়া মিনার। সামাররা মসজিদের মানারা আল-মালবীয়া অর্থাৎ প্যাঁচানো মিনারের অনুকরণে নির্মিত আবু দুলাফ মসজিদের মিনারটি এখনও মুতাওয়াক্কিলের স্থাপত্যকীর্তির গৌরব বহন করে রয়েছে। সামাররার মতো মিনারটি উত্তরদিকে এবং উত্তর রিওয়াক থেকে বেশ দূরে অসংলগ্নভাবে তৈরি করা হয়। উত্তর-দক্ষিণ অক্ষরেখায় উত্তর যিয়াদায় অবস্থিত এই মিনারটি ৩১^{১}/৩ ফুট দূরে নির্মিত হয়। ৮^{১}/৪ ফুট উঁচু এবং ৩৬^{৩}/৪ বর্গফুটের পরিমাপ একটি মজবুত ইটের তৈরি ভিতের উপর এই মিনারটি স্থাপিত। এই ভিতটি চারপাশে, বিশেষ করে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমে তেরটি কিংবা চৌদ্দটি ক্ষুদ্রাকার কুলুঙ্গী দ্বারা অলঙ্কৃত। দক্ষিণদিকে মসজিদের সঙ্গে সেতুর সংযোগ থাকায় মাত্র দশটি কুলুঙ্গী দেখা যাবে। এই ভিতের মাঝ থেকে মিনারটি ৫২^{১}/২ ফুট পর্যন্ত উপরের দিকে উঠে গেছে। দক্ষিণদিক থেকে প্যাঁচানো সিঁড়ি তিনবার সম্পূর্ণরূপে ঘুরে শীর্ষদেশে পৌঁছেছে। সামাররার মালবীয়া মিনারের অনুরূপ এখানে বাম দিকে প্যাঁচানো ৩^{৩}/৪ ফুট প্রশস্ত সিঁড়ি নির্মিত হয়। শীর্ষদেশ ভগ্নপ্রাপ্ত হওয়ায় কোনো প্যাভেলিয়ান ছিল কি না বলা যায় না, তবে সামাররার মসজিদের মিনারের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, এখানেও অনুরূপ একটি প্যাভেলিয়ন ছিল। আযানের জন্য মূলত ব্যবহৃত হলেও বিশালত্ব, সৌন্দর্য ও স্থাপত্যিক সৌকর্যের বিচারে আবু দুলাফের মিনারটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়।

আবু দুলাফ মসজিদে স্থাপিত মিহরাবটি বিশেষভাবে ব্যতিক্রমধর্মী; সাধারণ আয়তাকার অথবা অর্ধগোলাকার অবতল মিহরাব এ মসজিদের কিবলাদিককে চিহ্নিত

করছে না। Papadopoulo বলেন, "The mihrab made up of a series of recessed surrounds and molding has been in part restored"।[১] আবু দুলাফের মসজিদে অলঙ্করণ কি ধরনের ছিল তা ঠিকভাবে বলা যায় না কারণ ইমারতটি তার পূর্বগৌরবের একটি ছায়ামাত্র। তবুও ভগ্নাবশেষ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পিয়ারগুলো পলেস্টার করা ছিল এবং সাহানের সম্মুখে পিয়ারগুলোর উপরে খিলানের দুই পাশে খাঁজকাটা প্যানেল ছিল। এই প্যানেলের মধ্যভাগে ছোট খিলানাকৃতি কুলুঙ্গী খোদিত হয় এবং এর চারপাশে তিনসারি ইটের স্তর দেখা যাবে। খিলানগুলোর নির্মাণকৌশলও ছিল খুবই আকর্ষণীয়। দুইটি সারি বর্গাকার ইটের ব্যবহারে খিলান তৈরি হয়েছে। রাক্কার বাগদাদ ফটকের মতো এই দুই সারি খিলানের প্রথম সারিতে ইটগুলোকে সামনের দিকে মুখ করে স্থাপন করা হয় এবং দ্বিতীয় সারিতে কিনারাগুলো গেঁথে দেওয়া হয়।[২]

আবু দুলাফ মসজিদ প্রসঙ্গে কূহনেল বলেন, "সামাররার এ ধরনের (জা'মি মসজিদের মতো) দ্বিতীয় মসজিদটি হচ্ছে আবু দুলাফ; এটি তেমন ভালভাবে সংরক্ষিত হয়নি। আয়তনে ক্ষুদ্রতর এই মসজিদের স্তম্ভটি একই ধরনের। ভূমি-পরিকল্পনার মধ্যেও একটি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বিরাজমান। তবে এর ছাদ নির্মিত হয়েছে সূক্ষ্মাগ্র খিলানের
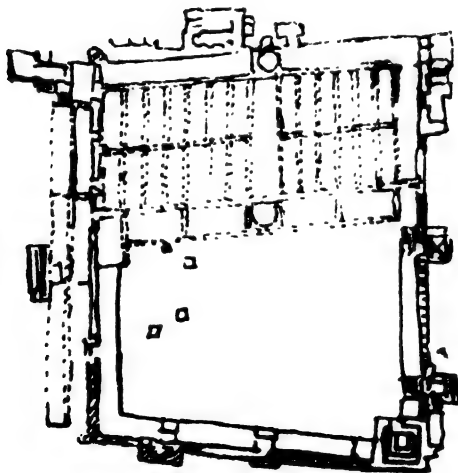
রেখাচিত্র : ৮৫
তিউনিস, জা'মি মসজিদ, ভূমি নক্শা

১। Ibid, p. 491.
২। ইসলামী শিল্পকলা ও স্থাপত্য, পৃ. ২৫

ওপর। এগুলোর ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম এই যে, খিলানগুলোর কিবলা দেওয়ালের সঙ্গে লম্বালম্বিভাবে নির্মিত। খোদ বাগদাদ শহরেও অনুরূপ কোনো মসজিদ ছিল বলে আমার জানা নেই।" Papadopoulo খিলানের আকৃতি সম্পর্কে বলেন, "The arches do not have the Persian profile of those in the earlier Mosques but are, instead pointed and stilted and rest on massive rectangular pillars."[১] এখানে তিনি রাক্কার চতুর্বলয় থেকে নির্মিত খিলান (four-centred arch)-এর সঙ্গে আবু দুলাফ মসজিদের দ্বি-বলয়ে নির্মিত খিলানের প্রভেদ দেখিয়েছেন। অলঙ্করণে স্টাকোর ব্যবহার খুব বিচিত্র নয়, তবে সামাররার প্রাসাদসমূহে ও মসজিদে এর বহুল ব্যবহার পরবর্তীকালে পারস্যের মুসলিম স্থাপত্যের অলঙ্করণ-রীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১২। তিউনিস, জা'মি মসজিদ, ৮৬৪-৬৫ খ্রীঃ। (চিত্র : ২০-২২)

আরব ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী ৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে হাসান ইবনে আল-নু'মান তিউনিস জয় করে সেখানে একটি জা'মি মসজিদ নির্মাণ করেন। কিন্তু প্রাচীনতম মসজিদকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করে নূতন আঙ্গিকে যে মসজিদ উবায়দু'ল্লাহ ইবনু'ল হাবভাব প্রতিষ্ঠা করেন ৭৩৩ খ্রীস্টাব্দে, তা বর্তমানে 'আযযাইতুনা' নামে পরিচিত। আগলাভী বংশ প্রতিষ্ঠার পর সুলতানগণ স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। যিয়াদাতু'ল্লাহ, আবু ইবরাহীম আহমদ এবং দ্বিতীয় যিয়াদাতু'ল্লাহ তিউনিস মসজিদের সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন নবম শতাব্দীতে। আব্বাসীয় খলিফা আহম্মদ আল-মুসতাঈন বিল্লাহ এই সংস্কারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন, এমনকি তিনি তাঁর স্থপতি নুসাইরকে তিউনিস মসজিদ পুনর্নির্মাণের জন্য প্রেরণ করেন। অবশ্য ফাতেহ নামে অপর এক কারিগরের নাম শিলালিপি থেকে জানা যায়।

মসজিদ-স্থাপত্যের আদর্শ সাহানবিশিষ্ট আয়তাকার ভূমি-পরিকল্পনায় নির্মিত তিউনিসের জা'মি মসজিদ আব্বাসীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি। অবশ্য আব্বাসীয় রাজত্বে আগলাভী নামে উত্তর আফ্রিকায় একটি ক্ষুদ্র অনুগত রাজ্যের সুলতানদের অবদান এই মসজিদকে অনুপম সৌন্দর্য দিয়েছে। কায়রোয়ান মসজিদের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ করা যাবে এই মসজিদের। এর পরিমিতি উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত, কারণ মক্কা শরীফের পবিত্র কা'বাগৃহের সঙ্গে কিবলা নির্ধারণের জন্য ভৌগোলিক অবস্থানের নিমিত্ত মসজিদটির ভূমি-পরিকল্পনা তেরচা হয়েছে। লিওয়ানের পরিমাপ ১৭৭ ফুট প্রশস্ত এবং ৮৫ ফুট গভীর। কায়রোয়ান মসজিদের মতো লিওয়ানটি কতকগুলো খিলানরাজি দ্বারা লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত। অবশ্য খিলানগুলো কিবলা-প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। আবু দুলাফের মসজিদ ও কায়রোয়ান মসজিদে কিবলা-প্রাচীর এবং খিলানরাজিব মধ্যে যেমন একটি দীর্ঘ আইল বিদ্যমান অনুরূপ উপাদান তিউনিসের মসজিদে দেখা যাবে।

১। Papadopoulo, p 492

সর্বমোট চৌদ্দটি খিলানসারি দ্বারা লিওয়ানটি পনোরোটি আইলে বিভক্ত ও মধ্যবর্তী আইলটি পার্শ্ববর্তী আইলগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড়। ১৩ ফুট প্রশস্ত কিবলামুখী সমান্তরাল আইলের সঙ্গে মধ্যবর্তী আইল বা নেভের সংযোগ দেখে মনে হয় T-আকৃতিতে নামাজগাহ নির্মিত। প্রত্যেকটি খিলানসারিতে মোট ছয়টি খিলান আছে। এই মসজিদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, প্রথম তিনটি লম্বালম্বি খিলানের পর একটি সমান্তরাল খিলানরাজি আড়াআড়িভাবে লিওয়ানটিকে ভাগ করেছে। খিলানগুলো মার্বেলপাথরের স্তম্ভের উপর নির্মিত এবং অশ্বনালাকৃতি। কুব্বাতু'স সাখরায় যেমন স্তম্ভের শীর্ষদেশে impost বা শীর্ষাধার ব্যবহৃত হয়েছে, অনুরূপভাবে করিন্থীয় ক্যাপিটালের উপর পাথরের খণ্ড দেখা যাবে। এর উদ্দেশ্য ছিল ছাদের উচ্চতা বৃদ্ধি করা এবং খিলানশ্রেণীকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া। মধ্যবর্তী আইলের স্তম্ভগুলো লাল রঙের মার্বেল পাথরে তৈরি।

তিউনিসের মসজিদের মিহরাব কিবলা-প্রাচীরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। অর্ধগোলাকার ও অবতলাকার মিহরাবটির দুই পাশে একজোড়া মার্বেলের স্তম্ভের উপর থেকে একটি অশ্বনালাকৃতি খিলান নির্মিত হয়েছে। কুলুঙ্গী বিশেষভাবে আকর্ষণীয় কারণ উপরের দিকে অর্ধ-গম্বুজাকারে (half-dome) ফ্রেমের মতো রয়েছে। মিহরাবের সামনে চারটি স্তম্ভ থেকে চারটি খিলান আড়াআড়ি এবং লম্বালম্বিভাবে নির্মাণ করা হয় : কিবলা-প্রাচীরের সংলগ্ন দুটি স্তম্ভ এবং দুটি অসংলগ্ন স্তম্ভ (free standing)। চারটি খিলানের সাহায্যে গম্বুজ তৈরি করা হয়। চতুষ্কোণ থেকে গোলাকার এলাকায় পৌঁছতে স্কুইঞ্চ খিলানের ব্যবহার করতে হয়। মিহরাবের সম্মুখের গম্বুজটি খাঁজকাটা। এ ধরনের গম্বুজ কুব্বাতু'স সাখরা এবং কায়রোয়ান মসজিদে দেখা যাবে। গম্বুজটি একটি গোলাকার ড্রামের উপর স্থাপিত এবং ড্রামের চারিপাশে আটটি জানালা রয়েছে। জানালাগুলো অশ্বনালাকৃতি খিলানের ফ্রেমে আবৃত এবং মাথায় ঝিনুকাকৃতিতে অর্ধগম্বুজ রয়েছে।

কায়রোয়ান মসজিদের মতো তিউনিসের মসজিদে সাহানের তিনদিকে কোনো রিওয়াক নেই। ধারণা করা হয় যে, রিওয়াক পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়। সাহানের সম্মুখেও একটি গম্বুজ নির্মিত হয় এবং গম্বুজে প্রোথিত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এই গম্বুজটি ৯১৩ কিংবা ১০০১ সালে স্থাপিত হয়। এই মসজিদের প্রবেশপথের সংখ্যা তেরোটি। উত্তর-পূর্বদিকে পাঁচটি, দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে তিনটি, উত্তর-পশ্চিমদিকে তিনটি এবং দক্ষিণ-পূর্বদিকে দুটি প্রবেশপথ সংযোজিত হয়। প্রবেশপথগুলো বিভিন্ন সময়ে নির্মিত হয়। অতি আধুনিককালে ১৮৯৫ সালে কায়রোয়ানের মসজিদে নির্মিত মিনারের অনুকরণে একটি মিনার স্থাপিত হয়। এই মিনারটি মসজিদের পশ্চিম কোণায় অবস্থিত।

তিউনিসের মসজিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, স্থাপত্যিক ও আলঙ্কারিক দিক থেকে এই ইমারতে সিরীয় ও মেসোপটেমীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ দেখা যাবে। কায়রোয়ান ও সুসা মসজিদের প্রভাব ছাড়াও অপর যে স্থাপত্যের ধারা লক্ষ করা যায়, তা হচ্ছে স্প্যানিশ। স্পেনের কর্ডোভা মসজিদের প্রভাবে খিলানগুলো অশ্বনালাকৃতি।

উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে মুসলিম স্থাপত্যের যে ধারা প্রবর্তিত হয়, তা 'মাগরেবী' নামে পরিচিত।

১৩। কায়রোয়ান, তিন দরওয়াজা মসজিদ, ৮৬৬ খ্রীঃ। (চিত্র-২৩)

কায়রোয়ান শহরের দক্ষিণ ফটক এবং জা'মি মসজিদের মধ্যবর্তী স্থলে একটি ছোট তিন দরজাবিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদটির প্রাচীনতম অংশ হচ্ছে সামনের দিকে এবং এইদিকে তিনটি অশ্বনালাকৃতি খিলান-দরজা থাকায় সাধারণভাবে এটি তিন দরওয়াজাবিশিষ্ট মসজিদ নামে পরিচিত। সামনের দিকে প্রাচীরের উচ্চতা ২২১/২ ফুট; এই মসজিদে কোনো সাহান ছিল না। প্রধান আকর্ষণই হচ্ছে খিলান তিনটি। চারটি সংলগ্ন স্তম্ভের (attached column) উপর একখণ্ড পাথর (impost) স্থাপন করা হয় এবং এই পাথরের উপর থেকে তিনটি খিলান নির্মাণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, লম্বা এবং সরু পাথরখণ্ড দিয়ে ভূসুয়ার্স পদ্ধতিতে নির্মিত খিলান দেওয়ালসংলগ্ন হওয়ায় এগুলোকে প্রকৃত খিলান বলা যাবে না অর্থাৎ free standing নয়, যদিও খিলান নির্মাণে ভূসুয়ার্স রীতি অনুসৃত হয়েছে। খিলানগুলো অনেকটা চাপ লঘুকারী খিলান বা relieving arch-এর মতো। খিলানগুলো ঈষৎ অশ্বনালাকৃতি এবং ঈষৎ কৌণিক। লক্ষণীয় যে, মধ্যের খিলানটি পাশের দুটি খিলান অপেক্ষা সামান্য বড়। কাঠের দরজার উপর লিনটেল বা সর্দল ব্যবহৃত হয়েছে।

তিন দরজাবিশিষ্ট তিউনিসের মসজিদটি ছোট হলেও বেশ আকর্ষণীয়। খিলানগুলোর পাশের ত্রিকোণাকার স্থান পামেট জাতীয় লতাপাতার নক্‌শা দ্বারা অলঙ্কৃত। খিলানের উপরের অংশ কেটে ১৪৪০-৪১ খ্রীস্টাব্দে একটি শিলালিপি স্থাপিত হয়। এই শিলালিপির সমান্তরালভাবে তিনটি নক্‌শাকৃত প্যানেল দেখা যাবে। উপরের এবং নিচের প্যানেলে কুফীরীতিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি শোভা পাচ্ছে এবং মাঝের অংশে লতাপাতা ও অ্যারাবেস্ক দ্বারা অলঙ্কৃত। কুফীরীতিতে উৎকীর্ণ শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে জানা যায় যে, এই মসজিদটি ৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়। নির্মাতা ছিলেন আন্দালুসীয়ার মুহাম্মদ ইবনে খাইরূন আল-মা'ফিরী। মসজিদে কার্নিসের ব্যবহার ছিল এবং এগুলো পঁচিশটি করবেলের উপর ন্যস্ত। তিন-দরওয়াজা মসজিদের মিনারটি আধুনিক : সিরীয় রীতিতে চতুষ্কোণাকার। মসজিদের অভ্যন্তরে সমসাময়িককালের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। মসজিদের ছাদটিও কাঠ দিয়ে আধুনিককালে নির্মিত। Papadopoulo বলেন, "What is of real interest is the facade with its three doors under arches that have the same profile as those of the Great Mosque."[১]

১৪। আব্বাসীয়া, মসজিদ, ৮৭৭ খ্রীঃ

আব্বাসীয় খলিফা হারুনর-রশীদ ৮০০ খ্রীস্টাব্দে ইব্রাহীম ইবনে আল-আগ্‌লাভকে উত্তর আফ্রিকায় গভর্নর নিযুক্ত করেন। শাসনভার গ্রহণ করে তিনি কায়রোয়ানের

১। ibid, p. 507.

মসজিদের দক্ষিণদিকে দারুল ইমারতটি ভেঙে দেন এবং তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্বে একটি নূতন শহরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ইব্রাহীম এই নূতন শহরটির নাম দেন আব্বাসীয়া। আরব ঐতিহাসিকগণ আব্বাসীয়ায় নির্মিত একটি প্রাসাদ এবং মসজিদের উল্লেখ করেন। কাসর আল-আব্বাসীয়ায় আগলাভী বংশের শাসনকর্তাগণ ৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বসবাস করেন।

আরব ঐতিহাসিকগণের তথ্য অনুযায়ী আব্বাসীয়ায় একটি মসজিদ স্থাপিত হয়। এই মসজিদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও ইমারতটি যে বর্গাকার ছিল এবং ইট ও মার্বেলপাথরের স্তম্ভ দ্বারা নির্মিত হয় তার উল্লেখ আছে। পরিমাণে মসজিদটি ২০০ বর্গহাত ছিল। কাঠের ছাদ এবং গোলাকার মিনার মসজিদের উপকরণ ছিল। স্থাপত্য-উপকরণ ও শৈলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদটি ইসলামের প্রথম যুগের আদি মসজিদগুলোর মতো ছিল। তার গোলাকার মিনারটিতে ইটের ব্যবহার ও ছাদে কাঠের আচ্ছাদন নিঃসন্দেহে মেসোপটেমীয় রীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৫। কায়রো, ইবনে তুলুনের মসজিদ, ৮৭২-৮৬ খ্রীঃ। (চিত্র ২৪-২৬)

পটভূমি :

আব্বাসীয় খিলাফতের শেষভাগে তুর্কী সেনাবাহিনীব আধিপত্য মাত্রাধিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে আল-মুতাসিম ৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে রাজধানী বাগদাদ থেকে সামাররায় স্থানান্তর করতে বাধ্য হন। তুর্কীগণ রাজ্যের সকল ক্ষমতা দখল করেন এবং তাঁদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে আহমদ ইবনে তুলুন সামান্য তুর্কী ক্রীতদাস থেকে খলিফার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। তিনি বুখারা থেকে আল-মামুনের দরবারে আসেন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে রাজসভায় উচ্চ আসনে সমাসীন হন। তুলুনের পুত্র আহমদ ধীশক্তিসম্পন্ন ও প্রতিভাধর ছিলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সামাররা থেকে মিশরে উপ-গভর্নর হিসাবে গমন করেন। ৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি সমগ্র মিশর প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মিশরে পদার্পণ করে আহমদ ইবনে তুলুন প্রথমে আল-আসকার প্রাসাদে বসবাস করতে থাকেন কিন্তু আল-আসকার ও ফুসতাতের অল্প-পরিসর স্থান তাঁর পছন্দ না হওয়ায় তিনি এই দুই স্থানের মধ্যবর্তী এলাকায় একটি নূতন বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ৮৭০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ফুসতাত এবং আধুনিক কায়রোর মাঝখানে আল-কাতাই নামক একটি উপশহর গড়ে তোলেন। আল-কাতাই-এ আহমদ ইবনে তুলুন যে সমস্ত অনিন্দ্যসুন্দর ইমারত নির্মাণ করেন তা হচ্ছে আল-মায়দান প্রাসাদ, আল-মায়দান মসজিদ যা ইবনে তুলুনের মসজিদ হিসাবে সুপরিচিত, একটি হাসপাতাল এবং জলাধার। একটি সুচিন্তিত ও অপূর্ব নীলনক্শার মাধ্যমে এই উপশহর স্থাপিত হয়। বর্তমানের আল-মায়দান প্রাসাদ এবং হাসপাতালের কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট নেই। আল-কাতাই-এ আহমদ ইবনে তুলুনের সুষমামণ্ডিত, আকর্ষণীয় ও বিশালাকার মসজিদটি নির্মাতার স্থাপত্যকীর্তির অতুলনীয় পৃষ্ঠপোষকতার স্বাক্ষর বহন করে রয়েছে। ৮৭২-৩ খ্রীস্টাব্দে ইবনে তুলুন এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয় ৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে।

আহমদ ইবনে তুলুন আব্বাসীয় খলিফার আনুগত্য স্বীকার করলেও মিশরে একটি স্বাধীন বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশ তুলুনী বংশ নামে পরিচিত। ইবনে তুলুনের রাজত্বের কর্মকাণ্ড এবং বিশেষ করে স্থাপত্যকীর্তি সম্বন্ধে আরব ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মাকরিজী এবং ইবনে ডুকমাক ছাড়াও আল-বালাউইর 'সীরাত আহমদ ইবনে তুলুনে' এই মসজিদের বিষদ বর্ণনা পাওয়া যাবে। কায়রোর আল-কাতাই এলাকায় ইবনে তুলুনের মসজিদটি স্থাপত্য-প্রাচুর্য ও সম্ভার-এর সাক্ষী হয়ে অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। এই মসজিদ নির্মাণের একটি পটভূমি রয়েছে। ইবনে তুলনের মসজিদ নির্মাণের পূর্বে মিশরের রাজধানীতে ফুসতাতের মসজিদ ব্যতীত মুসলমানদের নামাজ পড়ার অপর কোনো স্থান ছিল না। পুরাতন মসজিদে স্থানসঙ্কুলান না হওয়ায় নাগরিকগণ অভিযোগ করলে ইবনে তুলন 'জবল ইয়াসকুর' নামক একটি উঁচু পাহাড়ের উপর একটি নূতন মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
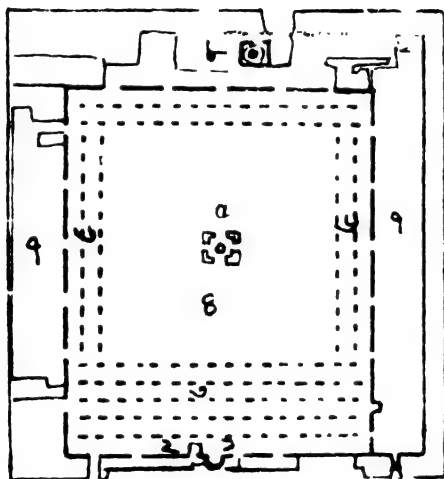
রেখাচিত্র : ৮৬
কায়রো, ইবন তুলুনের মসজিদ, ভূমি নক্‌শা

ইবনে তুলুনের মসজিদে সার্বজনীনভাবে পিয়ারের ব্যবহার হয় এবং গোলাকার স্তম্ভের প্রয়োগ দেখা যায় না। পিয়ারের ব্যবহার প্রসঙ্গে নানাবিধ মতবাদ প্রচলিত আছে। ইবনে ডুকমাক এবং মাকরিজী মনে করেন যে, মার্বেলে স্তম্ভের পরিবর্তে ইটের তৈরি পিয়ার ব্যবহার করা হয় এই কারণে যে, স্তম্ভ আগুনে ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা

১। লেখক ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে এই মসজিদটি যখন দেখেন তখন অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল যে, নবম শতাব্দীতে নির্মিত ইমারত এত সুন্দরভাবে সংরক্ষিত থাকতে পারে।

থাকে, পিয়ারের তা থাকে না। অবশ্য আল-বালাউই অন্য ধারণা পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, মসজিদ নির্মাণের সময় ইবনে তুলুনকে বলা হয় যে, ইমারতটি তৈরি করতে ৩০০ স্তম্ভের প্রয়োজন হবে এবং এই সমস্ত স্তম্ভ কেবলমাত্র দূরাঞ্চলের খ্রীস্টান গির্জা থেকেই সংগ্রহ করা সম্ভব। ইবনে তুলুন অমুসলমানদের ধর্মীয় ইমারত ভেঙে উপকরণ সংগ্রহে আগ্রহী ছিলেন না। স্তম্ভের প্রয়োজনের সংবাদ যখন স্থানীয় খ্রীস্টানদের কাছে পৌঁছাল তখন তাঁদের মধ্যে একজন এ নিয়ে খুব চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। উল্লিখিত খ্রীস্টান তখন কারাগারে ছিলেন। তিনি যখন ইবনে তুলুনকে বলেন যে, মিহরাবের দুই পাশে দুটি স্তম্ভ ব্যতীত অপর কোনো স্তম্ভ ছাড়াই তিনি মসজিদ নির্মাণ করতে সক্ষম তখন তাঁকে মুক্তি দিয়ে শাসনকর্তার সামনে হাজির করা হয়। খ্রীস্টান স্থপতি ইবনে তুলুনকে বুঝিয়ে দেবার জন্য একটি চামড়ার উপর নক্‌শা অঙ্কন করেন। ইবনে তুলুন ভূমি-পরিকল্পনায় খুশি হয়ে তাঁকে মসজিদ নির্মাণের দায়িত্ব দেন। ক্রেসওয়েল আল-বালাউইর এই ঘটনাকে একটি কিংবদন্তি বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, ইবনে তুলুন সামাররা থেকে মিশরে আসেন এবং সামাররার আব্বাসীয় স্থাপত্যের নিদর্শনবাহী আল-মুতাওয়াক্কিলের জা'মি মসজিদ এবং আবু দুলাফের মসজিদে পিয়ারের যে ব্যবহার ছিল তা লক্ষ করেন। সুতরাং খুবই স্বাভাবিক যে সামাররা মসজিদের অনুকরণে পিয়ার ব্যবহৃত হয়েছে।

সাধারণ বর্ণনা :

আহমদ ইবনে তুলুনের মসজিদটি মুসলিম স্থাপত্যের একটি অসাধারণ কীর্তি। ক্রেসওয়েল যথার্থই বলেন,"The Mosque of Ibn Tulun impresses one by it great size and and by the noble simplicity of it plan."[১] মসজিদটি একটি উঁচু স্থানে নির্মিত বলে দূর থেকে ইমারতটি আকর্ষণীয় ও দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান কায়রোর ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার মাঝখানে এই অপরূপ মসজিদটি ইবনে তুলুনের স্থাপত্যশিল্পের একটি গৌরব। ঢালু পথ দিয়ে মসজিদের বাইরের অঙ্গনে বা যিয়াদায় প্রবেশ করতে হয়। যিয়াদা পার হয়ে আরও কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে মসজিদের সাহানে প্রবেশ করা যায়। রাস্তা থেকে বেশ উঁচু এই মসজিদটি স্থাপিত হয়েছে একটি মনোরম পরিবেশে। বিভিন্ন স্তর পার হয়ে মসজিদে প্রবেশের যে রীতি ইবনে তুলুনের মসজিদে দেখা যাবে তা সামাররার বুলকাওয়ারা প্রাসাদের পদ্ধতি অনুকরণে করা হয়। শহরের কোলাহল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দুটি প্রাচীরের সাহায্যে অপূর্ব সুন্দর মসজিদটি নির্মিত হয়। অভ্যন্তরে এক প্রশান্তি ও ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ বিদ্যমান। স্থাপত্য ও অলঙ্করণের মিশ্রণে মসজিদটি এক অসামান্য মর্যাদা লাভ করেছে।

ইবনে তুলুনের মসজিদটি আগুনে পোড়া ইট দিয়ে তৈরি করা হয়। আয়তনে দৈর্ঘ্যে ৪৬০ ফুট এবং প্রস্থে ৪০১ ফুট হওয়ায় আয়তাকার ভূমি-পরিকল্পনার উপর এই মসজিদটি স্থাপিত। মূল মসজিদটির দক্ষিণ-পূর্ব অর্থাৎ কিবলা-প্রান্ত ছাড়া অপর

১। A Short Account, p. 305

তিনদিক যিয়াদা দ্বারা পরিবেষ্টিত। দক্ষিণ-পূর্বদিকে দারুল ইমারা অর্থাৎ শাসনকর্তার বাসস্থান ছিল। যিয়াদাসহ সমগ্র মসজিদটি একটি বিস্তীর্ণ আয়তাকার এলাকা, প্রায় বর্গাকার বলা যায়। এর পরিমাপ ৫৩১ ফুট গভীর এবং ৫৩২১/২ ফুট প্রশস্ত। প্রায় ৬ একর অর্থাৎ ৩১,৫০০ বর্গগজ এলাকা জুড়ে এই বিশালাকার মসজিদটি নির্মিত।

মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব অর্থাৎ কিবলা-প্রাচীরের সংলগ্ন দারুল ইমারা নির্মিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের সরকারী বাসস্থান নির্মাণের পদ্ধতি ইতিপূর্বে কুফা, বসরা ও ফুসতাত মসজিদেও দেখা যায়। মাকরিজী বলেন, "মসজিদ বরাবর ইবনে তুলুন একটি 'দার' বা বাসস্থান নির্মাণ করেন এবং মসজিদ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে এর নির্মাণ চলতে থাকে। এটি দক্ষিণ (দক্ষিণ-পূর্ব) দিকে অবস্থিত ছিল। মসজিদের দেওয়ালের একটি দরজা দিয়ে মিহরাবের পাশে মাকসুরায় প্রবেশ করা যেত (এই দরজা এখনও বিদ্যমান)। এই বাসস্থানে কার্পেট, পর্দা এবং তৈজসপত্র ছিল এবং শুক্রবারে নামাজ পড়তে যাবার পূর্বে এই স্থানে বিশ্রাম করতেন এবং পোশাক বদল করতেন।"[১]

মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত লিওয়ানটিতে পাঁচটি খিলানসারি রয়েছে। প্রতি খিলানসারিতে সতেরোটি খিলান দেখা যাবে। এই খিলানসারি দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব দিকের প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত। খিলানগুলো পিয়ারের উপর থেকে উঠে গেছে। পিয়ারগুলোর পরিমাপ ৮ ফুট প্রশস্ত এবং ৪১/২ ফুট গভীর। প্রতিটি পিয়ার ১৫ ফুট দূরে দূরে স্থাপিত। লিওয়ানের পিয়ারসমূহের উচ্চতা ১৪১/২ ফুট এবং পার্শ্ববর্তী পিয়ারগুলোর উচ্চতা সামান্য কম। নক্‌শা করা কাঠের পাত দিয়ে পিয়ারের মাথা মজবুত করা হয়েছে। খিলানের আকৃতি কৌণিক এবং ১২ ফুট পর্যন্ত প্রসারিত। লিওয়ানের খিলানগুলো কিবলা-প্রাচীর বরাবর সমান্তরালভাবে বিস্তৃত এবং সাহানের দিকের খিলানরাজি লিওয়ানের প্রাচীরের কাজ করছে।

মসজিদ-স্থাপত্যের সার্বজনীন ভূমি-নকশা সাহান ও রিওয়াকবিশিষ্ট আয়তাকার ইবনে তুলুনের মসজিদে লক্ষ করা যাবে। খোলা সাহানটির পরিমাপ ৩০২ বর্গফুট। এই চত্বরে একটি ওজুর স্থান বা 'মিদা' রয়েছে এবং তিনদিকে অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দুই আইলবিশিষ্ট রিওয়াক দ্বারা পরিবেষ্টিত। লিওয়ানের দুইপাশে দুটি পিয়ার থেকে T-আকৃতির পিয়ারের সাহায্যে লম্বালম্বিভাবে দুটি খিলানসারি উত্তর-পূর্বদিকের রিওয়াকের সঙ্গে মিশেছে। উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের রিওয়াকের প্রতিটি সারিতে তেরোটি করে খিলান নির্মিত হয়েছে। পিয়ার ও খিলানের আকৃতি লিওয়ানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উত্তর-পশ্চিমদিকে অর্থাৎ কিবলার বিপরীত দিকে লিওয়ানের মতো সমান্তরাল খিলানরাজি দেখা যাবে এবং পার্শ্ববর্তী দুটি প্রাচীর থেকে পিলাস্টারের সাহায্যে খিলান উত্থিত হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম রিওয়াকের প্রতি সারিতে লিওয়ানের অনুরূপ ষোলোটি পিয়ারের উপর থেকে সতেরোটি খিলান নির্মিত হয়েছে। লিওয়ান ও সাহানের পবিমাপ

১। A Short Account, p. 304.

অনুযায়ী লিওয়ানটি সাহানের এক-চতুর্থাংশ। উল্লেখ্য যে, উত্তর-পশ্চিমদিকের রিওয়াকটি হাজী উবায়েদ ইবনে মুহম্মদ ১৩৯০ খ্রীস্টাব্দে পুনর্নির্মাণ করেন।

লিওয়ানের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে মিহরাব। অর্ধগোলাকৃতি অবতল মিহরাবটিতে কুলুঙ্গী ৪ ফুট প্রশস্ত এবং ৩১/২ ফুট গভীর। মিহরাবের দুই পাশে দুটি করে যুগল স্তম্ভ স্থাপিত হয়। এই স্তম্ভ সম্ভবত মার্বেলের ছিল এবং এর শীর্ষদেশে bell-shaped অর্থাৎ ঘন্টার আকৃতিতে নির্মিত হওয়ায় অনেকে মনে করেন যে, বায়জানটাইন ইমারত থেকে সংগৃহীত। প্রধান মিহরাব ছাড়াও আরও পাঁচটি সাধারণ মিহরাব দেখা যাবে। পলেস্তারা করা এই সমস্ত মিহরাব পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়। এই সমস্ত মিহরাব শিলালিপি অনুযায়ী ১০৯৪ খ্রীস্টাব্দে ফাতেমীয় খলিফা আল-মুসতানসির এবং ১২৯৫ খ্রীস্টাব্দে মামলুক সুলতান লাজীন নির্মাণ করেন। বামদিকের সর্বশেষ প্রান্তের মিহরাবটির সাইদা নাফিসার মিহরাব নামে পরিচিত। খুব সম্ভবত এই মিহরাবটিও লাজীন নির্মাণ করেন। মিহরাবের পিছনে কিবলা-প্রাচীরের সংলগ্ন তিনটি কুঠরী দেখা যাবে।

ইবনে তুলুনের মসজিদের লিওয়ানে মিহরাবের সম্মুখে একটি গম্বুজ দেখা যাবে। এই গম্বুজটির নির্মাণকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলে গবেষকগণ ধারণা করেন অর্থাৎ মামলুক সুলতান লাজীন এটির নির্মাতা। মনে হয় মূল গম্বুজটি পড়ে গেলে কাঠের এই গম্বুজ নির্মিত হয়। ড্রামের উপর গম্বুজটি স্থাপিত এবং স্কুইঞ্চ পদ্ধতির সাহায্যে গোলাকার গম্বুজটি চতুষ্কোণাকার এলাকার উপর নির্মাণ করা হয়। ড্রামে আটটি জানালা সৃষ্টি করা হয়েছে আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে গম্বুজের উপরিভাগ সংস্কার করা হয়।

মসজিদের ছাদ কাঠের তৈরি ছিল। মূল কাঠের ছয়টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে কাঠের নূতন ছাদ দিয়ে সংস্কার করা হয়। মূল ছাদটি নির্মাণের কৌশল খুবই আকর্ষণীয়। কাঠের তক্তাবিশিষ্ট (Sycamore planks) ছাদ পাশাপাশি স্থাপন করে কাঠের প্যানেলের সাহায্যে সংযোগ করে মোটা কাঠের বীমের উপর ন্যস্ত করা হয়। লক্ষণীয় যে, সামাররা মসজিদের ছাদ স্তম্ভের উপর সরাসরিভাবে ন্যস্ত ছিল, কিন্তু আবু দুলাফ এবং ইবনে তুলুনের মসজিদের ছাদ স্তম্ভের খিলানের সাহায্যে নির্মিত হয়। অবশ্য এই তিনটি ইমারতেই ছাদ ছিল সমান্তরাল।

নামাজের পূর্বে ওজুর জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হয় মসজিদের সাহানে। ইবনে দুলাফ বলেন, সাহানের মাঝখানে একটি ফোয়ারা ছিল এবং চারিদিকে জানালা ছিল। ফোয়ারাটি দশটি মার্বেলস্তম্ভের উপর গম্বুজাকৃতি ছিল। গম্বুজ সোনালী রঙে রঞ্জিত করা হয়। এই ফোয়ারার চারপাশে ষোলোটি মার্বেল স্তম্ভের একটি বেষ্টনী তৈরি করা হয়। এই গম্বুজের নিচে ৪ হস্তফুট ব্যাসের মার্বেলের তৈরি একটি জলাধার ছিল। ৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে এই ফোয়ারাটি অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায়। ক্রেসওয়েল মনে করেন যে, বর্তমানে সাহানে যে গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকৃতি ইমারতটি তা পরবর্তীকালে ১২৯৬ খ্রীস্টাব্দে লাযীন কর্তৃক নির্মিত।

ইবনে তুলুনের মসজিদের প্রবেশের জন্য সর্বমোট উনিশটি প্রবেশদ্বার ছিল। খুবই সাধারণ এই সমস্ত দরজা আয়তাকার এবং তালগাছের তৈরি সর্দল বা লিন্টেল ব্যবহৃত

হয়। সামাররা মসজিদের প্রবেশপথের মতো লিনটেন দরজার উপর রিলিভিং খিলান নির্মিত হয়। প্রবেশপথসমূহের বিন্যাস ছিল এরূপ : উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সাতটি করে চৌদ্দটি, উত্তর-পশ্চিমে পাঁচটি এবং কিবলাপ্রান্তে চারটি। কিবলাপ্রাচীরের প্রবেশপথ ব্যতীত অপর তিনদিকের প্রবেশপথসমূহ যিয়াদার প্রবেশপথের একই অক্ষরেখায় অবস্থিত। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রাচীরে একটি ছোট এবং ছয়টি বড় আকারের দরজা নির্মিত হয়েছে। বড় দরজাগুলো ১০ ১/২ ফুট চওড়া এবং ১৩ ফুট উঁচু। এই সমস্ত দরজার উপরে একত্রিশটি কৌণিক খিলানাকৃতি জানালার সারি রয়েছে। জানালার গোবরাট (sill) মেঝে থেকে ১৮ ৩/৪–১৯ ১/৪ ফুট উঁচুতে স্থাপিত। একত্রিশটি জানালা ছোট সংলগ্ন স্তম্ভ থেকে খিলানাকারে নির্মিত এবং প্রতিটি জানালার পাশে ক্ষুদ্রাকার খাঁজকাটা কুলুঙ্গী রয়েছে। সাতটি খাঁজ স্পষ্টতই এই সমস্ত কুলুঙ্গীতে দেখা যাবে। কুলুঙ্গী এবং জানালা একই সমান্তরাল রেখায় তৈরি। প্রাচীরের উপরে একটি দীর্ঘ প্যানেল চলে গেছে এবং এই প্যানেল ছোট ছোট বর্গাকারে বিভক্ত। এই সমস্ত বর্গাকারের মাঝে গোলাকার রোজেট ধরনের অলঙ্করণ দেখা যাবে। এই প্যানেলটির উচ্চতা ৩ ১/৪ ফুট এবং এর উপরে ৬ ১/২ ফুট উঁচু প্যারাপেট দেওয়ালটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। প্যারাপেটটির নক্‌শা খুবই আকর্ষণীয়। মসজিদের প্রাচীরের চার কোণায় চারটি কৌণিক বুরুজ রয়েছে।

ব্রিগস মনে করেন যে, ইবনে তুলুনের মসজিদেব ভূমি-পরিকল্পনায় তেমন কোনো আশ্চর্যজনক উপকরণ নেই, কারণ ফুসতাত, দামেস্ক এবং কায়রোয়ান মসজিদের অনুকরণে এই মসজিদটি নির্মিত। তবুও সামান্য বৈপরিত্য লক্ষ করা যাবে এবং পূর্ববর্তী ইমারতের চেয়ে সামান্য অগ্রণীর ভূমিকা পালন করছে এই কাবণে যে, এর সকল উপাদানের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় হয়েছে এবং কিবলা-প্রাচীর ছাড়া অপর তিনদিকে যিয়াদ ব্যবহৃত হয়েছে। কোলাহলপূর্ণ শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত হয়েও ধর্মীয় ইমারতটিকে জাগতিক ঘরবাড়ি থেকে পার্থক্য করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বিঘ্নে যাতে নামাজিগণ নামাজ আদায় করতে পারেন তার জন্য মসজিদ-প্রাচীর থেকে ৬২ ফুট দূরে যিয়াদার বেষ্টনীপ্রাচীর নির্মিত হয়। একসময় এখানে ওজুখানা, শৌচাগার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ইমারত ছিল। বর্তমানে এখানে শুধুমাত্র রয়েছে একটি অত্যুৎকৃষ্ট মিনার। যিয়াদাটির প্রাচীর ২৬ ১/২ ফুট উঁচু এবং ৪ ১/২ ফুট মোটা। ক্রেসওয়েল উল্লেখ করেন যে, এই যিয়াদার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, অন্যান্য প্রাচীর অপেক্ষা উত্তর-পশ্চিমদিকের দেয়ালটি অধিক উচুঁ। মসজিদে প্রবেশপথের বরাবর যিয়াদা-প্রাচীরে প্রবেশের জন্য দরজা নির্মিত হয়। যিয়াদা-প্রাচীরের নক্‌শা পারাপেট এবং গঠন সৌকর্য প্রশংনীয়।

ইবনে তুলুন মসজিদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে মিনার। স্থাপত্যশৈলীর চরম প্রকাশ ঘটেছে এই ইমারতটিতে। উত্তর-পশ্চিম দিকের যিয়াদাসংলগ্ন এবং মসজিদ-প্রাচীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই মিনারটি নির্মিত হয়েছে। চুনাপাথরে তৈরি এই মিনারটি চারস্তরে তৈরি করা হয়। সর্বনিম্ন স্তরটি বর্গাকার এবং ৭ ১/৩ ফুট উঁচু। এই স্তরের পাশ দিয়ে একটি ঢালু সিঁড়ি দ্বিতল পর্যন্ত গিয়েছে। দ্বিতীয় স্তরটি গোলাকার ২৯ ফুট উঁচু

এবং এর পাশে প্যাঁচানো সিঁড়ি উপরের দিয়ে উঠে গেছে। তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরটি অষ্টভুজাকৃতি। সর্বশীর্ষে একটি খাঁজকাটা গম্বুজ রয়েছে। এই মিনারের উচ্চতা ভূমি থেকে শীর্ষ পর্যন্ত ১৩৩ ফুট। বর্গাকার মিনারের প্রথম তলাকে বেষ্টিত করে দ্বিতলে যাওয়ার সিঁড়ির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে একটি পাথরের সেতু নির্মিত হয়। এই সেতু দিয়ে মসজিদের ছাদে যাওয়া যায়। অশ্বনালাকৃতি খিলানের উপর স্থাপিত এই সেতুটি মিনারের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় গবেষকগণ মনে কবেন যে, এই অংশটি পরবর্তী পর্যায়ে সংযোজিত হয়। একজোড়া অশ্বনালাকৃতি খিলানের ব্যবহার এবং ১৩^১/৪ ফুট ব্যাস-সম্বলিত সেতুর প্রতি প্রাচীর এবং টানেল ভল্টের ব্যবহার অসঙ্গতিপূর্ণ। ক্রেসওয়েল মনে করেন যে, মিশরে সুলতান কালাউনের মাদ্রাসা সমাধিতে (১২৮৪-৮৫ খ্রীঃ) সর্বপ্রথম অশ্বনালাকৃতি খিলান ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে ১৩০৩-৪ খ্রীস্টাব্দে সালার এবং সন্জর আলগাওয়ালীর মাদ্রাসা-সমাধিতে এর প্রয়োগ দেখা যায়। এমতাবস্থায় ক্রেসওয়েল সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই অসংলগ্ন অংশ ১২৯৬ খ্রীস্টাব্দে মামলুক সুলতান লাযীনের সংস্কারের ফল। তিনি বলেন যে, কেবলমাত্র দ্বিতীয় গোলাকার স্তরটি মসজিদের সমসাময়িক এবং তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরটিও পরে সংযোজিত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইবনে তুলুনের মিনারটি সামাররা মসজিদের মালবীয়া মিনারের অনুকরণে নির্মিত।
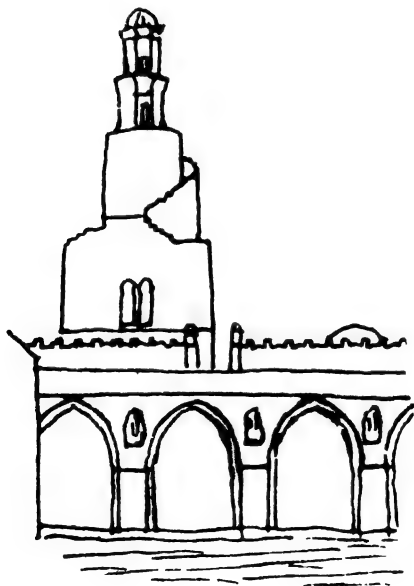
রেখাচিত্র : ৮৭
কায়রো, ইবন তুলুনের মসজিদ, মিনার

অলঙ্করণ :

ইবনে তুলুনের মসজিদের প্রধান স্থাপত্যিক উপকরণ ইট। মিশরে সচরাচর ইটের ব্যবহার দেখা যায় না। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, এটা ব্যতিক্রমধর্মী এবং মেসোপটেমীয় প্রভাবের ফলেই সম্ভবপর হয়েছে। উন্নতমানের লাল ইটের প্রয়োগে মসজিদটির অপরূপ শোভা লক্ষ করা যায়। ইটের পরিমাপ ৭-৭^{১}/৪ × ৩-৩^{১}/৪ × ১^{১}/২–১^{৩}/৪ ইঞ্চি। এক ইঞ্চি মোটা সংযোগকারী গাঁট (joint) এইগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে রেখেছে। ইটের উপর প্লাস্টারের আস্তর দেওয়া হয় এবং এর উপর স্টাকোর নক্‌শা কাটা হয়। ইটগুলো যে পদ্ধতিতে একটির সঙ্গে অপরটির বন্ধনী সৃষ্টি করেছে তা সাধারণভাবে 'English bond' নামে পরিচিত। ইবনে তুলুনের মসজিদের অলঙ্করণ খুবই আকর্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ। সমগ্র মসজিদের অভ্যন্তরে এক দৃশ্যে মনে হবে যেন পিলার থেকে অসংখ্য খিলানের বিচিত্র সমাবেশে এক ধর্মীয় ভাবগাম্ভির্যের সৃষ্টি করেছে। খিলানগুলো কৌণিক এবং প্রথাগত অর্থাৎ ভূসুয়ার্সের সাহায্যে নির্মিত। এই খিলানগুলো পাশে ঈষৎ চাপা (stilted) কিন্তু পূর্ববর্তী ইমারতসমূহের, যেমন কায়রোয়ান মসজিদ, সুসু মসজিদ, মতো অশ্বনালাকৃতি নয়। মিশরে সার্বজনীনভাবে কৌণিক খিলানের ব্যবহার খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম স্থাপত্যে এমনকি ইউরোপের গথিক স্থাপত্যে এ ধরনের খিলান প্রয়োগ করা হয়। খিলানগুলো বিশেষভাবে অত্যুৎকৃষ্ট কারণ এগুলো তলার দিকে (soffit) বিভিন্ন ধরনের স্টাকোর নক্‌শা দেখা যাবে। দক্ষিণ-পশ্চিম রিওয়াকের খিলানের তলদেশে অলঙ্করণের যে দৃষ্টান্ত দেখা যায় তার প্রধান উপকরণ হচ্ছে জ্যামিতিক ও লতাপাতার সমন্বয়ে সৃষ্ট নক্‌শা। দুই পাশে দুটি লতাপাতার নক্‌শার ব্যান্ড রয়েছে এবং মধ্যবর্তী স্থানে বৃত্ত, ত্রিকোণ অথবা বরফীর আকারে নক্‌শা করে তার গর্ভাংশে ফুল-লতাপাতা খোদিত করা হয়। ক্রেসওয়েল এ ধরনের অলঙ্কারের সঙ্গে সামাররার নক্‌শার সাদৃশ্য দেখতে পান। সরলরেখা, বৃত্ত, অষ্টভুজ প্রভৃতি পরস্পরকে ছেদ করেছে এবং জ্যামিতিক নক্‌শার মধ্যে নানা ধরনের ফুল, গোলাপ (rosette) ত্রি-পত্রবিশিষ্ট উপাদান রয়েছে।

ইবনে তুলুনের মসজিদের পিয়ারের চার কোণায় সংলগ্ন স্তম্ভ সংযোজিত হয়েছে। এই স্তম্ভের শীর্ষদেশ (capital)-এর অলঙ্করণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইটের উপর নক্‌শাকৃতি হলেও, ক্রেসওয়েলের মতে, করিন্থীয় ক্যাপিটালের অনুকরণে অলঙ্কৃত ; কেবলমাত্র দ্রাক্ষালতা করিন্থীয় পাতার স্থান দখল করে রয়েছে। খিলানগুলোর অলঙ্করণ খুবই আকর্ষণীয়। সংলগ্ন স্তম্ভ থেকে খিলানের সম্মুখভাগে স্টাকোর নক্‌শা পরপর খিলানের উপর দিয়ে চলে গেছে। খিলানের মাথায় সমান্তরাল স্টাকোর ব্যান্ড লক্ষ করা যাবে। ইবনে তুলুনের মসজিদে জালির জানালা অলঙ্করণশৈলীর অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইটের তৈরি এমন সূক্ষ্ম জ্যামিতিক এবং লতাপাতার সমন্বয়ে সৃষ্ট জালি বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। কিবলা-প্রাচীরে জালির জানালাকে বিশেষজ্ঞগণ Claire voies বলে অভিহিত করেন। মসজিদের মিহরাবটিও রুচিসম্মতভাবে অলঙ্কৃত। পলেস্টারা ফ্রেমে আবদ্ধ এই মিহরাবের নিম্নাংশ ৮ ফুট পর্যন্ত মার্বেল প্যানেল দ্বারা আবৃত। উপরের দিকে কাঠের মোজাইক ব্যান্ড দ্বারা পরিব্যপ্ত। মোজাইক ব্যান্ডে নসখী রীতিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লাযীন কর্তৃক স্থাপিত। মিহরাবের উপরে কাঠের বীমে খোদিত কুফী শিলালিপি মসজিদের নির্মাণকালের সমসাময়িক।

সামাররা মসজিদের সঙ্গে তুলনা

মিশরে ইবনে তুলুনের মসজিদের সঙ্গে সামাররার জা'মি মসজিদের এবং আবু দুলাফের মসজিদের তুলনা করে বিশেষজ্ঞগণ মত পোষণ করেছেন যে, প্রথমটি দ্বিতীয়টি দ্বারা প্রভাবান্বিত। Al-Qudai বলেন, "He (Ibn Tulun) built it (the Mosque) on the plan of the Mosque of Samarra and likewise the minaret." আল-কুদায়ের মতের সমর্থন করেন ইবনে দুকমাক এবং মাকরিজী। অপরদিকে ক্রেসওয়েল আর-কুদায়ের মন্তব্যকে ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, "The words of al-Qudai quoted by Ibn Duqmaq and Maqrizi that the Mosque of Ibn Tulun was built after the style of the Mosque of Samarra is certainly not correct."[১] বস্তুত মেসোপটেমীয় মসজিদের সঙ্গে এই দুটি ভিন্নমুখী মতবাদের যথার্থতা বিচার করলে সত্য উদ্ঘাটিত হবে। মিশরীয় মসজিদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই ছিল।

সাদৃশ্য : আহমদ ইবনে তুলুন সামাররায় বাল্যকাল অতিবাহিত করেন এবং পিতার সঙ্গে তথায় লালিতপালিত হন। স্বীয় মেধাবলে তিনি ৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে মিশরের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং একথা মনে করা স্বাভাবিক যে, তাঁর ইমারতে সামাররার স্থাপত্যিক প্রভাব থাকবে।

(ক) পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় পাথরের উপকরণে নির্মিত স্থাপত্য ঐতিহ্য অপেক্ষা ইবনে তুলুনের মসজিদে মেসোপটেমীয় রীতিতে ইটের উপকরণে নির্মিত স্থাপত্যরীতির প্রভাব খুবই স্পষ্ট।

(খ) ইবনে তুলুন এবং সামাররার মসজিদে আচ্ছাদিত লিওয়ান, ঢাকা রিওয়াক এবং খোলা সাহান রয়েছে।

(গ) তুলুন এবং সামারার মসজিদ দুটি আয়তাকার এলাকায় প্রতিষ্ঠিত।

(ঘ) উভয় মসজিদেই যিয়াদের ব্যবহার দেখা যাবে।

(ঙ) উভয় মসজিদেই দুটি বেষ্টনীপ্রাচীর রয়েছে।

(চ) সামাররা এবং কায়রোর মসজিদে পোস্তার ব্যবহার দেখা যায়।

(ছ) উভয় মসজিদে প্রবেশপথ কাঠের লিনটেল বা সর্দল দ্বারা তৈরি এবং লিনটেলের উপর ইটের রিলিভিং খিলান ব্যবহৃত হয়েছে।

(জ) সামাররা এবং তুলুনের মসজিদের প্রাচীরে আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে জালি দ্বারা আবৃত জানালা এবং খাঁজকাটা খিলানের ব্যবহার ছিল।

(ঝ) উভয় মসজিদের মিনার ছিল অসংলগ্ন (detached) এবং প্যাঁচানো সিঁড়ি রয়েছে।

(ঞ) উভয় মসজিদের ছাদ সমান্তরাল এবং কাঠের তৈরি।

১। A Short Account, p. 316.

(ট) ইবনে তুলুন এবং সামাররার কিবলার দিকে প্রবেশপথ আছে।
(ঠ) উভয় মসজিদে মিহরাবের পাশে একজোড়া সংলগ্ন স্তম্ভ আছে।
(ড) উভয় মসজিদে অলঙ্করণের বহুল সাদৃশ্য দেখা যাবে। স্টাকোর নক্‌শা, জ্যামিতিক ও লতাপাতার উপাদানের প্রাচুর্য মেসোপটেমীয় ও মিশরীয় দৃষ্টান্তে লক্ষ করা যাবে। ক্রেসওয়েল বলেন, "It is principally in respect of its ornament and its piers that the mosque of Ibn Tulun is a foreign Iraqi building planted down on the soil of Egypt and a large number of Iraqi craftsmen must have been employed for its ornament in wood and stucco"[১] ইবনে তুলুনের মসজিদের স্টাকো-অলঙ্করণে সামাররার প্রভাব বিদ্যমান। খিলানের তলদেশে (soffit) জ্যামিতিক নক্‌শার বিন্যাস ক্রেসওয়েলের মতে সামাররার 'Style B'।
(ঢ) সামাররা ও কায়রোর মসজিদের পিয়ারের চার কোণায় সংলগ্ন স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছে।
(ণ) উভয় মসজিদের দেওয়ালে খাঁজকাটা কুলুঙ্গী ধরনের নক্‌শা দেখা যাবে। ইবনে তুলুনের মসজিদের প্রাচীরে কৌণিক জানালাগুলোর মাঝে খাঁজকাটা যে নক্‌শা দেখা যাবে তার সঙ্গে সামাররা মসজিদের প্রাচীরে পাঁচটি খাঁজবিশিষ্ট জানালার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

বৈসাদৃশ্য : আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে, ইবনে তুলুনের মসজিদ সামাররা মসজিদের হুবহু অনুকরণ কিন্তু সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্য অনেক বেশি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করলে স্পষ্টত জানা যায় যে, ইবনে তুলুনের মসজিদ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একটি অভিনব ও অতুলনীয় স্থাপত্যকীর্তিতে পরিণত হয়েছে।

(ক) সামাররা মসজিদের লিওয়ানের স্তম্ভরাজি লম্বালম্বিভাবে স্থাপিত, অপর দিকে ইবনে তুলুনের লিওয়ানের স্তম্ভরাজি কিবলা বরাবর সমান্তরাল।
(খ) ইবনে তুলুনের মসজিদে লিওয়ানে আইলের সংখ্যা ৫টি এবং তিনদিকে রিওয়াক ২টি ; অপরদিকে সামাররা মসজিদের লিওয়ানের আইল হচ্ছে ৯টি, পূর্ব ও পশ্চিমের রিওয়াকে ৪টি এবং উত্তরে ৩টি।
(গ) ইবনে তুলুনের মসজিদের লিওয়ানের পিয়ারগুলো আয়তাকার, কিন্তু সামাররায় চতুষ্কোণাকার।
(ঘ) সামাররা মসজিদের পিয়ারের চার কোণায় চারটি মার্বেলের সংলগ্ন (engaged) স্তম্ভ ব্যবহৃত হয় ; ইবনে তুলুনের সংলগ্ন স্তম্ভগুলো ইটের তৈরি।
(ঙ) ইবনে তুলুনের মসজিদে কৌণিক খিলান সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে কিন্তু সামাররার মসজিদে কোনো খিলান ছিল না। ছাদ সরাসরি স্তম্ভের উপর ন্যস্ত ছিল।
(চ) ইবনে তুলুনের মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনা চতুষ্কোণাকার, সামাররায় আয়তাকার।
(ছ) সামাররার মিহরাব আয়তাকার, কিন্তু ইবনে তুলুনের মসজিদের মিহরাব অর্ধ-গোলাকার ও অবতলাকৃতি।

১। A Short Account, p 317.

(জ) ইবনে তুলুনের মসজিদের মিহ্‌রাবের সম্মুখে একটি গম্বুজ নির্মিত হয়, কিন্তু সামাররা মসজিদে কোনো গম্বুজ ব্যবহৃত হয়নি।

(ঝ) সামাররা মসজিদের দেওয়ালের চারপাশে অর্ধবৃত্তাকার পোস্তা (buttress) ছিল; কিন্তু ইবনে তুলুনের মসজিদের প্রাচীরে অথবা জিয়াদায় কোনো পোস্তা ছিল না, কেবলমাত্র মসজিদের বেষ্টনীপ্রাচীরের চারকোণায় চারটি চতুষ্কোণাকার বুরুজ ছিল।

(ঞ) মেসোপটেমীয় ও মিশরীয় ইমারতের প্রাচীরে জানালার ব্যবহার থাকলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। যেমন সামাররার জানালায় পাঁচটি খাঁজবিশিষ্ট খিলান (cinquefoil) দেখা যাবে; অথচ ইবনে তুলুনের জানালা কৌণিক খিলান দ্বারা গঠিত। এ ছাড়া তুলুনের মসজিদের জানালার পাশে যে, খাঁজকাটা হুডের মতো ছিদ্র আছে সামাররা মসজিদের দেওয়ালে তা দেখা যায় না।

(ট) প্রবেশপথের তুলনা করলে দেখা যাবে যে, সামাররায় ষোলোটি এবং তুলুনের মসজিদে উনিশটি আছে।

(ঠ) ক্রেসওয়েল সামাররা এবং ইবনে তুলুনের মসজিদের অলঙ্করণের রীতি ও কৌশলের পার্থক্য উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে সামাররায় নক্‌শাসমূহ পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে (A, B, C Styles), কিন্তু মিশরীয় মসজিদে এসমস্ত নক্‌শা প্রয়োগ সমন্বিতভাবে দেখা যাবে।

(ড) তুলুনের মসজিদের অসংলগ্ন (detached) মিহ্‌রাবটিকে সামাররার মালবীয় মিনারের অনুকরণে নির্মিত বলে মনে করা হলেও আসলে এই দুটি ইমারতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; যথা : তুলুনের মিনার চুনাপাথরের তৈরি, সামাররার মিনারটি ইটের; তুলুনের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে কেবল প্যাঁচানো সিঁড়ি রয়েছে, কিন্তু সামাররার মিনারের সমস্ত স্তরেই এই সিঁড়ি দেখা যাবে, অর্থাৎ নিচ থেকে শীর্ষ পর্যন্ত উঠে গেছে। সামাররার মসজিদের মিনারের আকৃতি গোলাকার, কিন্তু ইবনে তুলুনের মিনারের কেবলমাত্র দ্বিতীয় স্তরটি গোলাকার; তুলুনের মিনারে ব্যবহৃত গোলাকার অশ্বনালাকৃতি খিলান সামাররায় দেখা যাবে না।

সুতরাং ইবনে তুলুনের মসজিদের গঠন, স্থাপত্যকৌশল, অলঙ্করণরীতি সামাররা মসজিদের হুবহু অনুকরণ বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না। কূহনেলের অভিমত যে, আহম্মদ ইবনে তুলুন (৮৭৭-৭৯ খ্রীস্টাব্দে সামাররার মসজিদের প্রায় অনুরূপভাবে তাঁর সেনানিবাস শহর আল-কাতাই-এ (পুরাতন কায়রো) একটি জাঁকজমকপূর্ণ মসজিদ নির্মাণ করেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়।"

গুরুত্ব :

Gardner বলেন, "It is at Cairo that Muhammadan art reveals itself in its most refined and purest form." Briggs-এর অভিমত "The great congregational mosque created by Ibn Tulun is perhaps the most important building in the whole history of Arab art." আহমদ ইবনে তুলুন

কায়রোর উপকণ্ঠে আল-কাতাই নামে যে উপশহরে অতুলনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত জা'মি মসজিদ নির্মাণ করেন তা আরব তথা মুসলিম স্থাপত্যের অসাধারণ কীর্তি। দুই বছরে এই ইমারতের কাজ সম্পন্ন হয় এবং ১২০,০০০ দীনার ব্যয় হয়।

ইবনে তুলুন মসজিদের স্থপতি ছিলেন ইবনে কাতিব নামধারী একজন মিশরীয় খ্রীস্টান (Coptic) অথচ ঐতিহাসিকগণ তাঁকে নাসারী বলে অভিহিত করেন। সুতরাং এটি খুবই স্বাভাবিক যে কপটিক প্রভাব তুলুনের মসজিদে বিদ্যমান। ক্রেসওয়েল সামাররা মসজিদের অলঙ্করণ-পদ্ধতি (stucco) এবং উপাদানের প্রভাব তুলুনের মসজিদে লক্ষ করেন, কিন্তু Papadopoulo সামাররা অর্থাৎ মেসোপটেমীয় অপেক্ষা কপটিক প্রভাবকে অধিক প্রাধান্য দেন। তাঁর মতে, ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই কপটিক বস্ত্রে জ্যামিতিক নক্শা এবং কাঠ খোদাই-এ স্টাকোর ধরন প্রতিফলিত হয়েছিল। এই যুক্তির সপক্ষে তিনি Hautecoeur-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করেন, "It is certain that such elements as chevron in border, spirals, intelacings, pearls, vine leaves already existed among the Copts. But they themselves had taken them from the antique and Byzantine art that also reached as far as Samarra."[১] ক্রেসওয়েল যথার্থই বলেন যে, সামাররার প্রভাব অনস্বীকার্য ; অবশ্য স্থানীয় প্রভাব একেবারেই অবজ্ঞা করা যায় না। তিনি একথাও বলেন যে, সামাররা থেকে মিশরে আসার সময় ইবনে তুলুন সহস্রাধিক ইরাকী কারিগর, স্থপতি, দক্ষ কারুশিল্পী নিয়ে আসেন। এমনকি তাঁর আগমনের বহু পূর্বে ৮৬১ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদের বহু অধিবাসী ফুসতাতে বসতি স্থাপন করে। একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, "The example of Ibn Tulun in the sphere of Muslim decorative art by the combination of the two elements ; (i) a geometrical framework and (ii) conventional floral pattern is the most spectacular innovation which continued to exit in Muslim architecture."[২]

ইবনে তুলুন মসজিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথমত মার্বেলের গোলাকার স্তম্ভের পরিবর্তে আয়াতাকার ইটের পিয়ারের ব্যবহার ; দ্বিতীয়ত গোলাকার অশ্বনালাকৃতি খিলানের মূলে কৌণিক খিলানের প্রচলন। সিরিয়ায় নির্মিত মসজিদসমূহে মার্বেল স্তম্ভের বহুল প্রয়োগ দেখা যায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে খ্রীস্টান গির্জার ধ্বংসাবশেষ থেকে এই সমস্ত স্তম্ভ আহরণ করা হয় কিন্তু স্তম্ভের পরিবর্তে পিয়ারের ব্যবহার আল-কালাউইর তথ্যানুসারে শুধুমাত্র গির্জা থেকে এসব স্তম্ভ সংগ্রহের প্রয়োজনই হয় না বরং সিরীয় বায়জানটাইন প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে মিশরে মেসোপটেমীয় রীতিকৌশলের প্রবর্তন করে। ইবনে তুলুনের মসজিদে সর্বপ্রথম সার্বজনীনভাবে ইটের ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে সম্পূর্ণ নূতন ভূমি-পরিকল্পনায় এবং বিশেষভাবে প্রস্তুত ইটের উপকরণের সাহায্যে তুলুন তার অসামান্য স্থাপত্যকীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। পিয়ারের ব্যবহারের মূলে প্রধান যুক্তি হচ্ছে যে কোনো গির্জা থেকে স্তম্ভ আহরণের

১। Papadopoulo, p. 251.

২। A Short Account, p. 317.

প্রয়োজন হবে না, পিয়ার দ্বারা স্তম্ভের তুলনায় ছাদ অনেক উঁচু করে নির্মাণ করা যায় কারণ পিয়ারে impost-এর ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না এবং স্তম্ভ অপেক্ষা পিয়ার খিলারের নিম্নমুখী চাপ ধারণ করতে অধিকতর সক্ষম। ইবনে তুলুনের মসজিদে ব্যবহৃত পিয়ারের অনুকরণে পরবর্তী কালে হাকিম, বায়বার্স এবং বারকুকের মসজিদ নির্মিত হয়।

আগুনে পোড়া ইটের প্রচলন অভিনব বলে মনে করা হয়। মার্বেল ও পাথর দ্বারা নির্মিত স্থাপত্যকীর্তির অঞ্চলে ইটের ব্যবহার সত্যই কৃতিত্বের দা'বিদার। আল-কুদাই বলেন যে, ইবনে তুলুন এমন এক উপাদানসহকারে জা'মি মসজিদ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যদি মিশর অগ্নিদগ্ধ হয়েও ভস্মীভূত হয় তবুও মসজিদ যেন অক্ষত থাকে। মার্বেল স্তম্ভ আগুন প্রতিরোধক না হওয়ায় সম্ভবত ইটের সার্বজনীন ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অনন্তকাল পর্যন্ত তুলুনের অমর সৃষ্টি যাতে অম্লান থাকে সেজন্যই সম্ভবত মার্বেলের স্থলে ইটের প্রয়োগ দেখা যাবে। উপরন্তু, ইটের ব্যবহার অসাধারণ রীতি ও কৌশলকে নূতন রূপ দান করেছে। ইট ব্যতীত স্টাকোর নক্শা কখনওই সম্ভবপর ছিল না। স্টাকোর নক্শার ব্যপকতা ও অভিনবত্ব মিশরে সর্বপ্রথম তুলুনের মসজিদে দেখা যাবে—যা নিঃসন্দেহে মেসোপটেমীয় প্রভাবের ফলশ্রুতি।

ইবনে তুলুনের মসজিদের পিয়ার ও ইটের ব্যবহার প্রসঙ্গে প্রফেসর জোসেফ হেল বলেন যে, এই মসজিদে বায়জানটাইন প্রভাব স্তিমিত হয়ে মেসোপটেমীয় প্রভাব প্রকট আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। উমাইয়া যুগে দামেস্ক, জেরুজালেম, কায়রোয়ান প্রভৃতি শহরে নির্মিত মুসলিম ইমারতে বায়জানটাইন প্রভাবের যে ব্যাপকতা ও পরিশিলীত প্রয়োগ দেখা যায় মেসোপটেমীয় (সামাররা ও আবুদুলাফে) এবং মিশরীয় (ইবনে তুলুন) প্রভাবে আব্বাসীয় যুগের স্থাপত্যরীতি এক নূতন দিগন্তের সূচনা করে। মার্বেল, গোলাকার খিলান, করিন্থীয় শীর্ষদেশ বা ক্যাপিটাল, কাঠের বন্ধনী, মোসাইক প্রভৃতির অবর্তমানে বায়জানটাইন প্রভাবের ক্ষয়িষ্ণুতাকে প্রমাণিত করে।

মসজিদ-স্থাপত্যের ইতিহাসে ইবনে তুলুনের মসজিদ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। মদিনা, বসরা, কুফা ও দামেস্কের মসজিদে যে সাহানবিশিষ্ট আয়তাকার ভূমি-পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে ইমারত নির্মিত হয়েছে তারই প্রতিফলন আব্বাসীয় যুগে বাগদাদ, রাক্কায়, সামাররা, আবু দুলাফ এবং কায়ারাতে পরিলক্ষিত হবে। ইবনে তুলুন মসজিদের শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে যে, মুসলিম স্থাপত্যের ক্রমবিবর্তনে এই মসজিদের সর্বপ্রথম কৌণিক খিলান সুষ্ঠু এবং সার্বজনীনভাবে ব্যবহৃত হয়। Lanepoole যথার্থই বলেন যে, ইবনে তুলুনের মসজিদে ব্যবহৃত কৌণিক খিলান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর ভাষায়, "the first example of the universal employment of pointed arches throughout a building 300 years before the adoption of the pointed style [Gothic] in England."[১] মুসলিম স্থাপত্যের ক্রমবির্তনের খিলানের ব্যবহার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অন্যান্য প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে দ্বিবলয় থেকে সৃষ্ট

১। Lanepooll, S., The Art of the Saracens in Egypt, London, 1888, p. 54.

কৌণিক খিলান নির্মাণকৌশল হিসাবে স্বীকৃত। প্রত্নতাত্ত্বিক এবং বিশেষজ্ঞবর্গ কৌণিক খিলানের উৎপত্তি ও উৎসস্থল সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। Stratham মিশরের কপটিক গির্জা থেকে কৌণিক খিলানের উদ্ভব হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। Sturgis মনে করেন যে, দামেস্কে জা'মি মসজিদের লিওয়ানের তিন খিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথের উপর কৌণিক ফ্রেম থেকেই কৌণিক খিলানের উৎপত্তি। Butler সিরিয়া উৎপত্তিস্থল হিসাবে বিশ্বাস করেন এবং প্রাক্-মুসলিম যুগের হোমসের নিকট কাসর আল-ওয়ারদান গির্জার (৫৬১-৬৪ খ্রীস্টাব্দ) উল্লেখ করেন। ক্রেসওয়েল সিরিয়া অর্থাৎ পূর্বদেশীয় উৎস প্রমাণ করার জন্য দীর্ঘ তালিকা দিয়ে বলেন যে, কাসর আল-ওয়ারদানের গির্জা ছাড়াও কুসইর আমরা এবং হাম্মাম আস-সারখে কৌণিক খিলানের ব্যবহার দেখা যাবে। সাসানীয় যুগে টেসিফোনে নির্মিত প্রাসাদের খিলান থেকে Dieulafoy কৌণিক খিলানের ক্রমবিকাশের সূত্র আবিষ্কার করেন। Rivoira এবং Havell ভারতীয় উৎস প্রতিষ্ঠার জন্য বৌদ্ধযুগের পাহাড় কেটে মন্দিরসমূহের উল্লেখ করেন। তিনি বিশেষ করে অজন্তা ও নাসিকের উদাহরণ দেন। Lanepoole কায়রোর নিলোমিটারে (৮৬১-২ খ্রীঃ) কৌণিক খিলানের ব্যবহারের কথা বলেন।

কৌণিক খিলানের উৎস ও ক্রমবিকাশ আলোচনায় ক্রেসওয়েলের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, এ ধরনের খিলান সিরিয়া থেকে উৎপত্তি হয়েছে এবং ইবনে তুলুনের মসজিদে সার্বজনীনভাবে ব্যবহারের পূর্বে কাসর আল-হাইর (৭২৮-২৯ খ্রীঃ), উখাইদিরে (অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ), ফুসতাতের আমলের মসজিদে (৮২৭ খ্রীঃ) এবং কায়রোয়ানের মসজিদে (৮৬২ খ্রীঃ) এর প্রচলন হয়েছিল। ইবনে তুলুন মসজিদে কৌণিক খিলান সার্বজনীন রূপ ধারণ করে এবং এর প্রভাব পরবর্তীকালে মুসলিম স্থাপত্যের অন্যান মসজিদ, এমনকি ইউরোপীয় গথিক স্থাপত্যে দেখা যাবে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে গথিক গির্জা নির্মিত হয় তা মুসলিম স্থাপত্যের অভিনব ও বহুলপ্রচলিত কৌণিক খিলানের ফলেই সম্ভবপর হয়েছে। লেখক একটি প্রবন্ধে বলেন, "Pointed style first appeared in Europe in the Abbey Church of Cluny (1089-1131) and the window of the Church of Souterraine (1200), France and existed upto the end of the 14th century A.D."[১] ফ্রান্সে নতরদাম, লিঁউ, আঁমেন, ইংল্যান্ডের সলসবেরী ও ডারহাম এবং সিসিলির পালের্মোর বিখ্যাত যিযা প্রাসাদে কৌণিক খিলান ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে তুলুনের মসজিদের খিলান প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সার্বজনীন ব্যবহারের ফলে কৌণিক খিলান সুষমামণ্ডিতরূপে এবং স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

ইবনে তুলুনের মসজিদ প্রসঙ্গে বিচমন্ড বলেন, "The absence of Arab monuments in Egypt and Syria prior to Ibn Tulun's Mosque and for a century after its completion marked it all the more an architectural landmark, standing in splendid isolation." ইবনে তুলুন মসজিদের অসামান্য

১। Glimpses of Muslim Art and Architecture, 1983, p 30

প্রভাব সম্পর্কে Ware মন্তব্য করেন, "By the time of Toulun in the ninth century, the new style was apparently so perfected that it only needed encouragement to produce works of great splendour."[১]

১। Ware, W.R. Saracenic Architecture, Harvard Engineering Jourrnal, Vol IV, April, 1805 No. 1, p 5.

৫

মূর স্থাপত্য

ভূমিকা . মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেকটি অঞ্চলে স্থাপত্যকলার বিকাশ ঘটে। ৭১২ খ্রীস্টাব্দে স্পেনবিজয়ের পর স্বাভাবিকভাবে নতুন শাসকবৃন্দ ধর্মীয় অনুশাসন পালনের জন্য মসজিদ নির্মাণে ব্রতী হন। অধীনস্থ আমিরাতের (৭১১-৫৫ খ্রীঃ) শাসনামলে স্থাপত্যকলার উন্মেষ ও বিকাশ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এ সময় আন্দালুসিয়ার রাজধানী ছিল বন্দরনগরী সেভিলে। গভর্নর আস-সামাহ বিন মালিক ৭১৯ খ্রীস্টাব্দে স্পেনের অভ্যন্তরে অবস্থিত সুন্দর কর্ডোভা নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এর পর থেকে কর্ডোভা একটি তিলোত্তমা নগরীতে রূপান্তরিত হতে থাকে। প্রায় বিশ জন গভর্নর চুয়াল্লিশ বছর, গড়ে দু'বছর করে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্য ইমারত নির্মাণ ব্যাহত হয়। কোনো মসজিদ এ সময় নির্মিত হয়েছিল কি না জানা যায়নি। মসজিদ নির্মিত না হলেও নামাজের জন্য অবশ্যই মুসাল্লা ছিল। ৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম আবদুর রহমান স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করার পর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্যরীতির উদ্ভব হয়। প্রথম আবদুর রহমান উমাইয়া বংশোদ্ভূত বলে স্বাভাবিক কারণে স্পেনে উমাইয়া স্থাপত্যকলার প্রভাব দেখা যাবে। তিনি পিতামহ হিশামের সময় যে সমস্ত রাজপ্রাসাদ, প্রমোদ-প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, যেমন– কুশাইর আমরা ; ঠিক তারই অনুকরণে রুসাফায় একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্রথম আবদুর রহমান কর্ডোভায় যে জা'মি মসজিদ নির্মাণ করেন, পরবর্তীকালে তা মূর স্থাপত্যকলা তথা মসজিদস্থাপত্যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। এ মসজিদটি পরবর্তী আমির এবং খলিফাগণ সম্প্রসারণ, সংযোজন ও অলঙ্করণ করেন। কর্ডোভা একসময় এক গৌরবমণ্ডিত ও ঐতিহ্যবাহী নগরী ছিল, যেখানে তিন হাজার মসজিদ, একলক্ষ তেরো হাজার বাসগৃহ এবং তিনশত স্নানাগার ছিল। স্থাপত্যকলা ও অলঙ্করণের দিক থেকে মূর স্থাপত্য এক অনবদ্য ঐতিহ্যের সৃষ্টি করে যা পরবর্তীকালে ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতিকে প্রভাবান্বিত করে। ধর্মীয় ইমারতের পাশাপাশি জাগতিক (secular) ইমারত, যেমন– প্রাসাদ বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ছিল। এ প্রসঙ্গে দুটি প্রাসাদের কথা বলা যায়, তৃতীয় আবদুর রহমান কর্তৃক মদীনাত-আল-জোহরা এবং হাজিব আল-মনসুরের নির্মিত মদীনাত-আল-জাহিবা।

এম. এ. কাদের স্পেনের মূর স্থাপত্যকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন– (১) উৎপত্তির যুগ, (২) পরিবর্তনের যুগ ও (৩) চরম উন্নতির যুগ। আমিরাত ও

খিলাফতের আমলে নির্মিত ধর্মীয় ও বেসামরিক ভবনসমূহ প্রথম শ্রেণীতে পড়বে। খিলাফতের আমলে স্পেনে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় যা সাধারণভাবে 'মূলক-আত-তাওয়াইফ' নামে পরিচিত, তখনও মূর স্থাপত্যের ক্রমবিকাশ হতে থাকে। তবে এ সময়ের ইমারতে তেমন মৌলিকত্ব দেখা যায়নি। উপরন্তু, মসজিদ অপেক্ষা প্রাসাদনির্মাণে তাইফা নেতৃবৃন্দ বেশি আগ্রহী ছিলেন। এ সমস্ত ইমারতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সারাগোসার জাফেরিয়া প্রাসাদ, সেভিলের আল-কাযার এবং তলোডার প্রাসাদ। তৃতীয় পর্বে চরমোৎকর্ষের অন্যতম নিদর্শন গ্রানাডার আল-হামরা।

দ্বাদশ শতাব্দীতে স্পেনে উত্তর আফ্রিকার বংশোদ্ভূত আল-মোরাবীয় এবং আল-মুওয়াহেদীয় (Morabits and Mohades) শাসনকালে স্বাভাবিকভাবে উত্তর আফ্রিকার অশ্বখুরাকৃতি (horse-shoe arch) খিলান ও চতুষ্কোণাকার স্তম্ভ বিশেষ প্রাধান্য পায়। এ সময় উমাইয়া মূর স্থাপত্যের অনুকরণ হলেও, পলেস্তারা অলঙ্করণ (plaster-cut ornamentation) বিশেষ আকর্ষণীয় হয়। টালির অলঙ্করণও এ সময় প্রবর্তিত হয়। খ্রীস্টানদের ধ্বংসলীলায় খুব কমই আল-মোরাবীয় এবং আল-মুওয়াহেদীয় স্থাপত্যকলার নিদর্শন অক্ষত রয়েছে এবং বহু মসজিদ গির্জায় রূপান্তরিত হয়েছে। সেভিলের মসজিদের মিনার, যা জিরাল্ডা নামে পরিচিত তা এখন গির্জার ঘণ্টাঘর (belfry)। স্পেনে মুসলমানদের পতনের যুগে আল-হামরা নির্মিত হয় এবং এটি স্পেনে মুসলিমকীর্তির একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

উল্লেখ্য যে, স্পেনে মুসলিম ও খ্রীস্টানরীতির মিশ্রণে যে মিশ্র স্থাপত্যরীতির উদ্ভব হয় তা মুদেজার (Mudejar) নামে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে এ.বি.এম. হোসেন বলেন, "এই মুদেজারগণ (জিজিয়া প্রদানের শর্তে খ্রীস্টান স্পেনে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়) খ্রীস্টান নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্যের যে রীতি উদ্ভাবন করে গেছেন তা-ই মুদেজার রীতি। মুদেজার রীতির স্পেনীয় মুসলিম স্থাপত্য ধারার নামে [illegible]নেই (একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী) ও শেষ পর্যায়ের গথীয় (ত্রয়োদশ শতাব্দী) রীতিতেও যে বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হল পলেস্তারা অলঙ্করণ। ইট ও কাঠের মাল-মসলার সাথে মিশ্রিত হয়ে এই পলেস্তারা অলঙ্করণ মুদেজার স্থাপত্যে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল তা আল-হামরার সাথে তুলনীয়। আল-হামরার স্থাপত্যের ন্যায় মুদেজার স্থাপত্যেও বিশেষ বিশেষ স্থানে গুরুত্বের জন্য মর্মরস্তম্ভ ব্যবহার করা হয়েছে।

১। কর্ডোভা, জা'মি মসজিদ, (৭৮৬ খ্রীঃ) (চিত্র : ২৭-৩০)

৭১১ খ্রীস্টাব্দে মুসলিমবাহিনী স্পেন অধিকার করে কর্ডোভা নগরীতে অবস্থিত সেন্ট ভিনসেন্ট গির্জার অর্ধেক অংশে প্রথম মসজিদ স্থাপন করে। বাকি অংশ গির্জা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম আবদুর রহমান (৭৫৬-৮৮ খ্রীঃ) স্পেনে উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ডোভা মসজিদটিতে স্থানসঙ্কুলান না হওয়ায় তিনি গির্জার অংশ ক্রয় করে নিয়ে নতুন পরিকল্পনায় একটি বিশালাকার মসজিদ নির্মাণ করেন।

বর্তমানে আদি কর্ডোভা মসজিদটি পুনঃপুনঃ সংস্কার, পরিবর্ধন ও পুনর্নির্মাণের জন্য সঠিকভাবে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন। সেন্ট ভিনসেন্ট নামে ভিসিগথিক গির্জাটি

মসজিদে রূপান্তরিত হয়। ৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম আবদুর রহমান কর্ডোভার আদি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই ইমারতটি নির্মাণে ব্যয় হয় ৮০,০০০ দিনার এবং এক বছর সময় লাগে। লিওয়ানের পরিমাপ ১২১ ফুট x ২৪১ ফুট। এটি দশটি খিলানরাজি দ্বারা এগারোটি আইলে বিভক্ত ছিল। প্রতি খিলানসারিতে এগারোটি খিলান ছিল এবং এগুলো কিবলার দিকে লম্বালম্বিভাবে নির্মিত হয়। এই মসজিদের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে, মার্বেলের তৈরি সরু ও মসৃণ স্তম্ভ—যার ক্যাপিটাল কারিন্থিয়ান এবং ক্যাপিটালের উপরের একটি প্রস্তরখণ্ডের (abaci) উপর থেকে নির্মিত গোলাকার অশ্বনালাকৃতি খিলান। ছাদ উঁচু করার জন্য গোলাকার স্তম্ভের উপর চতুষ্কোণী পাথরখণ্ড বা পিলার সংযোগ করা হয়েছে যা থেকে নিচের খিলানের ঠিক উপরে আর একটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান তৈরি করা হয়েছে। উত্তরের খিলানে গাঁথনি করে তার উপরে কাঠের ছাদে নির্মাণ করা হয়। বলাই বাহুল্য যে, এই খিলানরাজি স্থাপত্যের শ্রীবৃদ্ধিই করেনি বরং লিওয়ানটিকে সুদৃঢ় করেছে। কায়রোয়ান মসজিদের অনুকরণে কর্ডোভা মসজিদেও অশ্বনালাকৃতি খিলান ব্যবহৃত হয়েছে। ভূসুয়ার্স অর্থাৎ একটির পর একটি করে একবার ইট ও একবার পাথর দিয়ে খিলান নির্মিত হয়। মেঝে থেকে ছাদের উচ্চতা ৩২১/৪ ফুট। নিচে সমতল ছাদ আছে এবং তার উপরে এগারোটি টালির চালা ছাদ (gable roof) দেখা যাবে। সীসা দ্বারা মজবুত ও ওয়াটারপ্রুফ করা হয়েছে। পানি বের করার জন্য নালা বা গার্গইল নির্মিত হয়।

প্রথম আবদুর রহমানের মসজিদটিতে ২৪০ ফুট × ১৯৭ ফুট অঙ্গন ছিল; কিন্তু এর চারিদিকে কোনো রিওয়াক ছিল না। কিবলাদিক ব্যতীত অন্য তিনদিকে প্রবেশ তোরণ ছিল। উত্তরদিকে ক্ষমা তোরণ. (Puerta del Perdon), পশ্চিমদিকে অধিকর্তা তোরণ (Puerta delos Deanes) এবং পূর্বদিকে সেন্ট ক্যাথেরিন তোরণ। এ ছাড়া পশ্চিমদিকে সেন্ট স্টিফেন তোরণ নামে আর একটি দরজা ছিল। কর্ডোভা মসজিদটির বহিঃপ্রাচীরে চতুষ্কোণী বুরুজ ছিল।

সম্প্রসারণ : প্রথম হিশাম (৭৪৮-৯৬ খ্রীঃ) : প্রথম আবদুর রহমানের পুত্র হিশাম কর্ডোভা মসজিদটির সংস্কার ও সংযোজন করেন। মসজিদের অসম্পূর্ণ কাজ তিনি সমাধা করা ছাড়াও ৪০ ফুট উঁচু একটি মিনার নির্মাণ করেন। এটি ছিল চতুষ্কোণী।

দ্বিতীয় আবদুর রহমান (৮২২-৫৬ খ্রীঃ) : প্রথম হাকামের পুত্র দ্বিতীয় আবদুর রহমান মসজিদটি দক্ষিণ কিবলার দিকে সম্প্রসারণ করেন। সম্প্রসারিত অংশের পরিমাপ ১৫০ হাত প্রশস্ত এবং ৫০ হাত গভীর। এই অংশে ৮০টি স্তম্ভ ছিল। প্রথম আবদুর রহমানের নির্মিত দশটি স্তম্ভরাজি সম্প্রসারণ করে প্রতি সারিতে আটটি স্তম্ভ সংযোজন করা হয়। তিনি হিশামের মিনারে একটি কিয়স্ক এবং উপরে ওঠার সিঁড়ি নির্মাণ করেন।

প্রথম মুহম্মদ (৮৫২-৮৬ খ্রীঃ) : দ্বিতীয় আবদুর রহমানের পুত্র প্রথম মুহাম্মদ পিতার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেন এবং পশ্চিমদিকে সেন্ট স্টিফেন নামে আর একটি তোরণ নির্মাণ করেন। সংস্কার ও অলঙ্করণের ফলে কর্ডোভা মসজিদের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়।

আবদ আল্লাহ (৮৮৮-৯১২ খ্রীঃ): প্রাসাদ থেকে মসজিদে অবস্থিত মাকসুরায় যাওয়ার জন্য পশ্চিমদিকের দরজার সঙ্গে একটি ঢাকা পাকা রাস্তা তৈরি করেন।

খলিফা তৃতীয় আবদুর রহমান (৯১২-৬১ খ্রীঃ) : কর্ডোভা মসজিদের পুনর্নির্মাণে তৃতীয় আবদুর রহমান অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি মসজিদের সম্মুখভাগ বা ফাসাদ পুনর্নির্মাণ করেন এবং হিশামের মিনারটি ৯৫১-৫২ খ্রীস্টাব্দে ভেঙে ৭২ হাত উঁচু করে পুনঃসংস্কার ও সংযোজন করেন। পাথরের তৈরি এই চতুষ্কোণী মিনারটিতে তিনি দুটি সিঁড়ি নির্মাণ করেন। মিনারটিতে গম্বুজ ছিল এবং চূড়াটিতে সোনা-রূপার তৈরি আপেলের নক্শা ছিল। অলঙ্করণের দিক দিয়ে বিচার করলে মসজিদটি সুশোভিত ও সুষমামণ্ডিত করেন তৃতীয় আবদুর রহমান।

দ্বিতীয় হাকাম (৯৫১-৭৬ খ্রীঃ) : কর্ডোভা মসজিদের সংস্কারে দ্বিতীয় হাকাম বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি প্রাসাদ থেকে মসজিদ পর্যন্ত তৈরি রাস্তাটি ভেঙে দক্ষিণদিকে সম্প্রসারণ করেন। তিনি একটি নতুন প্রাসাদতোরণ নির্মাণ করে মসজিদ থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। হাকামের অপর একটি অসামান্য কীর্তি হচ্ছে মিহরাব। ৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এই মিহরাব খুবই আকর্ষণীয়। দ্বিতীয় হাকাম মিহরাবের সামনে একটি মাকসুরাও নির্মাণ করেন। অর্ধ-অষ্টকোণী মিহরাবের দুপাশে দুটি চ্যানেল আছে। মিহরাবের পরিকল্পনা করা হয়েছে খাঁজ কাটা (cusped) খিলান দ্বারা এবং একটি ঝিনুকের আকৃতিতে আচ্ছাদন (cupola) দ্বারা আবৃত। কুউপুলাটি রিবড অথবা গ্রইন্ড (ribbed or groined) ভল্ট দ্বারা নির্মিত চতুষ্কোণী এলাকা থেকে অর্ধকোণী এলাকায় নিয়ে যেতে আটটি খিলান সম্মিলিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। S.P. Scott বলেন, "The mihrab of the Mosque of Cordova had no prototype in Islam or elsewhere and both its plan and details have defied all limitations"

দ্বিতীয় হিশাম (৯৭৬-১০০৯ খ্রীঃ) : কর্ডোভা মসজিদের সর্বাপেক্ষা সম্প্রসারণ হয় দ্বিতীয় হিশামের রাজত্বে, বিশেষ করে তাঁর মন্ত্রী ইবনে আল-মনসুরের প্রচেষ্টায়। দক্ষিণদিকে গুয়াডেলকুইভার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত থাকায় মসজিদটির সম্প্রসারণ করা হয় পূর্বদিকে। মনসুর মসজিদে আরও ৮টি আইল নির্মাণ করেন এবং এর ফলে মসজিদের প্রস্থ ২৩০ হাতে দাঁড়ায়। প্রতি আইল ১০ হাত প্রশস্ত ছিল। আইলের সংখ্যা দাঁড়ায় উনিশে। আড়াই বছরে ২৮৭-৮৯ খ্রীস্টাব্দে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়।

সাধারণ বিবরণ :

কর্ডোভা মসজিদ একটি বিশাল আয়তাকার এলাকা জুড়ে নির্মিত হয় এবং এর পরিমাপ দাঁড়ায় ৫৮৫ ফুট উত্তর-দক্ষিণে এবং ৪১০ ফুট পূর্ব-পশ্চিমে। পীতরঙের পাথর দিয়ে নির্মিত মসজিদের দেওয়াল ৩৪ ফুট উঁচু এবং উপরে কাঙ্গুরা রয়েছে। দেওয়ালের চারপাশের বুরুজগুলো খুবই সুদৃশ্য ও সুদৃঢ়। অঙ্গনের তিনদিকে রিওয়াক রয়েছে। মসজিদের ফাসাদে সতেরোটি অশ্বনালাকৃতি খিলান দেখা যায় যার একটি ছাড়া অন্যগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নামাজগৃহ বা লিওয়ানের প্রবেশের জন্য একটি

গেট রয়েছে। লিওয়ান ১৮টি খিলান দ্বারা ১৯টি আইলে বিভক্ত। আইলগুলো কিবলার দিকে লম্বালম্বিভাবে স্থাপিত হয়েছে। মসজিদে প্রবেশের জন্য উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমদিকে দুটি করে মোট ছয়টি তোরণ আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই মসজিদের অভ্যন্তরে একটি গির্জা নির্মিত হয়।

অলঙ্করণের দিক দিয়ে কর্ডোভা মসজিদ অতুলনীয়। নীল, গোলাপী, কালো, ধূসর রঙের মার্বেল ও গ্রানাইটের তৈরি প্রায় এক হাজার স্তম্ভ মসজিদের অভ্যন্তরে একটি মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করে। কোনোটি গোল, আবার কোনোটি প্যাঁচালো ও শিরাল ধরনের স্তম্ভ রয়েছে। করিন্থীয় এবং মিশ্রিত (করিন্থীয় ও আইওনীয়) ধরনের শীর্ষের (ক্যাপিটাল) ব্যবহার দেখা যায়। স্তম্ভের উপরের খিলান লাল ও ফিকে পীতরঙের জেব্রা ডোরাকাটা। দ্বিতীয় হাকামের মিহরাবটি একটি আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ এবং মোজাইক দ্বারা অলঙ্কৃত। এর উপর খাঁজকাটা খিলানের (stalactite) ব্যবহার দেখা যায় এবং দুপাশে দুজোড়া গোলাকার স্তম্ভ রয়েছে। এটি লতাপাতা ও কুফীলিপি দ্বারা অলঙ্কৃত। মিহরাবের সামনে খাঁজকাটা গম্বুজ রয়েছে।

স্থাপত্যরীতির দিক থেকে মুসলিম শিল্পকলায় অনবদ্য অবদান রেখেছে কর্ডোভা মসজিদ। স্থাপত্যশৈলী ও অলঙ্করণের সংমিশ্রণে নির্মিত এই ইমারতটি স্থানীয় মুসলিম স্থাপত্যের অনন্যকীর্তি। এতে প্রাচ্য অর্থাৎ মেসোপটেমীয় এবং প্রতীচ্য অর্থাৎ রোমীয় বায়জানটাইন সিরীয় উপাদানের সংমিশ্রণ দেখা যায়। চালাছাদ, গোলাকার ও চতুষ্কোণী স্তম্ভের পর্যায়ক্রমে ব্যবহার, বিশেষ করে রিওয়াকে, তিনটি প্রবেশপথ প্রভৃতিতে যেমন উমাইয়া প্রভাব রয়েছে; অন্যদিকে বুরুজ, খাঁজকাটা খিলান, কিবলার দিকে লম্বালম্বিভাবে স্থাপিত খিলানসারিতে আব্বাসীয় রীতির প্রতিফলন দেখা যায়। দামেস্কের মসজিদে ব্যবহৃত অশ্বনালাকৃতি খিলান কর্ডোভা মসজিদে দেখা যাবে। এ মসজিদের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন ধরনের খিলান, যেমন—বহু খাঁজ (mulufoil), তিনটি খাঁজ (trefoil), পাঁচটি খাঁজ (cinquefoil), অর্ধগোলাকার, কৌণিক ও অশ্বনালাকৃতি। এ ছাড়া, দুস্তরে নির্মিত খিলানরাজিও খুবই সুশোভিত।

কর্ডোভা মসজিদের প্রভাব স্প্যানিশ ও উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম স্থাপত্যেই প্রতিভাত হয়নি ; বরং মধ্যযুগীয় ইউরোপের খ্রীস্টান স্থাপত্যেও এর প্রভাব দেখা যায়। কর্ডোভার মদীনাত আয-যোহরা, গ্রানাডার আল-হামরা এবং সেভাইলের আল-কাযার ও জিরাল্ডা ছাড়াও উত্তর আফ্রিকার রাবাতের সুলতান হাসানের মসজিদ ও তিউনিসিয়ার জা'মি আয-যাইতুনে কর্ডোভার জা'মি মসজিদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া ইউরোপীয় গথিক স্থাপত্যরীতির উন্মেষে গ্রইন ভল্ট ও খাঁজকাটা কৌণিক খিলানের প্রভাব কর্ডোভা মসজিদ থেকে এসেছে।

২। সেভিল, জা'মি মসজিদ, ত্রয়োদশ শতাব্দী (চিত্র-৩১) :

সেভিলে আল-মোহেডস (আল-মুয়াহিদুস) একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ১১৪৬ থেকে ১২৬৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মুয়াহিদগণ রাজত্ব করেন। সেভিলে প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি সর্ববৃহৎ। আয়তনে ছিল ৪৯২ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ১২০ ফুট প্রস্থ। কায়রোয়ানের জা'মি

মসজিদের অনুকরণে এর ভূমি-নক্‌শা ছিল ইংরেজি অক্ষর T-এর মতো। উত্তর-দক্ষিণে মোট সতেরোটি আইল ছিল যা কিবলার দিকে সম্প্রসারিত। কিবলার সম্মুখে একটি 'বে' আছে যাতে পাঁচটি গম্বুজ দেখা যাবে। সেভিল খ্রীস্টানদের দখলে চলে গেলে তারা এই সুন্দর মসজিদটি ধ্বংস করে এবং এর উপর গির্জা নির্মাণ করে। শুধুমাত্র মিনারটি অক্ষত ছিল যা বর্তমানে গির্জায় ঘণ্টা বাজানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এই টাওয়ারটিই জিরাল্ডা নামে পরিচিত। যেখানে লিওয়ান ছিল সেটি বর্তমানে গির্জার খোলা চত্বর। এটি Patio de los Narangos নামে পরিচিত। গির্জার অংশ হলেও জিরাল্ডা মূর স্থাপত্যের অনুপম নিদর্শন। ১১৮৪ খ্রীস্টাব্দে সেভিলের জা'মি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং ১১৯৮ খ্রীস্টাব্দে এর কাজ সমাপ্ত হয়। স্পেন খ্রীস্টানদের দখলে চলে গেলে এই জিরাল্ডাটির উপরে ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দে একটি ঘণ্টাঘর বা belfry নির্মাণ করা হয়। মুযায়হীদ বা Mohades-এর স্থাপত্যশিল্পের চরম বিকাশ ঘটে। এই মিনারটি পরবর্তীকালে জিরাল্ডা বা বায়ুর গতিনির্দেশক হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। স্প্যানিশ ভাষায় এর নাম giraldillo। ইটের তৈরি এই মিনারটি ২৩০ ফুট উঁচু এবং আকৃতিতে বর্গাকার।

জিরাল্ডা প্রসঙ্গে এস. পি. স্কট বলেন, "... It (Giralda) is the most imposing and beautiful edifice of its kind that has ever been devised by the genius of men."

৩। তলোডা, বিব মারদুনের মসজিদ, ৯৯০ খ্রীঃ :

চতুষ্কোণাকার পরিকল্পনার উপর ক্ষুদ্রাকৃতির বিব মারদুনের (Bib Mardoon) মসজিদ নির্মিত হয়। অভ্যন্তরে নয়টি বর্গাকার এলাকায় বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি এক-একটি খাঁজকাটা গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজ নির্মাণে কর্ডোভা মসজিদে ব্যবহৃত কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে অর্থাৎ intersecting ribs পরস্পর ছেদকারী রিব। দুর্ভাগ্যবশত এই মসজিদটি একটি গির্জায় রূপান্তরিত হয়েছে।

৪। সারাগোসা, আল-জাফরিয়া প্রাসাদ মসজিদ :

স্পেনের সারাগোসা শহরের পশ্চিমপার্শ্বে আল-জাফারিয়া প্রাসাদটি নির্মিত হয়। প্রাসাদটি ও এর সংলগ্ন ক্ষুদ্রাকার মসজিদটি সম্ভবত তাইফা নৃপতি ইবনে জাফর আল-মুকতাদির (১০৪৯-১০৮১) কর্তৃক নির্মিত হয়। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে আল-জাফরিয়া প্রাসাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও অলৌকিকভাবে এই মসজিদটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। মসজিদটির সম্মুখে চত্বর রয়েছে। এ মসজিদের প্রধান আকর্ষণ মার্বেলের স্তম্ভের উপর নির্মিত গম্বুজ যা ৪৫ ফুট উঁচু এবং অলঙ্কৃত মিহরাব। বর্গাকৃতি মসজিদটিতে একটি মিনার রয়েছে। এটি ৮০ ফুট উঁচুঁ। মিনারটি মসজিদের সমসাময়িক বলে মনে হয়। অলঙ্করণ প্রসঙ্গে পাপাডোপোলো বলেন, The carved stucco relief decoration is of exceptional richness. Here the polylobate arches became flamboyant, flamelike arabesques that contrast with the very delicate design, filling all available spaces in accordance with the aesthetic of the

horror vacui" (বঙ্গানুবাদ : "স্টাকোর রিলিফে নক্‌শা অসাধারণ চাকচিক্যসম্পন্ন। এখানে বাহুখাঁজবিশিষ্ট খিলানসমূহ আরও অতিরঞ্জিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে যা ভীতির সৃষ্টি করতে পারে।" মিহ্‌বারটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়! উপরে গোলাকার অশ্বখুরাকৃতি খিলানের নিচে অর্ধগোলাকার অবতল মিহ্‌রাব বা Niche, যার দুপাশে মার্বেলের সংলগ্ন স্তম্ভ রয়েছে। উভয় পাশে পরস্পর ছেদকারী দুটি খিলান সৃষ্টি করা হয়েছে। কুফীর নক্‌শা উপরিভাগে শোভা পাচ্ছে। অষ্টকোণাকার ড্রামের উপর পরস্পর ছেদকারী খিলান দ্বারা একটি স্তর সৃষ্টি করা হয়েছে–যার উপর গম্বুজ নির্মিত হয়। স্পেনের মুসলিম স্থাপত্যিক অলঙ্করণে এ ধরনের বর্ণাঢ্য নক্‌শাকৃত মসজিদ খুবই বিরল। স্তম্ভের শীর্ষদেশে (capital) করিন্থীয় রীতির প্রয়োগ সহজেই লক্ষণীয়।

৬
ফাতেমীয় স্থাপত্য

ভূমিকা : P. K. Hitti বলেন "Though unfavourable to the cultivation of science and literature, the Fatimid era was characterized by works of art and architecture of first importance" প্রথম দুই খলিফা (আল-মুইজ এবং আল-আজিজ) এবং আর্মেনীয় উজীরদের (বদর-আল-জামালী) শাসনামলে যে ঐশ্বর্য মিশরে দেখা দিয়েছিল, তা ফেরাউনী অথবা আলেকজান্দ্রীয় যুগের সমতুল্য যা শিল্পকলা ও স্থাপত্যে প্রতিভাত হয়।

৯০৯ খ্রীস্টাব্দে ওবায়েদুল্লা আল-মাহদী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফাতেমী খিলাফত ১১৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ফাতেমীয় খলিফাগণ সংস্কৃতমনা ছিলেন এবং শিল্পকলা ও স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফাতেমীয়দের ঐশ্বর্যের তুলনা ছিল না। অপরিমিত অর্থ থাকায় ফাতেমীয় খলিফাগণ শিল্পকলার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখতে পেরেছিলেন। পারসিক কবি নাসিরী খসরু ১০৭৮ খ্রীস্টাব্দে কায়রো আগমন করে এ শহরের বৈভব ও ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হন। তিনি ফাতেমীয় দরবারকে ঐশ্বর্যশালী বলে অভিহিত করেন। এযুগে কায়রোসহ রাজ্যের বিভিন্ন শহরে মসজিদ, মাদ্রাসা, দুর্গ, পুল, স্নানাগার, বাগান, সৌধ ইত্যাদি নির্মিত হয়। সৌধনির্মাতা হিসেবে খলিফা ও উজীরদের খ্যাতি ছিল। খলিফা আল-আজিজ নিজে একজন স্থপতি ছিলেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য ইমারত নির্মিত হয়। সমস্ত ইমারত, প্রাসাদ, মসজিদ নক্‌শামাফিক তৈরি করা হত। ঐতিহাসিকদের মতে, আল-কাহিরার (কায়রো) নক্‌শা আল-মুইজ নিজেই তৈরি করেন। তাঁর প্রাসাদটি ছিল খুবই বিশাল। ৪০০০ কক্ষবিশিষ্ট এই প্রাসাদে তাঁর বেগম, পুত্র-কন্যা, দাস-দাসী ও খোজা-প্রহরীসহ মোট ১৮,০০০ থেকে ৩০,০০০ লোক বাস করত। শোনা যায় যে, একটি কক্ষ স্বর্ণমণ্ডিত থাকায় এর নাম হয় “স্বর্ণকক্ষ”। এতে একটি স্বর্ণদ্বারও ছিল।

ফাতেমী স্থাপত্যকলা পূর্ববর্তী ইবনে তুলুনের মসজিদ, কায়রোয়ানের মসজিদ এমনকি মূর স্থাপত্যরীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। অনেক ক্ষেত্রে শিয়া বংশোদ্ভূত ফাতেমী খলিফাগণ সিরিয়া এবং পারস্যের ইমারতের বহু উপাদান অনুকরণ করেন। কায়রোর অনেক ইমারত পূর্বে প্রতিষ্ঠিত সামররা বা মনসুরিয়ার ইমারতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এ.বি.এম. হোসেন বলেন, “কাহিরার স্থাপত্য প্রথমাবস্থায় সামরার স্থাপত্য দ্বারা কতখানি প্রভাবান্বিত হয়েছিল তা মালমশলার অভাবে সঠিক অবগত

হওয়া যায় না। তবে কাহিরার প্রাচীনতম বিদ্যমান ইমারত আল-আযহার মসজিদ যে কায়রোয়ানের আগলাভীয় মসজিদ এবং নিকটবর্তী আহমদ ইবনে তুলুনের মসজিদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল তা এর ট্রানসেপ্টস্থিত গম্বুজ, গৃহাভ্যন্তরস্থ আইলের সংখ্যাধিক্য এবং পলেস্তারার অলঙ্করণ নক্‌শা থেকে প্রতীয়মান হয়।" একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, কায়রো ফুসতাত, আল-বাতাই, মাহদীয়া, কায়রোয়ান সাররা এমনকি কর্ডোভার স্থাপত্যরীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আল-হাকিমের মসজিদের যে বিশাল বুরুজ লক্ষ করা যায়, তা মাহদীয়ার মসজিদ থেকে অনুসৃত।

ফাতেমী স্থাপত্যশিল্পে উমাইয়া, আব্বাসীয় ও পারস্য নির্মাণকৌশলের প্রয়োগ দেখা যাবে। কায়রোতে আল-মুইজ এবং আল-আজিজ কর্তৃক নির্মিত প্রাসাদে যে নক্‌শা ব্যবহৃত হয়েছে তাতে বাগদাদের আব্বাসীয় প্রাসাদের প্রভাব বিদ্যমান, বিশেষভাবে অঙ্গন, আইওয়ান, সুরঙ্গপথ প্রভৃতির ব্যবহারে। অবশ্য ফাতেমীয় বৈশিষ্ট্য মসজিদে দেখা যাবে, যেমন—তারা আল-আযহার এবং আল-হাকিমের মসজিদের কিবলাদিকের দুকোণে দুটি গম্বুজ নির্মাণ করে। ফাতেমী স্থাপত্যকলার উন্মেষে বিভিন্ন রীতির প্রভাব প্রসঙ্গে আর্নেস্ট কূহনেল বলেন, "কায়রোর ফাতেমীয় মসজিদের সম্পর্ক রয়েছে ইবনে তুলুন এবং সিদি ওকবা দুয়ের সাথে। এর পার্শ্বদেশ মেহরাব পর্যন্ত সম্প্রসারণের মধ্যেই সিদি ওকার সাথে এর সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও বহুলাংশে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন হচ্ছে—এর সম্মুখভাগের (ফাসাদ) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, যা এযাবৎকাল অজ্ঞাতই ছিল...।" আল-আযহার মসজিদ প্রসঙ্গে কূহনেল মন্তব্য করেন, "এর সামনের প্রাঙ্গণের চতুঃকেন্দ্রিক খিলানসজ্জা অত্যন্ত পুরাতন। কোনো ইরানী স্থপতি সম্ভবত সে সময়ে মিসরে এ স্থাপত্যরীতি চালু করে।" হিট্টিও একথা সমর্থন করে বলেন, ৯৭২ খ্রীস্টাব্দে জওহর কর্তৃক নির্মিত আল-আযহার মসজিদে ইটের কৌণিক খিলান রয়েছে—যা তাঁর ভাষায়, "betray of Iranian influence" অর্থাৎ ইরানী প্রভাব প্রকাশ করছে। গোলাকার মিনারের ব্যবহার যা হাকিমের মসজিদে দেখা যায়, তা সামাররার জা'মি মসজিদের মিনার দ্বারা প্রভাবান্বিত বলে হিট্টি মনে করেন। ফাতেমীয় খিলাফতের শেষভাগে ইট অপেক্ষা পাথরের ব্যবহার বেশি চালু হয় এবং এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ১২২৫ খ্রীস্টাব্দে আল-আকমারের মসজিদের সম্মুখভাগ বা ফাসাদ। হিট্টি মনে করেন যে, এটি কোনো আর্মেনীয় খ্রীস্টান স্থপতি তৈরি করেছিলেন। হিট্টি বলেন, "In al-Aqmar we recognize the first appearance of the later general Islamic features, the corbelled (stalactile) niche (muqarnas)." মুকারনাস প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পরবর্তীকালে আয়য়ীবী ও মামলুকদের স্থাপত্যে মুকারনাসের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

সাধারণত পারস্যে অশ্বনালাকৃতি খিলানের উদ্ভব হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু ক্রেসওয়েল বলেন যে, গোলাকৃতি অশ্বনালাকৃতি খিলান ৩৫০ খ্রীস্টাব্দে নিসিবিনের একটি গির্জায় সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। যাহোক, ইফ্রিকা বা উত্তর আফ্রিকা ও

স্পেনে অশ্বনালাকৃতি খিলানের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যাবে মসজিদ ও প্রাসাদে। মিশরীয় মুসলমানগণ এ উপাদানের সুষ্ঠু ব্যবহার করে। ফাতেমীয় পদ্ধতির অশ্বনালাকৃতি খিলান উচ্চ impost-এর সাথে সংমিশ্রিত কায়রোয়ানে জিয়াদাতুল্লাহর মসজিদে (৮৩৬-৩৭ খ্রীঃ) দেখা যাবে। ফাতেমীয় স্থাপত্যের অন্যতম অবদান এক নতুন ধরনের খিলান, যা "Keel" খিলান নামে পরিচিত। এ ধরনের খিলান আস-সালেহ তালাই-এর মসজিদে দেখা যাবে। পরবর্তীকালে বহু ইমারতে কীল খিলান ব্যাপকতা লাভ করে। আর্মেনীয় উজীর বদর আল-জামালী সিরিয়া থেকে মিশরে আসেন এবং প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব লাভ করেন। তাঁর সাথে তিনজন খ্রীস্টান স্থপতি মিশরে আসে এবং তাদের প্রচেষ্টায় যে সমস্ত ইমারত নির্মিত হয় স্বাভাবিকভাবে তাতে সিরীয় স্থাপত্যকলার প্রভাব ছিল। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অর্ধবৃত্তাকৃতি খিলান, খাঁজ ভূসোয়া (Joggled voussoir), গদিভূসোয়া (cushion voussior), পান্দানতিফ (pendentive), সমান্তরাল খিলান (দামেস্কের মসজিদ) ইত্যাদি।

কে. এ. সি. ক্রেসওয়েল ফাতেমী স্থাপত্যে পারস্য প্রভাব অস্বীকার করলেও কায়রোর অনেক ইমারতে পারস্য উপাদান লক্ষ করা যাবে। পারস্য উপাদানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ফুস্তাতের আবাসগৃহে আইওয়ানের ব্যবহার, সাধারণ গম্বুজ নির্মাণ পদ্ধতিতে স্কুইঞ্চ ও সমাধিসৌধে মুকারনাসের ত্রিপত্র মিহরাবের ব্যবহার, মসজিদবিশিষ্ট সমাধিগুলো, যা মাসহাদ নামে পরিচিত নিঃসন্দেহে পারস্যরীতির প্রভাবে নির্মিত হয়, যেমন– কুম, মাসহাদ এবং অন্যান্য শহরে দেখা যায়। জোড়াস্তম্ভের ব্যবহার, (আল-জুয়ূশীর মসজিদ), জোড়া মিনার (আল-হাকিমের মসজিদ) ফাতেমী স্থাপত্যকলায় বৈচিত্র্য এনেছে। আর্নেস্ট কূহনেল আল-আকমার মসজিদ প্রসঙ্গে বলেন, "ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবন থেকে সংগৃহীত স্তম্ভের ওপর ছুঁচলো খিলান বসিয়ে এর সামনের দিকটি নির্মিত করা হয়। এই সমৃদ্ধ অংশটি একসময় কায়রোতে ইতিহাস সৃষ্টি করে। এদিকটা কয়েকটি কুলুঙ্গীতে বিভক্ত। এগুলোর উপরের ঝিনুকের খোলার আকৃতিবিশিষ্ট (conch-shell) আলোকরশ্মির একটি গুচ্ছকে তাতে সুদৃশ্যভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মিশরের মাটিতে এ ধরনের অলঙ্করণ এই প্রথম।"

অলঙ্করণের দিক থেকে মিশরের ফাতেমী স্থাপত্যকলা বিশেষভাবে কৃতিত্বের দাবিদার। পাথরে খোদিত নকশা ছাড়াও পলেস্তরার অলঙ্করণ বিশেষ সৌকর্য লাভ করে। পাথরে খোদাইকৃত নকশা, জ্যামিতিক (অ্যারাবেস্ক) লতাপাতা, শিলালিপির ব্যবহার দেখা যায়। আর্নেস্ট কূহনেল কর্ডোভায় মদীনাতুজ জোহরার দ্রাক্ষালতার অলঙ্করণের সাথে কায়রোর আল-হাকিমের ফাসাদের নকশার মিল দেখতে পান। তিনি বলেন, "আল-আকমরের চমৎকার কৃত্রিম গোলাপ ফুল থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, মিশর স্থাপত্য কারিগরিতে তার নিপুণতায় মদীনাতুজ জোহরাকে কতখানি অতিক্রান্ত করে গেছে।" পলেস্তারার উপর অলঙ্করণ এবং দারুশিল্পেও ফাতেমী শিল্পীগণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। সবদিক থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, ডি.টি রাইসের ভাষায়, "the two centuries of their rule were from the artistic point of view perhaps the most glorious in Egyptian History."

১। কায়রো, আল-আযহার মসজিদ, ৯৭০-৭২ খ্রীঃ (চিত্র ৩২-৩৩)

ভূমিকা : ফাতেমী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় ৯০৯ খ্রীস্টাব্দে এবং উত্তর আফ্রিকায় এই রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। ১১৭১ খ্রীস্টাব্দে গাজী সালাহউদ্দীন সর্বশেষ সুলতান আল-আদীদকে সিংহাসনচ্যুত করলে ফাতেমী খিলাফতের অবসান হয়। ফাতেমী খলিফাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আল-মুইজ (মুইজ (৯৫২-৯৭৫ খ্রীঃ) এবং তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল মিশরবিজয়। সেনাপতি জওহুর মিশর বা আল-কাহিরা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে কায়রো ফাতেমীয় খিলাফতের রাজধানীতে পরিণত হয়। ৯৭২ খ্রীস্টাব্দে সেনাপতি জওহুর বিবি ফাতেমার স্মরণার্থে আল-আজহার নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ৯৭২ খ্রীস্টাব্দে এই মসজিদটির নির্মাণ সম্পন্ন হয়।

ভূমি-নক্‌শা ও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য

আল-আযহার শব্দটির উৎপত্তি 'যাহরা' থেকে; 'আল-আযহার' অর্থ জমকালো। 'আল-আযহার' মসজিদটি আয়তনে আয়তাকার; পরিমাপ ২৭৮ ফুট উত্তর-পশ্চিমে, ২৭৯^{৩}/৪ ফুট দক্ষিণ-পূর্বে, ২২৬ ফুট উত্তর-পূর্বে এবং ২২৩^{১}/২ ফুট দক্ষিণ-পশ্চিমে। এই মসজিদটি নির্মিত হয় ইটের সাহায্যে। কিবলার দিকে লিওয়ানটি পাঁচটি আইলে বিভক্ত ছিল এবং এই আইলগুলো কিবলা-প্রাচীরের সমান্তরালভাবে স্থাপিত হয়। আইলে মধ্যবর্তী স্থানে মিহরাব বরাবর একটি 'নেভ' ছিল। আদি মসজিদটিতে ব্যবহৃত খিলানগুলো মার্বেলপাথরের স্তম্ভের উপর থেকে নির্মিত। এই স্তম্ভগুলো সম্ভবত কোনো প্রাচীন স্থানীয় ইমারত থেকে সংগৃহীত। নেভের উভয়দিকে প্রতি সারিতে মোট নয়টি খিলান ছিল।

রিওয়াক : আল-আযহার মসজিদটি নবী করীম মসজিদের অনুকরণে চত্বরবিশিষ্ট (Courtyard) ভূমি-নক্‌শার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মসজিদটির তিনটি পৃথক অংশ ছিল—সাহান বা খোলা চত্বর, লিওয়ান বা প্রার্থনাগার এবং রিওয়াক বা ছাদবিশিষ্ট পথ। বায়তুল্লাহর দিকে মসজিদটির কিবলা স্থাপিত হলে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মিহরাব নির্মিত হয়। লিওয়ানের তিনদিকে রিওয়াক রয়েছে। রিওয়াকগুলো তিন খিলান গভীর ছিল। বর্তমানে রিওয়াকের খিলানসমূহ লিওয়ানের খিলানশ্রেণীর সমান্তরাল। সাহানের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবশ্য দুটি খিলানশ্রেণী আড়াআড়িভাবে নির্মিত হয়েছে। সাহানে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে কোনো রিওয়াক নির্মিত হয়নি। দামেস্ক মসজিদে লিওয়ানের তিনদিকে রিওয়াক নির্মিত হয়; কিন্তু আল-আযহার মসজিদের দুদিকে রিওয়াক দেখা যাবে। মসজিদটির উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে যিয়াদা ছিল। এই যিয়াদার পূর্বপ্রান্তে একটি অজুখানা নির্মিত হয়।

মিহরাব, মিনার ও খিলান : কৃহনেল বলেন, "এর (লিওয়ানের) সামনের প্রাঙ্গণের চতুঃকেন্দ্রিক খিলানসজ্জা (Four-centred arch) অত্যন্ত পুরাতন। কোনো ইরানী স্থপতি সম্ভবত সে সময়ে মিশরে এই স্থাপত্যরীতি চালু করেন। উপাসনাস্থলের খিলানশ্রেণীও অনুরূপ পুরাতন। খিলানগুলো সবই ছুঁচলো। মিহরাবটি অত্যন্ত প্রশস্ত

এবং এর দুপাশে রয়েছে দুটি করে স্তম্ভ। কায়রোয়ানের প্রভাবেই সম্ভবত এগুলো এভাবে নির্মিত হয়।

অষ্টকোণী পিলারের উপর নির্মিত হয়েছে এর দুটি গম্বুজ। কোণের দিকের সূঁচলো কুলুঙ্গীর সাহায্যে নির্মিত চতুস্কোণ স্তম্ভের উপর গড়ে উঠেছে পিপাগুলো। ফাতেমী স্থাপত্যরীতির অপূর্ব নিদর্শন আল-আযহার মসজিদটিতে কিবলার দিকে একটি অবতল মিহরাব ছিল। মসজিদের দক্ষিণ এবং পূর্বকোণে মিহরাবের সম্মুখস্থ গম্বুজের ন্যায় আরও দুটি গম্বুজ ছিল।

বর্ণনা : ডঃ সোয়াদ মেহের আল-আযহার মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালযের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দেন। তাঁর ভাষায়, "গওহর (জওহর) আল-সিকিলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আল-আযহার মসজিদটি আয়তনে বর্তমান মসজিদের অর্ধেক। পরবর্তীকালে এই মসজিদটি বিভিন্ন যুগে অসামান্যভাবে সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। উত্তরদিক থেকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে প্রথমে চত্বরে পৌছান যাবে। সম্মুখে দুটি দরজা দেখা যাবে যা মেযায়েনীনের (বার্বার) দরজা।" শাহজাদা আবদুর রহমান কাতখুদা কর্তৃক ১১৭৬ হিঃ (১৭৫২ খ্রীঃ) এই দরজা দুটি স্থাপিত হয়। এই দরজা দুটি দিয়ে একটি পথে প্রবেশ করা যায়, যার ডান ও বামে দুটি মক্তব স্থাপিত হয়েছে। বামদিকের মক্তবটি ৭৫০ হিজরীতে (১৩৩৯ খ্রীঃ) শাহজাদা আকবাগা আবদুল ওয়াহিদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে এটিতে আল-আযহার গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত। এই অংশে সোনালী ও বিভিন্ন রঙের সমাবেশে মোজাইকের একটি মিহরাব নির্মিত হয়। এই মিহরাবটি কায়রোর সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় মিহরাবগুলোর অন্যতম। দ্বিতীয় মক্তবটি হিজরী ৭০৯ (১৩০৯ খ্রীঃ) শাহজাদা তাইবার আল-আখাই কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

অলঙ্করণ : আল-আযহার মসজিদটি বারংবার পুনর্নির্মাণের ফলে মূল স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য ও অলঙ্করণ বহু পূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এসত্ত্বেও প্রাচীন অলঙ্করণের নিদর্শন ক্রেসওয়েল আবিষ্কার করেছেন। খলিফা আল-মুইজ এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ মসজিদের অলঙ্করণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। পলেস্তারার উপর কেটে এই নক্শাগুলো সৃষ্টি করা হয়। এই ধরনের অলঙ্করণ (plaster cut) মসজিদের নেভ, মিহরাব, কিবলা-প্রাচীর এবং উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম দেওয়ালে এবং সাহানের পরবর্তী খিলানশ্রেণীর শেষাংশের কোথাও কোথাও দেখা যাবে। এ নক্শাগুলো প্রধানত দুই, তিন অথবা পাঁচ-পত্রবিশিষ্ট 'পামেট'। এ ছাড়া কূফীরীতিতে উৎকীর্ণ লিপিমালা অলঙ্করণে ব্যবহৃত হয়। মাকরীযী মসজিদের মিহরাবে একটি রৌপ্য পাড় ছিল বলে উল্লেখ করেন, যার ওজন ছিল পাঁচ হাজার দিরহাম।

পুনর্নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যবর্ধন

ফাতেমীয় যুগ : মাকরীযী তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'খিতাতে' মিশরীয় মসজিদসমূহের বিবরণ দেন। তবে পরিবেশিত তথ্যানুযায়ী ফাতেমীয় খলিফা আবদুল আযীয (৯৭৫-৯৬ খ্রীঃ) আল-আযহার মসজিদের সম্প্রসারণ করেন এবং পূর্বের কোনো কোনো অংশ পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি নতুনভাবে ছাদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। আল-মাকরীযী একটি লোক-

কাহিনীর (legend) উল্লেখ করে বলেন যে, তিনটি স্তম্ভের উপর পাখির প্রতিকৃতি খোদিত করা হয় এই কারণে, যাতে সেগুলোর ঐন্দ্রজালিক গুণে কোনো পাখি মসজিদের অভ্যন্তরে বাসা বানাতে না পারে। অপ্রকৃতিস্থ খলিফা আল-হাকিম (৯৯৬-১০২১ খ্রীঃ) আল-আযহার মসজিদের সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যবর্ধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মসজিদের উন্নয়নের জন্য তিনি অনেক জমি ওয়াকফ করে দেন। তিনি ১০১০ খ্রীস্টাব্দে দুপাল্লাবিশিষ্ট তুর্কী পাইন কাঠের একটি অলঙ্কৃত দরজা সংযোজন করেন। বর্তমানে এই দরজাটি কায়রোর ইসলামী শিল্পকলা জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। দরজাটি ৩.২০ মিটার উঁচু। ডঃ সোয়াদ মেহের বলেন যে, হাকিম পশ্চিম দরজার নিকট একটি সুন্দর ব্যালকনি নির্মাণ করেন, যা 'ফাতেমীয় ব্যালকনি' নামে পরিচিত। আল-মুনতাসির (১০৩৬-৯৫ খ্রীঃ) আল-আযহার মসজিদের পুনর্নির্মাণ করেন। খলিফা আল-আমির (১১০১-৩০ খ্রীঃ) তুর্কী পাইন কাঠের নক্শাকৃত মিহরাব নির্মাণের নির্দেশ দেন। এই মিহারাবটি ছিল খুবই আকর্ষণীয়। লতাপাতা ও জ্যামিতিক নক্শা বা অ্যারাবেস্কের প্রয়োগে এই মিহরাবটি অলঙ্কৃত হয়। অবতল মিহরাবটির দুপাশে দুটি স্তম্ভ খোদিত হয় এবং উপরে কুফীরীতিতে একটি শিলালিপি উৎকীর্ণ করা হয়। ইসলামী শিল্পকলা জাদুঘরে রক্ষিত এই মিহরাবটির শিলালিপি উদ্ধার করে জানা যায় যে, ৫১৯ হিজরীতে আল-আমির এই মিহরাবটি সংযোজন করেন। পরবর্তী খলিফা আল-হাফেজ (১১৩০-৪৯ খ্রীঃ) ৫৪৪ হিজরীতে (১১৪৯ খ্রীঃ) মসজিদটির আমূল পরিবর্তন করেন। তিনি ভূমি-নক্শার রদবদল করে চত্বরের চারদিকে লিওয়ানকে ঘিরে বর্তমান পিস্তাক বা খিলানাকৃতি অংশ সংযোজন করেন। উপরন্তু, তিনি নেভের অপর প্রান্তে একটি গম্বুজও নির্মাণ করেন। এই গম্বুজটির অভ্যন্তরে কুফীরীতিতে উৎকীর্ণ কুর'আনের বাণী, যেমন– 'আয়তুল কুরসী' এবং 'সুরা ইয়াসিন' দ্বারা শোভিত ছিল। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, তিনি আল-আযহার মসজিদে একটি 'মাকসূরা'ও সংযোজন করেন।

আয়্যুবী যুগ : ফাতেমী আমলের পর আয়্যুবী রাজবংশের অভ্যুত্থান হয় এবং সালাহউদ্দিন আয়্যুবী (১১৭৪-৯৩ খ্রীঃ) এই মসজিদের সংস্কার করেন। তিনি মিনারটি সুউচ্চ করেন। অবশ্য ১১৭৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি মিহরাবের রৌপ্য পাড়টি স্থানান্তরিত করেন। শিয়া ফাতেমীদের ক্ষমতাচ্যুত করে সালাহউদ্দিন আয়্যুবী তাদের প্রভাব খর্ব করার প্রায়াস পান। সাফায়ী মতবাদ অনুযায়ী একই শহরের দু মসজিদে খোত্বাপাঠ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে যেহেতু আল-হাকিমের মসজিদে খোত্বা পাঠ করা হত, তাই আল-আযহার মসজিদে খোত্বাপাঠ নিষিদ্ধ করা হয়। পরবর্তীকালে মামলুক সুলতান বায়বার্স এই মসজিদে খোত্বাপাঠ পুনঃপ্রবর্তন করেন।

মামলুক যুগ : মামলুক সুলতানদের রাজত্বকালে আল-আযহার মসজিদ এর লুপ্ত গৌরব ফিরে পায়। বাহারী মামলুক সুলতানগণ (১২৫০-১৩৯০ খ্রীঃ) পুনরায় এই মসজিদে খোত্বাপাঠ প্রচলিত করেন এবং সুলতান বায়বার্স (১২৬০-৭৭ খ্রীঃ) এক ফরমানে এই নির্দেশ জারি করেন। আলজিয়ার্স জাদুঘরে রক্ষিত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, বায়বার্স ৬৬৫ হিজরীতে (১২৬৬ খ্রীঃ) আল-আযহার মসজিদে একটি কাঠের নক্শাকৃত মিহরাব নির্মাণ করেন। তিনি মসজিদের দেওয়াল ও ছাদের

সংস্কার করেন। তাঁর সময় একটি মাকসূরাও সংযোজিত হয়। হিজরী ৭০২ অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ১৩০২-৩ সনে ভূমিকম্পে আল-আযহার মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হলে শাহজাদা সালার মসজিদটির পুনর্নির্মাণে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে সুলতান কালাউনের রাজত্বের সেনাধ্যক্ষ শাহজাদা আলাউদ্দিন তাইবার ৭০৯ হিজরীতে (১৩১৯ খ্রীঃ) মসজিদটির উত্তর-পশ্চিমদিকের সম্মুখভাগের (ফাসাদ) ডানপাশে একটি মাদ্রাসা বা মক্তব নির্মাণ করেন। তিনি এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার জন্য অজস্র অর্থব্যয় করেন এবং সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেন। মাকরীযীর ভাষায়, "আল-আযহার মসজিদের সংলগ্ন এটি অন্যতম প্রধান মাদ্রাসা........এই মসজিদে তিনি শৌচাগার এবং জলাধার নির্মাণ করেন। শাহজাদা তাইবার এখানে সমাহিত রয়েছেন।" তাইবারেব নামানুসারে নির্মিত এই মাদ্রাসাটি এখনও বিদ্যমান। ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে কাযী নিজাম আদ-দীন মুহম্মদ আল-ইস'ইরদী মসজিদের সংস্কারসাধন করেন। আল-ইস'ইরদী কায়রোর মুহতাসিব ছিলেন। ১৩৪০ খ্রীস্টাব্দে আমীর আকবুগা আল-আযহার মসজিদের উত্তর-পশ্চিম ফাসাদের বামপাশে স্বীয় নামানুসারে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। পূর্বে এই স্থানে একটি ওজুখানা ছিল। ১২৬৬ খ্রীস্টাব্দে এই মাদ্রাসাটি একটি গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়।

৭৬১ হিজরী (১৩৫৯-৬০খ্রীঃ) সনে আল-আযহার মসজিদটির সংস্কার, সম্প্রসারণ এবং অলঙ্করণ করা হয়। আমীর বশীর আল-জামদার মসজিদের দেওয়াল ও ছাদের পুনঃসংস্কার করেন। টালির সাহায্যে মেঝে আচ্ছাদিত করা হয়। দক্ষিণ ফটকে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। কুর'আনশিক্ষার ব্যবস্থা এবং মিসকিনদের বিনামূল্যে অন্নদানের ব্যবস্থা করা হয়। হানাফী মাযহাবের ইমাম নিযুক্ত করে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচলন করেন।

বাহরী মামলুকদের ক্ষমতা লুপ্ত হলে তাঁদের উত্তরাধিকারী হিসেবে বুরজী মামলুকগণ (১৩৮২-১৫১৭ খ্রীঃ) মিশর শাসন করেন। বুরজী সুলতানগণ আল-আযহার মসজিদ-মাদ্রাসার উন্নয়নে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। সুলতান বারকুকের (১৩৮২-১৩৯৮ খ্রীঃ) আমলে শাহজাদা আল-তা-ওয়াসী বাহাদার আল-আযহার মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এই আমলে আল-আযহার মসজিদের পুরাতন মিনারটি ভেঙে ফেলা হয়; কারণ এর উচ্চতা ছিল খুম কম এবং স্থাপত্যের দিক থেকে অসামাঞ্জস্য-পূর্ণ। তিনি পুরাতন মিনারের স্থলে একটি নতুন, সুউচ্চ এবং অলঙ্কৃত মিনার নির্মাণ করেন। এই মিনারটি নির্মাণে ব্যয় হয় ১৫,০০০ রৌপ্যমুদ্রা বা দিরহাম। কিন্তু পরবর্তী মিনার ৬১৬ হিজরী (১৪১৫ খ্রীঃ) সনে বারকুকের মিনারটি ভেঙে কায়রোর গভর্নর শাহাজাদা তেজুদ্দীন আল-সুবকী একটি নতুন মিনার স্থাপন করেন। স্থাপত্যিক দিক থেকে মিনারটি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় এটি হেলে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে মিনারটি ৮২৭ হিজরী (১৪২৪ খ্রীঃ) সনে পুনর্নির্মিত হয়। এই নির্মাণকাজ সুলতান আল-আশরাফের (১৪২২-৩৮ খ্রীঃ) রাজত্বকালে সম্পূর্ণ হয়। একই বছর মসজিদের চত্বরে একটি পানির হাউজ নির্মিত হয়। হাউজটির উপরে একটি গম্বুজ ছিল। আশরাফের রাজত্বে শাহজাদা গওহর আল-কানুকবায়ীর আল-আযহার মসজিদের উত্তর-পূর্বকোণে

গওহরিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদ্রাসাটিতে চারটি ব্যালকনি ছিল এবং মধ্যভাগে একটি 'নেভ' নির্মিত হয়। মাদ্রাসার মেঝে মার্বেল দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। ডঃ সোয়াদ মেহের বলেন, "The parts of the school were wrongly symmetrical. Its upper windows were made of coloured glass which created in the school a romantic atmosphere both in sunshine and moonlight. Its doors and wall cupboards were made with great care and art : flower patterns ; geometrical patterns and writings were engraved on them and they were decorated with ivory, shells and ebony so that they became splendid artistic chef di'oeuvres."

মাদ্রাসার দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি গম্বুজবিশিষ্ট চতুষ্কোণাকার ইমারত রয়েছে। এই ইমারতটি শাহজাদা গওহর আল-কানুকবায়ীর সমাধি। পরবর্তী পর্যায়ে ১৪০৬ খ্রীস্টাব্দে আমির সুদূন মসজিদটির সংস্কারসাধন করেন। এই সংস্কারের মধ্যে মিহরাবের অলঙ্ককরণ এবং স্তম্ভের মসৃণকরণ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বুরজী মামলুকদের আমলে আল-আযহার মসজিদের সর্বাঙ্গীণ সৌন্দর্যবর্ধন করেন সুলতান কয়েত বে (১৪৬৮-৯৫ খ্রীঃ)। ১৪৬৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি মসজিদের উত্তর-পশ্চিম তোরণটি ভেঙে পুনর্নির্মাণ করেন এবং সেইসাথে একটি মিনারও প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪৭৬-৭৭ খ্রীস্টাব্দে মসজিদের উত্তর-পূর্ব তোরণটিও পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হয়ে পড়লে সংস্কার করা হয়। কয়েত বে'র মিনারটি বর্তমান মসজিদের উত্তর-পশ্চিম তোরণের ডান পাশে অবস্থিত। কয়েত বে'র শাসনামলে খাজা মুস্তাফা ইবনে মাহমুদ সংস্কারকাজ পরিচালনা করেন। এই কাজে মোট ১৫,০০০ দিনার খরচ হয়। ৯০১ হিজরী (১৪৯৬ খ্রীঃ) সনে একটি শৌচাগার, জলাধার এবং পানির বেসিন স্থাপিত হয়। কয়েত বে আল-আযহার মসজিদে সিরীয়, তুর্কী এবং মাগরেবীদের জন্য পোর্টিকো প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান কানসু আল-গাওরী (১৫০০-১৫১৬ খ্রীঃ) আল-আযহার মসজিদে যে মিনার নির্মাণ করেন তা খুবই আকর্ষণীয়। তিনি তাইবাসীয়া মাদ্রাসার ডানে এই সুউচ্চ এবং অলঙ্কৃত মিনারটি প্রতিষ্ঠা করেন। জনৈক লেখক বলেন যে, "দুই মাথাবিশিষ্ট এই মিনারটি খুবই প্রশস্ত ও উচ্চ। মোজাইকের ব্যবহারে অলঙ্কৃত এই মিনারটিতে সিঁড়ির সাহায্যে উপরে ওঠা যায়। পরপর দুটি ব্যালকনি রয়েছে। শীর্ষদেশে গম্বুজাকৃতি কুপোলা ব্যবহৃত হয়েছে। গাওরী মিহরাবের সম্মুখস্থ গম্বুজটি পুনর্নির্মাণ করেন।

তুর্কীযুগ : যুগ যুগ ধরে আল-আযহার মসজিদের সংস্কার, সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়েছে। তুর্কী শাসনামলে অটোমান সুলতান প্রথম সেলিম ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে মামলুক বংশ ধ্বংস করে মিশরে আধিপত্য বিস্তার করেন। সেলিম আল-আযহার মসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় করেন এবং দীন-দুঃখীদের অর্থ বিতরণ করেন। তুর্কী আমলে অসংখ্যবার আল-আযহার মসজিদ সংস্কার-সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা হয়। ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে আল-শরীফ মুহম্মদ পাশা এই মসজিদটি সংস্কার করেন। মিশরের তুর্কী শাসক হাসান পাশা আল-দেফতাবদার ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দে আল-আযহার

মসজিদটির সৌন্দর্যবৃদ্ধি করেন। মেঝে টালি দ্বারা আবৃত করা হয়। ১৬২৫ খ্রীস্টাব্দে ইসমাইল বে ইবনে আয়ায়াজ বে মসজিদটির ভগ্ন ছাদ পুনর্নির্মাণ করেন। ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দে শাহজাদা ওসমান কাতখুদা মসজিদটির পরিবর্ধন সাধন করেন। তিনি অন্ধদের জন্য একটি জাওয়ায়ী (Zawia) অর্থাৎ পৃথক নামাজগৃহ নির্মাণ করেন। এই অংশটি মসজিদের বাইরে ছিল; পরে এটি ভেঙে ফেলা হয়। তিনি সিরীয়, তুর্কী এবং আফগানদের জন্য নির্মিত পোর্টিকো পুনর্নির্মাণ করেন। ১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দে মন্ত্রী আহমদ পাশা কাউর আল-আযহার মসজিদে দুটি সূর্যঘড়ি দান করেন, যা এখনও দেখা যাবে। আল-আযহার মসজিদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ শুরু করেন শাহজাদা আবদুর রহমান কেতখুদা। ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি নতুন আইল সংযোগ করে মসজিদটিকে কিবলার দিকে সম্প্রসারিত করেন। এ ছাড়া তিনি তাইবার্সীয়া মাদ্রাসার নতুন দেওয়াল নির্মাণ করেন। পের্টিকো নির্মাণে মসজিদটির আয়তন বৃদ্ধি পায়। এই সম্প্রসারণে ৫০টি মার্বেলের স্তম্ভ ব্যবহৃত হয় এবং এই স্তম্ভগুলো থেকে পাথরের কৌণিক খিলান নির্মিত হয়। ছাদ উন্নতমানের কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে এই পোর্টিকোটি পুনর্নির্মিত হয়। এই অংশে কেতখুদা মার্বেলের একটি সুন্দর মিহরাব স্থাপন করেন এবং মিহরাবটির উপরে একটি গম্বুজ স্থাপিত হয়। এ ছাড়া একটি অলঙ্কৃত কাঠের মিমবারও প্রতিষ্ঠিত হয়। মিমবারের বামদিকে মার্বেলের একটি প্লেটে কুফীরীতিতে শিলালিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। এই লিপিকলাতে আল্লাহ, মুহম্মদ এবং যে দশজনকে বেহেস্তের প্রতিশ্রুতি দেন তাঁদের নাম উৎকীর্ণ করা হয়েছে। কেতখুদা একটি বৃহদাকার দরজা এবং স্বীয় সমাধি নির্মাণ করেন। এই দরজার সন্নিকটে তিনি একটি মিনার স্থাপন করেন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাসা ও মিনার ভেঙে একটি দরজা নির্মাণ করা হয়।

তুর্কী শাসনামলে মিশরের প্রাদেশিক গভর্নর বা পাশাগণ আল-আযহার মসজিদের সংস্কার, সম্প্রসারণ ও অলঙ্করণে অংশগ্রহণ করেন। ইব্রাহিম বে গওহর আল-কানকুবায়ীর মাদ্রাসা-সমাধির উপর শারকীয়া প্রদেশের বিদ্যার্থীদের জন্য একটি রিওয়াক স্থাপন করেন। এই রিওয়াকটি পূর্বনির্মিত একটি ইমারতকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়। আল-খাতিব তাঁর প্রখ্যাত 'আল-আযহার' গ্রন্থে বলেন যে, ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে মোহম্মদ ওয়াদ্দা আল-সেননাবীর অনুরোধে আল-আযহার মসজিদে সেননাবী পোর্টিকো স্থাপিত হয়। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে আল-আযহারের রেক্টর শেখ ইব্রাহিম আল-বাগাওরীর প্রচেষ্টায় তাঁর গোষ্ঠীর লোকদের জন্য একটি পোর্টিকো নির্মিত হয়। পের্টিকোটি 'হানাফী পোর্টিকো' নামে পরিচিত। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে আবদুর রহমান কেতখুদা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দরজা এবং শ্রেণীকক্ষসমূহের সংস্কার করা হয়। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে প্রধান নামাজগাহের ডানদিকে কয়েকটি খিলানশ্রেণী পুনর্নির্মিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে আল-আযহার মসজিদে প্রতিষ্ঠিত আকবুগাবীয়া মাদ্রাসার উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম ফাসাদ এবং অভ্যন্তরের চারটি চতুষ্কোণী স্তম্ভ ও আটটি গোলায়িত স্তম্ভের সংস্কার করা হয়। খেদিভ তৌফিক ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে কেতখুদা কর্তৃক নির্মিত নামাযগাহ এবং ব্যালকনিসমূহ পুনর্নির্মাণ করেন। পূর্ববর্তী পোর্টিকোসমূহের সংস্কার করা হয়। এ ছাড়া

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম ব্যালকনির খিলানরাজিও নতুন করে তৈরি করা হয়। খোদিভ আব্বাস ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে সাহানের চতুর্দিকের রিওয়াকসমূহ পুনর্নির্মাণ করেন। তবে পুরাতন পলেস্তারার অলঙ্করণ অক্ষত রাখা হয়। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে আল-আযহার মসজিদের উত্তর-পশ্চিম ফাসাদ এবং তৎসংলগ্ন বিশালাকারের দরজা সংস্কার করা হয়। তবে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে এই সংস্কারকাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়নি। 'রিওয়াক আল-আব্বাসী' নামে পরিচিত এই পোর্টিকো ত্রিতলবিশিষ্ট এবং পশ্চিমকোণে সর্ববৃহৎ কক্ষটি অনেকটা আকবুগাবীয়া মাদ্রাসার ন্যায় নির্মিত।

উপসংহার : ফাতেমীয় স্থাপত্যকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কায়রোর আল-আযহার মসজিদ মুসলিম শিল্পকলার একটি অনবদ্য সৃষ্টি। ভূমি-পরিকল্পনা, স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য এবং অলঙ্করণের দিক দিয়ে বিচার করলে এই অতুলনীয় ইমারতটি শতাব্দীর নির্মাণকর্মের স্বাক্ষর বহন করছে। কেবলমাত্র মসজিদ হিসেবেই নয়, ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এই মসজিদটির কৃতিত্ব অসামান্য। ফাতেমী খলিফা আল-আজিজের রাজত্বকালে (৯৭৫-৯৯৬ খ্রীঃ) ইয়াকুব ইবনে কিলিসের (আবুল ফাবাগ) পরামর্শে ৯৮৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে আল-আযহার মসজিদে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন হয়। প্রত্যেক শুক্রবার এখানে ইসলামী আইনশাস্ত্রের পাঠদান করা হত। আবু ইয়াকুব এই মহাবিদ্যালয়ের প্রথম রেক্টর ছিলেন। ক্রমশ এই মহাবিদ্যালয় বর্তমানের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ৯৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই মসজিদটি এক হাজার বছর ধরে পুনর্নির্মিত, সম্প্রসারিত, পরিবর্তিত ও অলঙ্কৃত হয়। বলা বাহুল্য, আল-আযহার মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিমজগতের একটি গর্ব। এই মসজিদে যুগ যুগ ধরে অসংখ্য পোর্টিকো (২৯), আইল (১৩), মিহরাব (১৩), মিনার (৬), তোরণ (৯) নির্মিত হয়েছে। ভূমি-নক্‌শার দিক থেকে মদিনার মসজিদের মতো আল-আযহার মসজিদটি 'চত্বর পরিকল্পনা' (Courtyard plan) অনুযায়ী নির্মিত। এর আয়তাকার ভূমি-পরিকল্পনায় নির্মিত আল-আযহার মসজিদের 'নেভ'টি দামেস্কের মসজিদের অনুকরণে স্থাপিত। আইলের ব্যবহারে ইবনে তুলুন মসজিদের প্রভাব দেখা যায়। তবে এই মসজিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কিবলা-প্রাচীরের দুপ্রান্তে দুটি গম্বুজ। এ ধরনের গম্বুজ সিরিয়া, ইরাক বা পারস্যের কোনো মসজিদে দেখা যায়নি। কিন্তু স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার অনেক মসজিদে এ ধরনের গম্বুজ দেখা যাবে। যেমন—মরক্কোর তিনমেলে আবদ আল-মুমিনের মসজিদ, মরক্কোর কুতুবীয়া মসজিদ, স্পেনের সেভিলে আবু ইয়াকুব ইউসুফের মসজিদ ইত্যাদি।

২। কায়রো, আল-হাকিমের মসজিদ, ৯৯০-১০০৩-৪ খ্রীঃ

কায়রো বা আল-কাহিরার বেষ্টনীপ্রাচীরের বাইরে বাব আল-ফুতুহর সন্নিকটে ৯৯০ খ্রীস্টাব্দে খলিফা আল-আজিজ একটি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১০০৩-৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পুত্র আল-হাকিম এটির নির্মাণ সমাপ্ত করেন এবং তাঁর নাম থেকেই এটির নামকরণ হয়েছে আল-হাকিমের মসজিদ। চল্লিশ হাজার দিনার ব্যয়ে নির্মিত এই মসজিদটির ভূমি-পরিকল্পনা আয়তাকার। কিন্তু চারটি বাহু সমান নয়। উত্তর-

পশ্চিমদিকে ৩৯৮ ফুট, দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ৩৫১ ফুট, দক্ষিণ-পূর্বদিকে ৩৯৬ ফুট, উত্তর-পূর্বদিকে ৩৫৬ ফুট।

আল-হাকিমের মসজিদটির লিওয়ান পশ্চিমদিকে অবস্থিত এবং সাহানের চারপাশে রিওয়াক ছিল। বর্তমানে মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। লিওয়ানে পাঁচটি আইল ছিল এবং এগুলো কিবলা-প্রাচীরের সাথে সমান্তরালভাবে স্থাপিত ছিল। সমান্তরাল আইলগুলোর মধ্যভাগে কেন্দ্রীয় মিহরাব বরাবর একটি ট্র্যানসেপ্ট বা লম্বালম্বি 'বে' ছিল, যা আইলকে দুভাগে ভাগ করেছে। এই মসজিদে ইট ও পাথর উভয় উপাদানই ব্যবহৃত হয়। প্রতি সারি আইলে আটটি খিলান রয়েছে। প্রধান মিহরাবের সম্মুখে একটি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে স্কুইঞ্চের সাহায্যে। কিবলার দিকে দুপ্রান্তে আরও দুটি গম্বুজ ছিল। পিলারগুলোতে সংলগ্ন পালাস্টার ছিল। ছাদ বহুপূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কৌণিক (ওজী) খিলান, বিভিন্ন ধরনের স্তম্ভ কাঠের বন্ধনী (tie beam) এবং দুটি বিশালাকার চতুষ্কোণী প্রধান তোরণে এই মসজিদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এটিতে সুউচ্চ মিনার এখনও ভগ্নাবস্থায় দেখা যাবে। এই মসজিদে মোট তেরোটি প্রবেশপথ ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন, যথা– উত্তরদিকে পাঁচটি, পূর্বদিকে তিনটি, পশ্চিমদিকে তিনটি এবং কিবলার দিকে দুটি। পরবর্তীকালে এ মসজিদটি পরিবর্ধিত হয়। ধারণা করা হয় যে, আল-হাকিমের মসজিদ ইবনে তুলুন এবং আল-আযহার মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে নির্মিত। আন্দ্রে পাপাডোপোলো বলেন, "This mosque dating from 1004 is a ruin, but its ogival arcades ornamented by niches are very reminiscent of those of in the Ibn Tulun mosque...sober decorative motifs are sculpted in their stone, and they are girdled by beautiful inscriptions in a florid kufic."

৩। কায়রো, আল-জুয়ুশীর মসজিদ, ১০৯৪ খ্রীঃ

মুকাত্তাম পাহাড়ের সন্নিকটে ১০৯০ খ্রীস্টাব্দে খলিফা আল-মুসতানসির বিল্লাহর নির্দেশে তাঁর সেনাধ্যক্ষ বদর আল-জামালী আল-জুয়ুশী মসজিদ নির্মাণ করেন। পাপাডোপোলো যথার্থ বলেন, "Probably making use of the same Syrian workers who built the city walls and gates, the vizier Badr-al-Jamali had a kind of Martyrium erected on the Mokattam platean above the city. Externally, it has nothing in common with a mosque, resembling instead a Christian Convent. The mihrab is beautifully decorated in stucco with clusters of grapes intertwined with foliage scrollwork."

আয়তাকার আল-জুয়ুশীর মসজিদটি আয়তনে উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ৫৯ ফুট দৈর্ঘ্য এবং উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৪৯ ফুট প্রস্থ। উত্তর-পশ্চিম ফাসাদে এর প্রধান প্রবেশপথ রয়েছে। এই মসজিদটি ইট এবং পাথরের তৈরি। প্রবেশপথটি ক্ষুদ্রাকৃতি এবং খিলানবিশিষ্ট। প্রবেশপথটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। এই

প্রবেশপথ দিয়ে সাহানে প্রবেশ করতে হয়। এর উভয় পাশে সমআকৃতির দুটি আয়তাকার কক্ষ রয়েছে যাকে রিওয়াক বলা যায়। তিন-খিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথ দিয়ে লিওয়ানে প্রবেশ করতে হয়। মধ্যভাগে খিলানপথটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। মধ্যভাগের খিলানটি দুজোড়া মার্বেলের স্তম্ভের সাহায্যে নির্মিত।

আল-জুয়ূশীর মসজিদটি ফাতেমী স্থাপত্যকলার একটি ব্যতিক্রমধর্মী ইমারত। কিবলা-প্রাচীরে একটি অর্ধগোলাকার মিহরাব রয়েছে। এর সম্মুখে একটি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। সামনের ফাসাদের মধ্যভাগে যে মিনার নির্মিত হয় তার উচ্চতা ৬৫১/২ ফুট। এটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম দুসারি বর্গাকার এবং তৃতীয়টি অষ্টভুজাকৃতি এবং গম্বুজ দ্বারা আবৃত। আল-জুয়ূশীর মসজিদটি অলঙ্করণের দিক থেকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। জ্যামিতিক, অ্যারাবেস্ক ও শিলালিপি (কূফী) এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। পলেস্তারা অলঙ্করণে এ মসজিদের স্থান আল-আযহার মসজিদের পরেই। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, এ মসজিদের মিনারে প্রথম মুকার্নাস বা ছোট ছোট খিলান আলঙ্কারিকভাবে সাজিয়ে সৃষ্ট নক্শা ব্যবহৃত হয়।

৪। কায়রো, আল-আকমার মসজিদ, ১১২৫ খ্রীঃ

আল-আকমার মসজিদটি ফাতেমী স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। হাকিমের মসজিদের ৯৮১ ফুট দক্ষিণ-পশ্চিমে এই ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত আকর্ষণীয় মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। মাকরীযীর মতে, এটি খলিফা আল-আমীর এবং উজীর আল-মামুন-আল-বাতাইহী ১১২৫ খ্রীস্টাব্দে নির্মাণ করেন। এ মসজিদটির প্রধান আকর্ষণ এর ফাসাদে বা সম্মুখভাগ সনাতনী ভূমি-নক্শার উপর ভিত্তি করে নির্মিত। অর্থাৎ লিওয়ান, সাহান ও রিওয়াক দেখা যাবে। এর পরিমাপ উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ৩৩১/২ ফুট, উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৩২ ফুট। লিওয়ান দুআইলে বিভক্ত হলেও রিওয়াকে একটি আইল দেখা যাবে। সাহানের চার কোণায় চারটি ইংরেজি L-অক্ষরের অনুরূপ স্তম্ভ রয়েছে, কিন্তু এগুলোর মধ্যবর্তী স্তম্ভগুলো গোলাকার। এখানে কাঠের বন্ধনী বা tie-beam ব্যবহৃত হয়েছে। এ মসজিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, কিবলা-প্রাচীর থেকে দুসারিবিশিষ্ট লিওয়ানের মধ্যভাগে কোনো স্তম্ভ বা খিলান নেই এবং ২৬১/৪ ফুট প্রশস্ত। সম্মুখের প্রস্তর নির্মিত ফাসাদ কিবলা-প্রাচীরের সমান্তরাল না হয়ে তেরচা করে নির্মিত হয়েছে। এটিতে প্রবেশতোরণ নির্মিত হয়েছে। এই তোরণের দুপাশে অবতলাকৃতি মিহরাব আকারের বৃহদাকার কুলুঙ্গী দেখা যাবে। এগুলোর প্রধান আকর্ষণ সুউচ্চ খিলান। পাপাডোপোলো বলেন, "Decidedly agitated the facade strikes one as almost Baroque compared with that of the al-Salih Tala`i Mosque. The large recess of the portal has the same sunburst relief, though here cut very deeply and these are other blind niches, stone stalactites, rosettes and window grills that combine to create the animated effect of this highly sculptured facade."

আল-আকমারের মসজিদটি পরবর্তীকালে বহুবার সংস্কার করা হয়। মামলুক সুলতান বারকুক এ মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করেন। তুর্কী আমলেও এর সংস্কার করা হয়।

৫। কায়রোর, আল-সালেহ তালাইয়ের মসজিদ, ১১৬০ খ্রীঃ

বাব যুওয়াফ্লার দক্ষিণে অবস্থিত আল-সালেহ তালাইয়ের মসজিদটি স্থাপত্যরীতি ও অলঙ্করণের দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ফাতেমী খিলাফতে একটি আকর্ষণীয় নিদর্শন এই মসজিদটি ১১৬০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়। সনাতনী ভূমি-নক্শার উপর নির্মিত হয় মসজিদটি, যাতে তিনসারিবিশিষ্ট আইল, সাহান ও রিওয়াক রয়েছে। আয়তাকার এই মসজিদটির আয়তন উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ১৩৬ ফুট এবং উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৮৩১/৪ ফুট। মসজিদটির প্রাচীর পাথরে নির্মিত হলেও মূলত এ ইমারতে ইটের ব্যবহার দেখা যায়। পাপাডোপোলো বলেন, "But the distinction of this mosque lies in the purity and sobriety of its outer facade in hewn stone with its rhythmic arrangement of five keel arches flanked by two blind niches of similar profile that contain a sun burst of radiating moulding."

আল-সালাহ তালাই-এর মসজিদটি উঁচু ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিচে ছিল বিপণী এবং এর উপর ভিত্তি করে এ মসজিদ নির্মিত হয়। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমদিকের প্রবেশপথে পৌঁছতে অনেক ধাপবিশিষ্ট সিঁড়ি ব্যবহার করতে হয়। মসজিদের সাহানটির দৈর্ঘ্য ৭৬১/২ ফুট এবং প্রস্থে দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্তে ৬০১/২ ফুট। কিবলা-প্রাচীরের সম্মুখে সমান্তরাল প্রশস্ত আইল রয়েছে, অভ্যন্তরে দুটি খিলানসারি লিওয়ানকে তিনভাগে ভাগ করেছে। প্রতিটি সারিতে সাতটি করে কীল (keel) খিলান রয়েছে। খিলান থেকে খিলান পর্যন্ত কাঠের বন্ধনী দেখা যাবে। বর্গাকার ভিতের উপর স্তম্ভগুলো গোলাকার। কিবলা-প্রাচীরের মধ্যভাগে একটি অবতলাকৃতি মিহরাব তৈরি করা হয়েছে। এ মসজিদটি বহুবার সংস্কার করা হয়েছে, যার ফলে কৌণিক উপাদানগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। এ মসজিদের মূল মিনারটিও মসজিদসহ ১৩০৩ খ্রীস্টাব্দের ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ে। পরে এ দুটি সংস্কার করা হয়।

এ.বি.এম. হোসেন বলেন, "মসজিদটির সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এর খিলান ছাদবিশিষ্ট ভিত। এ বৈশিষ্ট্য ফাতেমীয় স্থাপত্যে পরিলক্ষিত হয়নি। উমাইয়া এবং আব্বাসীয় প্রাসাদে এ বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হলেও এর প্রয়োগ প্রাসাদের নিম্নস্থ ভূমির গঠন দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। সমতল ভূমিতে এ বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। খুব সম্ভবত এর অনুরূপ পারসিক বৈশিষ্ট্য থেকে অলঙ্কৃত হয়েছে। পারসিক প্রভাবান্বিত ভারতীয় স্থাপত্যে এর প্রয়োগ তুঘলক, লোদী এবং মুঘল স্থাপত্যে দৃষ্ট হয়।"

৭

পারস্য স্থাপত্য

ভূমিকা :

৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে নেহওয়ান্দের যুদ্ধে পারসিকদের পরাজিত করে আরব সেনাবাহিনী পারস্যে আধিপত্য বিস্তার করে। এর ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণই হল না, সেই সাথে সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্পকলারও বিকাশ ঘটে। সামানীয়দের সাম্রাজ্য আরবদের পদতলে এলে মুসলিম শিল্পকলার ব্যাপক প্রসারতা ঘটে। A.U. Pope-এর ভাষায়, "The organization of the Islamic Empire dominating a culturally diverge area, opened new avenues of communication, augmenting commerce and creating an expanding economy which in time supplied the wealth needed for a new and urgent era of building both secular and religious, mosques, colleges, tombs, bridges, forts, hospitals, caravanserais and libraries were needed everywhere." (বঙ্গানুবাদ : সংস্কৃতির দিক থেকে বৈপরিত্য সত্ত্বেও ইসলামী সাম্রাজ্য বিশাল এলাকায় ব্যপৃত ছিল এবং নতুন যাতায়াতের পথ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সেইসাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এরূপ পর্যায়ে গড়ায় যে, ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ (secular) ইমারত নির্মাণের জন্য যে পর্যাপ্ত ধন-সম্পদ প্রয়োজন হল তার অভাব হল না। ফলে (নব-বিজিত রাজ্যে) মসজিদ, মাদ্রাসা, সমাধিসৌধ, পুল, দুর্গ, হাসপাতাল, সরাইখানা এবং গ্রন্থাগার নির্মাণের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিল।)

পারস্যবিজয়ের পূর্বেই আরবগণ ইস্তেখারে (Persepolis) প্রথম যে মসজিদ নির্মাণ করে তার উপাদান অ্যাকামেনীয় ইমারতের ধ্বংসাবশেষ থেকে নেওয়া হয়েছিল। মুকাদ্দেসী বলেন যে, "সিরিয়ার জা'মি মসজিদের অনুকরণে ইস্তেখারে যে মসজিদ নির্মিত হয় তার গোলাকার স্তম্ভের মাথায় গরুর মূর্তি ছিল।" এ থেকে ক্রেসওয়েল মনে করেন যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত 'অ্যাকামেনীয় প্রাসাদের আপাদানা বা স্তম্ভবিশিষ্ট হল থেকে এ ধরনের বৃষাকৃতি স্তম্ভ (bull-headed columns) সংগ্রহ করা হয়। সম্ভবত এ মসজিদটি সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত হয়। অনুরূপ অপর একটি মসজিদ স্থাপিত হয় কাযউইনে। হাজ্জাজের পুত্র মোহাম্মদ (মৃঃ ৭১০ খ্রীঃ) এই মসজিদটির নির্মাতা এবং এখানেও ইস্তেখারের মসজিদের অনুরূপ বৃষাকৃতি স্তম্ভ থাকায় এটির নামকরণ হয় 'Bull Mosque' অথবা বৃষাকৃতি স্তম্ভবিশিষ্ট মসজিদ।

মূলত ধর্মীয় প্রয়োজনে মসজিদ নির্মাণ শাসকগোষ্ঠীর অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর্থার উপেনহাম পোপ বলেন যে, মসজিদ শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের প্রতীকই (symbol) নয়, বরং সার্বভৌমত্বের নিদর্শন (an essential confirmation of sovereignty)। একারণে সপ্তম শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী, অর্থাৎ সাফাভী যুগ পর্যন্ত ইরানের সর্বত্র অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে। D. N. Wilber বলেন, "Following Arab invasion of Iran and the rapid conversion of many of its people to Islam, there was an urgent need to establish mosques (masjid) in which the believers assembled for prayers." (বঙ্গানুবাদ : ইরানে আরব বিজয়াভিযান এবং এর বহু জনসাধারণকে ধর্মান্তরিত করার ফলে বিশ্বাসীদের একত্রে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদ নির্মাণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।) দুর্ভাগ্যবশত বিজয়ের পর দু'শ বছর (ষষ্ঠ এবং সপ্তম) অর্থাৎ ইসলামের প্রথম দু'শতাব্দীর কোনো মসজিদ বা অন্য কোনো ইমারত ইরানে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকদের তথ্যাবলী থেকে জানা যায় যে, বিপুল অর্থব্যয়ে আরব শাসকগণ ইরানে বহু মসজিদ নির্মাণ করেন, এ সমস্ত মসজিদ প্রথম যুগে ছিল খুবই সাদামাটা। অনেকটা নামাজগাহের মতো। এ কারণে উইলবার বলেন যে, এটি প্রাথমিক যুগ থাকায় এর পরিকল্পনা ছিল অবিন্যস্ত ("this was, still so early in the history of Islam that the mosque plan was fluid.) এ সময়ে মসজিদে খোলা চত্বর বা সাহান, নামাজ পড়ার জন্য লিওয়ান, আজানের জন্য মিনার এবং খোৎবা পড়ার জন্য মিমবার এবং নামাজ পরিচালনার জন্য মিহরাব ব্যবহৃত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় স্থানীয় অমুসলিম ইমারত এমনকি অগ্নি-উপাসনাগারকে (Fire Temple) রূপান্তরিত করে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা হয়। পরবর্তীকালে বিশেষ করে অষ্টম শতাব্দী থেকে (বিশেষ করে দামগানের জা'মি মসজিদ থেকে) পারস্যে মসজিদের ক্রমবিকাশ ঘটে।

পোপ বলেন যে, পারস্যে তিন প্রকারের মসজিদ নির্মিত হয় : (ক) প্যাভেলিয়ন টাইপ, যা বর্গাকার ইমারতে গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত অগ্নি-উপাসনালয় থেকে অনুকরণ করা হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন ; (খ) আইওয়ান (Ivan) টাইপ, যা তাক-ই-কিসরার অনুরূপ একটি ব্যারাল ভল্টসম্বলিত গৃহ ; (গ) চত্বর বা সাহানবিশিষ্ট আরব ভূমি-নক্শা, যার মধ্যে লিওয়ান ও রিওয়াক থাকবে। পারস্যের মসজিদ-স্থাপত্যের বিকাশে সামানীয় স্থাপত্যরীতি ও অলঙ্করণের প্রভাব ছিল। ডেভিড ট্যালবট রাইস তার ইসলামী শিল্পকলা (Islamic Art) গ্রন্থে পারস্য শিল্পকলার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। পারস্য স্থাপত্যকে মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিক ভিত্তিতে নিম্নলিখিত স্তরে ভাগ করা যায় : (ক) প্রাক্-সামানী যুগ (৬৩৯-৮১৯ খ্রীঃ); (খ) সামানী যুগ (৮১৯-১০৫৫ খ্রীঃ); (গ) সেলজুক (১০৩৭-১১৯৪ খ্রীঃ); (ঘ) ইলখানী (১২৫৬-১৩৫৩ খ্রীঃ); (ঙ) তৈমুরী (১৩৬৯-১৫০৬ খ্রীঃ); (চ) সাফাভী (১৫০২–১৭৩৬ খ্রীঃ)। পারস্যের কতিপয় ঐতিহাসিক মসজিদের বর্ণনা থেকে পারস্য স্থাপত্যকলা ও অলঙ্করণের ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানা যায়। A.U Pope যথার্থই বলেন, "Persia made three outstanding contributions to muslim architecture–the development of the pointed four-centred arch and also, the perfection of domical structures and

the enrichment of surface decoration" (বঙ্গানুবাদ : মুসলিম স্থাপত্যশিল্পে পারস্য তিনটি অসাধারণ অবদান রেখে গেছে ; কৌণিক চারবিন্দু খিলান ; গম্বুজ নির্মাণের উৎকর্ষ এবং অলঙ্করণের সৌকর্য।) গ্রন্থাকার তাঁর "Mosque Architecture of pre-Mughal Bengal" গ্রন্থে বলেন, "So the mosque, a new architectural organic unit, essentially Islamic, assumed its characteristic expression in Persia in both structural ingenuity and decorative effect." (বঙ্গানুবাদ : পারস্যে একটি নতুন স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রীতি হিসেবে মসজিদ নির্মাণকৌশল এবং আলঙ্কারিক চাতুর্যের বিশেষ ভূমিকা পালন করে।)

প্রাথমিক পর্ব

প্রাক্-সেলজুক যুগে (৬৪৩-১০৩৭ খ্রীঃ) পারস্যে মসজিদের ক্রমবিকাশ ঘটে এবং বলাবাহুল্য যে, সাসানীয় উপাদান ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন দেখা যায়। ফলে পারস্যের সর্বপ্রাচীন যে মসজিদ নির্মিত হয় এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমীর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই ইমারতে সাসানীয় blind arcading এবং সংলগ্ন half-round pilasters ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে এ সমস্ত উপাদান সিস্তান ও দামগানের ইমারতে দেখা যাবে। ৭৮০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত কায়রোর জা'মি মসজিদে সাসানীয় ধরনের ব্যারাল ভল্ট ও ভূসুয়ার্স খিলান লক্ষ করা যায়। ৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে ফজল ইবনে ইয়াহইয়া কর্তৃক খোরাসানে নির্মিত মসজিদ এবং ফাসা-তুরশীদ, নিশাপুর, মার্ভ, সিরাজা দামগান এবং নাইনে যে সমস্ত মসজিদ নির্মিত হয় তা স্তম্ভ এবং চত্বরবিশিষ্ট প্রাচীন আরব পরিকল্পনা-মাফিক। এমনকি দামগানে নির্মিত তারিকখানা মসজিদটিকে আরব ভূমি-নক্শার উপর একটি সাসানীয় ইমারত বলে ভ্রম হবে। সাসানীয় উপাদানগুলো দামগানের টেপী হিসারের প্রাসাদ থেকে অনুকরণ করা হয়েছে। সাসানীয় স্থাপত্যকলার ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য ৯৬০ খ্রীস্টাব্দে নাইনে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। এখানে কৌণিক খিলান, মিহরাব, সরু স্তম্ভ এবং সেলজুক অলঙ্করণ বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। পারস্যে মসজিদের ক্রমবিবর্তনে যে ভূমি-নক্শা সার্বজনীনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে তা হল আইওয়ান (Ivan)। এ পরিকল্পনা ৯৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দে নাইরিজে নির্মিত মসজিদে প্রথম দেখা যাবে। পারস্য মসজিদে কখনও কখনও গেবল বা ঢালু ছাদ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন– নবম-দশম শতাব্দীতে নির্মিত নিশাপুরের মসজিদ। পূর্ব পারস্যে আবহাওয়ার জন্য বর্গাকৃতি একগম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়, যেমন– কুখাবার নিকট হাযারাব মসজিদ।

১। দামগান, তারিকখানা মসজিদ, অষ্টম শতাব্দী

পারস্যের অন্যতম প্রাচীন মসজিদ হচ্ছে দামগানে অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত জা'মি মসজিদ, যা তারিকখানা নামে পরিচিত। মসজিদটি সেলজুক আমলে পুনর্নির্মিত হয় এবং সেইসাথে ১০৫৮ খ্রীস্টাব্দে যে মিনার নির্মিত হয়, সেলজুক আমলে তা পারস্যের অন্যতম প্রাচীন মিনার। ভূমি-পরিকল্পনায় তারিকখানায় মদিনা, দামেস্ক সামাররার

লিওয়ান, সাহান ও রিওয়াকের অনুকরণ দেখা যায়। নামাজগৃহ সমান্তরালভাবে তিনটি আইলে বিভক্ত এবং প্রতি সারিতে আটটি গোলাকার স্তম্ভের উপর ভল্টের ছাদ নির্মিত হয়েছে। মধ্যবর্তী বে-টি, যা কিবলার দিকে গেছে তা অধিক প্রশস্ত। সাহান মোটামুটি বর্গাকার এবং এটি তিনদিকে ভল্টের রিওয়াক দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ মসজিদের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে ইটের তৈরি বিশাল গোলাকার স্তম্ভ, যা ১১১/২ ফুট উঁচু এবং ৬ ফুট ব্যাসার্ধ এবং ভল্টের ব্যবহার। পাপাডোপোলা এটিকে চল্লিশ স্তম্ভের মসজিদ বা 'Mosque of the Forty Columns' বলেছেন। অলঙ্করণবিহীন সাদামাটা দামগান মসজিদে সাসানীয় স্তম্ভ ও ভল্টের ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও আর্থার উপহাম পোপ মনে করেন যে, এটি সাসানীয় ইমারত নয় (Tarikh Khana is not Sassanian)। সনাতনী পরিকল্পনায় নির্মিত তারিকখানা মসজিদটির প্রশংসা করে পোপ বলেন, "It certainly expresses dignity and confidence but also humility." (বঙ্গানুবাদ : নিশ্চিতভাবে এ মসজিদ সম্ভ্রম ও আত্মবিশ্বাসই শুধু প্রকাশ করছে না, সে সাথে নম্রতাও।)

২। নাইন, জা'মি মসজিদ, ৯৫০ খ্রীঃ

তারিকখানা মসজিদে সাসানীয় প্রভাব থাকলেও দশম শতাব্দীতে নাইনে নির্মিত জা'মি মসজিদটিকে নিঃসন্দেহে ক্লাসিক্যাল এবং টিপিক্যাল ইসলামী ইমারত বলা যাবে। দামগানের মতো নাইনের মসজিদেও লিওয়ান, সাহান ও রিওয়াক দেখা যাবে। তবে উপাদানের ব্যবহারে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, ভল্টের ব্যবহারে সাসানীয় ইলিপটিক্যালের (Elliptical) স্থলে কৌণিক ভল্ট ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কৌণিক টানেল ভল্টগুলো পাশের তুলনায় তিনগুণ বেশি উঁচু। স্তম্ভগুলো আকারে দামগানের মসজিদের মতো মোটা নয়, বরং সরু। মিহরাব কিবলার দিকে রয়েছে এবং এটি অবতলাকার। দামগানে এ ধরনের মিহরাব দেখা যায় না। ইটের ব্যবহারেও পার্থক্য লক্ষ করা যায়। দামগানে সাসানীয় রীতিতে খাড়াভাবে (vertically) ইট গাঁথা হলেও নাইনের মসজিদে সমান্তরালভাবে ইট বসানো হয় (English bond)। নাইনের মসজিদে সুউচ্চ ঢালু মিনার নির্মিত হয়েছে। এ মিনারটি তিনভাগে বিভক্ত। সর্বনিম্নে বর্গাকার, মধ্যভাগে গোলাকার এবং সর্বোচ্চ অংশটি ভুজাকৃত। নাইন মসজিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– স্টাকোর (stucco) অলঙ্করণ। প্লাস্টারের উপর খোদাই করে জ্যামিতিক লতাপাতা ও শিলালিপির (কুফী) সমন্বয়ে অলঙ্করণ করা হয়েছে। পোপ বলেন, "The exuberance of ornament at Nayin is also Persian." (বঙ্গানুবাদ : নাইনের আলঙ্কারিক প্রাচুর্য পারস্যরীতির প্রতিফলন।) মূলত সাসানীয় স্থাপত্যে এর প্রয়োগ দেখা যাবে। অবশ্য ইসলামী যুগে এর সৌকর্য ও ব্যপকতা লক্ষ করা যায়। পোপ বলেন, "At Nayin, less than a century later, the ornamentation was not merely sumptuous and firm but subtle and original as well." (বঙ্গানুবাদ : নাইনে এক শতাব্দী পরে (তারিকখানা মসজিদ নির্মাণের) অলঙ্করণ শুধুমাত্র সৌন্দর্যমণ্ডিত ও স্থিতিশীলই ছিল না, উপরন্তু সূক্ষ্ম ও মৌলিক ছিল।)

৩। ইসফাহান, জা'মি মসজিদ, একাদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী (সেলজুক) (চিত্র ৩৪-৩৬)

পারস্যে মসজিদের ক্রমবিবর্তনে দামগান ও নাইনের মসজিদের পরে নাইরিজে ৯৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত মসজিদটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এর প্রধান কারণ এই যে, এটিতে পারস্যের সার্বজনীনভাবে ব্যবহৃত আইওয়ান (Ivan) রীতির প্রথম প্রচলন হয়। সাসানীয় ভল্টের প্রভাব থাকলেও সেলজুক আমলে পারস্য ভল্টে যে উৎকর্ষ লাভ করে তা বিস্ময়কর। সেলজুকদের শাসনামলে (১০৩৭–১১৯৪ খ্রীঃ) পারস্যে স্থাপত্যের এক নবজাগরণের সূচনা হয়। লক্ষণীয় যে, পারস্যে সেলজুক শাসকগণ ইটের উপর নক্‌শা ও অলঙ্করণে যে দক্ষতা অর্জন করেন তা ইতিপূর্বে দেখা যায় না। এ রীতিকে 'naked brick style' বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে পারস্যের স্থাপত্যিক প্রতিভা চরম উৎকর্ষ লাভ করে, যার প্রমাণ ইসফাহানের জা'মি মসজিদ।

সেলজুক আমল

সমগ্র পারস্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয় এবং মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্যকীর্তির উদ্ভব হয় সেলজুকদের শাসনামলে। পি. কে হিট্টি যথার্থই বলেন, "the advent of the Saljuq Turks ushers in a new and notable era in the history of Islam and the Caliphate." (বঙ্গানুবাদ : সেলজুক তুর্কীদের আগমনে ইসলাম তথা খিলাফতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূত্রপাত হয়।) শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতেও এ যুগ চিরস্মরণীয়। সিয়া বুয়াইয়াদের শাসনের পরিসমাপ্তিতে সুন্নী ইসলামী শাসন পুনর্জাগরিত হয় এবং প্রাচীন আরব পারস্য ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। আর্থার উপহাম পোপ বলেন যে, স্থাপত্যকলায় সেলজুকদের অপরিসীম অবদান রয়েছে। তারা 'naked brick style' অর্থাৎ পাথরের পরিবর্তে নক্‌শাকৃত ইটের সাহায্যে মসজিদ, মাদ্রাসা, সৌধ নির্মাণ করতে থাকে। পোপ বলেন যে, তাঁরাই "ইরানীয় স্থাপত্যসৌকর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন ("fulfilment of architectural genius")। সেলজুক আমলে বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্যিক ও আলঙ্কারিক রীতি ও কৌশলের উদ্ভব হয়। সুউচ্চ মিনার, সুবিশাল মসজিদ, প্রশস্ত ও সুউচ্চ গম্বুজ, খাঁজকাটা ভল্ট, মুকারনাস, বিশেষ ধরনের স্কুইঞ্চ ছাড়াও রঞ্জিত টালির অলঙ্করণ বা lustre tile-এর ব্যবহার, বিভিন্ন ধরনের লতাপাতা, জ্যামিতিক নক্‌শা, লিপিকলার ব্যবহার তারাই প্রথম প্রবর্তন করে। উইলবার যথার্থই বলেন যে, সেলজুকদের স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ড মূলত মসজিদে সীমাবদ্ধ ছিল; উদাহরণস্বরূপ সিরাজ, ইয়াজদ, ইসফাহান এবং নিশাপুরের মসজিদ। ইসফাহানে নির্মিত জা'মি মসজিদ "পারস্য মসজিদ রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন" বলে মনে করা হয়। মসজিদে আইওয়ানের সাথে স্তম্ভসম্বলিত সাহান সন্নিবেশিত হয়েছে। সেলজুক মসজিদে ব্যবহৃত খাঁজকাটা ভল্ট (একাদশ শতাব্দী) পরবর্তীকালে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে, বিশেষ করে ডারহামের গির্জায় ব্যবহৃত হয়েছে।

সেলজুক স্থাপত্যশিল্প, পোড়ামাটির ইট এবং কারুকার্যখচিত মসজিদ, মিনার ও মাদ্রাসায় মূর্ত হয়ে রয়েছে। পোপ বলেন, "তাদের ধর্মীয় অনুরাগ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের

সাধনা পারস্য থেকে উদ্ভূত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করে এবং এ সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।" সেলজুক রাজত্বের অতুলনীয় স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে অন্যতম ছিল রায়ের তুগরীল সমাধি (১১৩৯ খ্রীঃ), ইসফাহানের জা'মি মসজিদ (১০৭৫ খ্রীঃ) এবং এর অনুকরণে আরদিস্তান (১০৮০ খ্রীঃ), জাউয়াবা (১১৫৩ খ্রীঃ), গুলপাইগানের (১১২০-৩৫ খ্রীঃ) জা'মি মসজিদগুলো। বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করেছেন যে, সেলজুক স্থপতিগণ স্থাপত্যকলায় এক অভূতপূর্ব মৌলিক উপাদান প্রয়োগ করে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁদের সমস্ত পূর্ববর্তী ইমারতে তুলনীয় স্থাপত্যকীর্তির গঠন সুন্দর, হালকা ও সৌষ্ঠব্য হয় (lighted and attenuated); উপরন্তু, তাঁরা কোনো প্রকার ঠেস বা support ছাড়াই গম্বুজ ও ভল্ট নির্মাণ করতে থাকেন এবং কৌণিক ভল্ট পরবর্তীকালে গথিক নামে ইউরোপে সমাদৃত হয়। মসজিদের সামনে দুটি মিনারসম্বলিত পোর্টাল বা প্রধান খিলান প্রবেশপথ নির্মাণ করে সেলজুক স্থপতি এক নতুনরীতির প্রবর্তন করেন যা পরবর্তীকালে তৈমুরী ও সাফাভী আমলে দেখা যাবে। এ ছাড়া সেলজুকদের কৃতিত্ব রয়েছে দ্বি-গম্বুজ (double-dome) নির্মাণে। উদাহরণস্বরূপ ১১৮৬ খ্রীস্টাব্দে কিরমানে নির্মিত জবল-ই-সঙ্গ সৌধের কথা বলা যায়। সেলজুক স্থাপত্যরীতি শুধুমাত্র এক-গম্বুজবিশিষ্ট ইমারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বহু মসজিদের ছাদ, অসংখ্য ছোট ছোট গম্বুজ দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল। ইসফাহান, আরদিস্তান এবং নাটাজের মসজিদে অসংখ্য গম্বুজের ব্যবহার দেখা যায়। পরবর্তীকালে দ্বি-গম্বুজ ভারতবর্ষে দিল্লীতে নির্মিত সেকেন্দার লোদীর সমাধি (১৫১৭ খ্রীঃ), হুমায়ূনের সমাধি (১৫৬৫ খ্রীঃ), আগরার তাজমহলে (১৬৩৪ খ্রীঃ) এবং সমরকন্দের আমির তৈমুরের সমাধিতে (চতুর্দশ শতাব্দী)। সেলজুক আমলে নির্মিত আনিন্দ্যসুন্দর মসজিদসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ইসফাহানের জা'মি মসজিদ (একাদশ শতাব্দী), আরদিস্তানের জা'মি মসজিদ (১১৮০ খ্রীঃ), কাযউইনের জা'মি মসজিদ (১১১৩-১১২৫ খ্রীঃ), যাওয়ারার জা'মি মসজিদ (১১৫৩ খ্রীঃ), গুলপাইগানের জা'মি মসজিদ (১১২০-৩৫ খ্রীঃ), যাওয়ারার জা'মি মসজিদ (১১৫৩ খ্রীঃ)।

ইসফাহানের জা'মি মসজিদের বর্ণনা

ভূমিকা : আর্থার উপহাম পোপ বলেন, "The power and nobility of Seljuk architecture doubtless best exemplified by the Masjid-Jami at Isfahan, one of greatest mosques in the world." পারস্যের সুসমৃদ্ধ ও অতুলনীয় ইমারত দ্বারা সুসজ্জিত ইসফাহান শহর প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় নগরী হিসেবে স্বীকৃত। এর গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য, বৈভব এবং সমৃদ্ধি একে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করে, যার অপর নাম ছিল 'নিসফ-ই-জাহান' অর্থাৎ পৃথিবীর অর্ধেক। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের (রাঃ) সময়ে ইসফাহান মুসলিমবাহিনী কর্তৃক বিজিত হয় এবং এর পর থেকেই এর সমৃদ্ধি ও উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। জ্ঞান বিকাশ, শিল্পকলার কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত পারস্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী ইসফাহান মুসলিম যুগে বিশেষ করে আব্বাসীয় আমলে সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়।

পারস্য প্রদেশের রাজধানী হিসেবে এখানে সেলজুক সুলতান মালিক শাহের রাজত্বে একটি জা'মি মসজিদ নির্মিত হয়। প্রকৃতপক্ষে শিলালিপি অনুযায়ী ইসফাহানের জা'মি মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জ্ঞানতাপস ও প্রধানমন্ত্রী নিযাম-উল মূলক। ১০৭২, মতান্তরে ১০৭৫ খ্রীস্টাব্দে এই জা'মি মসজিদটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। উল্লেখ্য যে, ইসফাহানের জা'মি মসজিদটি কালের অবিনশ্বর স্বাক্ষী বহন করছে। কারণ দীর্ঘ ৮০০ বছর ধরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজবংশ এই ইমারতে তাদের স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন রেখে গেছে। একাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই জা'মি মসজিদ পারস্যের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও অলঙ্করণের এক অনবদ্য ইতিহাস বিধৃত হয়ে রয়েছে। এল. হোনারফার বলেন, "So it is a record of all the changes in Iranian Islamic architecture over a period of more than a thousand years."

আদি মসজিদ : দক্ষিণ দিক : ইসলামী স্থাপত্যকলার ইতিহাস সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় এবং একই সাথে জটিল ধর্মীয় ইমারত হিসেবে ইসফাহানের জা'মি মসজিদকে চিহ্নিত করা হয়। সেলজুক আমলে ইসফাহানের জা'মি মসজিদটির নির্মাণ শুরু হলেও ধারণা করা হয় যে, ঐস্থানে দায়লামাইটগণ একটি সাদামাটা মসজিদ নির্মাণ করেন। পোপ বলেন যে, সর্বপ্রাচীন অংশ সম্ভবত দশম শতাব্দীর শেষার্ধে স্থাপিত হয় এবং প্রাচীন আরব মসজিদের নক্শায় এটি নির্মিত হয়। আদি মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনা পরিবর্তন করে এইস্থানে সেলজুক সুলতান মালিক শাহের রাজত্বে নিযাম-উল-মূলক ১০৭২ থেকে ১০৯২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এক-গম্বুজবিশিষ্ট ইটের সাহায্যে একটি মসজিদ স্থাপন করেন। সেলজুক মসজিদটি ছিল এক-গম্বুজবিশিষ্ট একটি চতুষ্কোণাকার কক্ষ এবং দক্ষিণদিকে অবস্থিত এই ইমারতটি ৫০ ফুট ব্যাসার্ধের একটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। এই গম্বুজটি স্কুইঞ্চের সাহায্যে নির্মিত হয়। গম্বুজের নিচে কুফীরীতিতে সেলজুক সুলতান মালিক শাহ-এর মন্ত্রী নিযাম উল-মুলকের নাম উৎকীর্ণ করা আছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, গম্বুজবিশিষ্ট কক্ষটি সেলজুক আমলে নির্মিত হয়। ইটের তৈরি গম্বুজটি ড্রামের উপর স্থাপিত। অভ্যন্তরে ড্রামের নিচের স্কুইঞ্চের পাশে গোলাকার পিলাস্টারের সাহায্যে অসংখ্য কুলুঙ্গী (blind arch) তৈরি করা হয়েছে। এই কক্ষের মেঝে মার্বেল দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। এই কক্ষের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে সেলজুক যুগের মিহরাব বা কিবলা-নির্দেশক। এই মিহরাবটি ইটের সাদামাটা উপকরণে তৈরি ছিল। পরবর্তীকালে পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে এই মিহরাবটি মিনাকরা টালি দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

গম্বুজবিশিষ্ট সেলজুক মসজিদের দক্ষিণে একটি পর্চ নির্মিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে এ পর্চটি স্থাপিত হয়। পর্চটি পারস্য স্থাপত্যকলায় 'আইওয়ান' (Ivan) নামে পরিচিত। মূল কক্ষের চারিদিকে, যা নামাযগাহ হিসেবে চিহ্নিত, ইটের ভল্টের সাহায্যে কতিপয় খিলান ও করিডর নির্মিত হয়েছে। কৌণিক খিলানের উপরে গথিক রীতিতে ত্রিপত্রবিশিষ্ট খিলানের নক্শা রয়েছে। এই সমস্ত সুদর্শন খিলানরাজি গোলাকার স্তম্ভের উপর নির্মিত। কক্ষের সম্মুখভাগে অবস্থিত আইওয়ানটি ছাদে ঝুলন্ত পেনডনটিভ বা স্টালাকটাইট দ্বারা তৈরি করা হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে হাসান বেক এই আইওয়ান ও

দুটি মিনার পুনর্নির্মাণ করেন। একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ১৪৭৫-৭৬ খ্রীস্টাব্দে এই সংস্কার সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীকালে উযুন হাসান মোজাইক টালির সাহায্যে এই পর্চের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। এরপর ষোড়শ শতাব্দীতে সাফাভী আমলে প্রথম শাহ্ তাহমাসপ মিনাকরা টালির ব্যবহারে এই পর্চের অলঙ্করণ করেন। দ্বিতীয় শাহ্ আব্বাস সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্চটির সংস্কার করেন।

পশ্চিমদিক : ইসফাহানের জা'মি মসজিদ যুগ যুগ ধরে সম্প্রসারিত হবার ফলে এর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সঠিক সন-তারিখ নিরূপণ করা দুরূহ। এই মসজিদের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অংশ হচ্ছে পশ্চিমদিকের 'আইওয়ান'। সেলজুক আমলে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হলেও দক্ষিণের 'আইওয়ানের' মতো এই ইমারতটি সাফাভী যুগে রঞ্জিত টালির সাহায্যে অলঙ্কৃত হয়। দক্ষিণের পর্চের যে ধরনের স্টালাকটাইট রয়েছে এখানেও সেরকম নক্‌শা দেখা যাবে। সাফাভী সুলতান শাহ্ সুলতান হোসেন এই আইওয়ানটির অভ্যন্তর ও বাইরের অংশ মোজাইক টালি দ্বারা এরূপ সজ্জিত করেন যে, আদি সেলজুক স্থাপত্যশৈলী ঢাকা পড়ে যায়। চার কেন্দ্রভিত্তিক খিলান (four-centred arch) দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হয় এবং এর দু'পাশের প্যানেলে কুফি-রীতিতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ আর-রসূলুল্লাহ্' উৎকীর্ণ করা হয়েছে। 'আইওয়ানের' উপরে ছাদে একটি কিয়স্ক রয়েছে। এই পর্চের দক্ষিণে একটি দরজা দিয়ে 'সাবেস্তান' নামের একটি গ্যালারীতে যাওয়া যায়। এই গ্যালারীটিকে শৈত্য গ্যালারী বা winter gallery বলা হয়। সম্ভবত এই কারণে যে, এখানে বাইরের উত্তাপ অনুভব করা যায় না। পশ্চিম পর্চের উত্তরদিকে একটি দরজা দিয়ে অপর একটি গ্যালারীতে প্রবেশ করা যায়। এখানে দেওয়ালে ইলখানী সুলতান ওলযাইতুর সময়ে নির্মিত প্লাস্টারে কাটা অপূর্ব নক্‌শায় সমৃদ্ধ একটি মিহ্‌রাব ও মিমবার দেখা যাবে। ১৩১০ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত এই মিহ্‌রাবটি পারস্য স্থাপত্যিক অলঙ্করণের একটি অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। ('marvellous plaster work–one of the most wonderful pieces of stucco work in Iran')। লতাপাতা, জ্যামিতিক অলঙ্করণে শোভিত এই মিহ্‌রাবটিতে ওলযাইতুর আমলের একটি শিলালিপি রয়েছে। এই কক্ষের সংলগ্ন আর একটি খিলানযুক্ত স্তম্ভের সাহায্যে একটি গ্যালারী রয়েছে যা 'বায়তউল সেতা' বা ঠাণ্ডা কুঠরী নামে পরিচিত। এই গ্যালারীটির নির্মাতা শাহরুখের পুত্র বায়-সুনকুরের পুত্র সুলতান মুহম্মদ। দরজায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ১৪৪৮ খ্রীস্টাব্দের উল্লেখ আছে। ছাদ ভল্টে নির্মিত এবং খুব নিচু। খিলান 'এলিপটিক্যাল গথিক' ধরনের অর্থাৎ স্বল্প উচ্চতা এবং স্ফীত পার্শ্বদেশসম্বলিত। নিচু ছাদবিশিষ্ট এই গ্যালারীটি অপেক্ষাকৃত অন্ধকার থাকায় ছাদ থেকে ঝাড়বাতি ঝোলানো হয়েছে। এই গ্যালারীর পরিমাপ ১৬০ × ৮৩ ফুট।

উত্তরদিক : জা'মি মসজিদের খোলা চত্বরের উত্তরদিকে যে 'আইওয়ান' রয়েছে তা অন্যান্য 'আইওয়ানের' মতো স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মূলত সেলজুক যুগে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রশস্ত পর্চটি নির্মিত। এই পর্চটির অন্যতম প্রধান

আকর্ষণ হচ্ছে যে, এর শেষপ্রান্তে মার্বেলের তৈরি একটি প্রাচীর রয়েছে যার মধ্যভাগ এবং উপরে খিলান দেখা যাবে। ছাদে কুফীরীতিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি শোভা পাচ্ছে। সম্পূর্ণ পর্চটি মিনাকরা টালি দ্বারা সুসজ্জিত ও অলঙ্কৃত করেন সাফাভী সুলতান শাহ সুলায়মান সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীতে (১৭৪৪ খ্রীঃ)। এই পর্চের উভয় পার্শ্বে খিলান-ভল্ট ও স্তম্ভের সাহায্যে নির্মিত কক্ষ রয়েছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হচ্ছে তাজুল মুলকের গম্বুজ। তাজুল মুলক মালিক শাহের একজন মন্ত্রী ছিলেন। কুফীরীতিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ১০৮৮ খ্রীস্টাব্দে এই গম্বুজটি নির্মিত হয়। ৬৫ ফুট উঁচু এবং ৩৫ ফুট ব্যাসার্ধসম্বলিত এই গম্বুজটি মূল নামাযগাহের উপর নির্মিত গম্বুজটি অপেক্ষা ক্ষুদ্র হলেও স্থাপত্যিক দিক থেকে খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। স্কুইঞ্চের সাহায্যে নির্মিত এই গম্বুজটি একটি আটকোণাকার ড্রামের উপর স্থাপিত। ড্রামের দেওয়ালে খাঁজ কেটে প্যানেলের সৃষ্টি করা হয়েছে। পোপ বলেন, "Every feature has been meticulously studied and with the perfection of a sonnet fused into a completely unified whole."

পূর্বদিক : পূর্বদিকে ও অন্যান্য দিকের 'আইওয়ানের' মতো একটি সুউচ্চ ও অলঙ্কৃত 'আইওয়ান' বা পর্চ রয়েছে। সেলজুক আমলে নির্মিত হলেও সাফাভী যুগে বিশেষভাবে শাহ সুলায়মানের রাজত্বে এই অংশ টালি দ্বারা সুশোভিত করা হয়।

স্টালাকটাইট পেনডেনটিভের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পর্চের সম্মুখভাগ বা প্রাসাদ খিলান-প্যানেল দ্বারা সুসজ্জিত। এই পর্চের উত্তরে একটি দরজা রয়েছে। এই দরজা দিয়ে একটি ডায়াসে (Dias) যাওয়া যায়, যা প্রাদেশিক শাসনকর্তা উমর তৈরি করেন। এই ডায়াসের উত্তরে আল-মুজাফফর চতুর্দশ শতাব্দীতে ১৮ স্তম্ভবিশিষ্ট একটি গ্যালারী নির্মাণ করেন।

উপসংহার : পারস্য মুসলিম স্থাপত্যকলায় ইসফাহানের জা'মি মসজিদ একটি অসাধারণ স্থাপত্যকীর্তি (masterpiece)। মূলত সেলজুক স্থাপত্যরীতির বিকাশ হলেও জা'মি মসজিদটি এক হাজার বছরের স্থাপত্যশৈলীর স্বাক্ষর বহন করছে। সাফাভী যুগে স্থাপত্যিক অলঙ্কার জা'মি মসজিদকে সমৃদ্ধ করেছিল। 'আইওয়ান' অলঙ্করণের স্থাপত্যরীতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ইসফাহানের জা'মি মসজিদ। কূহনেল যথার্থই বলেন, পরিবর্তিত ও সংযোজিত হলেও জা'মি মসজিদে সেলজুক আমলের 'আইওয়ান' ও দক্ষিণের গম্বুজটি অক্ষত রয়ে যায়। ইটের তৈরি খিলান ও ভল্টের ব্যবহারে মসজিদটি নির্মিত এবং ইটের বিভিন্ন ধরনের নক্শা ইমারতটির শ্রীবৃদ্ধি করেছে। ভল্টের মধ্যে তারকা ভল্ট সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। আইওয়ানের পশ্চাতে গম্বুজ, রিবড ভল্ট, মিনার, মিনাকরা টালি এবং সর্বোপরি কূফী, নাস্খ এবং নাস্তালিক শিলালিপি জা'মি মসজিদকে অসামান্য মর্যাদা দিয়েছে। Papadopoulo বলেন, "The mosque is certainly the most important Muslim monument in Iran not only for its history but also for the quality of its architecture and the beauty of its ceramic decoration."

৪। আরদিস্তান জা'মি মসজিদ (১১৪০ খ্রীঃ)

পোপ বলেন, "অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেলজুক মসজিদ ইসফাহানের জা'মি মসজিদের রীতিতে নির্মিত হয়।" ইসফাহানের মসজিদের মতো ১১৮০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত আরদিস্তানের মসজিদেও সাহান, গম্বুজসম্বলিত লিওয়ান ও আইওয়ান (Ivan) দেখা যাবে। পাপাডোপোলো এটিকে কিস্ক মসজিদ বলে অভিহিত করেছেন। উত্তরদিকের ফাসাদে দুটি উঁচু মিনার ছিল, বর্তমানে একটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

৫। কাযউইন, জা'মি মসজিদ, (১১১৩-১৫ খ্রীঃ)

সেলজুক স্থাপত্যকলার অপূর্ব নিদর্শন কাযউইনের জা'মি মসজিদটিতে বিশালাকার গম্বুজ রয়েছে। ১১১৩-১৫ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মসজিদের গম্বুজের ব্যাস ৫২ ফুট। এ ছাড়া এটির বিশেষ আকর্ষণ সম্মুখের পোর্টাল। গ্রন্থকার তাঁর একটি গ্রন্থে বলেছেন, "The Masjid-i-Jami at Qazvin has prominent portal which formed the dominating feature of the Persian mosque of the future." (বঙ্গানুবাদ : কাযউইনের জা'মি মসজিদে যে আকষর্ণীয় ও সুউচ্চ পোর্টাল (প্রবেশপথ) নির্মিত হয়েছিল, তা পরবর্তী পারস্য মসজিদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।) কাযউইনের মসজিদে স্কুইঞ্চের ব্যবহারে যেমন বৈপরিত্য রয়েছে তেমনি অলঙ্করণে রয়েছে অসামান্য মৌলিকতা। এ অলঙ্করণে ফুল-লতা-পাতা মিশ্রিত কুফীলিপির ব্যবহার রয়েছে। পোপ বলেন যে, কিবলাপ্রাচীরের সম্পূর্ণ অংশটিই মিহরাব দ্বারা 'আবৃত'। সম্ভবত পারস্যে তথা ইসলামী স্থাপত্যে সর্ববৃহৎ মিহরাব দেখা যাবে ('largest mihrab in Islam')

৬। যাওয়ারা জা'মি মসজিদ, ১১৩৫-৩৬ খ্রীঃ

সেলজুক আমলে নির্মিত যাওয়ারা মসজিদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটু ভিন্ন ধরনের। একটি বিশালাকার সাহানের চারপাশে বারোটি আইওয়ান নির্মিত হয়েছে। এ বারোটির মধ্যে দক্ষিণদিকের আইওয়ানটি অন্যান্যগুলোর চেয়ে আকারে বড়। লক্ষণীয় যে, এ মসজিদের চার আইওয়ানবিশিষ্ট ভূমি-নকশা সাফাভী যুগের ক্লাসিক্যাল মসজিদসমূহেও ব্যবহৃত হয়েছে। আইওয়ানবিশিষ্ট মসজিদ ছাড়াও সেলজুক আমলে এক-গম্বুজবিশিষ্ট সম্পূর্ণ ঘেরা (enclosed) মসজিদ নির্মিত হয়েছে, যেমন— ইয়াজর্দ এবং খারগিরদের মসজিদ।

ইলখানী আমল (১২৫৬-১৩৫৩ খ্রীঃ)

ডোনাল্ড উইলবার বলেন, The 'naked' brickwork of the Saljuq period would be seen to give way to the more sophisticated lighter structures of the Il-khanid (Mongol) period with colour just beginning to play a conspicuons role" (বঙ্গানুবাদ সাদামাটা সেলজুক স্থাপত্যরীতি ইলখানী যুগে (মোঙ্গল) অধিকতর সৌকর্য ও সুষমামণ্ডিত হালকা ধরনের

ইমারতে রূপান্তরিত হয়—যাতে উজ্জ্বল রঙের প্রলেপ দেখা যায়।) ইলখানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা হুলাকু খান ধ্বংসকারী ও দুর্ধর্ষ সেনাপতি হলেও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি মারাগায় মানমন্দির নির্মাণ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী আবাগা খান ১২৭৫ খ্রীঃ তাক্ত-ই-সুলায়মানে একটি সুউচ্চ আইওয়ান নির্মাণ করেন। ইলখানী সুলতান গাজান খান (১২৯৫-১৩০৪ খ্রীঃ) স্থাপত্য ও শিল্পকলার একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। "জা'মি আত-তাওয়ারিখের প্রণেতা রশীদউদ্দীন তাঁর শিল্পকলার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি তাব্রিজে রাজধানী স্থাপন করেন এবং প্রথম মোঙ্গল মুসলমান হিসেবে বহু মসজিদ নির্মাণ করেন। রশীদউদ্দীন উল্লেখ করেন যে, একমাত্র তাব্রিজেই ৩০,০০০ ঘরবাড়ি ছিল। গাজান খানের কীর্তি এখনও অক্ষত রয়েছে। তিনি তাব্রিজে একটি অতুলনীয় সমাধিসৌধ, একটি মসজিদ, দুটি শিক্ষায়তন, একটি গ্রন্থাগার এবং একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ইসলামী স্থাপত্যকলায় ইলখানী স্থাপত্যরীতি বিশেষ অবদান রেখেছে। ইলখানী স্থাপত্যশিল্প একদিকে যেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, অপরদিকে তেমনি মৌলিক পরিকল্পনাও অতুলনীয় অলঙ্করণের অধিকারী। এ যুগে তাব্রিজ, হামদান, সুলতানিয়া, ইসফাহান এবং মারাগায় সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে পারস্যে চারটি প্রধান কেন্দ্রকে উপলক্ষ করে নগরজীবন গড়ে ওঠে; যেমন– শাহরিস্তান অর্থাৎ শাসকবর্গের মহল্লা: মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ; সরাইখানা এবং কারিগরদের বসতি-এলাকা। ইলখানী যুগের স্থাপত্যিক নিদর্শন দেখা যাবে অপূর্ব সুন্দর ইটের তৈরি মসজিদগুলোতে। কায, দাস্তি, ফারুমদ. তাব্রিজ, ভারামিন, গুলপায়গান, দারার প্রভৃতি শহরে ইলখানী স্থাপত্যনিদর্শন বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এসমস্ত ধর্মীয় ইমারতের মধ্যে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় তাব্রিজের আলী শাহের মসজিদ (১৩১০-২০ খ্রীঃ) এবং ভারামিনের ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ (১৩২২ খ্রীঃ)। তাব্রিজের মসজিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর বিশালাকৃতি ভল্ট এবং ভারামিনের আইওয়ান রীতিতে নির্মিত মসজিদের বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে, এর অপূর্ব ইটের খোদাইকৃত নক্‌শাবলী।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইলখানী সুলতানগণ এমন একটি স্থাপত্যরীতির উদ্ভব করেন, যা সেলজুক স্থাপত্যকলার সাথে তুলনা করেন। সম্পর্কটি গথিকের সাথে রোমানেস্ক রীতির যে সম্পর্ক ছিল তাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সেলজুকদের গম্বুজ ও ভল্টের কৌশল অলঙ্করণ করে ইলখানী স্থপতি স্থাপত্যরীতি ও অলঙ্করণ-পদ্ধতিতে নতুন অধ্যায় সংযোজন করে। গ্রন্থকার তাঁর থিসিসে উল্লেখ করেন, "A refined attenuation is apparent in both their construction and ornament." (বঙ্গানুবাদ : এক প্রকার মার্জিত ও রুচিসম্পন্ন ক্ষুদ্রাকারকরণ স্থাপত্য এবং অলঙ্করণে লক্ষ করা যায়।") ইলখানী স্থাপত্যের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— স্টাকো এবং মিনাকরা টালির সমন্বিত ব্যবহার, সুউচ্চ মিনার, অতুলনীয় অলঙ্কৃত মিহরাব, মিনারসম্বলিত পোর্টাল, কৌণিক গম্বুজ, চার-বিন্দুবিশিষ্ট খিলান। দ্বি-গম্বুজ (সুলতানিয়ার ওলজাইতুর সমাধি) ইত্যাদি। ইলখানী যুগে দু'ধরনের মসজিদ দেখা যাবে। প্রথমত,

চতুষ্কোণাকার ভূমি-নক্শার উপর গম্বুজবিশিষ্ট ইমারত এবং দ্বিতীয়ত, আইওয়ান টাইপ। দারাবে নির্মিত প্রস্তরখোদিত মসজিদ বা মসজিদ-ই-সাঙ্গ, ১২৫৪ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয় এবং নকশাকৃত অভ্যন্তরীণে স্তম্ভ রয়েছে। মারান্দে ১৩৩০-৩৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত মসজিদটিও বর্গাকার গম্বুজবিশিষ্ট; কিন্তু তিনদিক, কিবলার দিক ছাড়া পোর্টাল রয়েছে। যে সমস্ত ইলখানী মসজিদ বিশেষভাবে আকর্ষণীয় তা হচ্ছে, তাব্রিজের আলী শাহের মসজিদ (১৩১২-২২ খ্রীঃ), নাটাজের জা'মি মসজিদ (১৩০৪-১৩০৯ খ্রীঃ), আর্দাবিলের জা'মি মসজিদ (চতুদর্শ শতাব্দী), ভারামিনের জা'মি মসজিদ (১৩২২ খ্রীঃ) ইয়াজদের জা'মি মসজিদ (১৩২৪-৬৪ খ্রীঃ), কিরমানের জা'মি মসজিদ (১৩৪৯ খ্রীঃ) ইত্যাদি।

৭। তাব্রিজ, আলী শাহের মসজিদ, ১৩১২-২২ খ্রীঃ

গাজান খান তাব্রিজে যে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন তা নানা ধরনের ইমারত দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল। এই শহরের অন্যতম আকর্ষণ আলী শাহের মসজিদ। আলী শাহ নিজেই একজন প্রখ্যাত স্থপতি ছিলেন এবং তিনিই সম্ভবত সুলতানিয়া নির্মিত ওলজাইতুর সমাধি নির্মাণ করেন। ১৩১২ খ্রীস্টাব্দে আলী শাহ এই মসজিদ নির্মাণ শুরু করেন এবং নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয় দশ বছর পর, অর্থাৎ ১৩২২ খ্রীস্টাব্দে। পোপ এ মসজিদ সম্বন্ধে বলেন যে, এটির পরিকল্পনা করা হয় একটি বিশালাকার ইমারত হিসেবে এবং গাজান খানের পৃষ্ঠপোষকতায় ইটের তৈরি এ ইমারতটি খুবই প্রকাণ্ড, যদিও এটি বর্তমানে অক্ষত অবস্থায় নেই। পোপ বলেন, "It is probably the most massive brick structure still partially standing" (বঙ্গানুবাদ : এটি এখনও দণ্ডায়মান সম্ভবত বিশালাকার ইটের ইমারত) কিবলার দিকে নামাজস্থানের আইওয়ানের ভল্ট ১০০ ফুট প্রশস্ত এবং ১৫৮ ফুট উঁচু। পোর্টাল এবং মিহরাবের মধ্যে দূরত্ব ২১৫ ফুট। পোর্টালের উভয় পাশে সম্ভবত দুটি মিনার ছিল। আইওয়ানের সম্মুখে মার্বেল দ্বারা আচ্ছাদিত একটি সাহান রয়েছে। এর পরিমাপ ৯৩৭ ফুট x ৭৫০ ফুট। সাহানের চতুর্দিকে পাথরে ভল্টের সাহায্যে নির্মিত রিওয়াক রয়েছে যাতে খিলানরাজি দেখা যাবে। নির্মাণের ত্রুটির জন্য বিশালাকার আইওয়ানের ভল্টটি বহুপূর্বে ভেঙে গেছে ; আলী শাহের মসজিদটিতে লতাপাতা, জ্যামিতিক নক্শা, শিলালিপির উপাদান দেখা যাবে। মিনাকরা টালি এ মসজিদকে আকর্ষণীয় করেছে।

৮। নাটাজ, জা'মি মসজিদ, ১৩০৪-১৩০৯ খ্রীঃ

পূর্ববর্তী সেলজুক ইমারতের ধ্বংসাবশেষের উপর ইলখানী যুগে নির্মিত নাটাজের জা'মি মসজিদটি স্থাপত্যরীতির সমন্বয়ের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৩০৪ খ্রীস্টাব্দে এ মসজিদটির নির্মাণ শুরু হয় এবং ১৩০৯ খ্রীস্টাব্দে এর নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। মসজিদটি আয়তনে ছোট হলেও এর সৌন্দর্যমণ্ডিত পোর্টাল বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। পাপাডোপোলো বলেন, "Its pishtaq (portal) is notable for its stalactites and the epigraphic decoration framing it and also composing large rosettes on the tympanum. The inscriptions in kufic characters of

various sorts on blue ceramic tiles are of much interest." (বঙ্গানুবাদ : "স্টালাকটাইট (মুকারনাস) এবং শিলালিপির নক্‌শা, পিশতাককে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে ; উপরন্তু, গোলাপ ফুল (রোজেট) এবং নীল টালির উপর কুফীরীতিতে বিভিন্ন ধরনের লিপি খুবই আকর্ষণীয়।)

৯। ভারামিন, জা'মি মসজিদ, ১৩২২-২৬ খ্রীঃ

নাটাজের মতো ভারামিনেও একটি সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়। ইলখানী সুলতান আবু-সাঈদ এ শহরের গোড়াপত্তন করেন। তিনি ১৩২২ খ্রীস্টাব্দে জা'মি মসজিদটি চার-আওয়ান এবং সুউচ্চ পোর্টাল প্রবেশপথসম্বলিত ভূমি-নক্‌শার উপর ভিত্তি করে নির্মাণ শুরু করেন এবং এর নির্মাণকাজ শেষ হয় ১৩২৬ খ্রীস্টাব্দে। বর্তমানে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। গ্রন্থকার তাঁর থিসিসে বলেন, "The Masjid-i-Jami of Varamin dated at A.H. 722/A.D. 1322, anticipates the fully developed Ivan mosques of the Timurid and Safarid periods." (হিজরী ৭২২/খ্রীস্টীয় ১৩২২ আব্দে নির্মিত ভারামিনের জা'মি মসজিদটি পরবর্তীকালের তৈমুরী ও সাফাভী যুগের আইওয়ান টাইপের মসজিদসমূহের পূর্বাভাস দিয়েছে।" ডি.টি. রাইস ভারামিন মসজিদের মিনাকরা টালির প্রশংসা করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তৈমুরী শাসক শাহরুখ এ মসজিদের সংস্কার করেন।

তৈমুরী আমল (১৩৬০-১৫০৬ খ্রীঃ)

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৈমুরী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমীর তৈমুর (১৩৬৯-১৪০৫ খ্রীঃ) এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি বিভিন্ন দেশ জয় করে অগাধ ধন-সম্পদ আহরণ করে তাঁর রাজধানী সমরকন্দকে ঐশ্বর্যশালী করেন। বুখারাও একটি সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হয়। হ্যারল্ড ল্যাম্ব বলেন, "তৈমুরের পৃষ্ঠপোষকতায় সমরকন্দ সত্যিই এশিয়ার শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হয়।" তৈমুর তৈমুরী স্থাপত্যকলা ও চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁর অনুকরণে শাহরুখ ও উলুগ বেগ তৈমুরী সংস্কৃতিকে সুদূরপ্রসারী করেন। তৈমুর লং স্থাপত্যকলার একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষে সফল বিজয়ের পর স্মারকচিহ্ন হিসেবে সমরকন্দে একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করেন। বিপুল অর্থব্যয়ে এবং অগণিত কারিগর ও দক্ষ স্থপতিদের দ্বারা নির্মিত বিবি খানামের এই মসজিদ তৈমুরী স্থাপত্যকলার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। বিদেশী পর্যটক ক্লাভিজো বলেন যে, সমরকন্দের ইমারতগুলো মিনাকরা টালি ও সোনালী রঙের প্রলেপদ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সমরকন্দের গুর-ই-মীর বা আমির তৈমুরের সমাধি। তৈমুরী সৌধস্থাপত্যে গুর-ই-মীর ছাড়াও পারস্য স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন বহন করছে গওহর সাদ কর্তৃক মাসহাদ নির্মিত মসজিদ, হিরাতের অপর একটি মসজিদ, সমরকন্দের বিবি খানুমের মাদ্রাসা এবং তাব্রিজের নীল টালিসম্বলিত মসজিদ (Blue Mosque) এবং মসহাদে ইমাম আলী রেজার সমাধি।

তৈমুরী স্থাপত্যকলায় রেনেসাঁ যুগের আবির্ভাব হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। এর স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বায়রন বলেন, "Domes and minarets protrude

and multiply; portals, ivans and niche-facades attain extraordinary height; pattern and texts become exuberant in proportion to their intricacy, unbridled, fantastic colour achieves a range, a dept and a brilliance, not equalled before or since." (বঙ্গানুবাদ : (এযুগে) অসংখ্য গম্বুজসম্বলিত ইমারত ও মিনার নির্মিত হতে থাকে। আইওয়ান এবং কুলুঙ্গী ফাসাদ (পোর্টাল) অস্বাভাবিক উচ্চতা লাভ করে। অলঙ্করণের প্যাটার্ন ও লিপিকলা (টেক্সট) শুধুমাত্র ব্যাপকতা লাভ করেনি; বরং এমনভাবে প্রাচুর্য ও প্রাণবন্ত হতে থাকে যে, তা অত্যাশ্চর্য ও সীমাহীন জটিল বলে মনে হয়। টালিতে রঙের ব্যবহারে ব্যাপকতা ও গভীরতাই সৃষ্টি হয়নি; বরং এমন উজ্জ্বলতা ও স্নিগ্ধতা লাভ করে যার পূর্বে অথবা পরের কোনো তুলনা নেই।

তৈমুরী স্থাপত্যে মসজিদ এক অসামান্য অবদান রেখেছে। ট্রানঅক্সিয়ানায় এই রীতি প্রথম চালু হয় এবং সমরকন্দে নির্মিত বিবি খানুমের (১৪০৫-৬ খ্রীঃ) মসজিদ এ যুগের অন্যতম প্রাচীন ইমারত। এর পূর্বে অবশ্য হযরত আহমদ ইয়াসাভীর মসজিদ নির্মিত হয় ১৩৯৪-৯৫ খ্রীস্টাব্দে। এ মসজিদের খাঁজকাটা গম্বুজের রীতি পরবর্তীকালে সমরকন্দের গুর-ই-মির-এর গম্বুজে প্রতিফলিত হয়। আমির তৈমুর তাঁর স্ত্রী বিবি খানুমের নামে যে মসজিদ নির্মাণ করেন, তা স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এ ছাড়া মাসহাদের গাওহর সাদ (১৪১৮ খ্রীঃ), তাব্রিজের নীলা মসজিদ (১৪৬৫ খ্রীঃ), হিরাতের গওহর সাদ (১৪৩৭-৩৮ খ্রীঃ), তৈমুরী আমলে নির্মিত শ্রেষ্ঠ মসজিদগুলোর নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়।

১) মাসহাদ, গওহর সাদের মসজিদ, ১৪১৮ খ্রীঃ

হিরাত তৈমুরী আমলে সমৃদ্ধশালী নগরীতে পরিণত হয়। তৈমুরের বংশধর শাহরুখ মির্জা (১৪০৫-১৪৪৭ খ্রীঃ) এবং হোসেন বায়কারার (১৪৬৯-১৫০৬ খ্রীঃ) শাসনামলে রাজধানী ছিল হিরাত। এ শহরে শাহরুখের স্ত্রী গওহর সাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এক অনিন্দ্যসুন্দর মসজিদ নির্মিত হয় ১৪১৮ খ্রীস্টাব্দে। পোপ এ মসজিদ সম্বন্ধে বলেন, "The first and the greatest surviving Persian monument of the fifteenth century is the beautiful Mosque of Gawhar Shad, now abutting the shrine of Imam Raza in Mashhad." (বঙ্গানুবাদ : পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ অক্ষত ইমারত হিসেবে গওহর সাদের অনিন্দ্যসুন্দর মসজিদ, যা ইমাম রেজার মাযারসংলগ্ন চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।) এই মসজিদের স্থপতি ছিলেন কাভাম আল-দীন সিরাজী। পারস্যের আইওয়ান রীতিতে নির্মিত মাসহাদের মসজিদে চারটি আইওয়ান রয়েছে—যা খোলা চত্বরের চারপাশে দেখা যাবে এবং কিবলার দিকে খিলানাকৃতি নামাজঘর রয়েছে। আইওয়ানের ফাসাদের উভয় পাশ থেকে জমি থেকে ঢালু হয়ে সুউচ্চ মিনার নির্মিত হয়েছে; এ ধরনের সংলগ্ন মিনার পূর্বে দেখা যায়নি, কারণ পূর্ববর্তী মিনারগুলো আইওয়ানের ভল্টের ছাদ থেকে নির্মিত হয়। গম্বুজ সামান্য বাল্বের আকৃতির (bulbous)—যা গুর-ই-মিরে দেখা যাবে।

উইলবার বলেন, "The major interest of the mosque is the splendid faience mosaic which flows over every square inch of the structure : in design, in skilled execution and in brilliant harmonious colours this faience never surpassed." (বঙ্গানুবাদ : এ মসজিদের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে, অভূতপূর্ব মিনাকরা টালির ব্যবহার, যা এই ইমারতের প্রতি ইঞ্চি জায়গায় ছড়িয়ে আছে। পরিকল্পনায়, সৌকর্যের সাথে প্রয়োগ এবং অপূর্ব উজ্জ্বল রঙের সমন্বয়ে এ মিনাকরা টালি তুলনাবিহীন।)

২) সমরকন্দ, বিবি খানমের মসজিদ, ১৪০৪ খ্রীঃ

আমীর তৈমুর তার স্ত্রী বিবি খানামের নামে রাজধানী সমরকন্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৪০৪ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মসজিদটি এমন বিশাল পরিকল্পনায় নির্মিত হয় যে, স্থাপত্য ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে নির্মাণের কিছুদিনের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর মূল কারণ স্থপতির ত্রুটি। যাহোক, ধ্বংসস্তূপ থেকে এ মসজিদের স্থাপত্যিক ও আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সহজেই লক্ষ করা যায়। আয়তাকারবিশিষ্ট বিবি খানমের মসজিদটির পরিমাপ ৫৪৮ ফুট × ৩৫৭১/২ ফুট, মধ্যভাগে প্রায় বর্গাকার সাহান রয়েছে যার পরিমাপ ২৫৬ × ২১০ ফুট। এর চারদিকে চারটি আইওয়ান ছিল। প্রধান ও বিশাল প্রবেশপথ বা পিশতাকের উল্টোদিকে কিবলাপ্রান্তে নামাজগা রয়েছে যা লিওয়ান নামে পরিচিত। কিবলার দিকে মিহরাব দেখা যাবে। চারটি আইওয়ানের সাথে সংযোগ রক্ষা করছে ছাদবিশিষ্ট গ্যালারী, যা স্তম্ভদ্বারা নির্মিত।

৩) তাব্রিজ, নীলা মসজিদ (Blue Mosque), ১৪৬৫ খ্রীঃ

জাহানশাহের কন্যা সালিহা খানুম তাব্রিজে যে মসজিদ নির্মাণের পৃষ্ঠপোষকতা করেন তা নীলা মসজিদ নামে পরিচিত। ১৪৬৫ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এই মসজিদটি আকারে ক্ষুদ্র এবং সম্পূর্ণ ছাদবিশিষ্ট। এক-গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি পশ্চিমদিকে দেখা যাবে এবং এর সামনে যে খোলা চত্বর ছিল তাও একটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। গম্বুজের চারিপাশে রয়েছে ছোট ও বড় আকারের কিউপলা (ক্ষুদ্রাকার গম্বুজ), পূর্ব প্রান্তে পিশতাক বা পোর্টাল ধরনের প্রবেশপথ। ফাসাদেব দুপাশের সুউচ্চ মিনার ও গম্বুজ বহুপূর্বেই ভূমিকম্পে ভেঙে গেছে। এ মসজিদের নক্‌শা পরবর্তীকালে তুর্কী মসজিদগুলোকে প্রভাবান্বিত করে। এ ইমারতের প্রধান বৈশিষ্ট্য অলঙ্করণের চাকচিক্য এবং নীল টালি দ্বারা আচ্ছাদিত এ মসজিদটি সমরকন্দের অলঙ্করণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পাপ'ডোপোলো বলেন, "The tiles used all the colours already exploited in Samarqand, namely ultra marine blue, deep green turquoise, golden yellow, deep red, white and black. The inscriptions are in both Thuluth and Naskhi characters." (বঙ্গানুবাদ : সমরকন্দে ব্যবহৃত বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত টালিগুলোর মতো এখানে টালি ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন— নীল, গাঢ় সবুজ, নীলকান্ত মণি, হলুদ, গাঢ় লাল, সাদা ও কালো। শিলালিপিগুলো সুলস এবং নসখী রীতিতে লিপিবদ্ধ।)

সাফাভী আমল (১৫০২-১৭৩৬ খ্রীঃ)

১৫০২ খ্রীস্টাব্দে শাহ ইসমাইল পারস্যে সাফাভী বংশ নামে একটি নতুন বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিয়া বংশোদ্ভূত ছিলো। তুর্কী চাগতাই সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত এ রাজবংশ পারস্যে দু'শতাব্দীর শাসনকালে সংস্কৃতি ও সভ্যতায় বিশেষ অবদান রাখে। ১৭৩৬ খ্রীস্টাব্দে নাদির কুলির নিকট পরাজিত হলে, সাফাভী বংশের পতন ঘটে। ব্রাউন বলেন, "পারস্যের সাফাভী বংশের উত্থান ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।" শাহ ইসমাইল এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন।

মহামতি শাহ আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯ খ্রীঃ)

বলাই বাহুল্য যে, শাহ আব্বাসের রাজত্বকালে সাফাভী স্থাপত্যকলায় নবযুগের সূচনা হয়। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে, কাযউইন থেকে রাজধানী ইসফাহানে স্থানান্তরিত করে এটিকে তিলোত্তমা নগরীতে রূপান্তরিত করা। ১৫৯৮ খ্রীস্টাব্দে দরবারসহ শাহ আব্বাস ইসফাহানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকলে ইসফাহান এ প্রাচ্যের একটি অপূর্ব নগরীতে পরিণত হয়, যা পরবর্তীকালে 'নিসফ-ই-জাহান' অর্থাৎ পৃথিবীর অর্ধেকের সমতুল্য বলে মনে করা হয়। শাহ আব্বাস একটি সম্পূর্ণ নতুন ও সুপরিকল্পিত নকশার উপর ভিত্তি করে ইসফাহান নগরী নির্মাণ করেন। সে সময়ে ইসফাহানের লোকসংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ। এই শহরের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে, ময়দান-ই-শাহ। এর চারদিকে নির্মিত হয় আলী কাপু প্রাসাদ, মসজিদ-ই-লুৎফুল্লাহ, মসজিদ-ই-শাহ এবং মধ্যভাগে শাহ-ই-ময়দান। এ ছাড়া পুল, মাদ্রাসা ও আরও অনেক ধরনের ইমারত ছিল। চার্ডিনেব বলেন যে, ইসফাহানে ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর ভ্রমণকালে ৪৮টি মাদ্রাসা, ১৬২টি মসজিদ, ১৮২টি সরাইখানা এবং ২৭৩টি স্নানাগাব ছিল।

পারস্য স্থাপত্যকলার স্বর্ণযুগ নামে খ্যাত সাফাভী যুগকে বিভিন্ন কারণে Climax-এর যুগও বলা যায়। ইসফাহান ছাড়াও মাজেন্দ্রাল, মাসহাদ, জিলান, আর্দাবিলসহ বহু শহরে সাফাভী স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন দেখা যাবে।

শিয়া বংশোদ্ভূত সাফাভী রাজবংশ পারস্যে একটি জাতীয় শিল্পরীতির সূচনা করে। পারস্যের জনগণই জাতীয় আদর্শের বাস্তব রূপদানে সচেষ্ট হয় এবং এভাবে এক সুমহান সাংস্কৃতিক যুগের উদ্ভব হয়। এ আমলের শিল্পকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, একদিকে তুর্কী ও চীন এবং অন্যদিকে ইউরোপীয় স্থাপত্যকলার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কস্থাপন। এর ফলে মধ্য-এশিয়ার তুর্কী সংস্কৃতি, চীনা প্রভাব প্রথমদিকে সাফাভী শিল্পকলাকে যেমন প্রভাবান্বিত করে, অপরদিকে সাফাভী যুগের শেষদিকে ইউরোপীয় প্রভাব একটি স্বকীয় শিল্পধারাকে ধ্বংস করে। বিশেষ করে চিত্রকলায় এ মন্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। শাহ আব্বাসের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসফাহান একটি সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হয়। এর প্রাণকেন্দ্র ছিল ময়দান-ই-শাহ, যার আয়তন ছিল ৫৬০ গজ x ১৭৪ গজ এবং এর চারপাশে চাহারবাগ ময়দানকে ঘিরে ইমারতগুলো নির্মিত হয়েছে। বিভিন্ন কারণে সাফাভী স্থাপত্যকলাকে সর্বোৎকৃষ্ট বলা হয়েছে; এর প্রধান কারণ, সেলজুক স্থাপত্যরীতি থেকে শুরু করে খিলান, গম্বুজ, ভল্ট, অলঙ্করণ এসময়ে

চরম উৎকর্ষ লাভ করে। শুধুমাত্র মসজিদ-স্থাপত্যই নয়, মাদ্রাসা ও সমাধিসৌধ নির্মাণে সাফাভী নির্মাতাগণ অসাধারণ মেধা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। অলঙ্করণ এক বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে। বিশেষ করে মিনাকরা টালি। মিনারগুলো সুউচ্চ এবং ক্ষীণ আকার ধারণ করে—যা ইমারতের সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে। পোপ বলেন, "With Shah Abbas I (1589-1627) the great period of Safavid architecture opened. By virtue of his resolute ambition, exceptional capacity and artistic sense and aided by the wealth that his able government had fostered he initiated a new period in Persian architecture in which the rich, sensationally colored and imaginative details developed by his predecessors became unified into scerene and meaningful ensembles of immense scale and grandeur. " (বঙ্গানুবাদ : প্রথম শাহ আব্বাসের রাজত্বে সাফাভী স্থাপত্যকলার মহান যুগের সূচনা হয়। তাঁর অদম্য ইচ্ছা ও অনমনীয় আকাঙ্ক্ষা, অসাধারণ ক্ষমতা এবং শৈল্পিক অনুভূতি এবং একটি সুশাসিত সরকার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ থাকায় পারস্য স্থাপত্যকলায় এ নবযুগের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিল–যাতে প্রগাঢ় রং এবং অকল্পনীয় নক্‌শা যা তাঁর পূর্ববর্তী শাসকেরা উদ্ভাবন করেছিলেন তা এক বিশালাকার এবং সুষমামণ্ডিত শিল্পরীতিতে রূপান্তরিত হয়।) সাফাভী যুগে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়, যার বিশদ বর্ণনা দিতে একটি পুরো গ্রন্থের প্রয়োজন হবে। এসত্ত্বেও কতিপয় প্রতিনিধিত্বমূলক ইমারতের বর্ণনা থেকে সাফাভী মসজিদ-স্থাপত্যের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যগুলো জানা যাবে।

১০। ইসফাহান, মসজিদ-ই-সেখ লুৎফুল্লাহ, ১৬০১-১৬২৮ খ্রীঃ (চিত্র ৩৭-৩৮)

মসজিদ-ই-শাহের তুলনায় ক্ষুদ্রাকৃতি হলেও শাহ আব্বাস কর্তৃক ১৬০১-২৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর ধর্মপ্রাণ শ্বশুর লুতফ-আল্লাহর নামে নির্মিত মসজিদটি খুবই আকর্ষণীয়। মসজিদটি একটি বর্গাকার গম্বুজবিশিষ্ট নক্‌শার উপর ভিত্তি করে নির্মিত। ময়দানের পাশে এবং প্রাসাদের উল্টোদিকে এ ক্ষুদ্রাকার মসজিদকে মুসাল্লা বা ব্যক্তিগত নামাজঘর (oratory) বলা হয়েছে। সম্মুখভাগে চিরাচরিত পিসতাক বা বা ভল্টবিশিষ্ট প্রবেশপথ যা মুকারনাস দ্বারা অলঙ্কৃত রয়েছে। কিবলামুখী করতে ইমারতটি ৪৫ ডিগ্রী উত্তর-দক্ষিণ ৪৫ ডিগ্রী অক্ষরেখায় নির্মাণ করতে হয়েছে। অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে প্রধান মিহরাবটি দেখা যাবে এবং চিরাচরিত সাহানের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গম্বুজটি কৌণিক এবং আকর্ষণীয়ভাবে অলঙ্কৃত। এটি অষ্টভুজাকৃতি ড্রামের উপর নির্মিত হয়েছে। ড্রামে জালির জানালা রয়েছে। একটি আবরণবিশিষ্ট (দ্বি-গম্বুজ নয়) গম্বুজটি ৪২ ফুট ব্যাসার্ধ। পোর্টালের দুপাশে দ্বিতল খিলানসারি দেখা যাবে। অভ্যন্তরে প্রগাঢ় রঙের ব্যবহারে টালির নক্‌শা এক নতুন জগতের সৃষ্টি করেছে। উইলবার বলেন, "The interior is a lovely Jewel box, every area is clad in glowing tile work blue predominates at the lower level, while the dome culminates in a sunburst of golden yellow." (বঙ্গানুবাদ : অভ্যন্তর দেখে মনে হবে, যেন এটি একটি অলঙ্কারের বাক্স–যার প্রতিটি স্থান উজ্জ্বল টালির দ্বারা

আচ্ছাদিত। ইমারতের নিম্নাংশে (dado) নীল রং থাকলেও গম্বুজে সোনালী সূর্যের রং দেখা যাবে।)

১১। ইসফাহান, মসজিদ-ই-শাহ, ১৬১২-৩৮ খ্রীঃ (চিত্র ৩৯-৪১)

আর্নেস্ট কূহনেল বলেন, "এই আমলের সত্যিকার মসজিদ বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে, ইসফাহানের মসজিদ-ই-শাহ। শুধু জাঁকজমকের দিক থেকেই নয়, কারিগরি কৌশলের দিক থেকেও এটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ যদিও মনোযোগে শৈথিল্য এখানেও বেশ খানিকটা অনুভূত হয়। সংযোগসাধনকারী উচ্চ মঞ্চগুলো সমগ্র মসজিদটিকে শিথিলভাবে একত্র সন্নিবিষ্ট করে রেখেছে। এর তিনটি আইওয়ান তিনটি স্বতন্ত্র গম্বুজযুক্ত ভবন বলে মনে হয়।" ১৬১১ থেকে ১৬১৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত অনিন্দ্যসুন্দর সাফাভী স্থাপত্যকীর্তির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন মসজিদ-স্থাপত্যে সত্যই বিরল। পোপ যথার্থই বলেন, "This monument represents the culmination of a thousand years of mosque building in Persia. The formative traditions the religious, ideas, usage and meaning, the plan which had slowly matured from a combining of earlier and simpler types, major structural elements and ornamentation are all fulfilled and unified in the Masjid-i-Shah with a majesty and splendour that places it among the worlds greatest building." (বঙ্গানুবাদ : এ মসজিদটিতে হাজার বছর ধরে পারস্যে মসজিদের যে ক্রমবিকাশ হয় তার পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। প্রাথমিক যুগের ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় ভাবধারা, প্রচলিত রীতি-নীতি এবং এর প্রয়োগ পূর্ববর্তী সহজ ভূমি-নক্শা থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে উত্তরণে মুখ্য স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং অলঙ্করণ, সমস্ত কিছুই মসজিদ-ই-শাহে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে এবং সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছে। যার ফলে এটি এমন এক মহিমামণ্ডিত ও আকর্ষণীয় ইমারতে পরিণত হয়েছে, যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তির অন্যতম বলে পরিগণিত হবে।)

মসজিদ-ই-শাহকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায় : (ক) পিস্তাক বা পোর্টাল প্রবেশপথ, (খ) ভেস্টিবুল বা ভল্টবিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ পথ যার মধ্য দিয়ে উত্তরদিকের আইওয়ান হতে সাহানে যাওয়া যায়, (গ) উত্তরদিকের আইওয়ান, (ঘ) সাহান (ঙ) নামাজগা আইওয়ান, (চ) গম্বুজ এবং মিহরাববিশিষ্ট লিওয়ান। পিস্তাকটির দু'পাশে সুডোল ও সুউচ্চ মিনারসম্বলিত আইওয়ান প্রবেশপথ। এটি অর্ধগোলাকৃতি মুকারনাস দ্বারা অলঙ্কৃত। দু'পাশে দ্বিতল গ্যালারী দেখা যাবে। এ পোর্টাল দেখে মূল মসজিদের ফাসাদ বলে ভুল হতে পারে, কিন্তু কিবলা নির্ধারণের জন্য তেরচাভাবে এ পোর্টালটি এভাবে নির্মিত হয়েছে। ভেস্টিবুল দিয়ে সোজা সাহানে যাওয়া যায় এবং সাহানের চারপাশে চারটি আইওয়ান নির্মিত হয়েছে। কিবলা অর্থাৎ দক্ষিণদিকের মূল আইওয়ানটি অপেক্ষাকৃত বড়। এর দু'পাশে দুটি সরু মিনার রয়েছে, যা পোর্টালের মিনার অপেক্ষা উঁচু। আসল নামাজগৃহটি বর্গাকৃতির গম্বুজ দ্বারা আবৃত। গম্বুজের বাইরের উচ্চতা ১৭০ ফুট ৭ ইঞ্চি। এই নামাজগৃহের উভয় পাশে আটটি গম্বুজবিশিষ্ট

গ্যালারী দেখা যাবে। অলঙ্করণের দিক থেকে মসজিদ-ই-শাহ্ অতুলনীয় বিভিন্ন রঙের মিনাকরা টালি দ্বারা সুসজ্জিত। স্থাপত্যরীতি ও আলঙ্কারিক প্রাচুর্য এ ইমারতকে মহিমান্বিত করেছে। মিনাকরা টালি বা হাফত-রঙ্গীর (haft rangı) ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। আরাবেস্ক ও মুকারনাসের চরম উৎকর্ষ এ ইমারতে এমন এক পর্যায়ে এসেছে যে, তা অবিশ্বাস্য। পাপাডোপোলার মতে, "Every part of the Mosque facade, pishtaqs, ıvans, minarets, cupolas, interior walls–is sheathed ın glistening patterned tiles and both mihrab and minbar are in marble ; so the whole can be taken to examplify the idea of loveliness as symbol of a paradise realized on this earth." (বঙ্গানুবাদ : মসজিদের সর্বাঙ্গ- -ফাসাদ, পিসতাক, আইওয়ান মিনারেট, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গম্বুজসমূহ এবং অভ্যন্তরীণ প্রাচীর চকচকে নক্‌শাকৃত টালি দ্বারা আচ্ছাদিত এবং মিহ্‌রাব ও মিমবার মার্বেলের তৈরি ; এ অবস্থায় সমগ্র আলঙ্কাবিক পরিকল্পনা সৌন্দর্যের ধারণাকে প্রমাণিত করে যে, এ সৌন্দর্য পৃথিবীর স্বর্গীয় সৌন্দর্যের প্রতীক।)

৮

ভারত উপমহাদেশের মুসলিম স্থাপত্য

(৭২২-১৫২৬)

ভূমিকা : মুসলিম স্থাপত্যের উৎস হিসেবে মসজিদ স্থাপত্যকলার বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সমস্ত বিজিত অঞ্চলেই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সার্বজনীনতা মুসলিম স্থাপত্যকে শুধুমাত্র ব্যপকতাই দেয়নি, বৈচিত্র্য ও স্থানীয় প্রভাবে অলঙ্করণের উৎকর্ষে বিশেষ অবদান রেখেছে। স্বাভাবিক কারণেই ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য ভারত উপমহাদেশে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে মসজিদ নির্মিত হয়। মুহম্মদ বিন কাসেম কর্তৃক সিন্ধু বিজিত হলে দিবাল বা বানবোর মুসলমানদের দখলে আসে। ওমাইয়া খিলাফতে সিন্ধুতে গভর্নরদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। হিশামের সময় (৭২৪-৪৩ খ্রীঃ) বানবোরে তথা ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মিত হয়। লক্ষণীয় যে, এ মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনা সপ্তম শতাব্দীতে (৬২২ খ্রীঃ) মদিনায় নির্মিত নবী করীমের মসজিদ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে ভারত উপমহাদেশে মসজিদ-স্থাপত্য তথা মসজিদ নির্মাণের ঐতিহ্য দেখা যায় না। দিল্লীতে দাসবংশ প্রতিষ্ঠার পর এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দীন আইবক কুওয়াত-উল-ইসলাম নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং অনুরূপভাবে আজমীরেও আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া নামে অপর একটি মসজিদ নির্মিত হয়। এ দুটি মুসলিম ইমারতে হিন্দু ও জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ প্রয়োজনের খাতিরে ব্যবহৃত হলেও মুসলিম স্থাপত্যের উন্মেষ হয় দিল্লী ও আজমীরের এই দুটি মসজিদ থেকে। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত উপাদান ব্যবহৃত হলেও মুসলিম স্থাপত্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যেমন– খিলান, ভল্ট, গম্বুজ, অ্যারাবেস্ক ও আরবী শিলালিপি এ সময় থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অবশ্য পাশাপাশি 'করবেল' পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। এ কারণে জন মার্শাল বলেন, "Seldom in the history of mankind has the spectacle been witnessed of two civilizations, so vast and so strongly developed, yet so radically dissimilar as the Muhammadan and Hindu, meeting and mingling together."

জেমস ফারগুসন ভারত উপমহাদেশের মুসলিম স্থাপত্যকীর্তির নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ই. বি. হ্যাভেল মনে করেন যে, মুসলিম স্থাপত্যকলা "প্রাক্-মুসলিম ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের একটি বর্ধিত সংস্করণ" মাত্র। তাঁর অগ্রহণযোগ্য ও

অযৌক্তিক মন্তব্য হচ্ছে যে, প্রাক্-মুসলিম হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধ স্থাপত্যকলা হতে কৌণিক খিলান, গম্বুজ, মিহরাব, মিনার গ্রহণ করা হয়েছে। হ্যাভেল বলেন যে, হিন্দু-জৈন মন্দির ভেঙে কুয়য়াতুল ইসলাম ও আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া নির্মিত হয়েছে এবং এ কারণে মসজিদের কোনো আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নেই। অপরদিকে জেমস ফারগুসন বলেন, "The glory of the mosque however is not in these Hindu remains, but in the great range of arches of the screen wall on the western side."

সুলতানী আমলে দাস, খলজী, তুঘলক, সৈয়দ, লোদীবংশ ভারতবর্ষে রাজত্ব করে। এসমস্ত রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানী ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন দেখা যায়, যার মধ্যে মসজিদ প্রাধান্য লাভ করেছে। গ্রহণ ও বর্জন এবং পরিশেষে সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে মুসলিম স্থাপত্যকলার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫২৬ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজবংশের শাসনামলে সুলতানী স্থাপত্যরীতির উৎকর্ষ হতে থাকে। তুঘলক বংশের রাজত্বকালের শেষভাগে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা হ্রাস পেলে বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্য কায়েম হয়, যেমন– মালব, বাংলা, জৌনপুর, গুজরাট, গুলবার্গা, বিদর, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর। এসমস্ত রাজ্যে পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থাপত্যরীতির উদ্ভব হয়; এসমস্ত প্রাদেশিক স্টাইলে দিল্লী স্থাপত্যের প্রভাব থাকলেও তা স্তিমিত হয়ে আসে। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, সনাতনী ইসলামী স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের সাথে স্থানীয় রীতির সংমিশ্রণ হয়েছিল। প্রাক্-মুঘল যুগের স্থাপত্যকলায় বৈদেশিক প্রভাব ছিল এবং এর প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন সময়ে নির্মিত ইমারতে। আরব, পারস্য, মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্তানের নির্মিত ইমারতের প্রভাব ভারত উপমহাদেশের সুলতানী স্থাপত্যে লক্ষ করা যাবে। উপমহাদেশের মুসলিম স্থাপত্যকলার উন্মেষ ও বিকাশে নিঃসন্দেহে মসজিদ অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। পার্সী ব্রাউনের মতে, "Taking the religious structures first, the mosque or masjid literally 'the place of prostration', ...is not only the all important building of the Faith, but it is also the key note of the style."

(১) প্রাথমিক যুগ

১। বানবোর (সিন্ধু), জা'মি মসজিদ, ৭২৭-২৮ খ্রীস্টাব্দ

পটভূমি : উমাইয়া খিলাফতে আল-ওয়ালিদের অধীনে হাজ্জাজ বিন্ ইউসুফ পূর্বদেশীয় অঞ্চলের শাসনকর্তা থাকাকালীন তাঁর ভাগ্নে ও জামাতা মুহম্মদ বিন কাশেম সিন্ধুতে অভিযান করেন। সিন্ধু অঞ্চলের রাজা দাহিরের রাজধানী ও সমুদ্রবন্দর ছিল দিবাল, যা পরবর্তীকালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রমাণিত হয় যে, এটি বর্তমান বানভোর। আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, সিন্ধুর রাজা দাহিরের সমুদ্রপোত দিবালের সন্নিকটে সিন্ধী জলদস্যু কর্তৃক আটটি আরব জাহাজ লুণ্ঠিত হয়।

সিংহলে আরব বণিকগণ বসবাস করতেন এবং তাঁদের কয়েকজনের মৃত্যুতে সিংহলের রাজা তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের একটি জাহাজে করে খলিফা আল-ওয়ালিদ ও শাসনকর্তা হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করেন। উক্ত আটটি জাহাজে আল-ওয়ালিদ এবং হাজ্জাজের জন্য অসংখ্য মূল্যবান উপঢৌকনও ছিল। উল্লিখিত জাহাজগুলো দিবাল বন্দরের উপকূলে পৌঁছলে জলদস্যু দ্বারা তা লুণ্ঠিত হয়। হাজ্জাজ দাহিরের নিকট জলদস্যুদের উপযুক্ত শাস্তি ও ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। দাহির জলদস্যুদের উপর তাঁর কোনো কর্তৃত্ব নেই বলে হাজ্জাজের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। ক্রুদ্ধ হয়ে সমুচিত শিক্ষা-প্রদানের জন্য হাজ্জাজ ৭১২ সালে মুহম্মদ বিন কাশেমকে জলদস্যুদের ধ্বংস এবং দাহিরকে উপযুক্ত শাস্তিপ্রদানের জন্য সিন্ধু অভিযানে পাঠান। রায় ও সিরাজ হয়ে মুহম্মদ বিন কাশেম মেকরানে এসে পৌঁছান এবং বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে হিন্দু রাজা দাহিরের রাজ্য আক্রমণ করেন। দিবাল মুসলিমবাহিনীর হস্তগত হয় এবং সিন্ধুর বিভিন্ন অঞ্চল নিরুণ ও রাওয়ার মুসলমানদের দখলে আসে। দাহির পরাস্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন।

মুহম্মদ বিন কাশেমের বিজয় কেবলমাত্র সিন্ধুতেই নয়, সমগ্র ভারত উপমহাদেশে ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান হিসেবে গণ্য করা হয়। রাজা দাহিরের দিবাল করাচীর ৪০ মাইল পূর্বে ঘারো (Gharo) নালার উত্তর পাড়ে. বর্তমান বানবোর নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। পাকিস্তান প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ ১৯৫১ সালে এই স্থানে খননকাজ শুরু করে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আবিষ্কৃত হয় একটি ঘনবসতিপূর্ণ স্থান। প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গ এলাকার পরিমাপ– উত্তর-দক্ষিণে ১২০০ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২০০০ ফুট এবং বাইরে উত্তর-পূর্বে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে খোলা চত্বর ছিল। উল্লেখ্য যে, ভারত উপমহাদেশে বানবোরে মুসলমানদের সর্বপ্রাচীন কীর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। ইসলামের প্রথম যুগের মৃৎপাত্র ছাড়াও এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে মুসলিম ছাউনি ও মসজিদের চিহ্ন। অবশ্য দিবাল অথবা বানবোরে প্রাক্-মুসলিম যুগের বহু নিদর্শনও পাওয়া যায়। ডঃ এফ. এ. খান[১] তাঁর বানবোর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এই স্থানে তিনটি খুবই স্পষ্ট যুগের কীর্তিচিহ্ন পাওয়া গেছে, সিথো-পার্থিয়ান, হিন্দু-বৌদ্ধ, এবং ইসলামী সময়কাল হিসেবে এই কীর্তি খ্রীঃ পূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত।

মসজিদ : বানবোর তথা উপমহাদেশের সর্বপ্রাচীন ইসলামী নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় এবং অষ্টম শতাব্দীতে মুহম্মদ বিন কাশেমের সিন্ধুবিজয় এবং দিবালে তাঁর বসতি স্থাপন ও মসজিদ নির্মাণ তারই প্রমাণ। ইসলামের প্রাথমিক যুগের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ হচ্ছে, সুরক্ষিত দুর্গ। এই দুর্গের অভ্যন্তরে আবিষ্কৃত হয় এককালের গুরুত্বপূর্ণ জা'মি মসজিদ, যা বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গ এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত এই মসজিদের অভ্যন্তরে দুটি প্রাচীন আরবী শিলালিপি পাওয়া গেছে। বেলেপাথরে কূফীরীতিতে উৎকীর্ণ দুটি শিলালিপি বানভোর মসজিদের প্রাচীনত্বকে

১। F. A. Khan Banbhore Department of Archaeology and museums, 1963.

প্রতীয়মান করে। এ দুটির মধ্যে প্রথমটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এতে তারিখ উল্লিখিত আছে—১০৯ হিজরী অর্থাৎ ৭২৭ খ্রীঃ।

প্রথম শিলালিপির অনুবাদ এরূপ :

"পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। যাহা আমির মারওয়ান ইবনে মোহম্মদ মউলা আমির আল-মুমেনীন, আল্লাহ তাঁহাকে সমৃদ্ধিশালী করুন, আলী ইবনে মুসার মাধ্যমে নির্মাণের আদেশ দেন। আল্লাহ তাঁহাকে আরও সৌভাগ্যবান করুন। সন : ১০৯ হিজরী, (অথবা ৭২৭-২৮ খ্রীঃ)"

উল্লিখিত শিলালিপি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুহম্মদ বিন কাশেমের সিন্ধুবিজয়ের পনেরো বছরের মধ্যে (৭১২-২৭ খ্রীঃ) ভারত উপমহাদেশে উমাইয়া খলিফা হিশামের (৭২৪-৪৩ খ্রীঃ) রাজত্বে বানবোরে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মিত হয় এবং নির্মাতা ছিলেন আলী ইবনে মুসা মউলা আমিরুল মুমেনীন। মসজিদটির বহিঃপ্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং চৌহদ্দী দেখে মনে হয় যে, এলাকাটি চতুষ্কোণাকার ছিল। এফ. এ. খানের মতে, পূর্ব-পশ্চিমে ১২০ ফুট এবং উত্তর-দক্ষিণে ১২০ ফুট। মসজিদের প্রাচীর নির্মিত হয় ভারী পাথরের টুকরা দিয়ে এবং প্রাচীরটি ৩ থেকে ৪ ফুট প্রশস্ত। মসৃণ চুনাপাথর দিয়ে এই প্রাচীর নির্মিত হয়। মসজিদের পরিকল্পনা ইসলামের চিরাচরিত চত্বর টাইপকে (Courtyard) স্মরণ করিয়ে দেয়। রসূলুল্লাহর মদিনা মসজিদ, কুফা ও ওয়াসিতের মসজিদের অনুকরণে বানভোর মসজিদটি তিনটি অংশে বিভক্ত— লিওয়ান, সাহান এবং রিওয়াক। ইটের মেঝেবিশিষ্ট চত্বরটির পরিমাপ ৭৫ ফুট × ৫৮ ফুট। পশ্চিমদিকে লিওয়ান এবং অপর তিনদিকে রিওয়াক নির্মিত হয়। পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণদিকের রিওয়াকের ছাদ দুই সারিবিশিষ্ট কাঠের স্তম্ভদ্বারা নির্মিত। খননের ফলে আবিষ্কৃত হয় যে, রিওয়াকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ছিল এবং এ সমস্ত প্রকোষ্ঠের পরিমাপ ছিল ১১ ফুট × ৯ ফুট।

পশ্চিমদিকে প্রশস্ত লিওয়ান নামাজের জন্য ব্যবহৃত হত। এই লিওয়ানটি দুই সারি পাথরের স্তম্ভ দ্বারা তিনটি আইলে বিভক্ত। প্রতি সারিতে ১১টি স্তম্ভ ছিল এবং ছাদের ভার বহন করত মোট ১১ × ৩ = ৩৩টি পাথরের স্তম্ভ। লিওয়ান এবং রিওয়াকের স্তম্ভগুলোর ভিত্তিমূল (base) ছিল নক্শাকৃত প্রস্তরখণ্ড। এই সমস্ত প্রস্তরখণ্ড অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং কখনও কখনও তিনটি স্তরে লতাপাতার নক্শা দ্বারা খোদিত ছিল। রিওয়াকে এই সমস্ত পাথরের ভিত্তিমূলের উপরে কাঠের স্তম্ভ স্থাপিত হয়। পাথরে কাঠের গুঁড়া পাওয়া যায় এবং এতে প্রমাণিত হয় যে, স্তম্ভ কাঠের ছিল। পাথরের খণ্ডগুলো প্রাক্-মুসলিম ইমারত থেকে সংগৃহীত; কারণ কোনো কোনোটিতে মূর্তিও খোদিত দেখা যায়। রিওয়াকে নির্মিত বর্তমানের কুঠরীগুলো পরবর্তীকালে সংযোজিত হয় এবং আদি মসজিদের সঙ্গে এদের কোনো সংস্পর্শ নেই।

বানবোরের মসজিদের সাহানে উঁচু চুনকাম করা একটি ওজুর স্থান ছিল। উত্তর-পূর্ব কোণায় অবস্থিত এই ওজুর স্থানটি মসজিদের অপরিহার্য অঙ্গ। পানি নিষ্কাশনের জন্য পাথরের একটি পয়ঃপ্রণালী নির্মিত হয়। মসজিদে প্রবেশের জন্য উত্তর এবং দক্ষিণদিকে প্রধান ফটক ছিল এবং পশ্চিমদিকে একটি ছোট প্রবেশপথ নির্মিত হয়।

পশ্চিমদিক থেকে বাইরে যাবার জন্য সিঁড়ি ছিল। পূর্বদিকের প্রকাণ্ড প্রবেশপথটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। ৫১/২ ফুট প্রশস্ত এই প্রবেশপথে ছিল একটি সুন্দর পর্চ এবং তিনটি ধাপবিশিষ্ট সিঁড়ি। উত্তরদিকের প্রবেশপথ অপেক্ষা পূর্বদিকের প্রবেশপথটি অনেক পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত বড় উত্তরদিকের প্রবেশপথটি ৭ ফুট চওড়া এবং বেশ কয়েকটি ধাপ পার হয়ে মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। এখানে কাঠের দরজা এবং লোহার কাঁটার অংশ পাওয়া গেছে। ৭২৭ সালে মসজিদ নির্মিত হলেও লক্ষণীয় যে, কিবলা-প্রাচীরে কোনো অবতলাকৃতি মিহরাব পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, খলিফা আল-ওয়ালিদের রাজত্বে হিজাজের শাসনকর্তা উমর ইবনে আবদুল আজীজ মদিনা মসজিদ পুনর্নির্মাণের সময় ৭০৭-৯ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম অবতলাকৃতি মিহরাব স্থাপন করেন। পশ্চিমদিকের প্রাচীর ভগ্নাবস্থায় থাকায় আদৌ কোনো মিহরাব ছিল কি-না তা সঠিকভাবে বলা যায় না।

অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত বানভোর মসজিদটির আসল রূপ বর্তমানে উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। বহু পূর্বেই আসল মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরও তিনবার অর্থাৎ আব্বাসীয় যুগে (৭৫০-১২৫৮ খ্রীঃ), সুলতানী আমলে (৯৯৮-১২৯৯ খ্রীঃ) এবং সর্বশেষ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পুনর্নির্মিত হয়। এর প্রমাণ রয়েছে আব্বাসীয় যুগে ২৯৪ হিজরী অর্থাৎ ৯০৭ খ্রীস্টাব্দের একটি কুফীরীতিতে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে। উল্লিখিত শিলালিপিটি তিনখণ্ডে বিভক্ত এবং দক্ষিণদিকের রিওয়াকে প্রাপ্ত এই শিলালিপি আরবী লিপিশৈলীর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কুফীর সঙ্গে লতাপাতার মিশ্রণে যে অলঙ্কৃত কুফীরীতির উদ্ভব হয়েছে তা ইসলামের আরবী লিপিকলায় বিশেষভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। এফ. এ. খান বলেন যে, এ ধরনের ৩০টি আরবী শিলালিপি পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ২৯৪ হিজরীতে স্থাপিত শিলালিপিটি। এসমস্ত শিলালিপিতে শাসনকর্তা অথবা খলিফার নাম উল্লেখ ছাড়াও বহু ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণিত রয়েছে। ২৯৪ হিজরীতে উৎকীর্ণ শিলালিপির অনুবাদ এরূপ–"পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং অবশ্যই মোহম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল এবং ভৃত্য। যে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, নামাজ আদায় করে, আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকেও ভয় করে না, যাকাত প্রদান করে, কেবলমাত্র সে-ই মসজিদে বসবাস করে। এটি আমির মোহম্মদ ইবনে আবদুহু জুলকাযা মাসে, ২৯৪ হিজরী তারিখে নির্মাণের নির্দেশ দেন।"

হিজরী ২৯৪ সাল অর্থাৎ ৯০৬ খ্রীস্টাব্দে যে নির্মাণের কথা বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা নির্মাণ নয়, পুনর্নির্মাণ। ভারত উপমহাদেশের সর্বপ্রথম মসজিদ বানবোরে নির্মিত হলেও পরবর্তীকালে সিন্ধুতে আরও মসজিদ নির্মিত হয় এবং প্রতীয়মান হয় যে, অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত মসজিদরীতির প্রতিফলন দেখা যাবে এই সমস্ত মসজিদে।

২। মনসুরা-ব্রাহ্মণাবাদ মসজিদ, অষ্টম শতাব্দী

সিন্ধুর মনসুরা ব্রাহ্মণাবাদ অঞ্চলে স্থাপত্যিক খননের ফলে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। অষ্টম শতাব্দীতে এই মসজিদ নির্মিত হয়। উল্লেখ থাকে

যে, ৭১২ খ্রীস্টাব্দে মুহম্মদ বিন কাশেম দাহিরকে পরাজিত করে দিবাল অধিকার করেন। এই দিবালই বর্তমানে বানবোর, যা পূর্বে বলা হয়েছে। দিবাল অধিকৃত হবার পর মুহম্মদ বিন কাশেম সিন্ধুর থর জেলার ব্রাহ্মণাবাদ অঞ্চল দখল করেন। এ স্থানে নির্মিত ইটের মসজিদটি বানভোর মসজিদের অনুরূপ ছিল। প্রাচীন মসজিদের রীতি ও ধরনের অনুকরণে এটি নির্মিত হয়। মদিনা, কুফা ও বসরায় প্রাচীন মসজিদের মতো এর ছাদ কাঠ দ্বারা সমান্তরালভাবে আবৃত ছিল। বানভোরের পর ভারত উপমহাদেশে সম্ভবত এটি প্রাচীনতম দ্বিতীয় মসজিদ।

বানভোর ও মনসুরা ছাড়াও প্রাক্-সুলতানী যুগে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে। বিশেষ করে আব্বাসীয় খিলাফতে। এসমস্ত মসজিদের কোনো চিহ্ন নেই, কোনো কোনো ঐতিহাসিকের বর্ণনায় এদের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সুলতান আল-মনসুরের আমলে মুলতানে জনৈক হাশাম এবং সিন্দান নামক স্থানে ফজল নামক এক ব্যক্তি জা'মি মসজিদ নির্মাণ করেন। আব্বাসীয় খলিফা-মুতাজিদ (৮৯২-৯৯ খ্রীঃ) মুলতানে একটি মসজিদ স্থাপন করেন। ইবনে মাসুদের বর্ণনা অনুযায়ী রাষ্ট্রকূট বংশের হিন্দু রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ (৯৩৯-৬৭ খ্রীঃ) তাঁর রাজ্যে একটি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেন।

৩। লাহোর, খিস্তী মসজিদ এবং মিনার, একাদশ শতাব্দী

পটভূমি : রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের দিক থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, আরবদের সিন্ধুবিজয় নিষ্ফল ছিল, অবশ্য সাংস্কৃতিক দিক থেকে নয়। সিন্ধুবিজয়ের প্রায় আড়াইশত বছর পরে দশম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে তুর্কীগণ মুসলিম আধিপত্য বিস্তার করেন। সামানী বংশের পতনের পর তুর্কীস্থান, পারস্য ও ইরাকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুর্কী বংশের উদ্ভব হয়। যে তুর্কী বংশ সর্বপ্রথম ভারত উপমহাদেশে নতুন উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় সমরাভিযান করে তা গজনী বংশ নামে পরিচিত। এ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান এবং দিগ্বিজয়ী বীর সুলতান মাহমুদ তাঁর তেইশ বছরের রাজত্বকালে সতেরোবার (১০০০–২৭ খ্রীঃ) ভারতে যুদ্ধাভিযান করেন। প্রতিবারেই তিনি অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু রাজনৈতিক দিক দিয়ে পাঞ্জাব ব্যতীত অপর কোনো অঞ্চল গজনী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হয়নি। শিল্প ও স্থাপত্যকলা প্রসঙ্গে মার্শাল বলেন, "ইসলামী শিল্পকলা বিস্তারে গজনী কেবল মাধ্যমই ছিল না, বরং সামানীয়দের নিকট থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে সমৃদ্ধিশালী স্থাপত্যশিল্প গড়ে তোলে।" গজনীতে সুলতান মাহমুদের কীর্তি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও ভারতবর্ষে মুসলিম স্থাপত্যের উন্মেষে এর বিশেষ অবদান রয়েছে। গজনীর অদূরে লস্করী বাজারে ১৯৪৯-৫২ খ্রীস্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে গজনী সুলতানদের রাজপ্রাসাদ আবিষ্কৃত হয়। গজনীতে নির্মিত সুলতান মাহমুদের অপরূপ মহিমামণ্ডিত মসজিদটি স্বর্গীয় বধূ ('Celestial Bride') নামে পরিচিত। এ ছাড়া গজনী মিনার (১০৩০ খ্রীঃ) স্থাপত্যকীর্তির অপূর্ব নিদর্শনই নয়, ভারতবর্ষের মুসলিম স্থাপত্যে বিশেষ করে দিল্লীর কুতুব মিনারে এর অসামান্য প্রভাব লক্ষ করা যায়। লাহোরে সুলতান মাহমুদ একটি

মসজিদ ও মিনার নির্মাণ করেন। খিস্তী মসজিদ ও মিনার নামে পরিচিত এই ইমারতটি গজনভী স্থাপত্যের সর্বপ্রাচীন এবং একমাত্র নিদর্শন। এই মসজিদ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

(২) দাসবংশ (১২০৬–৯০ খ্রীঃ)

পটভূমি : ভারতবর্ষে ইসলামকে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করার সৌভাগ্য আরবদের হয়নি। গজনীর তুর্কী সুলতানগণ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ইসলামের পতাকাই নিয়ে যাননি, বরং একটি স্থায়ী মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস পান এবং প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাব সুলতান মাহমুদের গজনী সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। কিন্তু মুসলিম সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় সর্বাধিক অবদান রাখেন ঘোরী বংশ। হিরাতের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ক্ষুদ্র পার্বত্য অঞ্চলে ঘোর উপজাতীয় আফগান নেতৃবৃন্দ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং গজনভী সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর ঘোরী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ ঘোরী ১১৭৩ খ্রীস্টাব্দে সেলজুকদের নিকট থেকে গজনী দখল করেন এবং ১১৮৬ খ্রীস্টাব্দে লাহোর ঘোরী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে ভারত উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চল এবং আফগানিস্তানে একটি নতুন মুসলিম রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়। মুহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষে অভিযান করে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হন। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১ খ্রীঃ) পরাজিত হলেও দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধের সাফল্য হিন্দুশক্তিকে ধূলিসাৎ করে এবং মুসলিম-আধিপত্য বিস্তারে সহায়ক হয়। হেগ বলেন, "তরাইনের বিজয় উত্তর ভারতে দিল্লী পর্যন্ত সমস্ত শহরের ফটক মুহম্মদের জন্য উন্মোচিত হয়ে পড়ে। তিনি পরপর হিন্দু রাজাদের নিকট থেকে হানসী, সামানা, সরস্বতী প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করেন। অতঃপর আজমীর মুহম্মদ ঘোরীর দখলে আসে। ভারতের নবাধিকৃত অঞ্চলসমূহের কর্তৃত্ব তাঁর সুযোগ্য এবং বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতুবউদ্দীন আইবকের উপর ন্যস্ত করে সুলতান মুহম্মদ ঘোরী গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন। মুহম্মদ ঘোরীর একজন তুর্কী ক্রীতদাস আইবক ভারতের অধিকৃত অঞ্চলে ঘোরী রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে মুসলিম অভিযানকে সুদূরপ্রসারী করেন। ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে তিনি মিরাট, কোইল (আধুনিক আলীগড়) এবং দিল্লী জয় করেন। ভারতবর্ষের মুসলিম-অধিকৃত অঞ্চলের রাজধানী লাহোর থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১১৯৪ খ্রীস্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরী আইবকের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে অভিযান পরিচলনা করে কনৌজ, আজমীর, গুজরাট, গোয়ালিয়র, বিয়ানা ও বাদায়ূন দখল করেন। ঈশ্বরীপ্রাসাদ বলেন, "ভারতবর্ষে কুতুবউদ্দীনের কর্মজীবন ছিল নিরবচ্ছিন্ন বিজয়ের প্রতীক।" কুতুবউদ্দীনের নির্দেশে তাঁর সুদক্ষ সেনাপতি মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী বিহার ও বাংলা জয় করেন। এইভাবে সুলতান ঘোরীর প্রতিনিধি হিসেবে আইবক পূর্ব-পশ্চিমে লাহোর থেকে লক্ষণাবতী (গৌড়) এবং উত্তর-দক্ষিণে দিল্লী থেকে কালিঞ্জর ও গুজরাট অবধি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুসলিম সার্বভৌমত্ব কায়েম করেন। ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা সুলতান গিয়াসউদ্দীন মুহম্মদ ১২০৬ সালে কুতুবউদ্দীনকে

ফরমান দ্বারা দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন এবং সুলতান হিসেবে তিনি একটি নতুন বংশ প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম দাসবংশ।

১। দিল্লী কুওয়াত উল ইসলাম মসজিদ, ১১৯১-৯২ খ্রীস্টাব্দ (চিত্র ৪২-৪৩)

পটভূমি : বর্তমান ভারতের রাজধানী দিল্লী অতি প্রাচীন শহর। মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে দিল্লী হিন্দু সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। স্টিফেনের মতে, দিল্লীর প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস খ্রীঃ পূর্ব পনেরো শত বছরের প্রখ্যাত রাজা যুধিষ্ঠিরের সময় থেকে শুরু। যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ (Indraprastha) নামে অভিহিত ছিল। বর্তমানে ইন্দ্রপ্রস্থের কোনো চিত্র অবশিষ্ট নেই। তবে হুইলার বলেন যে, কুতুবের দিকে যেতে রাস্তার পাশে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের স্তূপ দেখে মনে হয় যে, বহু শতাব্দী ধরে বহু রাজধানীর পুরাকীর্তির স্তর এই স্থানে খুঁজলে পাওয়া যাবে। যাহোক, স্টিফেনের মতে, "It is generally believed to have occupied the extensive piece of ground which covers the site of Indrapat and stretches northword to the Delhi gate of modern Delhi. General Curningham could fix its, southern boundary at or about Humayun`s tomb and its northern at the Kotlah of Firoz Shah... I am disposed to place the northern boundary of Indraprastha between the northern and southern boundaries of modern Delhi..."[১]

ইন্দ্রপ্রস্থ কখন থেকে দিল্লীতে রূপান্তরিত হল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য ইন্দ্রপ্রস্থ দখল করেন। এর পর কুমায়ূনের যে রাজা দিল্লী অধিকার করেন, তাঁর নাম সুকান্ত (Sukwanta)। কিন্তু ইতিহাসের বিচিত্র পটপরিবর্তনে দিল্লীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। ৭৮ খ্রীস্টাব্দে বিক্রমাদিত্য ইন্দ্রপ্রস্থ দখল করার পর 'দিল্লী' শব্দের প্রথম প্রচলন হয়, যদিও দিল্লী তাঁর রাজধানী ছিল না। এমনকি গুপ্তবংশ (চতুর্থ থেকে পঞ্চম শতাব্দী) কনৌজ বংশের (৫৫০-৬৫০ খ্রীঃ) রাজত্বকালে দিল্লী রাজধানী হিসেবে প্রাধান্য লাভ করেনি। প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়ান এবং হুয়েন সাং দিল্লীর উল্লেখ করেননি। সুলতান মাহমুদ দিল্লী অভিযান ও দখলের প্রয়োজনীয়তা বোধ করবেননি। তাঁর রাজত্বের উজ্জ্বল নক্ষত্র আল-বিরুনী কনৌজ, মথুরা, মিরাটের উল্লেখ করেন, কিন্তু দিল্লী সম্বন্ধে কিছু বলেননি।

'দিল্লী'[২] নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদ প্রচলিত আছে। (ক) বেগলারের মতে, যুধিষ্ঠিরের বংশধর রাজা দালিপের (Raja Dalip) নাম থেকে দিল্লী হয়েছে। কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থের বহু পরে দিল্লী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যুধিষ্ঠিরের বংশধর নগরী পত্তন করতে

১। Stephen. C. The Archaeology and Movmental Remains of Delhi, New Delhi, 1876 p 5

২। হিন্দু গ্রন্থকারগণ ডিলি (Dilli) এবং মুসলমান ঐতিহাসিকগণ দেহলী (Dehli) বলে উল্লেখ করেন। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের সরকারী নির্দেশে বর্তমান দিল্লীর (Delhi) প্রচলন হয়।

পারেননি; (খ) দ্বিতীয় অভিমত যে, খ্রীঃ পূর্ব ৯১৯ সালে টন-ওয়ার বংশের রাজা হিন্দু শব্দ ডিলি (dhili) অর্থাৎ আলগা থেকে দিল্লী নামের উৎপত্তি। দিল্লীর মাটি এমন আলগা ছিল যে, তাঁবুর খুঁটি পোতা যেত না—এমন ধারণা থেকে দিল্লী শব্দের উৎপত্তি যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, দিল্লীর মাটি খুবই শক্ত এবং কঙ্করমিশ্রিত। উপরন্তু, দিল্লীর কোনো অস্তিত্ব খ্রীঃ পূর্ব দশম শতাব্দীতে ছিল না; (গ) অপর একটি মতবাদ হচ্ছে, কনৌজের রাজা দেলুর (Raja Delu) নাম থেকে দিল্লী হয়েছে। দেলু দিল্লী অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। এপ্রসঙ্গে আমীর খসরুর উদ্ধৃতি বিশেষ যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। তিনি দিল্লীকে 'দেলু' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু রাজা দেলু খ্রীঃ পূর্ব ৩২৮ সালে রাজা পুরুর সমসাময়িক ছিলেন। যেহেতু বর্তমান দিল্লীর পুরাতত্ত্ব খ্রীঃ পূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে অনুসৃত হতে পারে না, সেহেতু রাজা দেলুর সঙ্গে দিল্লীর কোনো সম্পর্ক নেই।

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, আবু রায়হানের ভাষ্য মতে, ৭৮ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর শক বিজেতাকে পরাজিত করে বিক্রমাদিত্য গৌরব অর্জন করেন। ভিন্নমত থাকলেও একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের উপর দিল্লী শহর নির্মিত হয়। বিক্রমাদিত্য কর্তৃক শক রাজাদের পরাজয়ের ফলে দিল্লী ৭৯২ বছর ইতিহাসের তিমিরে নিক্ষিপ্ত হয়। নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী, কনৌজ রাজা প্রথম অনঙ্গ পাল ৬৭৬ সালে কনৌজ থেকে রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে স্থানান্তরিত করেন এবং স্থানান্তরের পর থেকে পূর্বের শক শহর দিল্লী রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। কানিংহামের মতে, অনঙ্গ পাল ৭৩১ অথবা ৭৩৬ সালে দিল্লী শহরের পুনঃনির্মাণ সম্পন্ন করেন। প্রথম অনঙ্গ পাল দিল্লীতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং প্রাসাদের দুপাশে দুটি সিংহের মূর্তি স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় অনঙ্গ পাল দিল্লী শহরের পুনর্নির্মাণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। কথিত আছে যে, বর্তমান কুওয়াত-আল-ইসলাম মসজিদের চত্বরে যে লোহার স্তম্ভ রয়েছে তা প্রথম অনঙ্গ পাল কর্তৃক স্থাপিত হয় এবং এটি মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রোথিত ছিল।

ভারতবর্ষের মুসলিম শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাচীন কুওয়াত আল ইসলাম মসজিদের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, ভিত্তিভূমি প্রাক্-মুসলিম যুগের একটি মন্দির ছিল। এ অঞ্চলটিতে কনৌজের চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বিরাজ, যিনি রায় পিথোরা নামে সমধিক পরিচিত, একটি কিল্লা বা দুর্গ স্থাপন করেন। সাধারণভাবে দুর্গটি 'কিলাহ রায় পিথোরা' নামে পরিচিত। আলেকজান্ডার কানিংহামের মতে, দিল্লী ও আজমীরের প্রতাপশালী চৌহান বংশের সর্বশেষ নৃপতি পৃথ্বিরাজ ১১৭০ থেকে ১১৯১ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং ক্রমবর্ধমান মুসলিম শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য ১১৮০ অথবা ১১৮৬ সালে দিল্লীতে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করেন। উল্লেখ্য যে, গজনভী রাজ্যের প্রদেশ পাঞ্জাব এবং ঘোরী বংশের অভ্যুত্থানে মুহম্মদ ঘোরীর সমরাভিযান হিন্দু রাজার সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ ছিল। পৃথ্বিরাজ ১১৯১ সালে প্রথম তরাইনের যুদ্ধে জয়লাভ করলেও দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে মুহম্মদ ঘোরীর নিকট পরাজয় বরণ করেন এবং নিহত হন। স্মিথ যথার্থই বলেন, "বস্তুত ১১৯২ সালের তরাইনের দ্বিতীয়

যুদ্ধকে একটি যুগসন্ধিক্ষণকারী সংঘর্ষ বলা যায়, যা হিন্দুস্থানে মুসলিম আক্রমণের চরম সাফল্যকে সুনিশ্চিত করে।"

স্টিফেন কিলাই রায় পিথোবা'র সীমানা বা চৌহদ্দী উল্লেখ করে বলেন যে, প্রধান সুরক্ষিত দুর্গটি বহিঃপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। বর্তমানের আদম খানের সমাধির কাছ থেকে পশ্চিমদিকে ৪০০ ফুট প্রসারিত হয়ে একটি ফটকের পাশ দিয়ে উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্বদিকে দুর্গপ্রাচীর বিস্তৃত। উত্তরদিকের প্রাচীর 'জাহানপানাহ' প্রাচীর থেকে হাউজ রানী হয়ে দক্ষিণে বাদাউন ফটক পর্যন্ত প্রসারিত। অতঃপর প্রাচীর দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘুরিয়ে জামালী মসজিদ পর্যন্ত চলে গিয়ে আদম খানের সমাধিতে মিশেছে। পৃথ্বিরাজের প্রাচীন কেল্লার প্রাচীরের দৈর্ঘ্য পাঁচ মাইল এবং ব্যাসও অনুরূপ। কিল্লার পশ্চিম প্রান্তে প্রধান প্রাসাদটি সুরক্ষিত বুরুজসম্বলিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ১১৯১-২ সালে মুহম্মদ ঘোরীর সুযোগ্য সেনাপতি কিলাহ রায় পিথোরা অবরোধ ও দখল করেন।

মসজিদ নির্মাণ : কুতুবউদ্দীন আইবক কিলাহ রায় পিথোরাকে নবঅধিকৃত ভারতবর্ষের মুসলিম অঞ্চলের রাজধানী হিসেবে নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। হাসান নিযামীর ভাষায়, "বিজেতা নগরীতে প্রবেশ করেন এবং সমগ্র এলাকাকে বিগ্রহ ও মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত করেন এবং দেবদেবীর মূর্তিসম্বলিত উপাসনালয়ে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনাকারীদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করেন।"[১] কুতুবউদ্দীন আইবক স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করে ইসলামের প্রতীক ও সার্বভৌমত্বের নিদর্শনস্বরূপ দিল্লীতে একটি মসজিদ নির্মাণে প্রয়াসী হন। উল্লেখ্য যে, নবঅধিকৃত অঞ্চলে মুসলমান সৈন্যবাহিনী একটি নতুন শহর বা 'হিরা' স্থাপন করে, যার প্রাণকেন্দ্র ছিল মসজিদ। প্রাচীন মসজিদ নির্মাণের ইতিহাসেও বিশেষ করে কুফা, বসরা ও ফুসতাতকে কেন্দ্র করে মুসলিম জনগোষ্ঠী, সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। উপরন্তু, বাণিজ্যিক, সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিচারকালে ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে দিল্লীর মর্যাদা অনস্বীকার্য। আইবক সবদিক দিয়ে বিচার করে পৃথ্বিরাজের কেল্লাকে তাঁর রাজধানীর প্রকৃত স্থান হিসেবেই নির্বাচন করেন। বিশেষ প্রয়োজনে স্থাপত্যিক উপকরণের অভাব এবং দক্ষ কারিগর ও স্থপতির অবর্তমানে আইবক কেল্লার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের বিভিন্ন অংশ দিয়ে একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। যুদ্ধে নিয়োজিত আইবকের পক্ষে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা নিয়ে দূরাঞ্চল থেকে পাথর কেটে স্তম্ভ তৈরি দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভবপর ছিল না। তা ছাড়া যুদ্ধাভিযানে বিজিতবাহিনী যুগ যুগ ধরে পরাজিত বাহিনীর উপাসনাগারের স্থাপত্য উপকরণ দিয়ে তাদের মন্দির নির্মাণ করেছে। গ্রীক জুপিটার মন্দিরকে রূপান্তরিত করে সেন্ট জনের গির্জা নির্মিত হয় দামেস্কে এবং পরবর্তী পর্যায়ে গির্জা জা'মি মসজিদে রূপান্তরিত হয়। সতীশ গ্রোভার যথার্থই বলেন, "Given time, the stone cutters would have been set to the task of winning blocks of stone from the quarries. But time was not at hand. This was the period of constant war."[২]

১। Taju-al-Ma-asir : See Brown, p. Indian Architecture (Islamic Period), P. 9

২। Grover, S., The Architecture of India (Islamic) Delhi, 1981. p. 6

কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদের নির্মাণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। দিল্লী অধিকার করে কুতুবউদ্দীন আইবক সেনাবাহিনীর জন্য নামাজের ব্যবস্থা এবং ভারতবর্ষে প্রথম ইসলামের প্রতীক হিসেবে একটি মসজিদ নির্মাণে ব্রতী হন। পূর্বেই বলা হয়েছে, পৃথ্বিরাজের কিলা বা দুর্গের অভ্যন্তরে মন্দিরপ্রাঙ্গণে মসজিদের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক মুসলিম ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন। কেউ কেউ বলেন যে, উক্ত স্থানে নির্মিত সাতাশটি জৈন এবং হিন্দু-মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপর মসজিদ নির্মিত হয়।[১] মুসলিম ঐতিহাসিক এবং ইউরোপীয় লেখকদের মতে, আইবক বিশাল মন্দির কমপ্লেক্সের পশ্চিমদিক ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন মাত্র। কিন্তু কানিংহাম মনে করেন যে, সম্পূর্ণ মন্দির ভেঙে যে প্লাটফর্ম (Chabbutra) পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে মসজিদ নির্মিত হয়। মন্দিরগুলোর স্তম্ভ একটির উপর অপরটি কোনো প্রকার মশলা ছাড়াই স্থাপিত হয় এবং এর ফলে অতি সহজেই স্তম্ভ, বীম লিনটেন খুলে ফেলা সম্ভবপর হয়। ব্রাউন বলেন যে, মন্দির অপেক্ষা মসজিদের আয়তন বৃহৎ হওয়ায় পাথরের হিন্দু প্লাটফর্মটির আয়তন দ্বিগুণ করা হয়। মসজিদের আকার ছিল আয়তাকার, পরিমাপ ২১২ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ১৫০ ফুট প্রস্থ। হিন্দু-মন্দিরের পাথরের স্তম্ভগুলো দ্বারা চত্বরের চারিপাশে লিওয়ান এবং রিওয়াক নির্মিত হয়। বলাই বাহুল্য যে, কিবলার দিকের স্তম্ভরাজির সংখ্যা অধিক ছিল, কারণ এখানে লিওয়ানের সৃষ্টি করা হয়। গ্রোভার বলেন, "the task of erecting a mosque was fairly simple, reassembling these structural elements to create a colonnade around an open sky courtyard, instead of the dark labyrinths of a Hindu temple"[২]

কুতুবউদ্দীন আইবক দিল্লীতে যে মসজিদ নির্মাণ করেন তা 'কুওয়াত আল-ইসলাম' বা 'ইসলামের শক্তি' মসজিদ (Might of Islam` Mosque) নামে পরিচিত। 'কুওয়াত' শব্দটি অর্থবোধক, কারণ আইবকই সর্বপ্রথম অমুসলমান ভারতবর্ষে ইসলামের সার্বভৌম ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং তারই প্রতীকস্বরূপ মসজিদের নামকরণ করেন 'কুওয়াত'। মসজিদটি চিরাচরিত আয়তাকার ধরনের এবং চত্বরসম্বলিত দামেস্কের মসজিদে এরূপ পরিকল্পনা দেখা যায়। চত্বরটির পরিমাপ ১৪২ ফুট x ১০৮ ফুট। চত্বরের পূর্বদিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণে দুটি আইল সৃষ্টি করা হয় হিন্দু ও জৈন মন্দিরের স্তম্ভগুলো বিন্যাস করে। লক্ষণীয় যে, যেহেতু স্তম্ভগুলো আকারে ছোট, সেহেতু পরপর দুটি স্তম্ভ সংযোগ করে ছাদ উঁচু করা হয়। বীমের সাহায্যে সমান্তরাল ছাদ তৈরি করা হয় তিনদিকের রিওয়াকে।

কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদটি স্টিফেন্সের বর্ণনায়, "the Mosque of Qutb-uddin Aibek as seen from outside is a sombre, heavy looking, square stone building. "এই মসজিদে প্রবেশের প্রধান ফটক পূর্বদিকের প্রাচীরে। খিলান

১। Brown, p. 10; Grover, p. 6.

২। Grover, p. 6

দ্বারা এই প্রবেশপথ নির্মিত এবং সাতটি পাথরের সিঁড়ি অতিক্রম করে মসজিদের চত্বরে প্রবেশ করতে হয়। পূর্বদিকের প্রাচীরটি ১৪৭ ফুট দীর্ঘ এবং চারটি জানালা রয়েছে। দেওয়াল থেকে সামান্য সামনে বাড়িয়ে এই ফটকটি নির্মিত এবং ৪½ ফুট ভিত্তিভূমির উপর স্থাপিত। ১২ ফুট লম্বা দুটি প্রাচীর দ্বারা ফটকটি নির্মিত এবং এর অভ্যন্তরে সাতটি সিঁড়ি রয়েছে। ফটকটি ১১ ফুট প্রস্থ এবং খুব উঁচু নয়। ফটকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে একটি ছোট গম্বুজ নজরে পড়বে। করবেল পদ্ধতিতে একটি ক্ষুদ্রাকার পাথরের বীম বা টুকরা দিয়ে চতুষ্কোণকে অষ্টভুজে রূপান্তরিত করা হয়। চতুষ্কোণটি স্তম্ভের সাহায্যে নির্মিত। গম্বুজ নির্মাণে সম্পূর্ণরূপে হিন্দুপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

প্রবেশপথের মধ্য দিয়ে পূর্বদিকের রিওয়াকে আসা যায় এবং এই রিওয়াকের উত্তর ও দক্ষিণদিকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারসারি স্তম্ভ প্রসারিত। তিনটি আইল পূর্বদিকের রিওয়াকে উভয় প্রান্তে প্রতি সারিতে সাতটি স্তম্ভ দ্বারা সৃষ্ট এবং শেষ প্রান্তে দুটি জেনানা গ্যালারী নির্মিত হয়েছে। এই গ্যালারীর পরিমাপ ২০ বর্গফুট। পূর্বদিকের রিওয়াকের মধ্যস্থলে একটি গম্বুজ দেখা যাবে এবং পূর্বদিকের প্রবেশপথের গম্বুজের অনুরূপ উত্তর ও দক্ষিণদিকের গ্যালারীতে গম্বুজ স্থাপিত হয়। আটটি স্তম্ভের সাহায্যে চতুষ্কোণ থেকে অষ্টভুজে রূপান্তরিত করে তার উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়। লক্ষণীয় যে, গ্যালারীগুলো দ্বিতলবিশিষ্ট এবং বহির্প্রাচীরে ছোট ছোট জানালা রয়েছে। গ্যালারীর মেঝেও রিওয়াকের মতো স্তম্ভের সাহায্যে নির্মিত।

পূর্বদিকের রিওয়াকের সঙ্গে লিওয়ানের সংযোগ রক্ষা করেছে উত্তর এবং দক্ষিণদিকের রিওয়াক। উত্তরদিকের প্রাচীরবেষ্টিত রিওয়াকটির মধ্যস্থলে একটি প্রবেশপথ দেখা যাবে। এই রিওয়াকটি তিনটি স্তম্ভসারি দ্বারা নির্মিত। সর্বমোট ঊনপঞ্চাশটি স্তম্ভ রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম সারিতে তেরোটি প্রাচীরের সঙ্গে গেঁথে দেওয়া হয়েছে; দ্বিতীয় সারিতে সতেরোটি এবং প্রথম সারি থেকে প্রায় সাত ফুট দূরে স্থাপিত। তৃতীয় সারিটি চত্বরের সামনে রয়েছে এবং মোট পনেরোটি স্তম্ভ দ্বারা নির্মিত। উত্তরদিকের রিওয়াকের মাঝে ছাদে একটি কৌণিক গম্বুজ দেখা যাবে। উত্তরদিকের প্রবেশপথে দুটি পাথরের সিঁড়ি আছে এবং উভয় পাশে তিনটি বড় জানালা আলো-বাতাসের জন্য স্থাপিত হয়েছে। খিলান প্রবেশপথের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। এখানে একটি শিলালিপিতে মসজিদের নির্মাণ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। স্টিফেন বলেন যে, উত্তর-পশ্চিম কোণায় রিওয়াকের নির্মাণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

দক্ষিণ রিওয়াকের স্তম্ভ, প্রাচীর প্রবেশপথ উত্তর রিওয়াকের অনুরূপ। দক্ষিণ প্রাচীর হিসেবে মসজিদের যে রিওয়াকের সৃষ্টি হয়েছে তাও অসম্পূর্ণ। দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে মাত্র ৬০ ফুট দীর্ঘ প্রাচীর অক্ষত রয়েছে এবং মাত্র পনেরোটি স্তম্ভ দণ্ডায়মান ও ছয়টি প্রাচীরে গাঁথা দ্বিতীয় সারিতে পাঁচটি এবং তৃতীয় সারিতে চারটি। দক্ষিণ-পশ্চিমদিকের অন্যান্য গ্যালারীর মতো যে গ্যালারী নির্মিত হয় তা বহু পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত। উত্তরদিকের প্রবেশ-পথের বরাবর দক্ষিণ প্রাচীরেও একটি প্রবেশপথ রয়েছে। সাতটি পাথরের সিঁড়ি পার হয়ে রিওয়াকে পৌঁছতে হয়। এই ফটকের দক্ষিণ-পূর্বদিকের জানালাগুলো অক্ষত আছে, কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমদিকের জানালাগুলো বহুপূর্বেই ভেঙে গেছে। কুওয়াত আল-

ইসলাম মসজিদের ভূমি-নকশায় দক্ষিণদিকের রিওয়াকের পশ্চিম প্রান্তে একটি ছোট প্রবেশপথ ছিল।

প্রধান নামাজগৃহটি নির্মিত হয় পশ্চিমদিকে। পাঁচ সারি স্তম্ভের সাহায্যে দক্ষিণদিকে অর্থাৎ কিবলাপ্রান্তে লিওয়ান নির্মিত হয়। সর্বপশ্চিমের স্তম্ভসারিটি প্রাচীরের সঙ্গে সংযোজিত ছিল। অপর চারটি সমান্তরাল স্তম্ভসারি দ্বারা চারটি আইলের সৃষ্টি করা হয়েছে। পূর্বের স্তম্ভসারি পরবর্তীকালে সুউচ্চ খিলানশ্রেণীর সঙ্গে সংযুক্ত। কিবলা-প্রাচীরে পাঁচটি মিহরাব থাকাই স্বাভাবিক এবং পাথরের স্তম্ভ ও খিলানের সাহায্যে মিহরাব তৈরি করা হয়। কিবলা-প্রাচীর থেকে অভ্যন্তরে প্রবেশের কোনো দরজা ছিল না। ১৪৭ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৪০ ফুট প্রস্থ এই লিওয়ানের নির্মাণে অসংখ্য স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছে। মসজিদটি বিশেষ করে নামাজগৃহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং মাত্র কয়েকটি স্তম্ভ উত্তরদিকের গম্বুজটিকে ধরে রেখেছে। লক্ষণীয় যে, পূর্বদিকের রিওয়াকের অনুরূপ লিওয়ানে নির্মাণ সম্পন্ন হয়; কেবল পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তিনটি আইলের পরিবর্তে চারটি আইল স্থাপিত হয় এবং পাঁচটি গম্বুজ স্তম্ভের সাহায্যে কর্বেল পদ্ধতিতে নির্মিত হয়। মধ্যস্থলের গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বড়। বর্তমানে কিবলাদিকে প্রধান খিলানের ডানদিকে চার সারিতে তিনটি করে মোট বারোটি স্তম্ভ এবং বামদিকে বারো সারিতে মোট আঠারোটি স্তম্ভ কালের স্বাক্ষর বহন করছে। স্তম্ভরাজির বিন্যাস দেখে মনে হয় যে, কুতুবউদ্দীন আইবক পশ্চিমদিকের স্তম্ভসারি যেরূপ ছিল সেরূপ রেখে ছিলেন। কোনোরকম রদবদল করেননি; অবশ্য রিওয়াকের নির্মাণ পরিকল্পিতভাবে হয়েছিল। হিন্দু ও জৈন স্তম্ভ, বীম ও পাথরখণ্ড প্রভৃতির সাহায্যে দিল্লীর এবং সুলতানী যুগের সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণে যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তার ব্যাখ্যা দিয়ে ফারগুসন বলেন, "It is quite certain, however, that some of the pillars at the Qutb are made up of dissimilar fragments, and all were placed where they now stand by the builders of the mosque. It may however, be necessary to explain that there could be no difficulty in taking down and fitted with the precision that Hindu patience alone could give. Each compartment of the roof is composed of nine stones, four architnaves four angular and one central slab, all so exactly filled and so independent of cement, as easily to be taken down and put up again." উল্লেখ্য যে, মুসলিম স্থপতি ও তদারককারীর তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের "clerks of works" বলা হয়েছে। হিন্দু কারিগর, ওস্তাগার, শিল্পী, পাথর খোদাইকারী এই মসজিদটির পুনর্গঠনে অবদান রেখেছেন। অবিন্যস্তভাবে গঠিত হওয়ায় ব্রাউন মসজিদটিকে "an archeological miscellany" বলেছেন এবং কোনো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্যকর্ম হিসেবে কুওয়াত-উল-ইসলামকে গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করলেও একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, জৈন ও হিন্দু-মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়নি। পশ্চিমদিকের স্তম্ভসারি লিওয়ান হিসেবে ব্যবহৃত হলেও রিওয়াকগুলো এবং বিশেষ করে দ্বিতল কোণার জেনানা গ্যালারীগুলো মুসলিম

স্থাপত্যশৈলীর ছাপ বহন করে এবং সম্পূর্ণরূপে নতুনভাবে নির্মিত হয়। গম্বুজ নির্মাণ এবং চত্বরের সৃষ্টি মুসলিম ভাবধারায় সম্পাদিত হয়। ব্রাউনের মন্তব্যের সমালোচনা করে সতীশ গ্রোভার বলেন, "The description though is rather uncharitable... Even under these difficult circumstances the Hindu builders put together an intelligible piece of architecture adorned with domes located over the corners of the courtyards and over the entrance canopy. These cupolas were fashioned by in filling with lime concrete the terraced pyramid that would result out of the Hindu trabeate system of roofing and then applying a thick layer of plaster to produce the smooth profile of a shallow dome."[১]

মসজিদের চত্বরে স্ক্রীন খিলানের প্রায় ৩০ ফুট দূরে একটি লৌহস্তম্ভ দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্রাউন বলেন যে, মথুরায় এই স্তম্ভটি, যা সাধারণভাবে গরুড় স্তম্ভ (যদিও গরুড় শীর্ষদেশ অবর্তমান) নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু কোনো এক সময় সেখান থেকে স্তম্ভটি এনে মসজিদ নির্মাণের বহু পূর্বে প্রোথিত করা হয়। লোহার এই স্তম্ভের সঙ্গে মসজিদের কোনোই সম্পর্ক নেই এবং মুসলমানগণ এই কীর্তিটিকে ধ্বংস না করে অক্ষত অবস্থায় রেখে দেন।

খিলান স্ক্রীন : ১১৯৫ সালে নির্মিত কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদটি নির্মাণের পর প্রায় তিন-চার বছর অরপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু ১১৯৯ সালে গজনীতে তাঁর প্রভু মুহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আইবক দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি মসজিদটিকে মুসলিম রীতিকৌশল মাফিক একটি পূর্ণাঙ্গ ইমারতে পরিণত করার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। অতঃপর ১১৯৯ সালে আইবক হিন্দু-জৈন স্তম্ভের দ্বারা নির্মিত লিওয়ানের সম্মুখে একটি খিলান দ্বারা সৃষ্ট স্ক্রীনের প্রয়োগ করেন। কিবলার দিকে এই সুউচ্চ খিলানশ্রেণী এক যুগান্তকারী স্থাপত্যিক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। ফারগুসনের মতে, "The glory of the mosque, however, is not in these Hindu remains, but in the great range of arches of the screen wall on the western side."[২]

সুদৃশ্য ও বিশালাকার খিলান স্ক্রীন হিন্দু-জৈন পাথর স্তম্ভদ্বারা সৃষ্ট লিওয়ানের পর্দা বা 'Maqsura' হিসেবেই ব্যবহৃত হয়নি, বরং ভারতবর্ষে মুসলিম স্থাপত্যরীতির প্রয়োগে প্রথম প্রয়াসও বটে। স্ক্রীনের প্রাচীরের ব্যাস ৮১/২ ফুট এবং পশ্চিমদিকে অবস্থিত এবং ১০৮ ফুট দৈর্ঘ্য। এই স্ক্রীনটি তিনটি অংশে বিভক্ত; প্রধান খিলানটি ৫৩ ফুট উঁচু এবং ৩১ ফুট প্রশস্ত। প্রধান খিলানের উভয় পার্শ্বে দুটি করে খিলান রয়েছে এবং এ সমস্ত খিলানের উচ্চতা ২৫ ফুট ও চওড়া ৩৫ ফুট। সর্বমোট পাঁচটি খিলান

১। Grover, S., P. 8
২। Fergusson, p. 203.

দ্বারা নির্মিত স্ক্রীনটির গঠনে স্থানীয় কর্বেলরীতির প্রতিফলন দেখা যাবে। অবিন্যস্ত পাথরের খণ্ড (rubble) দ্বারা স্ক্রীনের মূল কাঠামো তৈরি করে চতুর্দিকে ভারী ও পাথরের লম্বা টুকরো দিয়ে বেষ্টিত হয়। মূল খিলানের অভ্যন্তরের পরিমাপ ৪৩ ফুট উঁচু এবং ২২ ফুট চওড়া ; দুই প্বার্শের চারটি খিলানের মধ্যে তিনটি অক্ষত অবস্থায় আছে দুটি উত্তরে এবং একটি দক্ষিণে। প্রধান খিলানের পার্শ্বের খিলান দুটি ১১^{১}/২ ফুট এবং শেষপ্রান্তের দুটি ২০ ফুট চওড়া। মূল খিলানটি দুপার্শ্বের চতুষ্কোণী পিয়ার থেকে উঠে গেছে। পিয়ারের পরিমাপ ৯^{১}/২ বর্গফুট। পার্শ্বের পিয়ারগুলো ৪ বর্গফুট, কিন্তু শেষপ্রান্তের পিয়ারগুলো আয়তাকার ৪ ফুট × ৫ ফুট। স্ক্রীনটি লাল ও হলুদ রঙের বেলেপাথরে নির্মিত। পার্শ্ববর্তী চারটি খিলানের উপর চারটি খিলান-জানালা বা Clerestory নির্মিত হয়।

কুওয়াত আল-ইসলামের মসজিদটির সম্বন্ধে ব্রাউন বলেন, "There was however, little attempt at articulation of the mosque composition as a whole, the screen was almost an independent object in itself having but slight organic connection with the Hindu or low pillared sanetuary at its rear, and the clerestory was singularly in applicable as it served no practical purpose either for lighting the sancetuary or for anything else. As a matter of fact it provides an excellent illustration of a not uncommon circumstance in architectural evolution, when a traditional element appears in a scheme the real significance of which has been either forgotten or not understood." স্ক্রীন নির্মাণে ভারতবর্ষের সনাতনী কার্বেলরীতির প্রয়োগের উল্লেখ করে ব্রাউন যথার্থই বলেন যে, মুসলিম স্থপতির নির্দেশে হিন্দু ওস্তাগার, কারিগর ও শ্রমিক দ্বারা নির্মিত এই স্ক্রীনটি কৌণিক খিলানের প্রয়োগ এবং পারস্যের 'Pishtaq' বা ফাসাদ ধরনের নির্মাণ-কৌশল প্রকৃতপক্ষে ইসলামী স্থাপত্যের প্রভাবকে ইঙ্গিত করে। প্রাক্-মুসলিম ইরানে টেসিফোনে (মা'দাঈন) 'তাক-ই-কিসরা' প্রাসাদে ইমারতের সম্মুখভাবে খিলানস্ক্রীন দেখা যায়। পরবর্তীকালে মুসলিম ইমারতেও এধরনের স্ক্রীন ব্যবহৃত হয়েছে। উখাইদীরের 'কোর্ট অব অনারের' দক্ষিণদিকে যে খিলান স্ক্রীন ছিল তাকে ক্রেসওয়েল 'পিশতাক' বলে অভিহিত করেন।[১] তার ভাষায়, "We have here the first example of that ubiquitous feature of later Persian architecture, the Pishtaq or frontispiece."[২] পরবর্তী পর্যায়ে ইরানের মসজিদসমূহে যেমন দশম শতাব্দীর নায়িন মসজিদে স্ক্রীনের ব্যবহার দেখা যায়। স্ক্রীনের গুরুত্ব সম্বন্ধে ব্রাউন বলেন, "In addition to its artistic and architectural character this mosque facade at Delhi stands forth as a remarkable historical

---

১। Hasan, S.M. Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal, P. 81

২। EMA II. P. 634

document, recalling by its range of arches the experiences of several of the world's great civilizations which rose and fell during the previous millennium... In its Indian form it was derived from the arcaded fronts of the brick-built mosques of the Persians, but these builders of the Caliphate had themselves drawn their inspiration from such Arabian structures as those at Ukhaidir and Samarra of the eighth and ninth centuries A.D. ...."[১]

কুওয়াত আল-ইসলামের মসজিদের স্ক্রীনটি মূল মসজিদ ভবনের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য-পূর্ণই নয়, পৃথকভাবে নির্মিত। দূর থেকে মনে হবে যে, কোনোকিছু পর্দা দ্বারা ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সুউচ্চ ও পাঁচটি খিলান দ্বারা নির্মিত এই ফাসাদে (সম্মুখভাগ) মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ফারগুসন মন্তব্য করেন, "all above them is quite plan and smooth, without the least trace of any intention to construct a vault or roof of any sort. Indeed, a roof is by no means as essential part of a mosque, a wall facing Mecca is all that is required and in India is frequently all that is built, though an enclosure is often added in front to protect the worshippers from interruptions."[২] স্ক্রীনটি মুসলিম স্থাপত্যের বহিঃপ্রকাশই নয় অথবা ইসলামের সার্বভৌম ক্ষমতা ও ধর্মীয় ভাবমূর্তিরই প্রতীক নয়, উপরন্তু লিওয়ানে নির্বিঘ্নে নামাজ পড়ার জন্য এই স্ক্রীন একটি আড়াল বা পর্দার কাজ করেছে। লক্ষ করা যাবে যে, কোনো ভূসুয়ার্স পদ্ধতিতে খিলান নির্মিত হয়নি এবং এই সুবিশাল খিলানটি মূলত আলঙ্কারিক (decoration) স্থাপত্যিক (structural) নয়। যেহেতু এই স্ক্রীনটি কোনো ছাদের ভার বহন করছে না সেহেতু আলঙ্কারিক এবং এখনও মোটামুটি দর্শনীয় ও অক্ষত রয়েছে। কর্বেলের মাধ্যমে নির্মিত হলেও 'কুওয়াত-আল-ইসলামের' স্ক্রীনেই ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম কৌণিক খিলান ব্যবহৃত হয়। খিলানের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে ব্রাউন বলেন যে, খিলানের কৌণিক প্রান্তে 'ৎ' ধরনের একটি বক্ররেখা দেখা যাবে। ব্রাউন 'Ogee' ধরনের খিলানকে বৌদ্ধ চৈত্য-গুহার আলঙ্কারিক খিলানের অনুকরণ বলে অবহিত করেন।[৩] কুওয়াত-আল-ইসলাম মসজিদের খিলানের প্রভাব পরবর্তীকালে অনেক মসজিদের ফাসাদে দেখা যাবে।

কর্বেল অথবা ভূসুয়ার্স পদ্ধতিতে নির্মিত খিলানসারি দ্বারা স্ক্রীন কুতুবউদ্দীন কর্তৃক আজমীরে স্থাপিত 'আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া' ব্যতীত তুগলক আমলের বেগমপুরী মসজিদ, জৌনপুর ও গুজরাটের মসজিদসমূহে দেখা যাবে। ১২১১-৩৬ সালে নির্মিত বাদাউনের জা'মি মসজিদের খিলান ফাসাদকে 'মাকসূরা' বলা হয়েছে। লক্ষণীয় যে,

---

১। Brown, p. Indian Architecture (Islamic Period), p. 11.

২। History of Indian and Eastern Architecture, edited by J. Burgess and R. P. Piers, Vol. II. New Delhi, 1972 p, 203.

৩। Brown, p. 11.

স্ক্রীনের ব্যবহার সুদূর বাংলায় অনুপ্রবেশ করে এবং মালদা জেলার বড় পাণ্ডুয়ায় বিখ্যাত আদিনা মসজিদের (১৩৭৪-৮৪) মধ্যভাগে নেভের সম্মুখে খুবই চমৎকার স্ক্রীন তৈরি করা হয়। লেখক তাঁর একটি গ্রন্থে বলেন, "The Adina screen does not imitate the inclination or batter of the Begumpuri Mosque, built by Firuz Shah Tughluq, which became one of the most distinguished features of Jaunpur architecture,"[১] স্ক্রীন প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কুওয়াত-আল-ইসলাম এবং আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া মসজিদে খিলানসারি মসজিদের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় ভারসাম্যের অভাব রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে জৌনপুরের মসজিদসমূহে, অতলা জা'মি মসজিদ প্রভৃতিতে এ সমস্যার সমাধান করা হয়। জৌনপুরী মসজিদ প্রসঙ্গে মার্শাল বলেন, "The idea of giving increased height and importance to the prayer chamber by throwing an arched screen across its facade had been as we have already seen initiated, three centuries before in the Quwwat-al-Islam Mosque at Delhi and since then had frequently found favour and been repeated in various forms. It was left, however, for the architect of the Atala Masjid to make of the screen, a feature so massive and imposing as to overshadow all else in the quadrangle."[২]

অলঙ্করণ :

কুওয়াত-আল-ইসলাম মসজিদের অন্যতম আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অপূর্ব সুন্দর, সূক্ষ্ম ও রুচিসম্পন্ন পাথরে খোদাই নক্‌শা (low relief carving)। প্রধান খিলানটির চারিপার্শ্বে বিভিন্ন ধরনের নক্‌শাকৃত ব্যান্ড বা বেড়ী রয়েছে। বেলেপাথরের উপর নিখুঁতভাবে খোদিত এই সমস্ত নক্‌শা কারুশিল্পের উৎকর্ষই প্রমাণ করে। খিলানের পার্শ্বে ব্যান্ডগুলো কুর'আন শরীফের আয়াত দ্বারা খোদিত। আরবী শিলালিপির সঙ্গে লতাপাতা ও ফুলের সংমিশ্রণ দেখা যাবে। দ্বিতীয় ব্যান্ডটিতেও আরবী শিলালিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। লক্ষণীয় যে, যে রীতিতে আরবী শিলালিপি খোদিত হয়েছে তা আসল এবং অবশ্য মুসলিম কারুশিল্পীর দক্ষ চাতুর্যের পরিচায়ক। আমীর খসরু যথার্থই বলেন, "মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে, লতাপাতা, ফুল এবং কুর'আনের বাণী পাথরে খোদিত কিংবা প্লাস্টারে উৎকীর্ণ করা হয়।"[৩] প্লাস্টারের ব্যবহারের কথা উল্লেখ থাকলেও পাথরে প্লাস্টারের কাজ হয় না। যাহোক, আরবী শিলালিপি ছাড়াও তৃতীয় এবং চতুর্থ ব্যান্ডে যে ধরনের প্যাঁচানো (spiral) নক্‌শা দেখা যায় তা নিঃসন্দেহে হিন্দু কারিগরের অবদান। অলঙ্করণে মুসলিম ও হিন্দু কারিগর ও কারুশিল্পীর নিয়োগ বিচিত্র ছিল না। ব্রাউনের মতে".... Some of the designs (are) being the loveliest

১। Hasan, Mosque Architecture..... p. 82.
২। Marshall. S., The Monuments of Muslim India in Cambridge History of India Vol. III, Cambridge, 1928, p. 628
৩। Stephens, p. 47

of their kind. Ingenuously graceful is a border of spiral form having a floral device within each coil of its convolutions, emphatically a Hindu conception and contrasting with it are up right lines of decorative inscriptions just as emphatically Islamic"[১] তাজুল মাসীরে হাসান নিযামী পাথরের খোদাই কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন : "and upon the surfaces of the stones were engraved verses of the Koran in such a manner as could not be done in wax; ascending so high that you would think the Koran was going up to heaven and again descending in another line so low that you would think it was coming down from heaven."[২]

কেবলমাত্র প্রধান সুউচ্চ খিলানেই নয়, পার্শ্ববর্তী চারটি খিলানের চতুর্দিকে অপূর্ব সুন্দর নক্শা দর্শকদের মোহিত করে। যদিও শার্শের খিলানের উপরের জানালাসদৃশ খিলান বহুপূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে; তবুও স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, অনুরূপ পাথর খোদাই প্রাচীরের একঘেয়েমি দূর করে। খিলানের উপরে উভয় পার্শ্বেও (spandrel) সূক্ষ্মভাবে খোদিত অলঙ্করণ দেখা যাবে। ব্রাউন বলেন—পাথরের খোদাই নক্শায় ভারতীয় কৌশলের প্রতিফলন হয়েছে, অবশ্য কোনো কোনো মোটিভ, বিশেষ করে লতাপাতা (creeper) প্যাঁচানো (spiral) এবং গভীরভাবে খোদাই রীতি (deep-cut অথবা high relief) হিন্দু স্থাপত্যের অংশবিশেষ; তবুও মুসলিম স্থাপত্যিক অলঙ্করণে পাথরখোদাই-এর প্রচলন হয় বহু পূর্ব থেকেই, অর্থাৎ উমাইয়া যুগে। স্মিথ বলেন, "In the lace like tracery and delicate ornament it resembles the decoration of the Sassanian (? Umayyad) palace of Mashita (Mshatta) and those of certain parts of Sancta Sophia at Constantinople."[৩] স্ক্রীনের অলঙ্করণকে ফারগুসন বলেন, "the most exquisite specimen of its class known to exist anywhere."[৪] যাহোক, মোটামুটিভাবে ভিনসেন্ট স্মিথের ভাষায় বলা যায় যে, স্ক্রীনটি ছিল "Muslim in form and Hindu in constructiion."[৫]

কুতুবমিনার (চিত্র ৪৪)

কুওয়াত উল ইসলাম মসজিদের প্রধান আকর্ষণ সুউচ্চ কুতুবমিনার। মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত মিনারটি ২০৮ ফুট উঁচু এবং নিচ থেকে উপরে সরু হয়ে উঠে গেছে। পাঁচটি স্তরে বিভক্ত এ মিনারটি শুধু আযানের জন্যই নয়, বিজয়স্তম্ভও গণ্য করা হয়। এর ভিতরে প্রবেশ করা যায় এবং চারপাশে বিভিন্ন ধরনের নক্শা দ্বারা অলঙ্কৃত। এর ব্যালকনিগুলো সুদৃশ্য। সম্ভবত গজনী মিনারের অনুকরণে এটি নির্মিত।

১। Brown, p. 10.
২। Ibid, p. 11.
৩। Smith, V. A., A History of Fine Arts in India and Ceylon Oxford. 1911. p. 153.
৪। Fergusson, p. 204.
৫। Smith, p. 153.

সম্প্রসারণ :

ইলতুৎমিশের কীর্তি : কুওয়াত-আল-ইসলামের মসজিদটি কুতুবউদ্দীনের অমর কীর্তি তথা ভারতের ইসলামী স্থাপত্যকলার সূচনা। কিন্তু আয়তন ও উপাদানের সংযোজনে দিল্লীর আদি মসজিদটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, দাসবংশের সুলতান ইলতুৎমিশ এবং খিলজী বংশের প্রখ্যাত সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর আমলে কুওয়াত-আল-ইসলাম মসজিদের সম্প্রসারণ, পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়। ইলতুৎমিশ ১২১১ থেকে ১২৩৬ সাল পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর প্রধান এবং বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নির্মাণকাজের মধ্যে ১২২৯ সালে কুওয়াত-আল-ইসলাম মসজিদের সম্প্রসারণ।

ইলতুৎমিশ কুতুবউদ্দীন নির্মিত মসজিদটির আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ক্রমবর্ধমান মুসলমানদের নামাজ পড়ার সুবন্দোবস্তের জন্য কুওয়াত-আল-ইসলাম মসজিদের কিবলা-প্রাচীর উভয়দিকে, অর্থাৎ উত্তর এবং দক্ষিণে সম্প্রসারিত হয়। উভয়দিকে ১১৫ ফুট পর্যন্ত সম্প্রসারিত হলে পশ্চিমদিকের প্রাচীরের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৩৮০ ফুট। কিবলা-প্রাচীরের সম্প্রসারিত অংশের বহু উপকরণ পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম কোণায় ইলতুৎমিশের নির্মিত সম্প্রসারিত প্রাচীরের পায় ৫০ ফুট অবশিষ্ট রয়েছে। কিবলা-প্রাচীরের সম্প্রসারণে লিওয়ানও সম্প্রসারিত হয় এবং মূল মসজিদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণদিকে সাহানকে বেষ্টিত করে রিওয়াক সৃষ্টি করা হয়েছে। উত্তর রিওয়াকের দৈর্ঘ্য ২৮০ ফুট এবং পশ্চিমদিকের লিওয়ান স্ক্রীনের কিয়দংশ ব্যতীত খিলান ও উত্তর রিওয়াকের কোনো চিহ্ন নেই। দক্ষিণদিকের রিওয়াকও ২৮০ ফুট দীর্ঘ এবং উত্তরদিকের রিওয়াক অপেক্ষা সংরক্ষিত অবস্থায় আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় ইলতুৎমিশ যে সম্প্রসারণ করেন তার প্রায় ৭০ ফুট ফাঁকা রয়েছে। অর্থাৎ বহুপূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ; কিন্তু কিবলা প্রাচীরের ভিত্তি সহজেই লক্ষ করা যায়। দক্ষিণদিকের রিওয়াকও প্রায় ৩০ ফুট ধূলিসাৎ হয়েছে ; কিন্তু তিন সারি স্তম্ভের যে ফটক দক্ষিণ প্রাচীরের মধ্যভাগে নির্মিত হয় তা কুতুবউদ্দীনের মসজিদের বরাবরে রয়েছে। এই ফটকের খিলান বহুপূর্বে ভেঙে গেছে। কিন্তু স্তম্ভগুলো অক্ষত আছে। স্তম্ভগুলো ১৬ ফুট উঁচু। তিনটি সারি স্তম্ভের প্রথমটিকে ৫টি জোড়া স্তম্ভ, দ্বিতীয়টিতে ৭টি এবং তৃতীয়টিতে ৭টি স্তম্ভ এখনও কালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। স্তম্ভগুলো সমান্তরাল ছাদ নির্মাণে সাহায্য করেছে। ছাদ লম্বা সমান্তরাল পাথরখণ্ড দ্বারা (overlapping stones) নির্মিত। দক্ষিণদিকের ফটক থেকে পূর্বদিকে আলাউদ্দীনের নির্মিত আলাই দরওয়াজা পর্যন্ত ১০০ ফুট দীর্ঘ প্রাচীর নির্মিত হয়। স্তম্ভের উপর সমান্তরাল ছাদ এবং দক্ষিণদিকের প্রাচীরে ৭টি জানালা দেখা যাবে। এই জানালাগুলো পাথরের জা'মি দ্বারা (lattice) তৈরি করা হয়।

পূর্বদিকেও ইলতুৎমিশ মসজিদের সম্প্রসারণ করেন। আলাই দরওয়াজাকে দক্ষিণ-পূর্বকোণে রেখে যে প্রাচীর উত্তরদিকে সম্প্রসারিত হয়েছে তা কুতুবউদ্দীনের পূর্ব রিওয়াকের সমান্তরাল। আলাই দরওয়াজা থেকে কুতুবউদ্দীনের পূর্ব ফটক পর্যন্ত রিওয়াকের দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট। ইলতুৎমিশ প্রাচীন ফটকের বরাবর একটি খিলান-

প্রবেশপথ নির্মাণ করেন। এই ফটকের উত্তরে ৩০ ফুট পর্যন্ত রিওয়াক এখনও দেখা যায়। পূর্বদিকের রিওয়াকে চারসারি স্তম্ভ রয়েছে। সর্বমোট ৩৪টি স্তম্ভের মধ্যে ১৯টি অক্ষত আছে এবং ১৫টি বিলুপ্ত। চার সারির মধ্যে প্রথম সারিতে ৯টি, দ্বিতীয়টিতে ১১টি, তৃতীয়টিতে ১১টি এবং চতুর্থটিতে ৩টি। পূর্বদিকের রিওয়াকটি সমান্তরাল ছাদ দ্বারা আবৃত ছিল। লক্ষণীয় যে, ইলতুৎমিশ কুতুবউদ্দীনের মসজিদের আয়তন তিনগুণ বৃদ্ধি করার প্রয়াস পান। কুওয়াত-আল-ইসলামের মসজিদের খিলান স্ক্রীনের অনুরূপ উভয় পার্শ্বের সম্প্রসারিত লিওয়ানে খিলান স্ক্রীন নির্মিত হয়। লিওয়ানের উভয় পার্শ্বের তিনটি করে গম্বুজ ছিল এবং লিওয়ানের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ ছিল খিলান স্ক্রীন। কুতুবউদ্দীনের মূল স্ক্রীন খিলান অপেক্ষা ইলতুৎমিশের খিলান অপেক্ষাকৃত উঁচু ছিল। তিনটি খিলানের মধ্যে মধ্যবর্তী খিলানটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত ছিল এবং পার্শ্ববর্তী ছোট খিলান এবং প্রধান খিলানটি পিয়ারের উপর থেকে উঠে গেছে। খিলানগুলো কৌণিক এবং কর্বেল পদ্ধতিতে নির্মিত। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, একই ধরনের উপকরণের ব্যবহার সমগ্র খিলান-স্ক্রীনের মধ্যে অসাধারণ সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষা করেছে। উত্তরদিকের স্ক্রীনের সামান্য অংশ এখনও সংরক্ষিত আছে। উপরের অংশ ভেঙে গেলেও প্রধান খিলানের সুউচ্চ পিয়ার দেখে মনে হয় যে, ইলতুৎমিশ কুতুবউদ্দীনের স্ক্রীনকে উচ্চতায় ম্লান করার চেষ্টা করেন। ২৬ ফুট উঁচু এবং ১৩ ফুট প্রশস্ত দক্ষিণ খিলানটি সম্পূর্ণরূপে অক্ষত অবস্থায় ভেঙে গেছে। এই খিলানটি দুটি প্রশস্ত পিয়ার থেকে উঠে গেছে। দক্ষিণ পিয়ারটির গভীরতা ৬ ফুট এবং ৪ ফুট প্রশস্ত। উত্তরদিকের পিয়ারটি যা প্রধান খিলানের দক্ষিণ পিয়ার খুবই প্রকাণ্ড ; ১৫^{১}/২ ফুট চওড়া। প্রধান খিলানটি ২৪^{১}/২ ফুট প্রশস্ত ; খিলানটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় উচ্চতা কত তা বলা দুষ্কর। উত্তরদিকের খিলানের কোনো চিহ্ন নেই। দক্ষিণদিকে ইলতুৎমিশ খিলানের যে সম্প্রসারণ করেন তাও ধ্বংসপ্রাপ্ত।

কুওয়াত-উল-ইসলামের মসজিদের আসল ভবনের সঙ্গে ইলতুৎমিশের সম্প্রসারিত ইমারতের তুলনামূলক আলোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, ১১৯৭ থেকে ১২২৯ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছরে মসজিদ স্থাপত্যের সামান্য অগ্রগতি হয়। ব্রাউন বলেন, "Except for its size there is nothing specially notable in the remains of Iltutmish's great extension as the cloisters are merely a plainer replica of the previous scheme and the screen also simply duplicates the existing range of arches only to a larger scale." এতদ্‌সত্ত্বেও বলা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে স্থাপত্যকলার যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায় শুরু হয়, আইবকের সময় তা ক্রমশ সুষ্ঠু ও সুসাঞ্জস্যপূর্ণ পর্যায়ে পৌছায়। পূর্বের 'S' ধরনের Ogee খিলান একটি সুগঠিত কৌণিক (arc) খিলানে পরিণত হয়।

আলাউদ্দীন খিলজীর কীর্তি :

১২৯৫ সালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে খিলজী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী কুতুবউদ্দীন আইবকের অমর সৃষ্টি কুওয়াত-আল-ইসলামের সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যবৃদ্ধির পরিকল্পনা করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, দাসবংশের

আমলে ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের যে উন্মেষ হয় খিলজী আমলে তার বিকাশ হয় এবং অসাধারণ বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে। ভারত উপমহাদেশের সর্বপ্রথম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামের প্রতীকধর্মী ধর্মীয় ইমারত কুওয়াত-আল-ইসলামের সম্প্রসারণ বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইলতুৎমিশ আদি মসজিদের আয়তন বৃদ্ধি করে তিনগুণ করেন। কিন্তু আলাউদ্দীন খিলজী ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মসজিদটির ছয়গুণ আয়তন বৃদ্ধি করেন। উল্লেখ্য যে, ইসলামের প্রচারের ফলে অসংখ্য বিধর্মী ইসলামের পতাকাতলে আসতে থাকে এবং নব দীক্ষিত মুসলমানদের নামাজের স্থানসঙ্কুলান না হওয়ায় কুওয়াত-আল-ইসলাম মসজিদটির সম্প্রসারণ, সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ অবশ্য-করণীয় কর্তব্যে পরিণত হয়।

আলাউদ্দীন খিলজী কুওয়াত-আল-ইসলামের মসজিদে প্রধানত তিনটি অবদান রেখেছেন– (ক) আয়তন বৃদ্ধি, (খ) আলাই মিনার এবং (গ) আলাই দরওয়াজা নির্মাণ। ইলতুৎমিশের সম্প্রসারিত দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে পূর্বদিকে প্রাচীর সম্প্রসারিত করে উল্লিখিত অংশে আলাই দরওয়াজা নির্মিত হয়। আলাই দরওয়াজা পার হয়ে পূর্বদিকে ৩০ ফুট পর্যন্ত স্তম্ভরাজি দ্বারা প্রাচীর বিস্তৃত। এরপর কিছু অংশ ভেঙে গেছে এবং পুনরায় দক্ষিণদিকের এই স্তম্ভরাজি ১২০ ফুট পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। পূর্বদিকের এই সম্প্রসারণকে আমীর খসরু চতুর্থ চত্বর ('fourth part') বলে অভিহিত করেন। দক্ষিণদিকের প্রাচীরে চারটি দরজা এবং তিনটি উঁচু জানালা রয়েছে। জানালাগুলো লাল বেলেপাথরের জলি (lattice) দ্বারা তৈরি করা হয়। ছাদবিশিষ্ট এই দক্ষিণ রিওয়াকের সম্প্রসারিত অংশে দেওয়ালসংলগ্ন ১২টি, দ্বিতীয় সারিতে ১৫টি এবং তৃতীয় অর্থাৎ চত্বরের সম্মুখে ১১টি স্তম্ভ এখনও অক্ষত আছে। স্তম্ভগুলোর দূরত্ব এবং ছাদ নির্মাণ-পদ্ধতি ইলতুৎমিশের দক্ষিণ রিওয়াকের অনুরূপ। দক্ষিণ-পূর্ব কোণা থেকে আলাউদ্দীন খিলজীব নির্দেশে পূর্ব রিওয়াক ও তৎসহ প্রাচীরটি সোজা উত্তরদিকে বিস্তৃত। এখানে প্রথম অংশে মাত্র ২০ ফুট স্তম্ভরাজি দেখা যাবে এবং তারপর পূর্ব রিওয়াকের আর কোনো চিহ্নই পাওয়া যাবে না। ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আলাউদ্দীনের সম্প্রসারিত পূর্বদিকের রিওয়াকের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। এদিকে কেবলমাত্র ১১টি স্তম্ভ দেখা যাবে। ৪টি প্রাচীরসংলগ্ন, ৪টি দ্বিতীয় এবং ৩টি তৃতীয় সারিতে। ২০ ফুট বিস্তৃত প্রাচীরের অবশিষ্টাংশে একটি গম্বুজবিশিষ্ট দরজা বা ফটক এখনও কালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। লক্ষণীয় যে, কুতুবউদ্দীনের মূল, ইলতুৎমিশের পূর্ব রিওয়াকের ফটক এবং আলাউদ্দীনের সম্প্রসারিত পূর্ব রিওয়াকের ফটক একই অক্ষরেখায় নির্মিত। খননের ফলে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব রিওয়াক উত্তরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং বিশাল চত্বরের মধ্যস্থলে আলাই মিনার নামে একটি অসম্পূর্ণ মিনারের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। পূর্ব রিওয়াকে উত্তরদিকে আর একটি গম্বুজবিশিষ্ট ফটক নির্মিত হয়। উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে রিওয়াকটি পশ্চিমদিকে প্রসারিত হয়েছে। তিন সারি স্তম্ভ দ্বারা এই রিওয়াকটি নির্মিত; প্রাচীরের সংলগ্ন একটি এবং মধ্যবর্তী ও চত্বরের সম্মুখে দুটি স্তম্ভসারি নির্মিত হয়। উত্তরদিকে রিওয়াকের পশ্চিম প্রান্তে একটি গম্বুজবিশিষ্ট ফটক স্থাপিত হয়।

আলাউদ্দীন খিলজী যে বিশাল এবং উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করে স্থাপত্যকলার উৎকর্ষ বৃদ্ধির চেষ্টা করেন তা তাঁর সামরিক পরিকল্পনার সমতুল্য। তিনি মূল মসজিদটিকে উত্তর-দক্ষিণে ৭০০ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৪০০ ফুট পরিমাপের চত্বর দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। এর ফলে ইলতুৎমিশের সম্প্রসারিত মসজিদটির দ্বিগুণ আয়তন দৈর্ঘ্য এবং প্রায় অর্ধেক প্রস্থে বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য যে, কুতুবউদ্দীনের মসজিদটির আয়তাকার এলাকার দীর্ঘ বাহু দুটি ছিল উত্তর-দক্ষিণে; কিন্তু সম্প্রসারণের ফলে দীর্ঘ বাহু পূব-পশ্চিমে গিয়ে দাঁড়ায় ইলতুৎমিশের সময়। আলাউদ্দীন খিলজী ইলতুৎমিশের কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখে পূর্ব-পশ্চিমে বাহু সম্প্রসারিত করেন। এই সম্প্রসারণের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় উপাদান হচ্ছে কুওয়াত-আল-ইসলাম ও ইলতুৎমিশের সম্প্রসারিত লিওয়ানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কিবলা-প্রাচীর উত্তরদিকে সম্প্রসারিত হয়, লিওয়ান স্তম্ভরাজি দ্বারা নির্মিত হয়, নয়টি গম্বুজ দ্বারা ছাদ তৈরি করা হয় এবং সর্বোপরি তিনটি পৃথক পৃথকভাবে অথচ সংশ্লিষ্ট করে খিলান-স্ক্রীন স্থাপিত হয়। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া কুওয়াত-আল-ইসলাম মসজিদের যে নক্‌শা সম্পাদন করেছে তা দেখে মনে হয় যে, আলাউদ্দীনের স্ক্রীন-খিলানগুলো পূর্বের খিলানগুলোর তুলনায় অনেক প্রশস্ত ও উঁচু। কেন্দ্রীয় মিহরাবের সম্মুখে যে গম্বুজ আছে ঠিক তার বরাবর বিশালাকার খিলানটি নির্মিত হয় এবং মূল মসজিদে যেরূপ পার্শ্ববর্তী খিলান ও তার উপর খিলান ও জানালা সৃষ্টি করা হয়, ঠিক অনুরূপ খিলান ও জানালা নির্মিত হয়। প্রধান তিনটি খিলানপথের দুই পার্শ্বে তিনটি অপেক্ষাকৃত ছোট খিলান দ্বারা লিওয়ানে প্রবেশ করা যেত। তবে উল্লেখ্য যে, পার্শ্বের খিলান-স্ক্রীনে খিলান জানালার প্রয়োগ দেখা যায় না।

২। আজমীর, আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া মসজিদ, ত্রয়োদশ শতাব্দী (চিত্র ৪৫)।

কুতুবউদ্দীন আইবক কর্তৃক নির্মিত অপর একটি অতুলনীয় ধর্মীয় স্থাপত্যের নিদর্শন দেখা যাবে আজমীরে। দিল্লীর ৪৮০ মাইল পশ্চিমে আজমীর ইসলামের সাধকপুরুষ এবং 'সুলতান-উল হিন্দ' নামে সুপরিচিত খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তীর সমাধিভূমি। তাঁর মাজারের অদূরে কুতুবউদ্দীন রাজপুতানায় রাজপুত সামন্তবাদী রাজা পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করে ইসলামের অমোঘ স্বাক্ষর রাখেন এই মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে। এদিক থেকে দিল্লীর কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদের সঙ্গে আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া নামে আজমীরের মসজিদের সাদৃশ্য রয়েছে। ভারত উপমহাদেশে মুসলিম স্থাপত্যের উন্মেষ হয় মূলত এই দুটি মসজিদের মাধ্যমে।

১২০০ খ্রীস্টাব্দে কুতুবউদ্দীন আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া মসজিদের নির্মাণ শুরু করেন। যে স্থানে এই মসজিদটি নির্মিত হয় সেখানে ২$^{1}/_{2}$ দিনব্যাপী মেলা হত। এ থেকে মসজিদটির নামকরণ হয়েছে আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া। বেলেপাথরের একটি উঁচু চত্বরে এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল্লীর মসজিদের মতো আজমীরের এই মসজিদটি স্থানীয় হিন্দু-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা নির্মিত হয়। যাকে Improvisation বলা যায়। প্রচলিত মসজিদ-পরিকল্পনায় নির্মিত এই মসজিদটি তিন

অংশে বিভক্ত এবং সেদিক থেকে দিল্লীর মসজিদের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। এ তিনটি অংশ হচ্ছে লিওয়ান অর্থাৎ পশ্চিমদিকের নামাজের স্থান, সাহান বা মধ্যবর্তী চত্বর এবং রিওয়াক বা সাহানের চতুর্দিকে ছাদবিশিষ্ট পায়ে চলার পথ। পরিমাপে আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া মসজিদটি ২৬২ বর্গফুট অর্থাৎ চতুষ্কোণাকার। মসজিদের প্রাচীরের চার কোণায় বুরুজ রয়েছে। এই মসজিদে প্রবেশের জন্য পূর্ব এবং দক্ষিণদিকে সুউচ্চ প্রবেশপথ রয়েছে। প্রধান প্রবেশপথটি অবশ্য পূর্বদিকে যা সরাসরি লিওয়ানের মিহরাবের সঙ্গে একই অক্ষরেখায় অবস্থিত।

আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া মসজিদটির লিওয়ান দিল্লীর মসজিদ অপেক্ষা সুপ্রশস্ত। ব্রাউন মনে করেন যে, আজমীরের মসজিদে দক্ষ স্থপতি ও কারিগরেরা সুনির্দিষ্ট এবং সুপরিকল্পিত উপায়ে মসজিদ নির্মাণে সক্ষম হয়। যদিও স্থানীয় প্রাক্-মুসলিম ইমারতের ভাস্কর্যসম্বলিত স্তম্ভ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তবুও আজমীরের মসজিদটির উচ্চতা, বিশালতা ও নির্মাণ-নৈপুণ্য দর্শকদের মুগ্ধ করবে। ভগ্নপ্রাপ্ত আজমীরের মসজিদের লিওয়ানে বর্তমানে চারসারি স্তম্ভ রয়েছে। প্রতি সারিতে মোট আঠারোটি স্তম্ভ আছে। সমগ্র লিওয়ানটি এভাবে পাঁচটি আইলে বিভক্ত। তুলনামূলকভাবে কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদের স্তম্ভ অপেক্ষা আজমীরের স্তম্ভগুলো চিকন, মসৃণ এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যের নিদর্শন বহন করছে; উপরন্তু ছাদের উচ্চতাবৃদ্ধি দ্বারা অভ্যন্তরে আলো-বাতাস প্রবেশের সুবিধার্থে তিনটি স্তম্ভ জোড়া দিয়ে একটি সুউচ্চ স্তম্ভ সৃষ্টি করা হয়েছে। মসজিদে আয়তন, পরিসর ও বিশালতা আনয়নের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে মেঝে থেকে ছাদ ২০ ফুট উঁচুতে নির্মাণ করা সম্ভবপর হয়েছে।

দিল্লীর মসজিদের মতো আজমীরের মসজিদে কোনো খিলানের ব্যবহার দেখা যায় না। উভয় ইমারত একই ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত হলেও আজমীরের মসজিদে প্রথম কিবলা প্রাচীরে একটি অবতল মিহরাব সংযোজিত হয়। করবেল পদ্ধতিতে নির্মিত ছাদে কিবলার সম্মুখে ৫টি গম্বুজ এবং চত্বরের সম্মুখে ৫টি ক্ষুদ্রাকার গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে এগুলোকে গম্বুজ বলা যাবে না। কারণ স্থানীয় হিন্দুরীতি অনুযায়ী করবেল পদ্ধতিতে নির্মিত ত্রিকোণাকার চত্তি (Chattri)। আজমীর মসজিদের রিওয়াক বহুদিন পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তবুও দিল্লীর মসজিদের রিওয়াক দেখে মোটামুটি ধারণা করা যায়। মসজিদের মধ্যভাগে রয়েছে বিশাল চত্বর বা সাহান—এর পরিমাপ ১৭৫ ফুট × ২০০ ফুট। ফারগুসন বলেন যে, এই চত্বরের চারিপাশ দেওয়ালকে সুরক্ষিত করবার জন্য চারকোণায় সুউচ্চ বুরুজ ছিল, কিন্তু বর্তমানে উত্তর-পশ্চিম কোণায় বুরুজটি দেখা যায় না। উত্তরদিকের রিওয়াকের কোনো চিহ্ন নেই। পূর্বদিকের রিওয়াকটি পুনর্নির্মিত হয়েছে। দক্ষিণদিকের রিওয়াকের কেবলমাত্র দেওয়াল অবশিষ্ট রয়েছে। ফারগুসনের মতে, লিওয়ানটি হিন্দু ও জৈন-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা নির্মিত হয়। কুতুবউদ্দীন আইবক তাঁর স্থাপত্যকীর্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বারা মুসলিম ঐতিহ্যকে শাশ্বত করে গেছেন।

আজমীর মসজিদটি দূর থেকে খুবই দর্শনীয় লাগবে, কারণ ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে নির্মিত এই মসজিদটিতে প্রবেশ করতে হলে পূর্বদিক দিয়ে সুদীর্ঘ সিঁড়ি ব্যবহার করতে হয়। প্রবেশপথটি একটি পোর্টিকোতে গিয়ে পৌছেছে। পোর্টিকোর উপরে দুপাশে খাঁজকাটা টাওয়ার দেখা যাবে। ফারগুসন বলেন, "What remains, however, is sufficient to show that if completed, it must originally have been a singularly elegant specimen of an early Indians mosque."

আজমীর মসজিদের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ এবং স্থাপত্যকলার বিচারে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সুলতান ইলতুৎমিশ কর্তৃক নির্মিত লিওয়ানের সম্মুখভাগের খিলানাকৃতির স্ক্রীন। ১২১১-৩৫ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এই স্ক্রীনটি দিল্লী মসজিদের স্ক্রীনের সমতুল্য, বস্তুত ইলতুৎমিশ কুয়য়াত-উল-ইসলাম মসজিদটি সম্প্রসারণকালে উভয়দিকে যে ধরনের স্ক্রীন নির্মাণ করেন আজমীরেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। প্রাক্-মুসলিম স্থাপত্যিক উপকরণ দ্বারা নির্মিত উভয় মসজিদের লিওয়ানকে দৃষ্টির অন্তরালে রাখার জন্য এ ধরনের খিলান-সম্বলিত স্ক্রীনের আবির্ভাব। আজমীরের স্ক্রীনটিতে মোট সাতটি খিলান রয়েছে, প্রধান খিলানটি পার্শ্ববর্তী খিলানসমূহ অপেক্ষা প্রশস্ত ও সুউচ্চ : ২২´২´´ প্রশস্ত প্রধান খিলানটি কৌণিক এবং সামান্য 'Ogee' ধরনের, যা দিল্লীর স্ক্রীনে দেখা যাবে। এর পাশের দুটি খিলান ১২´৮´´ প্রশস্ত এবং সর্বশেষ প্রান্তরে উভয়দিকের দুটি খিলান ক্ষুদ্রাকৃতি, যদিও উচ্চতায় একই রূপ–১৩´৪´´ প্রশস্ত। বেলেপাথরে নির্মিত অনিন্দ্যসুন্দর খিলানরাজি স্থাপত্যিক সৌকর্য প্রদর্শন করছে। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হচ্ছে অলঙ্করণ পদ্ধতি--খিলানসমূহের উভয় পাশে দুসারি আরবী শিলালিপি খোদিত রয়েছে। প্রথম সারি কুফী এবং দ্বিতীয় সারি নাস্খী রীতিতে উৎকীর্ণ। এই দুই আরবী শিলালিপির পার্শ্বে খোদিত রয়েছে 'আরাবেস্ক' অর্থাৎ জ্যামিতিক নক্শা যার ফলে সামগ্রিকভাবে স্ক্রীনের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। প্রধান খিলানটির উচ্চতা ভূমি থেকে ৫৬ ফুট এবং এর উভয় পাশে দুটি ভগ্নপ্রাপ্ত খাঁজকাটা ও গোলাকার টাওয়ার রয়েছে, যার ব্যাসার্ধ ১০১/২ ফুট। এই টাওয়ারের কৌণিক ও গোলাকার খাঁজের কুতুব মিনারের সর্বনিম্ন স্তরের অলঙ্করণের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। আজমীরের টাওয়ারের সঙ্গে আজানের কোনো সম্পর্ক নেই। এই কারণে বলা যেতে পারে যে, সম্ভবত দিল্লীর কুতুব মিনারের একটি স্থূল এবং পরবর্তীকালের অনুকরণ ('an afterthought)। ফারগুসন বলেন, "the production of an unpractised hand working in an unfamiliar style.") ব্রাউন একে খাঁজকাটা ('fluted') বলেছেন যা সত্য নয় ; কারণ একটি কৌণিক এবং গোলাকার খাঁজের সমন্বয়ে এই টাওয়ার সষ্টি করা হয়েছে। খিলানের ব্যবহার প্রসঙ্গে ব্রাউন বলেন যে, প্রধান খিলানটি চার বিন্দু বা টিউডর ধরনের এবং অপরাপরগুলো পাঁচপত্রবিশিষ্ট ; তাঁর ভাষায়, "Then these are the smaller side arches, four of which are of the multifoil pointed variety, a type rose in Indian architecture but probably derived from Arab sources as seen in the eighth century mosque at Ukhaidir in Iraq."

স্থাপত্যিক অলঙ্করণের ক্ষেত্রে আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া মসজিদ বিশেষ অবদান রেখেছে। স্ক্রীনের বিশালতা, প্রশস্ততা ও সৌন্দর্য যতটা আকর্ষণীয় হোক না কেন, এর স্থাপত্যিক অলঙ্করণের রীতি ও সৌকর্য এই ইমারতের অসাধারণ মর্যাদা দান করেছে। দিল্লীর স্ক্রীনের সঙ্গে তুলনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, স্থানীয় কারিগরদের দ্বারা খোদিত রিলিফ-এর নক্‌শা তিরোহিত হয়েছে। তার স্থলে সূক্ষ্ম অগভীর খোদাইকাজ প্রাধান্য পেয়েছে। উভয় স্ক্রীনে আরবী শিলালিপি, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নক্‌শার ব্যবহার দেখা যায় ; কিন্তু খোদাই-এর রীতিকৌশলে বিরাট প্রভেদ সহজেই লক্ষ করা যাবে। ব্রাউনের ভাষায়, "The free and flexible handiwork of the Hindus, as expressed on the Qutb screen has become rigid under the more strict application of the Koranic prohibition, Nonetheless the Ajmeer screen is a fine work of art..." কূফী, নস্‌খী, তুখরা, শিল্পশৈলী ব্যতীত আজমীরের স্ক্রীনে অপূর্ব জ্যামিতিক ও লতাপাতার নক্‌শা রয়েছে। ফারগুসন মন্তব্য করেন, "Nothing in Cairo or in Persia is so exquisite in detail and nothing in Spain or Syria can approach them for beauty of surface-decoration."

ভারত উপমহাদেশের মুসলিম স্থাপত্যরীতির উদ্ভাবনে দিল্লী ও আজমীর মসজিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দাসবংশের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দীন আইবক ভারত উপমহাদেশে প্রথম মুসলিম রাজবংশই প্রতিষ্ঠা করেননি, উপরন্তু মসজিদ স্থাপত্যের রীতির প্রচলন দ্বারা এই উপমহাদেশে নতুন স্থাপত্যকৌশল, পরিকল্পনার প্রবর্তন করেন।

বিশেষজ্ঞগণ আজমীর মসজিদ সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্তব্য করেন। S.K. Saraswati বলেন যে, আজমীর মসজিদটি "more organized composition, apparently the experience gained in the construction of the earlier building had been put together." এ মসজিদের স্তম্ভগুলো সুবিন্যাস্ত এবং সুচারুরূপে স্থাপিত, আয়তন পরিসর এবং পরিপাটির দিক থেকে দিল্লীব মসজিদ অপেক্ষা উন্নতমানের।

৩। হানসী মসজিদ, ১২২৬ খ্রীঃ

পাঞ্জাবের হানসী নামক স্থানে ১২২৬ খ্রীস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে ১৪৭১ খ্রীস্টাব্দে এটি সংস্কার করা হয়। বর্তমানে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত।

৪। নাগাউর, শাম্‌স মসজিদ (১২১১-১২৩৬ খ্রীঃ)

যোধপুরের নাগাউর নামক স্থানে ইলতুৎমিশ একটি মসজিদ নির্মিত হয়। শামস এই মসজিদটির নির্মাতা। আয়তাকার এই মসজিদের চত্বর রয়েছে।

৫। আলীগড়, জালালীর জা'মি মসজিদ (১২৬৬ খ্রীঃ)

গিয়াসউদ্দীন বলবন ১২৬৬ খ্রীস্টাব্দে আলীগড়ে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। এই ইমারতটির মৌলিকত্ব অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে বারংবার সংস্কারের ফলে। বর্তমানে তিন-গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদটি খুবই আকর্ষণীয়।

৬। বাদাউন, শামসী ঈদগাহ্ ও জা'মি মসজিদ, ত্রয়োদশ শতাব্দী

দাসবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ইলতুৎমিশ ভারত উপমহাদেশের মুসলিম স্থাপত্যরীতির উদ্ভাবনে বিশেষ অবদান রেখেছেন। দিল্লীর কুওয়াত-উল-মসজিদের সম্প্রসারণ-আজমীর মসজিদের স্ক্রীন ছাড়াও তিনি বাদাউনে কতিপয় আকর্ষণীয় ইমারত নির্মাণ করেন। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঈদগাহ ও জা'মি মসজিদ। বাদাউনের মসজিদটি বিশালাকার। ২৮৮ ফুট চওড়াবিশিষ্ট এই মসজিদটি দিল্লীর বাইরে নির্মিত এক সুন্দর ও বৃহৎ ইমারত। খলজী সুলতান মোবারক (১৩১৬-২০ খ্রীঃ) এই মসজিদটি দিল্লীর মসজিদের অনুকরণে পুনর্নির্মাণ করেন। ১২২৩ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এই ইমারতটির মৌলিক উপাদান পরবর্তীকালে খলজী ও তুগলক আমলে সংস্করণের ফলে বিলুপ্ত হয়েছে।

৭। বিয়ানা, উখা মসজিদ, ত্রয়োদশ শতাব্দী (চিত্র ৪৬)

রাজপুতনার ভরতপুর এলাকায় বিয়ানা নামক স্থানে ইলতুৎমিশ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উখা মসজিদ নামে পরিচিত এই ইমারতটির নামকরণ হয়েছে উখা মন্দিরের নাম থেকে এবং বলাই বাহুল্য যে, প্রাথমিক যুগে মুসলিম ইমারতে স্থানীয় হিন্দু-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ব্যবহৃত হয়েছে। এই মসজিদের প্রধান আকর্ষণ করবেল পদ্ধতিতে নির্মিত খিলান।

Y. K. Bukhari বলেন, "Its (Ukha Mosque) character implies that it was probably built by local workmen under the guidance of Muslim engineers in as much as it does not possess the robust curves of the 'Keel' type and there is clear weakness in its contour, although the spear headed fringe is apparently more emphasized."

স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য :

পাঠান স্থাপত্যকলার সূচনা হয় দিল্লীতে এবং ফারগুসনের ভাষায়, "Nothing could be more brilliant and at the same time more characteristic than the commencement of the architectural career of these Pathans in India." দাসবংশের সুলতানদের নির্মিত দিল্লী ও আজমীরের ইমারতের প্রভাব পরবর্তী তুঘলক এবং জৌনপুর, গুজরাট, মালব প্রভৃতি অঞ্চলে লক্ষ করা যাবে। অবশ্য মুসলিম ও হিন্দু রীতিকৌশলের সংমিশ্রণেই 'Indo-Islamic' স্টাইল উদ্ভাবিত হয়। স্ক্রীন ফাসাদ, খিলান, জানালা, গ্যালারী, মিনার, অলঙ্করণ দাসবংশের ইমারতসমূহের অবদান।

(৩) খলজী বংশ (১২৯০-১৩২০ খ্রীঃ)

দাসবংশের মতো খলজী বংশ তুর্কী বংশোদ্ভূত। দাসবংশের সর্বশেষ সুলতান কায়কোবাদের রাজত্বে রাজনৈতিক অরাজকতা শুরু হয়। এর সুযোগে খল্‌জী মালিক জালালউদ্দীন ক্ষমতা দখল করেন। কায়কোবাদ নিহত হলে জালালউদ্দীন ১২৯০

খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে খলজী বংশের সূচনা করেন। জালালউদ্দীন ১২৯০ থেকে ১২৯৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আলাউদ্দীন খলজী সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর সুশাসনে মুসলিম আধিপত্য কেবল সুদৃঢ়ই হল না, বরং দাক্ষিণাত্যে সম্প্রসারিতও হল। তিনি স্থাপত্যকলার একজন প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনার মতো স্থাপত্যকর্মেও তিনি বিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি দিল্লীর কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদের সম্প্রসারণ, খিলান স্ক্রীন, আলাই মিনার এবং আলাই দরওয়াজা নির্মাণ করে অমর হয়ে রয়েছেন। আসলে সাদা মার্বেল ও লাল পাথরের ব্যবহার গম্বুজ, অশ্বখুরাকৃতি খিলান, পাথরে কাটা নক্‌শা প্রাধান্য লাভ করে।

১। দিল্লী, জামাতখানা মসজিদ, ত্রয়োদশ শতাব্দী (চিত্র-৪৭)

আলাউদ্দীন খলজী দিল্লীর কুওয়াত-আল-ইসলাম মসজিদের সম্প্রসারণ, আলাই মিনার, আলাই দরওয়াজা নির্মাণ ছাড়াও তাঁর অপর কীর্তি হচ্ছে হযরত নিযামউদ্দীন আওলিয়ার মাজারসংলগ্ন মসজিদটি, যা 'জামাতখানা' নামে পরিচিত। মাজারের পশ্চিম প্রান্তে সমগ্র চত্বর জুড়ে নির্মিত এ মসজিদটি ভুলবশত জি. স্টিফেন ফিরোজ শাহ তুঘলকের সৃষ্টি বলেছেন। কিন্তু আলাই দরওয়াজার সঙ্গে স্থাপত্যিক সাদৃশ্য থাকায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এটি আলাউদ্দীন খলজী কর্তৃক নির্মিত হয়।

'জামাতখানা' মসজিদটি সম্ভবত প্রথম আয়তাকার মসজিদ, যা মসজিদ-স্থাপত্যে একটি বিশেষ ভূমি-পরিকল্পনায় পরিণত হয়। এই মসজিদের পরিমাপ ৯৪ ফুট × ৬৪ ফুট, উচ্চতা ৪৮ ফুট, ছাদ পর্যন্ত ৩৬ ফুট এবং প্রধান গম্বুজের শেষপ্রান্ত ১২ ফুট। পার্শ্ববর্তী দুটি গম্বুজ অপেক্ষাকৃত ছোট, অর্থাৎ মসজিদটির ছাদে তিনটি গম্বুজ রয়েছে। পাথর এবং মসলার সংমিশ্রণে নির্মিত গম্বুজগুলো স্কুইঞ্চ খিলানের সাহায্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে আলাই দরওয়াজার প্রভাব সুস্পষ্ট।

অভ্যন্তরে 'জামাতখানা' তিনটি অংশে বিভক্ত। মধ্যভাগের প্রধান কক্ষটিতে মিহরাব ও মিমবার রয়েছে। এর পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ৪৬ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৫৪ ফুট। পার্শ্ববর্তী কক্ষ দুটির আয়তন ৫৪ ফুট × ২০ ফুট। প্রধান কক্ষ এবং পার্শ্ববর্তী কক্ষ দুটিতে প্রবেশ করবার জন্য পূর্বদিকে খিলানকৃত প্রবেশপথ রয়েছে। প্রধান কক্ষটির খিলান ভূমি থেকে ১৫ ফুট উঁচু। পার্শ্ববর্তী কক্ষের বহিঃপ্রাচীরের দুই-তৃতীয়াংশ লাল পাথরের জালি স্ক্রীন দ্বারা অলঙ্কৃত। এর মধ্যভাগে ছোট দরজা আছে। প্রধান প্রবেশপথটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। এই দরজার উভয় পাশে লাল পাথরের জালির খিলানাকৃতি স্ক্রীন দেখা যাবে। আলাই দরওয়াজা ইলতুৎমিশের নির্মিত আজমীরের স্ক্রীনখিলানের অনুরূপ। এই দরজাগুলোর উভয় পার্শ্ব আরবী শিলালিপি ও জ্যামিতিক নক্‌শা দ্বারা সুশোভিত। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় খিলানসমূহের অভ্যন্তর থেকে সৃষ্ট দাঁতের মতো মোটিভ যা 'spearhead fringe' নামে সমধিক পরিচিত। মসজিদের ছাদে প্যারাপেট রয়েছে।

'জামাতখানা' মসজিদ ক্ষুদ্রাকার হলেও স্থাপত্যিক গুরুত্ব অপরিসীম। মিহরাব প্রাচীরে তিনটি সুউচ্চ খিলান দেখা যাবে যা কেবলমাত্র সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। লাল পাথরে নির্মিত মিমবার ও মিহরাব খুবই সুন্দর দেখায়। মিহরাবের চারিপাশে আরবী শিলালিপি খোদাই করা আছে। যদিও ব্রাউন বলেন যে, "It seems not improbable that the accomplished workmen who carried out the design and execution of the Darwaza were no longer available with the essentials of the style". তবুও একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, 'জামাতখানা' মসজিদ খলজী তথা সুলতানী স্থাপত্যকলায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। প্রথমত, জামাতখানা তিন-গম্বুজবিশিষ্ট প্রথম আয়তাকার মসজিদ—যার ভূমি-নক্‌শা পরবর্তীকালে বহুলব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, লিওয়ানে কোনো স্তম্ভ না থাকায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রার্থনাগারে পরিণত হয়েছে। তৃতীয়ত, জামাতখানার সম্মুখভাগের তিনটি খিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথ পূর্ববর্তী দিল্লী ও আজমীরের খিলান-স্ক্রীনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং ইমারতের সঙ্গে একত্রিভূত হয়েছে। চতুর্থত, খিলান প্রসঙ্গে বলা যায় যে, আলাই দরওয়াজাব মতো অশ্বখুরাকৃতি খিলান ব্যবহৃত হলেও এতে এতটা প্রকট আকারে আত্মপ্রকাশ করেনি। উপরন্তু, দিল্লীর কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদের স্ক্রীনে 'ওজী' মোটিভ খলজী স্থাপত্যে পুনরায় আবির্ভূত হয়। সীতশ গ্রোভার বলেন, "The span of the arches too is clear, indication of the Indian builders growing familiarity with the construction of the true arch."

'জামাতখানা' মসজিদের আয়তাকার লিওয়ানটি আলাউদ্দীন খলজী কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল কিনা বলা দুষ্কর। মূল কেন্দ্রীয় কক্ষটির নির্মাণকৌশলের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী কক্ষ দুটির তুলনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, রীতি-প্রকরণ ও উপকরণ ভিন্ন। ইউসুফ কামাল বুখারীর মতে, "In the Jama-at Khana of Nizamuddin at Delhi whose central chamber was built in the Khalji period and side chambers in the Tughluq period, the architectural peculiarities of the Khaljis and the Tughluqs are most marked. The walls of the latter are battered and made of plastered rubble instead sandstone used by the Khaljis while the Khalji squinches have been replaced by triangular pendentives to support the domes."

খলজী আমলে অনেকগুলো আকর্ষণীয় মসজিদ নির্মিত হয়।

২। দিল্লী, সীরী জা'মি মসজিদ, ১৩০৪ খ্রীঃ

দিল্লীর উপকণ্ঠে সুলতান আলাউদ্দীন খলজী ১৩০৪ খ্রীস্টাব্দে যে নগরী প্রতিষ্ঠা করেন তা সীরী নামে পরিচিত। এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। বর্তমানে এটির কোনো চিহ্ন নেই। সীরী নগরে অপর যে মসজিদ নির্মিত হয় তা তুহফী ওয়ালা গম্বুজ মসজিদ নামে পরিচিত। এটি ভগ্নাবস্থায় রয়েছে। আমীর খসরুর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আলাউদ্দীন খলজী সীরী নগরীতে বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এগুলো ইতিহাসের পাতায় বর্ণিত রয়েছে, বাস্তবে এদের কোনো অস্তিত্ব নেই।

৩। উখা, মসজিদ (১৩১৬-২০ খ্রীঃ)

রাজপুতানার উখা নামক স্থানে খলজী আমলে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। এটি ১৩২০ খ্রীস্টাব্দে মালিক কাফুর সুলতান কুতুবউদ্দীন মোবারক শাহের (১৩১৬-২০) আমলে নির্মিত হয়। এটিতে লিওয়ান, সাহান ও রিওয়াক রয়েছে। বিয়ানায় উখা মসজিদের মিনারটি আকর্ষণীয়।

(৪) তুঘলক বংশ (১৩২০-১৩৩৪ খ্রীঃ)

খলজী বংশের পতনের পর তুঘলক বংশের আবির্ভাব হয়। আলাউদ্দীন খলজীর মৃত্যুর পর রাজনৈতিক অরাজকতা শুরু হলে নিম্নবংশীয় ধর্মান্তরিত হিন্দু খসরু ক্ষমতা গ্রাস করার চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজী মালিক আমীর-উমরাহদের সহায়তায় দিল্লী অভিযান করে ক্ষমতা দখল করেন। ১৩২০ খ্রীস্টাব্দে সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক উপাধি ধারণ করে গাজী মালিক দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। দিল্লীতে মুসলিম স্থাপত্যকলার যে ঐতিহ্য কুতুবউদ্দীন আইবক প্রচলন করেন তা অব্যাহত থাকে এবং পরপর পাঁচটি রাজবংশ এই ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখে। অবশ্য উপকরণের তারতম্যে এবং রীতিকৌশল প্রয়োগের বৈপরীত্যের ফলে বিভিন্ন রাজবংশের আমলে বিভিন্ন স্থাপত্য-স্টাইল গড়ে ওঠে। এ কারণে দাসবংশের আমলে নির্মিত ইমারতের সঙ্গে খলজী অথবা তুঘলক সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট ইমারতসমূহের পার্থক্য রয়েছে, যদিও মূল ইসলামী ধারা অপরিবর্তিত থাকে।

উল্লেখ্য যে, প্রথম তিনটি রাজবংশের আমলে দিল্লীতে তিনটি পৃথক ঐতিহ্যবাহী রাজধানী নির্মিত হয়। কুতুবউদ্দীন আইবক 'কুতুব-দিল্লী' বা কিলা-ই-রায় পাথরোতে প্রথম মুসলিম রাজধানী স্থাপন করেন এবং তাঁর আমলে নির্মিত স্থাপত্যকীর্তি এখনও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আলাউদ্দীন খলজী 'সিরি' নামে একটি নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক 'তুঘলকাবাদ' নামে একটি নতুন নগরী নির্মাণ করেন। এই প্রাচীন নগরীর ভিত্তি ১৩২১ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৩২৩ খ্রীস্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ফারগুসন একে "প্রাচীন পাঠান সামন্তদের একটি বিশালাকার দুর্গ" বলে অভিহিত করেন। এ দুর্গের এক অংশে প্রাচীরবেষ্টিত গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের সমাধি নির্মিত হয়েছে। মুহম্মদ বিন তুঘলক এবং ফিরোজ শাহ তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীতে অসংখ্য ইমারত নির্মিত হয়। বিশেষ করে ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-৮৮ খ্রীঃ) স্থাপত্যকলার একজন নিবেদিতপ্রাণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা, দুর্গ, প্রাসাদ, সমাধি নির্মিত হয়–বিশেষ করে তিনি ফিরোজ কোটলা নামে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করেন, যা স্থাপত্যকলার নিদর্শন বহন করে রয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে, ফিরোজ শাহ ৩০টি রাজপ্রাসাদ, ২০০ পান্থশালা, ৫টি হাসপাতাল, ১০টি স্নানাগার এবং ১০০ সেতু নির্মাণ করেন। তিনি পূর্ত বিভাগ স্থাপন করেন। তাঁর ভাষায়, "আল্লাহ তাঁর নগণ্য বান্দাকে যে সমস্ত গুণ দিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, গৃহনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা।" তাঁর প্রধান স্থপতি ছিলেন মালিক গাজী শাহানা এবং তাঁকে সহায়তা

করতেন আবদুল হক। ফিরোজশাহ্ তুঘলক মসজিদ-স্থাপত্যের বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি দিল্লীতে ফিরোজ কোটলা ব্যতীত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নগর প্রতিষ্ঠা করেন, যেমন– জৌনপুর, ফতেহাবাদ, হিসার ফিরোজ। এই সমস্ত নগরীতে মসজিদ স্থাপিত হয়। কোটলায় ফিরোজ শাহে নির্মিত জা'মি মসজিদ ব্যতীত দিল্লীতে কালী, কালান, খিড়কী, বেগমপুরী, তিমুরপুরের শাহ আলমের দরগায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

১। দিল্লী, কালান মসজিদ, ১৩৭৫ খ্রীঃ (চিত্র-৪৮)

সি. স্টিফেন বলেন, "Among the most perfect specimens of architecture of the age of Firoz Shah Tughlaq is the large mosque within the walls of modern Delhi (Shahjahanabad). Known as the Kali Masjid or black mosque; but this designation though these are grounds for believing it to be one of long standing is in all probability as corruption of Kalan Masjid or chief mosque." স্টিফেন কালী এবং কালান মসজিদ দুটিকে একই ইমারত বলেছেন, যা সত্য নয়। কালী মসজিদ হযরত নিযামউদ্দীন আউলিয়ার মাজারের সন্নিকটে অবস্থিত এবং কালান মসজিদ তৈমুরী ফটকের নিকট স্থাপিত। কালান মসজিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটি ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে তাহখানার উপর নির্মিত। তুঘলক আমলে এ ধরনের 'তাহখানা' প্রথম প্রবর্তিত হয়, যা পরবর্তীকালে এমনকি বাংলার মুঘল স্থাপত্যেও দেখা যাবে। দৃশ্যত কালান মসজিদ দ্বিতলবিশিষ্ট মনে হলেও প্রথম স্তরটি তাহখানা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই তাহখানা ভিত্তিভূমির কাজ করছে। ভূমি থেকে ২৮ ফুট উঁচু এই তাহখানা খিলানের সাহায্যে নির্মিত হয়েছে এবং উপকরণ হিসেবে অমসৃণ পাথর এবং মশলা (mortar) ব্যবহৃত হয়েছে। এই তাহখানা নির্মাণের পশ্চাতে কী কারণ ছিল তা বলা দুষ্কর; তবুও বলা হয়ে থাকে যে, তুঘলক স্থাপত্যে 'সামরিক' স্থাপত্য -যাতে অলঙ্করণের অভাব দেখা যায়। তাহখানার উপর মূল মসজিদটি স্থাপিত। উচ্চতায় ৩৮ ফুট এ মসজিদটিতে অসংখ্য গম্বুজ রয়েছে।

কালান মসজিদের চারি কোণায় গোলাকার বুরুজ রয়েছে এবং বুরুজ নিচে থেকে উপরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। এ ধরনের বুরুজ তুঘলক স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। বুরুজের শীর্ষদেশে গোলাকার গম্বুজ, যা cupola নামে পরিচিত রয়েছে। মসজিদে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে একটি পর্চ নির্মিত হয়েছে এবং এ পর্চে পৌঁছবার জন্য ৩১টি ধাপবিশিষ্ট একটি সিঁড়ি রয়েছে। লিনটেলের উপর ভিত্তি করে প্রবেশপথ নির্মিত হয়েছে এবং এর দুপাশে দুটি ক্ষীণ এবং ক্রমশ সরু ক্ষুদ্রাকার টাওয়ার বা turret রয়েছে। পর্চটি গম্বুজবিশিষ্ট। এ পর্চটি ভূমি থেকে ২০ ফুট উঁচুতে স্থাপিত এবং প্রবেশপথে নাস্‌খী শিলালিপিতে উৎকীর্ণ একটি পাথর দেখা যাবে। এ লিপিতে উল্লেখ আছে যে, সুলতান ফিরোজশাহের রাজত্বে খানজাহান কর্তৃক এ মসজিদ হিজরী ৭৮৯/১৩৭৫ইং তারিখে নির্মিত হয়।

প্রবেশপথের মধ্য দিয়ে মসজিদের সাহান বা চত্বরে প্রবেশ করা যায়। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, চিরাচরিত সাহানসম্বলিত ভূমি-পরিকল্পনায় মসজিদটি স্থাপিত হয়।

সাহানের পরিমাপ ৬০ ফুট × ৪৮ ফুট। পশ্চিমদিকে লিওয়ান বা প্রধান প্রার্থনাগার রয়েছে এবং সাহানের তিন পার্শ্বে রিওয়াক দেখা যাবে ; পূর্বদিকের রিওয়াকটি ৬টি গম্বুজ দ্বারা আবৃত, উত্তর ও দক্ষিণদিকের রিওয়াকে চারটি করে গম্বুজ রয়েছে। লিওয়ানটি কিবলার দিকে অবস্থিত ; সাহান থেকে পশ্চিমদিকে পাঁচটি খিলানসারির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। লিওয়ানটিতে তিনসারি আইল রয়েছে এবং সমগ্র লিওয়ানটি ১৫টি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। এ গম্বুজগুলো ৬টি জোড়া এবং ১৮টি একক স্তম্ভদ্বারা নির্মিত। কিবলা-প্রাচীরে মিহ্‌রাব ও মিমবার রয়েছে। ব্রাউন বলেন যে, কালান মসজিদটির গঠনশৈলী ও সুউচ্চ প্রবেশপথ দিল্লীতে ইলতুৎমিশের রাজত্বে নির্মিত সুলতান ঘোরীর সমাধির সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে—বিশেষ করে দুর্গের মতো স্থাপত্যকলা ও অলঙ্করণবিহীন সাদামাটা উপকরণের ব্যবহারে।

Bishop Heber কালান মসজিদ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, "The Kala(n) Musjid is small and has nothing worthy of notice about it, but its plainner, solidity and great antiquity being & work of first Pathan conquerors and belonging to the times of primitive Musulman simplicity. It is exactly of the plan of the original Arabian mosques, a square court surrounded by a cloister and roofed with many small domes of the plainest and the most solid construction, like the rudest specimen of what we call the early Norman architecture."

২। দিল্লী, কালী মসজিদ, ১৩৭৬ খ্রীঃ

হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়ার মাজারের সন্নিকটে অবস্থিত কালী মসজিদের নামকরণ হয়েছে 'সনজর' বা black থেকে। কালান মসজিদের মতো কালী মসজিদেও সাহান, লিওয়ান ও রিওয়াক রয়েছে। কিন্তু ভূমি-পরিকল্পনার দিক থেকে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যাবে। তুলনামূলক আলোচনায় প্রতীয়মান হবে যে, কালান মসজিদের মতো কালী মসজিদে তাহখানা, অসংখ্য সিঁড়িবিশিষ্ট পর্চের প্রবেশপথ, চারকোণায় গোলাকার ও ক্রমশ সরু (taper) বুরুজ, প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে ক্ষীণ ও সুউচ্চ ক্ষুদ্রাকার টাওয়ার (turret) রয়েছে। স্থাপত্যিক উপকরণ ও কৌশল একই ধরনের, কিন্তু ভূমি-নক্‌শায় নতুনত্ব দেখা যাবে। এ মসজিদের সাহান চারটি অংশে বিভক্ত এবং সমগ্র মসজিদের এলাকাকে ক্রসের (+) আকারে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। এই বিভক্তিকরণ সম্ভব হয়েছে খিলানবিশিষ্ট আইল দ্বারা, যা উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে একে অপরকে ছেদ করেছে। কালান মসজিদের মতো কালী মসজিদে ক্ষুদ্রাকার কৌণিক (conical) গম্বুজের ব্যবহার প্রাধান্য পেয়েছে।

৩। দিল্লী, খিড়কী মসজিদ, ১৩৭৫ খ্রীঃ

দিল্লীর জাহানপানা এলাকায় খিড়কী মসজিদ অবস্থিত যা ফিরোজ শাহ্‌ তুঘলকের স্থাপত্যকীর্তির অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত হিসেবে এখনও দর্শকদের অভিভূত করে।

চিরাচরিত প্রথায় এ বিশালাকার মসজিদটি তাহখানার উপর নির্মিত। কালো গ্রানাইট পাথরের উপর পলেস্তারা করা এই মসজিদটি বর্গাকার। কালান, খিড়কী ও ফিরোজ কোটলার মসজিদে তাহখানার ব্যবহার থাকলেও কালী ও বেগমপুরী মসজিদ ভূমির উপর স্থাপিত কোনো খিলানরাজি দ্বারা সৃষ্ট দ্বিতল ছিল না।

খিড়কী মসজিদটিতে প্রবেশের জন্য উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণদিকে অসংখ্য সিঁড়িবিশিষ্ট পর্চ রয়েছে। পর্চটিতে কালান মসজিদের মতো কোনো গম্বুজ নেই। সমান্তরাল ছাদ পর্চটিকে আবৃত করে রেখেছে। মসজিদের চারকোণায় চারটি বুরুজ রয়েছে এবং ছোট গম্বুজ বা cupola দ্বারা আবৃত এই গম্বুজগুলো ভূমি থেকে ক্রমশ সরু হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। এগুলোর মোট উচ্চতা ৫০ ফুট। এ বুরুজগুলো তিনটি অংশে বিভক্ত, প্রথম অংশ তাহখানা পর্যন্ত বিস্তৃত, দ্বিতীয় স্তর ছাদ পর্যন্ত চলে গেছে এবং তৃতীয় বা গম্বুজের অংশে ছাদের উপরে বিস্তৃত। স্টীফেন প্রবেশপথগুলোকে পাঠান ফটক বলেছেন এবং সেগুলো দেওয়াল থেকে ২৩ ফুট দূরে নির্মিত। প্রবেশপথটি অপরাপর মসজিদের মতো লিনটেন এবং তার উপরে খিলান দ্বারা নির্মিত। কালী বা কালান মসজিদের মতো প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে ক্রমশ সরু করে ক্ষুদ্রাকৃতি টাওয়ার (turret) নির্মিত হয়েছে।

ভূমি-পরিকল্পনায় খিড়কী মসজিদটির সঙ্গে কালী মসজিদের সাদৃশ্য রয়েছে অর্থাৎ উভয় ইমারত ক্রশাকৃতিতে (cruciform) নির্মিত। ভারত উপমহাদেশের মসজিদ-স্থাপত্যে এ ধরনেব ভূমি-নক্শা সর্বপ্রথম ফিরোজশাহী মসজিদে প্রচলিত হয়। এর মূল কারণ এই যে, প্রথম তাপদাহে বাতাস প্রবেশের জন্য সমগ্র মসজিদটি ছাদ দ্বারা আবৃত করা হয়নি। ক্রশের বাহুর মতো (+) মসজিদটিকে লম্বালম্বি এবং সমান্তরালভাবে দিখণ্ডিত করা হয়েছে। এর পব মসজিদের প্রাচীর বরাবর চারটি করিডর সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে মসজিদের অভ্যন্তরে চারটি উন্মুক্ত চত্বরের সৃষ্টি হয়েছে। ক্রশাকৃতি খিলানরাজিতে তিনসারি খিলান রয়েছে। এ মসজিদের ছাদে মোট ক্ষুদ্রাকৃতি ড্রামবিহীন ৮১টি গম্বুজ দেখা যাবে। এই গম্বুজগুলো তিনসারিতে বিভক্ত এবং প্রত্যেক সারিতে ৯টি করে মোট ২৭টি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। প্রথম স্তব ১০ ফুট উচ্চ হলেও আসল মসজিদের ইমারতটি ২২ ফুট উঁচু।

এক নজরে খিড়কী মসজিদের সঙ্গে কালান মসজিদের সাদৃশ্য দেখা গেলেও বৈপরীত্যও রয়েছে অনেক। উভয় মসজিদ একই সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত–'rubble' এবং 'plaster'-এর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে। উভয় মসজিদে তাহখানা, পর্চবিশিষ্ট প্রবেশপথ, গোলাকার ঢালু কৌণিক বুরুজ, টারেট প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষণীয়, কিন্তু বৈষম্য রয়েছে। কিন্তু কালান মসজিদ ১৪০ ফুট দীর্ঘ, অন্যদিকে খিড়কী ২১০ ফুট দীর্ঘ; কালান আয়তাকার, কিন্তু খিড়কী চতুষ্কোণাকার। কালান মসজিদে প্রচলিত মসজিদ ভূমি-পরিকল্পনা মাফিক সাহান আছে, কিন্তু খিড়কী মসজিদে চারটি উন্মুক্ত সাহান দেখা যাবে। সতীশ গ্রোভার বলেন, "To the great egalitarian brotherhood` of Islam of which congregational worship was the pivotal ritual this 'compartmentalization` of the faithful at

prayer was psychologically more difficult to tolerate than the hot Indian sun. And so this experiment was repeated only once again at Gulbarga in the South.

৪। দিল্লী, বেগমপুরী মসজিদ, ১৩৭০ খ্রীঃ

ভূমিপরিকল্পনার দিক থেকে বিচার করলে বেগমপুরী মসজিদ কালী এবং খিড়কী মসজিদ থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। চিরাচরিত লিওয়ান, সাহান ও রিওয়াকসম্বলিত আদি যুগের মসজিদের মতো এ মসজিদটি নির্মিত। এ মসজিদে কোনো তাহখানা ব্যবহৃত হয়নি এবং ইমারতটি ভূমিতে স্থাপিত। আয়তনে আয়তাকার বেগমপুরী মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৩০৭ ফুট উত্তর-দক্ষিণে এবং প্রস্থে ২৯৫ ফুট পূর্ব-পশ্চিমে, উচ্চতা ৩১ ফুট। মধ্যভাগে বিশাল সাহান রয়েছে যার পরিমাপ ২৪৭ ফুট × ২২৩ ফুট। সাহানের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে রিওয়াক দেখা যাবে এবং এগুলো ১৬১/২ ফুট প্রশস্ত।

মসজিদের পশ্চিম অর্থাৎ কিবলার দিকে প্রবেশের জন্য একটি তিন-খিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথ নির্মিত হয়েছে। প্রধান খিলানটি পার্শ্ববর্তী খিলান অপেক্ষা বৃহত্তম। এই তিন খিলানের উপর তিনটি খিলান-জানালা দেখা যাবে। সমগ্র প্রবেশপথটি একটি খিলানাকৃতি ঢালু পায়লন (pylon) দ্বারা আবৃত। এই পায়লনের উভয় পার্শ্বে ক্রমশ সরু দুটি সংলগ্ন-টাওয়ার নির্মিত হয়। বেগমপুরী মসজিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য–সম্মুখভাগের ঢালু (bater) পায়লন, যার সঙ্গে প্রাচীন মিশরীয় পিরামিডের সাদৃশ্য দেখা যাবে। ব্রাউন বলেন, "A distinctive feature of this pylon-facade which itself is a descendant of the Maqsura or screen of arches, is the tapering turret at each of its quoins creating that sloping appearance, inherent in the production of this reign."

বেগমপুরী মসজিদের লিওয়ান ও রিওয়াক গম্বুজ দ্বারা আবৃত। কিবলা-প্রাচীরে মিহরাব ও মিমবার রয়েছে। সর্বমোট ৬৪টি গম্বুজ দ্বারা এ মসজিদের ছাদ নির্মিত হয়। চত্বর যা সাহানে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে খিলানরাজির শোভা দেখা যাবে এবং ব্রাউন এ ধরনের খিলানকে 'tudor' বলে অভিহিত করেন। এ মসজিদে প্রবেশের জন্য তিনটি খিলানাকৃতি পর্চ স্থাপিত হয়েছে। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে নির্মিত এই ফটকগুলোতে অসংখ্য ধাপসম্বলিত সিঁড়ি দিয়ে আসতে হয়। প্রতিটি ফটকে দুটি কক্ষ রয়েছে।

বেগমপুরী মসজিদের প্রভাব জৌনপুরের মসজিদসমূহে লক্ষণীয়--বিশেষ করে ঢালু পায়লন ফাসাদ যা লিওয়ানে স্ক্রীনের কাজ করে। সাধারণভাবে এ ঢালু 'ফিরোজীয় ঢালু' নামে অভিহিত।

৫। দিল্লী, কোটলা ফিরোজ শাহ, জা'মি মসজিদ, ১৩৫৪ খ্রীঃ

ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনামলে মুসলিম স্থাপত্যকলা অসাধারণ বিকাশ লাভ করে। তিনি ফিরোজাবাদ নামে দিল্লীতে একটি সুরক্ষিত দুর্গপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। কার্নিংহাম এ প্রাসাদ সম্বন্ধে বলেন, "The palace of Firuzabad which formed also the

citadel of the new city, was strongly fortified with massive stone walls and towers of more than Egyptian slope." এ দুর্গপ্রাসাদে বিভিন্ন ধরনের ইমারত স্থাপিত হয়–রাজকীয় হারেম, স্নানাগার, উদ্যান, জা'মি মসজিদ, সেনাছাউনি, পরিবারবর্গের বাসস্থান, অস্ত্রাগার প্রভৃতি। ফিরোজ কোটলা নামে সমধিক পরিচিত এই প্রাসাদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ; তবুও এ দুর্গের সর্ববৃহৎ জা'মি মসজিদের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়।

দুর্গের মধ্যভাগে এবং যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত জা'মি মসজিদটি ১৩৫৪ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়। সুউচ্চ তাহখানার উপর স্থাপিত এই মসজিদটি বর্গাকার। চিরাচরিত সাহান, রিওয়াক ও লিওয়ানসম্বলিত সনাতনী ভূমি-পরিকল্পনায় নির্মিত এই মসজিদটি একটি স্থাপত্যিক বিস্ময় ছিল। সুলতান মাহমুদ তুঘলকের রাজত্বে তৈমুরলঙ্গ ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ এবং সাময়িকভাবে দিল্লী দখল করেন। তিনি ফিরোজ শাহ কর্তৃক নির্মিত জা'মি মসজিদের স্থাপত্যশৈলী ও বিশালতায় এরূপ মুগ্ধ হন যে, সেখানে নামাজ আদায় করেন এবং এই মসজিদের অনুকরণে সমরকন্দে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য মডেল নিয়ে যান। অপরাপর ফিরোজীয় ইমারতের মতো এই মসজিদটিও বেলেপাথর, মর্টার বা মশলা দিয়ে নির্মিত। কথিত আছে যে, এ মসজিদে দশ হাজার মুসল্লী একত্রে নামাজ আদায় করতে পারতেন।

জা'মি মসজিদে প্রবেশের জন্য উত্তরদিকে প্রবেশপথ নির্মিত হয়। খিলানসম্বলিত তাহখানা মসজিদের ভিত্তিভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্গাকার প্রবেশপথটির চারদিকে খিলানপথ রয়েছে। সনাতনী পদ্ধতি অনুযায়ী লিনটেল এবং তার উপরে খিলান (arch and lintel) দ্বারা প্রবেশপথ নির্মিত। মসজিদের মধ্যভাগে খোলা চত্বর রয়েছে। এর উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে গম্বুজবিশিষ্ট রিওয়াক দেখা যাবে। রিওয়াকে তিনসারি আইল এবং আইলগুলো গম্বুজ দ্বারা আবৃত। পশ্চিম অর্থাৎ কিবলার দিকে চারসারি আইল রয়েছে এবং অনুরূপভাবে গম্বুজ দ্বারা ছাদ তৈরি করা হয়েছে। আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য মসজিদ-প্রাচীরে জানালা নির্মিত হয়েছে। কিবলা-প্রাচীরে মিহরাব ও মিমবার রয়েছে।

৬। দিল্লী, তিমুরপুরের মসজিদ ও ইরিচপুরের মসজিদ, চতুর্দশ শতাব্দী

ফিরোজ কোটলায় জা'মি মসজিদ ছাড়াও ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে দিল্লীর তিমুরপুরে শাহ আলমের মাজারে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। এ ছাড়া ইরিচপুরে যে জা'মি মসজিদ স্থাপিত হয় তা তুঘলক এবং সৈয়দ লোদী স্থাপত্যরীতির সেতুবন্ধনের কাজ করে। খিলানে পরপর খাঁজ সৃষ্টি করা হয়েছে যা লোদী ও সৈয়দ যুগের মসজিদ ও সমাধিতে লক্ষ করা যাবে। ইরিচপুরের মসজিদের মিহরাব খুবই অলঙ্কৃত এবং ধারণা করা হয়, পাথরের খোদাই-এ স্থানীয় হিন্দু কারিগরের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

তুঘলক স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য :

তুঘলক রাজত্বকাল ছিল খুবই অরাজকতাপূর্ণ এবং এ আমলেই তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে দিল্লী অধিকার এবং ১,০০,০০০ নিরীহ নগরবাসীকে হত্যা করেন।

তাঁর আক্রমণের ফলে স্থাপত্যকীর্তি বিনষ্ট হয়; দিল্লী, ভাটনীর, দিপালপুর, মীরাট, হরিদ্বাব ও অপরাপর শহর বিধ্বস্ত হয়। ফিরোজ শাহের সময় স্থাপত্যকলার বিকাশ ঘটে। তুঘলক ইমারতে খলজী স্থাপত্যের অলঙ্করণশৈলী অথবা সাদা মার্বেল ও লাল পাথরের ব্যবহার দেখা যায় না। তুঘলক ইমারত প্রসঙ্গে জন মার্শাল বলেন, "The days of its first youthful splendour and prodigal luxuriance were over. Lavish display of ornament and richness of detail now began to give place to a chaste sobriety which, as time went on, developed into a severe and puritanical simplicity. At first the change was due to the urgent need for economy and to the general revulsion of feeling against the excesses of the Khalji regime." দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের ফলে দক্ষ স্থপতি ও কারিগর দিল্লী ত্যাগ করলে ইমারতনির্মাণে সঙ্কট দেখা যায়। উপকরণের দিক থেকে অতি মামুলি অমসৃণ ও অসমতল রেখে পাথর এবং প্লাস্টার ব্যবহৃত হয়, যার ফলে স্থাপত্যেব লালিত্য ব্যাহত হয়। এই কারণে ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, "Tughluq style suggested the early Norman work in England." অর্থাৎ সামরিক স্থাপত্যের রূঢ়তা ও চাকচিক্যবিহীন অলঙ্করণ তুঘলক স্থাপত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। লিনটেল ও খিলানসম্বলিত প্রবেশপথ, ঢালু প্রাচীর (bater), ক্রশাকৃতি মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনা, গোলাকার কৌণিক বুরুজ, মুসলিম ও হিন্দু রীতিপদ্ধতির সংমিশ্রণ, যেমন— গম্বুজের উপর হিন্দু স্থাপত্যের অংশ 'কলস' চূড়া, তুঘলক স্থাপত্যকে মহিমান্বিত করেছে। উল্লেখ্য যে, তুঘলক স্থাপত্যের প্রভাব কেবলমাত্র জৌনপুরে ও গুলবার্গায় পরিলক্ষিত হয়নি; সুদূর বাংলায় সুলতানী আমলের স্থাপত্যকীর্তি, বিশেষ করে বাগেরহাটের খান জাহান কর্তৃক নির্মিত মসজিদসমূহে সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

(৫) সৈয়দ (১৪১৫-৫১ খ্রীঃ) এবং লোদী (১৪৫১-১৫২৬ খ্রীঃ) বংশ

তুঘলক বংশের সর্বশেষ সুলতান মাহমুদ শাহ ১৪১৩ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে আমীর-ওমরাহগণ প্রভাবশালী অমাত্য দৌলত খান লোদীকে দিল্লীর সিংহাসনে বসান। তৈমুরের প্রতিনিধি এবং দিপালপুরের শাসনকর্তা খিজির খান ১৪১৪ খ্রীস্টাব্দে দৌলত খানকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। রসূলে করীমের বংশধর দাবি করে তিনি বংশের নাম রাখেন 'সৈয়দ'। এই বংশের সুলতানদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মোবারক শাহ (১৪২১-৩৪), মোহাম্মদ শাহ (১৪৩৪-৩৫) এবং আলম শাহ (১৪৪৫-৫১)। তুঘলক বংশের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল তৈমুরের আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞ, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হ্রাস পেলেও দিল্লীতে দুটি স্বাধীন রাজবংশ রাজত্ব করতে থাকে–সৈয়দ ও লোদী। রাজনৈতিক অরাজকতা ও কেন্দ্রীয় শাসনের শিথিলতা, দক্ষ কারিগরের অভাব ও পৃষ্ঠপোষকতার অপ্রতুলতার জন্য এই যুগে স্থাপত্যকলা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ কারণে কোনো নতুন রাজধানী, দুর্গ-প্রাসাদ, বিশালাকার সৌধ বা মসজিদ দেখতে পাওয়া যায় না। সৈয়দ বংশের পর লোদী বংশ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে ১৪৫১ থেকে ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে।

বাহলুল লোদী এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সুযোগ্য পুত্র সিকান্দার লোদী এ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। তাঁর আমলে স্থাপত্যকলার চর্চা হয়। কিন্তু সেকেন্দার লোদীর পুত্র ইব্রাহিম লোদী ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবুরের নিকট পরাজিত হলে এ বংশ বিলুপ্ত হয়ে মুঘল বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সৈয়দ ও লোদী রাজবংশের শাসনামলে অতুলনীয় সৌধ নির্মিত না হলেও অসংখ্য মাযার বা সমাধি স্থাপিত হয়। এ সমাধিগুলোর অধিকাংশ ছিল হয় বর্গাকার, নাহয় অষ্টকোণাকার। এ আমলে কতিপয় মসজিদও নির্মিত হয়। যদিও সংখ্যায় খুব নগণ্য ; যেমন– সেকেন্দার লোদীর মসজিদ, বড় গম্বুজ সংলগ্ন মসজিদ, মত্‌কী মসজিদ এবং জামালা মসজিদ।

১। দিল্লী, সেকেন্দার লোদীর জা'মি মসজিদ, ১৪৯৪ খ্রীঃ

পুরাতন দিল্লীর খয়েরপুর এলাকায় অবস্থিত সেকেন্দার লোদীর জা'মি মসজিদ ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়। মসজিদটি আয়তাকার এবং ১০ ফুট উঁচু ভিত্তিভূমির উপর স্থাপিত। এই মসজিদের সংলগ্ন আরও কয়েকটি ইমারত রয়েছে, যেমন— বড় গম্বুজ, শিশগম্বুজ, সেকেন্দার লোদীর সমাধি। এ সমস্ত ইমারত ১০৪ ফুট × ৮২ ফুট পরিমাপের একটি চত্বরের চারিপার্শ্বে অবস্থিত।

সেকেন্দার লোদীর মসজিদে প্রবেশের জন্য পাঁচটি খিলানপথ রয়েছে, যার মধ্য দিয়ে মসজিদের পাঁচটি 'বে' অথবা প্রকোষ্ঠের দিকে মিহরাব পর্যন্ত যাওয়া যায়। বড় গম্বুজ ও জামালী মসজিদের মতো এই মসজিদের খিলানগুলো তিনটি ক্রমশ খাঁজকাটা স্তরে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রধান প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং এর উভয় পার্শ্বে ঠেস বা buttress দেখা যাবে। এই buttress দুটিতে কতিপয় কুলুঙ্গী সৃষ্টি করা হয়েছে। খিলানের উভয় পার্শ্বের spandrel মেডালিয়ন দ্বারা অলঙ্কৃত। এ প্রবেশপথটি পোর্টাল বলে মনে হলেও তুঘলক ও জৌনপুরের মসজিদের স্ক্রীন পোর্টালের মতো নয়। খিলানগুলোর বাইরের অংশ শিলালিপি দ্বারা উৎকীর্ণ।

সেকেন্দার লোদীর মসজিদের অভ্যন্তর একটি আয়তাকার এলাকা, যার পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ৮২ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২১ ফুট। মসজিদটি তিনটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। মধ্যভাগের গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ; ড্রামের উপর নির্মিত এ গম্বুজগুলোতে 'কলস' চূড়া ছিল। পেনডেনটিভের (Pendentive) সাহায্যে গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। এই পেনডেনটিভগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কারণ প্রতি সমান্তরাল স্তরে ক্ষুদ ক্ষুদ্র কুলুঙ্গী দ্বারা অলঙ্কৃত। এ ছাড়া ড্রামে প্যারাপেটের (Parapet) নক্‌শা ও চূড়ার জন্য পদ্মফুলের ভিত্তি এ মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। কিবলা-প্রাচীরে পাঁচটি প্যানেল সৃষ্টি করে প্রতিটিতে মিহরাব নির্মিত হয়েছে। মধ্যবর্তী বৃহত্তম প্যানেলে প্রধান মিহরাব স্থাপিত হয়েছে এবং আয়তাকার মিহরাবটি খিলান দ্বারা আবৃত। মিহরাবের মধ্যভাগ থেকে ঝুলন্ত বাতি ও শিকলের অলঙ্করণ মসজিদের শ্রীবৃদ্ধি করছে। সর্বশেষ প্রান্তের মিহরাব ব্যতীত অপর তিনটি মিহরাবের উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্রাকার মিহরাব নির্মিত হয়েছে। পাঁচধাপবিশিষ্ট মিমবার থেকে ইমাম খোৎবা পাঠ করেন।

সেকেন্দার লোদীর মসজিদের কিবলা-প্রাচীরের উভয় কোণায় ফিরোজীয় ঢালু বুরুজ দেখা যাবে। প্রধান মিহরাবের পশ্চাতে buttress বা ঠেস রয়েছে এবং এর উভয় পার্শ্বে টারেট ছাদের উপর পর্যন্ত চলে গেছে। ব্রাকেটের সাহায্যে কার্নিস নির্মিত হয়। এই মসজিদে কতিপয় ঐতিহাসিক এবং স্তুতিমূলক আরবী শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়েছে। নস্খী শৈলীতে উৎকীর্ণ শিলালিপিগুলো খুবই আকর্ষণীয়। এ মসজিদের অলঙ্করণ প্রসঙ্গে ডঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন, "The whole surface (of the mosque) is profusely decorated with ornaments and inscriptions in stucco on a blue ground, both inside and out. Lavishness is there out novelty is missing compared to other Islamic monuments it lacks in diffentiations. The single elements are very sharply cut, not rounded densely set and are all on the same level. Ornamentation of this mosque reminds us of the flat Taxila patterns. They are even more conventional in design and of less variety."

২। দিল্লী, বড় গম্বুজ সমাধিসংলগ্ন মসজিদ, ১৪৯৪ খ্রীঃ

সৈয়দ এবং লোদী শাসনামলে দিল্লী অথবা দিল্লীর বাইরে কোনো বৃহদাকার ও অনিন্দ্যসুন্দর মসজিদ নির্মিত না হলেও ইসলামের বিধান অনুযায়ী নামাজের সুবিধার্থে ক্ষুদ্রাকার নামাজগাহ স্থাপিত হয়। এ সমস্ত মসজিদ বেশির ভাগই সুলতানদের ব্যক্তিগত নামাজের জন্য ব্যবহৃত হত। যেমন— বড়-খান-কা গম্বুজ সমাধিসংলগ্ন মসজিদ। আয়তাকার মসজিদটি ক্ষুদ্রাকৃতি হলেও স্থাপত্যকৌশলের দিক থেকে এটি বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছে। কিবলা-প্রাচীরে ফিরোজীয় 'বুরুজ' ঢালু অবস্থায় উপরের দিকে নির্মিত হয়েছে। সম্মুখভাগে তিনটি খিলান স্তম্ভের সাহায্যে নির্মিত। মসজিদটির প্রধান আকর্ষণ তিনটি স্তরে নির্মিত খিলান এবং এর বাইরের অংশে উৎকীর্ণ আরবী শিলালিপি। খিলানের আকৃতি হচ্ছে চওড়া অর্থাৎ flatened ও চার বিন্দু থেকে (four centred) নির্মিত। মসজিদটি তিনটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত এবং সম্ভবত 'কলস' চূড়া দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল–যা বহুপূর্বে ভগ্নপ্রাপ্ত। কিবলা-প্রাচীরে মিহরাব ও মিমবার রয়েছে। লোদী যুগ মুসলিম ভারতীয় স্থাপত্যের স্বর্ণযুগ, বিশেষ করে সমাধিনির্মাণের ক্ষেত্রে।

৩। দিল্লী, মত্‌কী মসজিদ, ১৫০৫ খ্রীঃ

সুলতান সিকান্দার লোদী ১৫০৫ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে মত্‌কী মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। সৈয়দ আহ্‌মদ খান উল্লেখ করেন যে, এ মসজিদে প্রবেশের জন্য একটি আকর্ষণীয় ও অতুলনীয় ফটক ছিল, যা বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। এ মসজিদের নামকরণের মূলে কিংবদন্তি রয়েছে। কথিত আছে যে, একজন দরিদ্র কৃষক একটি শস্যদান (মথ) নিয়ে উক্ত স্থানে বপন করেন এবং এ থেকে উৎপন্ন শস্য ধর্মীয় কাজে ব্যয় করবেন বলে শপথ করেন। কালক্রমে উৎপন্ন শস্য থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জিত হয় তা দিয়ে মত্‌কী মসজিদ নির্মিত হয়। সি. স্টিফেন বলেন, "It is a good specimen of the style of architecture which was common in the time of the Lodis."

মত্‌কী মসজিদ ৬ ফুট উঁচু বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি আয়তাকার এবং দৈর্ঘ্যে ১৩০ ফুট এবং প্রস্থে ৩০ ফুট। ভূমি থেকে প্রধান গম্বুজ পর্যন্ত ৬০ ফুট উঁচু। এ মসজিদের লিওয়ানে প্রবেশের জন্য পাঁচটি খিলান-দরজা রয়েছে। এ খিলানগুলো প্রধান প্রবেশপথ ব্যতীত তিনটি স্তরে নির্মিত। মধ্যভাগের প্রধান খিলানপথটি পার্শ্ববর্তী খিলান অপেক্ষা বৃহত্তর। এতে দুটি স্তরবিশিষ্ট খিলান রয়েছে এবং এর উপরে একটি জানালা দেখা যাবে। সমগ্র প্রবেশপথটি একটি সুউচ্চ কৌণিক খিলান দ্বারা আবৃত। খিলান-ফাসাদের উভয় পার্শ্বে টাওয়ার বা ঠেস নির্মিত হয়েছে। এতে আটটি খিলানাকৃতির কুলুঙ্গী সৃষ্টি করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। মত্‌কী মসজিদ তিনটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। মধ্যবর্তী বৃহত্তর গম্বুজটি মিহরাবের সম্মুখে নির্মিত ; অপর দুটি গম্বুজ দুপার্শ্বে স্থাপিত হয়েছে। পাথর এবং মশলা (mortai) দিয়ে নির্মিত এ গম্বুজগুলো অতীব সুন্দর ; কিন্তু এর 'কলস' চূড়াগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। গম্বুজগুলো অষ্টকোণাকার ড্রামের উপর স্থাপিত।

মত্‌কী মসজিদ লোদী স্থাপত্যশৈলীর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ মসজিদে কতিপয় আকর্ষণীয় স্থাপত্যরীতির উদ্ভব হয়। সুসামঞ্জস্যপূর্ণ গম্বুজ ও খিলানরাজি পূর্বদিকের প্রাচীরের ব্র্যাকেট দ্বারা নির্মিত কার্নিস, মেডালিয়ন, ছাদের প্যারাপেট, ড্রামের অলঙ্করণ এবং সর্বোপরি উত্তর ও দক্ষিণদিকে দুটি দ্বিতল টাওয়ার ও ব্যালকনি মত্‌কী মসজিদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। এ ছাড়া কিবলা প্রাচীরের বাইরের অংশে মিহরাবের পশ্চাতে যে ঠেস বা buttress আছে তা ফিরোজীয় ঢালু টারেট দ্বারা সুরক্ষিত। উভয় পার্শ্বের টাওয়ারগুলো অষ্টকোণাকার। এসমস্ত উপকরণ ও বৈশিষ্ট্য ব্রাউনের ভাষায়, "add a note of pleasing vitality to this aspect of the building.

গম্বুজ নির্মিত হয় বিশেষ প্রক্রিয়ায় ; প্রধান গম্বুজটি স্কুইঞ্চের সাহায্যে এবং পার্শ্ববর্তী গম্বুজ দুটি পেনডেনটিভের সাহায্যে নির্মিত হয়। কিবলা প্রাচীরে পাঁচটি মিহরাব রয়েছে, প্রধান মিহরাবটি অন্যান্যের অপেক্ষা বৃহৎ। এ মসজিদের অলঙ্করণ পাথরে খোদাই করে করা হয়নি, প্লাস্টারের উপর সূক্ষ্ম নক্‌শা কেটে লতাপাতা জ্যামিতিক (arabesque) মোটিভ উৎকীর্ণ করা হয়েছে ; উজ্জ্বলতার জন্য রঙের প্রলেপ দেওয়া হত। ব্রাউনের ভাষায়, "These was evidently a very talented group of craftsmen engaged in this art during the fifteenth century, reminiscent of that much greater school of artists, who at about the same time wise perpetuating such wonders in a similar technique on the walls of the Alhambra in Spain."

৪। দিল্লী, জামালী মসজিদ, ১৫৩৬ খ্রীঃ

দিল্লীর একজন সাধকপুরুষ শেখ ফজলুল্লাহ ওরফে জালাল খান, যিনি জামালী নামে সর্বজনবিদিত ছিলেন, তিনি ১৫২৮ খ্রীস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সুলতান সেকেন্দার লোদীর সময় এর নির্মাণ শুরু হলেও হুমায়ূনের রাজত্বে এর নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। বলাই বাহুল্য যে, ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে ভারতবর্ষের

রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে মুঘল নামে একটি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী রাজবংশের আবির্ভাব হয়। রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হলেও লোদী স্থাপত্যকীর্তি অব্যাহত থাকে এবং এর প্রমাণ জামালী মসজিদ।

জামালী মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ১২০ ফুট এবং প্রস্থে ২৭ ফুট। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত এর উচ্চতা ৩২ ফুট এবং ছাদ থেকে গম্বুজের শীর্ষ পর্যন্ত ১০ ফুট। মত্‌কী মসজিদের সঙ্গে এ মসজিদের সাদৃশ্য রয়েছে পূর্বের মসজিদের মতো। এতে লিওয়ানে প্রবেশের জন্য পাঁচটি খিলানপথ রযেছে। মধ্যভাগের প্রধান খিলানটি ২ ফুট পর্যন্ত গভীর, ৩০ ফুট এবং ১৫ ফুট চওড়া। খিলানের উভয় পার্শ্বে (spandrel) প্লাস্টারের নক্‌শা দেখা যাবে এবং মধ্যভাগে গোলাকার পিণ্ড (boss) রয়েছে। খিলানের চারপাশে মার্বেল এবং লাল বেলেপাথরের যে আয়তাকার ব্যান্ড রয়েছে তা সুন্দর ও সুচারুরূপে নির্মিত। পার্শ্ববর্তী খিলানসমূহ ১২ ফুট উচ্চ এবং ১০ ফুট প্রশস্ত।

জামালী মসজিদটিতে বেলেপাথরের মেঝে দেখা যাবে। ছাদে তিনটি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। প্রধান গম্বুজটি অন্যান্য গম্বুজ অপেক্ষা বৃহত্তর। মধ্যবর্তী গম্বুজটি অষ্টকোণাকার এবং পরে পেনডেনটিভের সাহায্যে নির্মিত। মসজিদের সাহানের পরিমাপ ১২০ ফুট × ৭০ ফুট। মসজিদের পূর্বদিকে একটি ফটক রয়েছে যা সম্ভবত পরে সংযোজিত হয়েছে। প্রধান ফটক দক্ষিণদিকে নির্মিত হয়। জামালী মসজিদের কিবলা-প্রাচীরে পাঁচটি মিহরাব আছে। প্রধান মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর এবং একটি মিমবার দেখা যাবে।। এই মসজিদের গুরুত্ব উল্লেখ করে ব্রাউন বলেন, "This mosque, although in treatment and technique is an advance on all previous structures of its kind, was in itself merely a preparation for the fourth and last mosque of the series the Qila Kuhna Masjid in the Purana Qila at Old Delhi."

পরিশিষ্ট

ইউরোপীয় স্থাপত্যে মুসলিম শিল্পকলার অবদান

বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, ভৌগোলিক সীমারেখাগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইসলাম বিশ্বের সমস্ত মুসলমানকে একটি ধর্মীয় বিশ্বাসে আবদ্ধ করে একতাবদ্ধ করেছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশের কৃষ্টির মধ্যে স্থানীয় প্রভাবজনিত প্রভেদ থাকা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে সার্বজনীন রূপ গ্রহণ করে তা যে-কোনো সভ্যতার সমতুল্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যুৎকৃষ্টও বটে। ইসলাম বিশ্বসভ্যতায় অসামান্য অবদান রেখেছে। শিক্ষা, দীক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সঙ্গীত ছাড়াও স্থাপত্যকলায় মুসলিম অবদান খুবই জ্বাজ্বল্য এবং যুগান্তকারী। ইসলামী স্থাপত্যকলা যে দেশেই উৎকর্ষ লাভ করুক না কেন বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং অতুলনীয় উপাদানের যে সাদৃশ্য ও সার্বজনীন রূপ দেখা যায় তার ফলেই ইসলামী স্থাপত্য অন্যান্য স্থাপত্যশৈলী থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে ধরা পড়েছে। একটি মসজিদকে কেউই গির্জা, হিন্দুমন্দির, মঠ, বৌদ্ধবিহার, ইহুদিদের সিনেগগ বলবেন না, কারণ, মসজিদ এমন কতকগুলো উপাদানের সমষ্টি যা সহজেই নজরে পড়ে—খিলান, গম্বুজ, ভল্ট, স্থাপত্যকৌশলের দিক থেকে অথবা অলঙ্করণের ব্যবহারে আরাবেস্ক, মুকারনাস, মিনার, মাসরাবিয়া, মিনাকরা টালি, আরবী হরফের বিচিত্র সমাবেশে শিলালিপি ইত্যাদি।

মসজিদকে স্থাপত্যের একটি অভিনব রীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এর প্রভাব বিশ্বের সর্বত্র লক্ষ করা যায়। বিমূর্ত অলঙ্করণ এই রীতিকে মহিমামণ্ডিত করেছে। মসজিদের এই টাইপ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশেই অনুসৃত্ হয়নি, বহু অমুসলমান দেশেও এর স্থাপত্যিক প্রয়োগ হয়েছে নিছক আলঙ্কারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে মুসলিম সভ্যতার সঙ্গে ইউরোপীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সংযোগ ঘটে। বিশেষ করে স্পেন, সিসিলি, পূর্ব ইউরোপ ইসলামের পতাকাতলে আসার পর খ্রীস্টান এবং মুসলিম সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান শুরু হয়, বিশেষ করে স্থাপত্যে। নিজস্ব ছকে ইউরোপীয় স্থাপত্যের ধারা অব্যাহত থাকলেও মুসলিম স্থাপত্য ও কারুশিল্প ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ইমারত ও স্থাপত্যিক অলঙ্করণে বিশেষ অবদান রেখেছে।

মুসলিম স্থাপত্যিক অলঙ্করণে সর্বাপেক্ষা অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছে আরবী নক্শা (arabesque)। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় কারুশিল্পীগণ মুসলিম নক্শাকলার অপূর্ব লালিত্য এবং মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে অনুকরণ করেন। ফলে ইউরোপীয় স্থাপত্যের রোমানেস্ক থেকে গথিকের উত্তরণ এবং তা থেকে রেনেসাঁ পর্যায়ে যে ধারা প্রবর্তিত হয় তাতে ইসলামী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রেনেসাঁ যুগের শিল্পীগণ এমন কি লিওনার্দো দা ভিঞ্চি প্রাচ্যদেশীয় নক্শার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর স্কেচবইতে যে ধরনের নক্শা দেখা যায় তার পূর্বসূরী হচ্ছে দ্বাদশ শতাব্দীতে মরক্কোর রাবাতে সুলতান হাসানের মিনারে জড়ানো নক্শা (Interpaced design)। এ ধরনের জটিল জ্যামিতিক নক্শা পরবর্তীকালে Francesco di Pellegrnie, Peter Flotner, Virgil Soils এবং অন্যান্য শিল্পীর প্যাটার্ন বই সৃষ্টির সহায়ক ছিল। Christie বলেন, "It is instructive to turn to the designs by Holbein in whose drawings for silversmiths and workers in other crafts, Muslim inspirations are skilfully welded into an original style."[১] বিস্ময়ের কথা যে, রেনেসাঁ শিল্পী ও কারিগরেরা জ্যামিতিক নক্শার সঙ্গে লতাপাতা ফুলের সমন্বয়ে যে মোটিভ তৈরি করেন তা পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত ভেনিসের S. Maria dei Miracoli গির্জার প্যানেলে দেখা যাবে।[২] এমনকি এলিজাবেথীয় ইংল্যান্ডে নতোন্নত খোদাইকাজে (low relief) অ্যারাবেস্ক ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিশেষ করে অ্যারাবেস্ক একধরনের নক্শাকে (diaper work) বোঝায়।[৩] রেনেসাঁ যুগে ইতালিতে এবং র‍্যাফায়েলের শিল্পকর্মে অ্যারাবেস্কের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।[৪] এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, "As a striking feature of Arab architecture arabesque exhibits so much skill in design and so nice a taste and gracefulness that even if all this be regarded as effects of imitation, the Arabs must be held to have attained perfection in this branch."[৫]

১০৭২ সালে নরমানদের দ্বারা সিসিলি বিজয়ের পূর্বে রাজধানী পালের্মোতে ৩০০ মসজিদ নির্মিত হয়। এ দ্বীপের স্থাপত্য ও কারুশিল্পে বায়জানটাইন এবং মুসলিম স্থাপত্যের উপাদানের সংমিশ্রণ দেখা যায়। ১১৪৫ খ্রীস্টাব্দে ইবন যুবাইর যে Martorana গির্জা পরিদর্শন করেন তার কারুকলা ফাতেমীয় শিল্পরীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। Jairazbhoy বলেন, "He (Ibn Zubayr) did not notice, however, that the timber door was carved with floral arabesques in

১। Quoted by M. S. Briggs in Architecture, in the Legacy of Islam, ed. by T Arnold and A. Guillaume, O.U P. 1931. P. 150. (LI)

২। Flectcher, B., A History of Architecture, New York, 1951. pp. 731, 1257. (HA)

৩। LI, PP. 175, 179.

৪। HA, P 802

৫। Qader and Hasan, Impact of Muslim Architecture on European Architecture, Shilpakala, 1978, p. 39.

the Fatimid style and that there was (and still is) an Arabic inscription below the cupola spelling out a Byzantine hymn."[১] কেবলমাত্র স্থাপত্যিক অলঙ্করণেই নয়, পাণ্ডুলিপির চিত্রেও অ্যারাবেস্কের প্রভাব দেখা যায়। ১৪৭৪-৭৫ সালে ফ্লোরেন্সে Gherard de Giovanni কর্তৃক অঙ্কিত Annunciation-এ প্রাচ্যের নক্‌শা বৈচিত্র্য অর্থাৎ অ্যারাবেস্ক ব্যবহৃত হয়েছে।[২] এইচ. জি. ওয়েলস উল্লেখ করেন যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত সেন্ট মার্কের গির্জা ভিনিসীয় লোম্বার্ড এবং প্রাচ্যদেশীয় শিল্পী কারিগরের প্রচেষ্টায় সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয়েছিল।[৩]

গম্বুজ নির্মাণে মুসলিম স্থপতি চাতুর্য ও অভিনবত্ব প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন। রোমে গম্বুজ নির্মিত হলেও মুসলিম স্থাপত্যে গম্বুজ প্রাচ্যদেশীয় অর্থাৎ এশিয়া মাইনর অথবা ব্যাবিলন থেকে অনুকরণ করা হয় এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকৃতি ধারণ করে। মুসলিম স্থাপত্যে গম্বুজে কৌণিক আকৃতি বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে এবং পেঁয়াজ (onion) বাল্ব (bulb) প্রভৃতি আকৃতি বহুলপ্রচলিত। উল্লেখ্য যে, মুসলিম স্থপতিকগণ বিশ্বের সর্ববৃহৎ গম্বুজনির্মাণে সক্ষম হন। এই গম্বুজ দেখা যাবে বিজাপুরে সুলতান মুহম্মদ আদিল শাহের সমাধিতে। সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই সমাধির গম্বুজটি সম্বন্ধে ব্রাউন বলেন, "It is considerably larger (18,000 sq. feet), in area than the Pantheon at Rome which measures 15,833 square feet so that the Gol Gumbaz may claim to be the largest domical roof in existence."[৪] উল্লেখ্য যে, গোল গম্বুজের ব্যাস হচ্ছে ১৪৪ ফুট, অপরদিকে প্যানথিয়নের গম্বুজের ব্যাস হচ্ছে ১৪৩ ফুট।[৫]

গম্বুজ নির্মাণে স্কুইঞ্চের ব্যবহার প্রথম প্রচলিত হয় সাসানীয় প্রাসাদ ফিরোজাবাদে চতুর্থ শতাব্দীতে। পোপের মতে, সাসানীয় উপাদান বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। তাঁর ভাষায়, "it was from then on richly developed and widely disseminated throughout Armenia, Syria, Byzantine, reaching Europe as Central Asia."[৬] মুসলিম স্থাপত্যের গোড়া থেকেই পেনডেনটিভ এবং স্কুইঞ্চ ব্যবহৃত হয়ে আসছে : সামাররার 'বাবুল আম্মা' প্রাসাদ, ইসফাহানে ও আরদিসতানের মসজিদে স্কুইঞ্চের যে প্রয়োগ দেখা যায় তা পরবর্তী পর্যায়ে ইউরোপীয় স্থাপত্যে প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইতালির পাভিয়ার S. Michele (দ্বাদশ শতাব্দী) এবং সীয়েনার গির্জা (চিত্র ৪৯) (ত্রয়োদশ শতাব্দী)।

১। Jairozbhoy, R A. Influence of Islamic Arcitecture on Western Europe, Arts & the Islamic World, I. No. 1, Winter, 1982-83, p. 28.

২। Gombrich, E.H., the Story of Art. London, 1906 pp. 187, 194.

৩। Burns, Western Civilization, p. 411.

৪। Brown, P., Indian Architecture Islamic Period p. 77.

৫। Great Architecture of the World, p.72.

৬। Pope, Av, Some Interrelations between Persian and Indian Architecture, Indian Art and Letters, vol ix, No. 2 p. 14.

স্কুইঞ্চের একটি অতি আকর্ষণীয় ব্যতিক্রম হচ্ছে স্টালাকটাইট। মিশরের মসজিদে, বিশেষ করে আল-যুয়ুশীর মসজিদের (১০৮৬ খ্রীঃ) মিনার এবং আল-আকমারের মসজিদের (দ্বাদশ শতাব্দী) সম্মুখভাগে স্টালাকটাইট দেখা যাবে। ঝিনুকের মালার মতো ক্ষুদ্রাকৃতি কুলুঙ্গী দ্বারা স্টালাকটাইটের ব্যবহার রেনেসাঁ যুগের বহু ইমারতের ঝিনুকাকৃতি কুলুঙ্গীতে (shell niche) প্রতিফলিত। ভারতউপমহাদেশ, স্পেন এবং সিসিলিতে এর সার্বজনীন প্রয়োগ দেখা যাবে। মৌচাকের মতো স্টালাকটাইটের দৃষ্টান্ত রেনেসাঁ যুগের বহু খ্রীস্টান ইমারতে রয়েছে, যেমন ভেনিসের পাল করনারোর (Pal Cornaro) গির্জার কুলুঙ্গী এবং ফ্লোরেন্সের জাতীয় জাদুঘর (পঞ্চদশ শতাব্দী)। গম্বুজ অর্ধগোলাকৃতির পরিবর্তে মুসলিম প্রভাবে কৌণিক আকৃতি ধারণ করে। ভেনিসের সেন্ট মার্কের গির্জার (চিত্র-৫০) (১০৪২-৮৬ খ্রীঃ) গম্বুজে প্রাচ্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পিসার ক্যাথেড্রালের (একাদশ শতাব্দী) গম্বুজও কৌণিক। Pevsner-এর মতে, "Pisa strikes one altogether as of rather an alien character-oriental more than Tuscany."[১] বাল্বের আকৃতিতে নির্মিত ডোম খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং তুশের আমির তৈমুরের গম্বুজ দিল্লী, আগ্রা এবং লাহোরের মুঘল ইমারতসমূহের বাল্ব আকৃতির (চিত্র ৫১) (bulbous) গম্বুজ দেখা যাবে। জন ন্যাশ কর্তৃক ব্রাইটনে নির্মিত রাজকীয় প্রাসাদের (Royal Pavilion : ১৮১৫-২১ খ্রীঃ) গম্বুজে (চিত্র ৫১) নিঃসন্দেহে মুঘল গম্বুজের অনুকরণ লক্ষ করা যায়। ভারত উপমহাদেশ মধ্য-এশিয়া এবং পারস্যে পেঁয়াজের (onion) আকৃতিতে অসংখ্য গম্বুজ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ধারণা করা যায় যে, মস্কোর রেড স্কোয়ারে স্থাপিত St. Basil Cathedral (১৫৫৫-৬০ খ্রীঃ)-এর গম্বুজগুলো মুসলিম ইমারতে ব্যবহৃত পেঁয়াজের আকৃতির অনুকরণ। এমনকি সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্যারক স্টাইলে নির্মিত ইমারতেও এর প্রভাব রয়েছে, যেমন ভেনিসের S. Maria della Salute। গম্বুজনির্মাণে মুসলমান স্থপতির অসামান্য দক্ষতার কথা গোল গম্বুজ প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হয়েছে। পোপ মন্তব্য করেন, "This is architecturally the Supreme Creation, the world's largest dome if measured by the enclosed space and one of the best constructed measured by any standard."[২] একটি আচ্ছাদন ছাড়া মুসলমানগণ দ্বি-গম্বুজ অর্থাৎ পরপর দুটি পৃথক আচ্ছাদনের ছাদ নির্মাণের কৌশল সর্বপ্রথম কুব্বাতু'স সাখরায় প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তীকালে রোমের সেন্ট পিটার (১৫০৬-১৬৬২ খ্রীঃ) এবং লন্ডনের সেন্ট পল (১৬৭৫-১৭১০ খ্রীঃ) গির্জায় ডবল ডোমের ব্যবহার দেখা যায়।

কৌণিক খিলানের সার্বজনীন ব্যবহারের ফলেই গথিক স্থাপত্যরীতির উদ্ভব হয়েছে। সিরিয়ার কাসর-ই-ওয়ারদানে (৫৬১-৬৪ খ্রীঃ) সর্বপ্রথম কৌণিক খিলান ব্যবহৃত হলেও মুসলিম স্থাপত্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়। ক্রেসওয়েল বলেন, "The occurrence of pointed arch at Qusayr Amra and

---

১। Pevsner, N., An Outline of European Architecture, London, 1943, p. 83.

২। Pope, Interrelations, p. 15.

Hammam-ash Sarakh is proof of the priority of the East for no European examples are known until the end of the eleventh or the beginning of the twelfth century."[১] দামেস্কের মসজিদে সর্বপ্রথম কৌণিক খিলানের ব্যবহার দেখা যায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে কায়রোতে নির্মিত ইবনে তুলুনের মসজিদে এই নির্মাণকৌশল (unit of construction) সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা হয়। লেনপুল বলেন যে, ইবনে তুলুনের মসজিদে কৌণিক খিলানের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ভাষায় "the first example of the universal employment of pointed arch throughout a building 300 years before the adoption of the pointed sytle (Gothic) in England."[২] (চিত্র ৫৩) গথিক স্থাপত্যে মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাব স্বীকৃত এবং এই প্রভাব লক্ষ করা যাবে কৌণিক খিলান, খাঁজকাটা খিলান, জালির জানালা, অ্যারাবেস্ক ইত্যাদিতে।[৩] ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবের নির্মাতা ক্রিস্টোফার রেনের মতে, "This we now call Gothick Manners of Architecture the the Goths were rather Destroyers than Builders : I think it should with more Reason be called the Saracen style : for those people wanted neither arts nor Learning."[৪]

ইউরোপীয় স্থাপত্যে কৌণিক খিলানের প্রচলন হয় একাদশ শতাব্দীতে। ১০৬৬-৭১ খ্রীস্টাব্দে Abbot Desiderius-এর পৃষ্ঠপোষকতায় মন্টে ক্যাসিনোর মঠে সর্বপ্রথম কৌণিক খিলানের আবির্ভাব ঘটে। দক্ষিণ ইতালির আমালফি শহরের সঙ্গে মুসলিম প্রাচ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল এবং সম্ভবত আমালফির স্থপতিগণ মন্টে কার্সিনোর মঠে কৌণিক খিলান নির্মাণ করেন। অ্যাবট হিউজ মন্টে ক্যাসিনো পরিদর্শনকালে কৌণিক খিলানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং সেখান থেকে মধ্য ফ্রান্সের ক্লুনীতে (১০৮৮-৯৫ খ্রীঃ) এই ধরনের খিলান প্রয়োগ করেন। কৌণিক খিলানের সাহায্যে ইউরোপের গির্জাগুলো দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত নির্মিত হয় এবং এই স্থাপত্যরীতি গথিক নামে অভিহিত হয়। স্পেন ও সিসিলির মাধ্যমে কৌণিক খিলান ইউরোপে প্রবর্তিত হয়। Hoar বলেন, "It first appeared in Sicily in famous Zisa in Palermo (c 1154-65 A.D.), half-palace and half-fortress. Its high wide facade with pointed arches and the central hall with its fountain and Arab stalactite cupola derived from its Arab builders who gave it the name El-Aziza (hence La Zisa or Palace of Delight.)"[৫] নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গ্রানাডায় নির্মিত আল-হামরা অথবা Red Palace-এর প্রভাব (চিত্র ৫৪-৫৫) La-Zisa প্রাসাদে লক্ষণীয়। ফ্রান্সের গথিক গির্জায় কৌণিক খিলান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর নিদর্শন দেখা যাবে

১। Creswell, A Short Account, p. 102-13.
২। Lanepoole, The Art of the Saracens in Egypt, London,1894, p. 54.
৩। Burns. p. 304.
৪। HA. p. 1251.
৫। Hoar, F., European Architecture, London, 1967, p. 85

প্যারিসের নতরদ্যাম গির্জা (১১৬০-১২২৫ খ্রীঃ), অ্যামেন্সের গির্জা (১২২০-৮৮ খ্রীঃ), স্ট্যাসবুর্গের গির্জায় (১২৩০-১৩৬৫ খ্রীঃ)। ফ্রান্স থেকে জার্মানিতে গথিক স্থাপত্য প্রসারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ মারবুর্গ, কোলন এবং আগসবার্গের গির্জার নাম উল্লেখ করা যায়। কিন্তু ইংল্যান্ডে গথিক স্থাপত্যের উল্লেখ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ফ্লেচার বলেন, "The vault over the nave of the Durham Cathedral (1128-34 A.D.) has pointed transverse ribs which are believed to be the earliest examples of a pointed arch to a high vault in England."[১] কৌণিক খিলানের উপর ভিত্তি করে গথিক স্থাপত্যরীতির দৃষ্টান্ত দেখা যাবে লিনকন (১১৯২-১২০০ খ্রীঃ) পিটারসবারা (১১৯৩-১২৩০ খ্রীঃ), ওয়েলস (১২০৬-৪১ খ্রীঃ) এবং সলসবেরিতে (১২২০-৬৫ খ্রীঃ)।

কৌণিক খিলান ছাড়াও চার বিন্দু থেকে সৃষ্ট 'পারস্য খিলান' (four centred arch) যা রাক্কার বাগদাদ ফটকে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং নায়িন মসজিদ ও কায়রোর আল-আযহার মসজিদে পুনর্রাবৃত্তি ঘটে, খ্রীস্টান ইউরোপে অনুপ্রবেশ করে। (চিত্র ৩২-৩৩) বিশেষ করে স্পেন, সিসিলি এবং উত্তর আফ্রিকার মধ্য দিয়ে মুসলিম উপাদান পশ্চিমাঞ্চলে যায়। ইংল্যান্ডের টিউডর (Tudor period, A.D. 1485-1558 A.D.) যুগে বিশেষভাবে অক্সফোর্ডের Christ Church হলে (ষোড়শ শতাব্দী) এবং ওয়ার-উইক্সায়ারে Compton Wynyates প্রাসাদে (১৫২০ খ্রীঃ) চার কেন্দ্র থেকে সৃষ্ট খিলান দেখা যাবে। এ ছাড়া অশ্বনালাকৃতি খিলানের যে বহুলব্যবহার উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেনে সার্বজনীন রূপ লাভ করে, তা টলেডোর Puerta del Sol প্রাসাদে (পঞ্চদশ শতাব্দী) দেখা যাবে। পারস্য ও ভারত উপমহাদেশের বহু ইমারতে 'Ogee' খিলানের খুবই স্পষ্ট প্রয়োগ হয়েছে এবং পরবর্তীকালে তা ইউরোপীয় স্থাপত্যে অনুপ্রবেশ করে বিশেষ অলঙ্করণরীতিতে পরিণত হয়, যেমন– ভেনিসের সেন্ট মার্কের গির্জা (পঞ্চদশ শতাব্দী) (চিত্র ৫০) এবং চিচেস্টারের (ইংল্যান্ড) Market Cross-এ (ষোড়শ শতাব্দী)।[২] খিলান প্রসঙ্গে বলা যায় যে ত্রিপত্র (trefoil), বহুখাঁজ (multifoil) খিলান ইউরোপীয় স্থাপত্যকীর্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সমস্ত উপাদানের প্রয়োগে প্রচ্ছন্ন মুসলিম প্রভাব লক্ষ করা যায়। Hoar বলেন, "Islamic influence is seen in the Church of S. Michel d' Aiguilhe at Le-Puy, where strong and vivid geometrical patterns lend an oriental flavour to the indigeneous style."[৩] ত্রিপত্রবিশিষ্ট খিলান Le Puy-এ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমনভাবে বহুখাঁজবিশিষ্ট খিলান দেখা যাবে ইংল্যান্ডের সলসবেরী, (চিত্র ৫৩) নরফোক এবং ওয়েলসের গির্জাসমূহে। Viardot মন্তব্য করেন, "I saw multifoil arch of the Mosque of Cordova in the cloisters of the Church of Norwitch (Norfolk)." বহুখাঁজবিশিষ্ট খিলানের বহুলব্যবহার দেখা যাবে ওয়েলসের

১। HA., p. 397.
২। Ibid, pp. 286, 483.
৩। Hoar, p 54.

এবং সলসবেরীর গির্জার প্রবেশপথে; উপরন্তু ফ্রান্সের La Souterraine গির্জায়ও এর প্রয়োগ দেখা যায়।

খিলান ব্যতীত শিরাযুক্ত ভল্টের (ribbed vault) প্রভাব ইউরোপীয় স্থাপত্যে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে গথিক স্থাপত্যরীতির উৎকর্ষে। হিট্টি[১] বলেন, "Another contribution of Arab Cordova which was truly original was the system of vaulting based on intersecting arches and visible interesecting ribs." (চিত্র ৫৪) কর্ডোভা মসজিদের শিরাযুক্ত ভল্টের প্রভাবে ফ্লোরেন্সের সেন্ট লরোঞ্জোর গির্জার (১৬৬৬ খ্রীঃ) ছাদ নির্মিত হয়েছে বলে Pevsner মন্তব্য করেন, "At S. Lorengo for instance arches and balconies swing forward into the central space, which is crowned by a dome. For the dome Guarini invented (or took over from the Mohammedan Mosque of Cordova) an eight cornered star of ribs flowing forward and backward and crossing on their way."[২] পারস্য মসজিদে যে ধরনের কৌণিক ভল্টের ব্যবহার দেখা যায় সেরূপ আটুনের গির্জা (১১১৯-৩২ খ্রীঃ), অভিগননের নটরডাম গির্জায় (একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর) প্রয়োগ করা হয়। রোমানেস্ক স্থাপত্যের ogival vault বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে এবং মনে করা হয়ে থাকে যে, ইসফাহান অথবা কর্ডোভার মসজিদের ভল্টের প্রভাব এতে খুবই প্রকট। রোমানেস্ক যুগে নির্মিত ফ্রান্সের ভ্যাসিলীতে নির্মিত Sainte Madeleine গির্জায় এবং গথিক স্থাপত্যকীর্তি, যেমন— ডারহাম এবং সলসবেরী গির্জায় শিরাযুক্ত ট্যানেল-ভল্টের দৃষ্টান্ত খুবই আকর্ষণীয়।

ইউরোপীয় সামরিক স্থাপত্যে, বিশেষ করে বহু দুর্গে মুসলিম প্রভাব প্রকটভাবে দেখা যায়। ক্রুসেডের সময় খ্রীস্টানগণ সিরিয়া, মিশর এবং আর্মেনিয়ায় নির্মিত দুর্গগুলোর বিভিন্ন উপাদান দেখে মুগ্ধ হন এবং ইউরোপে ফিরে গিয়ে তাঁদের দুর্গে সেগুলো প্রয়োগ করেন। Prut-এর ভাষায়, "Arabic influence may be traced in the disposition of the different parts of the fortresses in addition of parts unknown to the older military architecture of the West and in a number of new methods of defence made necessary by the technique of siege tactics developed in the East."[৩] মুসলিম দুর্গস্থাপত্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন উপাদান–বাঁকা প্রবেশপথ (bent entrance), অলঙ্কৃত প্যারাপেট (crenellated parapet) বৃত্তাকার পরিকল্পনা প্রভৃতি।

সামরিক স্থাপত্যে প্রযোজ্য অসংখ্য উপকরণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শত্রুদের ধ্বংস করার জন্য দুর্গপ্রাচীরের ছিদ্র বা ফোকল থেকে তীর, গোলা বা প্রস্তর-

১। Hitti, p. 597.

২। Pevsner, p. 262, pl. 189.

৩। Pruts, H. see legacy of Islam, pp. 51–58.

নিক্ষেপের ব্যবস্থা, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Machicolation। ক্রেসওয়েল বলেন যে, মুসলমানদের কাছ থেকে ক্রুসেডারগণ এই উপকরণ অনুকরণ করেছে। ৭২৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত কাসরুল হাইর এবং দশম শতাব্দীতে স্থাপিত বাবুন নাসর (কায়রো)-এ machicolation ব্যবহৃত হয়েছে এবং অনুরূপ উপাদান ইউরোপীয় দুর্গেও দেখা যাবে, যেমন, ফ্রান্সের Chateau Gaillard (১১৮৭ খ্রীঃ), Chatillon (১১৮৬ খ্রীঃ), Avignon (চতুর্দশ শতাব্দী) এবং ইংল্যান্ডের নরউইচ (১১৮৭ খ্রীঃ), উইনচেস্টার (১১৯৩ খ্রীঃ), ওয়ারউইক (১৪০০ খ্রীঃ)-এ রোমীয় অথবা বায়জানটাইন স্থাপত্যে বাঁকানো প্রবেশপথ (crooked entrance) সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। বাগদাদের গোলাকার শহরে যা মদিনাতুস সালা'ম-এ ধরনের প্রবেশপথ নিরাপত্তার জন্য নির্মিত হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে সালাহউদ্দীন আয়যূবী কর্তৃক কায়রোতে নির্মিত দুর্গ (১১৭৬ খ্রীঃ) এবং আলেপ্পোর দুর্গেও বাঁকানো প্রবেশপথ ছিল। ইউরোপীয় দুর্গের অনুরূপ প্রবেশদ্বারে মুসলিম প্রভাব লক্ষণীয়। ব্রিগসের ভাষায়, "Another feature in military architecture borrowed from Egypt and Syria was the 'right angled', or 'crooked' entrance to a fortress through a gateway in the walls."[১] ইংল্যান্ডের Beamaris (১২৮৩-১৩২৩ খ্রীঃ), Anglesey এবং Warkworth Castle (পঞ্চদশ শতাব্দী) ও ফ্রান্সের Carcassonne (ত্রয়োদশ শতাব্দী) ও Avignon (চতুর্দশ শতাব্দী) দুর্গে বাঁকানো প্রবেশপথের প্রয়োগ দেখা যায়।

দুর্গে দুটি পরপর বৃত্তাকার প্রাচীর দ্বারা বেষ্টনীর মূলে ছিল নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুসংহত করা। বাগদাদ দুর্গে সর্বপ্রথম এই ব্যবস্থা প্রচলিত হয় এবং ফ্লেচার মনে করেন যে, লন্ডনের দুর্গে (Tower of London) (১০৮৬-৯৭ খ্রীঃ) মুসলিম প্রভাব দেখা যাবে। তাঁর ভাষায়, টাওয়ার অব লন্ডনে "concentric castle with sucsessive lines of fortification based on Muslim models."[২] কায়রো থেকে সুদূর ইতালিতে অলঙ্কৃত প্যারাপেটের ধারণা আনীত হয় এবং ইবনে তুলুনের মসজিদের প্যারাপেট ভেনিসের 'Palazzo cad' Oro (১৪২৪-৩৬ খ্রীঃ) সহজেই লক্ষ করা যায়।[৩]

রেনেসাঁ যুগের Campanile অথবা পালের্মোর গির্জার বুরুজে মিনারের প্রভাব রয়েছে। উত্তর আফ্রিকায় এবং স্পেনে উমাইয়া যুগে চতুষ্কোণাকার যে মিনার প্রবর্তিত হয় তারই অনুকরণে ইউরোপের গির্জার ঘণ্টা বুরুজ (bell tower) নির্মিত হয়েছে। স্পেনের Giralda (সেভিল) (১১৮৪-৯৬ খ্রীঃ) (চিত্র ৩১) এবং রাবাতের মসজিদের চতুষ্কোণাকার বুরুজ পালের্মোর La Ziza বুরুজ (১১৫৪-৬৬ খ্রীঃ), ভেনিসের Torre del. Commune (১১৭২ খ্রীঃ), ফ্লোরেন্সের Sienna Cathedral (১২১৬-১৩৮০ খ্রীঃ) প্রভৃতি গির্জার টাওয়ারের পূর্বসূরী। ইংল্যান্ডের বহু গির্জা-বুরুজে অক্সফোর্ডের

১। LI, p 168
২। LI, p.38. PL 36.
৩। LI, p. 166.

Magdalen College (১৪৫০ খ্রীঃ), মানচেস্টারের S. Mary (পঞ্চদশ শতাব্দী), লন্ডনের S. Maryle Bow (১৬৭১-৮৩ খ্রীঃ) চতুষ্কোণাকার টাওয়ারে মুসলিম প্রভাব দেখা যায়। ব্রিগসের মতে, "It seems possible that Muhammadan minarets of the graceful type found, especially in Cairene buildings of the fourteenth and fifteenth centuries may have influenced the design of the later Renaissance Campanile of Italy and hence some of Wren`s fine city steeples".[১]

আল-হামরায় অনিন্দ্যসুন্দর খিলানাকৃতি যে পর্চনির্মিত হয়েছে তার প্রভাব সিসিল, স্পেন এবং ইতালির বহু খ্রীস্টান ইমারতে লক্ষণীয়। Braun বলেন, "Throughout the medieval period Muslim civilization was far in advance of the Christian and the architects of the latter were only too glad to learn from their colleagues."[২] যে সমস্ত প্রাসাদে মুরিশ, গথিক এবং রেনেসাঁ প্রভাবের সংমিশ্রণ ঘটছে সেগুলো হচ্ছে ভেনিসের The Doge`s (Duke) Palace, Valladolid Gi College deiosan Gregoriot। ফ্লেচার মন্তব্য করেন, "The Patio (the Al-cazar), Toledo, the Patio (1537–53), or Spanish version of the Roman atrium and Italian cortile is universal in houses and is given even greater seclusion doubtless due to Moorish influence."

পিয়ারের চার কোণায় যে সংলগ্ন স্তম্ভ ব্যবহারের প্রচলন করেন মুসলিম স্থপতিগণ সামররা এবং ইবনে তুলুন মসজিদে তার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। মুসলিম উপকরণের অনুকরণে রোমানেস্ক যুগের ফ্রান্সে S. Madeleine, Veziley, (১০৮৯-১২০৬ খ্রীঃ), গথিক গির্জা (Cathedral, Amiens, ১২২০-৮৮ খ্রীঃ) এবং ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডের Christ Church (১১৫৮-৮০ খ্রীঃ), স্পেনের Leon Cathedral, (১২৫৫-১৩০৩ খ্রীঃ) ইতালির Sienna Cathedral (১২২৬-১৩৮০ খ্রীঃ)-এ সংলগ্ন স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রিগস বলেন, "The use of engaged shafts at the angels of piers so important in the history of Gothic vaults is a Saracen innovation of the eighth or ninth century."[৩]

স্থাপত্যকৌশল, রীতি ও পদ্ধতি ছাড়াও মুসলিম প্রভাব ইউরোপীয় স্থাপত্য ও কারুশিল্পে পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করে অলঙ্করণের মাধ্যম ও মোটিভ হিসেবে। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, রোমানেস্ক, গথিক, রেনেসাঁ, এমনকি ব্যারক যুগের বহু ইউরোপীয় ইমারতে মুসলিম অলঙ্করণের ছাপ খুবই স্পষ্ট। যে সমস্ত কৌশল ও রীতি অলঙ্করণে প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে তা হচ্ছে অ্যারাবেস্ক,খাঁজকাটা খিলানশ্রেণীর জালির জানালা (lattice), করাতের দাঁতের অনুরূপ প্রাচীরের উপরভাগ (battlement), কালো এবং লাল রঙের পাথরের পর্যায়ক্রমে ব্যবহারে ভূসুয়ার্সের

১। LI. p. 174.
২। Braun, Architecture, p. 323.
৩। HA, Pls. 499, 5157

পদ্ধতিতে খিলান নির্মাণ, স্টাকোর শিলালিপি, মিনাকরা টালি, আলঙ্কারিক লিপিমালা, রঙিন গ্লাসের ব্যবহার; 'মাসরাবিয়া' অর্থাৎ কাঠের জালি-জানালা বহুখিলানবিশিষ্ট নক্‌শা বা stalactite (চিত্র-৫৬) ইত্যাদি।

খাঁজকাটা খিলানশ্রেণীর যে প্রয়োগ সেভিলের Giralda-তে দেখা যাবে তা গথিক নক্‌শায় পূর্বসূরী। অক্সফোর্ডের মারটন কলেজের Sedilia অর্থাৎ ধর্মযাজকের বেদী (১২৭৪ খ্রীঃ), লেচফিল্ডের গির্জার জানালা (১১৮৯-১৩০৭ খ্রীঃ) এবং এভারশামের ঘণ্টা-বুরুজের (Bell Tower) (১৫৩৩ খ্রীঃ) দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে খুবই প্রাসঙ্গিক। জেনানামহলকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার জন্য সৃষ্টি করা হত কাঠের অপূর্ব জ্যামিতিক নক্‌শাখোদিত জালির জানালা। এ ধরনের মোটিভ রানী এলিজাবেথের (১ম) সময়ের তরবারির খাপে দেখা যাবে। ফ্লেচার বলেন, "The dainty wooden mashrabiyyah of Muslim houses was copied in metal on several grills of English Churches."[১] মুসলিম ইমারতে ব্যবহৃত করাতের দাঁতের অনরূপ প্যারাপেট যা ইবনে তুলুনের মসজিদে দেখা যাবে, উত্তরসূরী হিসেবে ভেনিসের Palazzo Ca d' Oro (১৪৩১ খ্রীঃ) এবং নরফোকের Cromer Church (পঞ্চদশ শতাব্দী)-এর উল্লেখ করা যায়। জেরুজালেমের ডোম অব দি রকের খিলানগুলো কালো এবং লাল রঙের মার্বেলপাথর দিয়ে সৃষ্ট এবং এর ফলে যে অসাধারণ বৈচিত্র্য দেখা যায় তার প্রতিফলন পরবর্তী পর্যায়ে কায়রোয়ান মসজিদে (নবম শতাব্দী) এবং কর্ডোভা মসজিদেই শুধু নয়, বহু ইউরোপীয় স্থাপত্যকীর্তিতেও দেখা যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় পিসার S. Maria della Spina (১৩২৩ খ্রীঃ), সিনার গির্জা (১২২৬-১৩৮০ খ্রীঃ), ফ্লোরেন্সের S. Maria Novella (১৪৫৬-৭০ খ্রীঃ), ফ্রান্সের Auvergne-র Lee Puy গির্জা এবং ইংল্যান্ডের নরদামটনের সেন্ট পিটার গির্জা।

স্টাকোর অলঙ্করণে মুসলিম প্রভাব অনস্বীকার্য। স্পেন ও সিসিলিতে বহু ইমারত নির্মিত হয়েছে যার অলঙ্করণে স্পষ্টত মুসলিম নক্‌শারীতির ছাপ রয়েছে। পালের্মোর Capella Palatina (চিত্র ৫৭) এবং Monareale Cathedral (১১৭৬-৮২ খ্রীঃ) জটিল জ্যামিতিক নক্‌শা মুসলিমরীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জায়রাজবয় বলেন, "The courtyard of a house in Seville called Casa de Pilators (begun 1492) reflects the style of the Alcazar of Seville although the stucco and tile work are some what prime and mechanical and something of the romanticism has gone."[২] (চিত্র-৫৮) পালের্মোর যিজা প্রাসাদের টালির কাজ অবশ্যই মুসলিম কারিগরের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। ইমারতের অভ্যন্তরীণ ছাদের বিচিত্র কাঠ ও স্টাকোর নক্‌শায় মুসলিম প্রভাবের জাজ্বল্য প্রমাণ পাওয়া যায়। Lambert বলেন, "Terragena Cathedral in Catalonia whose large cloister resembles cistercian cloisters but has some Moorish details."[৩]

১। HA, P. 1251

২। Jairazbhoy. p, 27.

৩। Lamber, 6, Encyclopaedia of World Art, vol. vi. p, 490.

টলেডোতে হিস্পানো-মোরিস্ক স্টাইলে ইমারতের অলঙ্করণের মিনাকরা টালির প্রাধান্য সর্বাধিক এবং জাইরাজবয়ের কথায়, "The cupola of the Convent of the Conception (1422) is revetted with gold and blue tiles in a frame of interlacing bricks. Lustre pottery and especially the deep blue ware were exported and they influenced the Majolica of Italy which received its name from Malaga or Malika."[১]

আরবী হরফে অলঙ্করণ ও শিলালিপির নক্‌শা মুসলিম স্থাপত্যের একটি অনবদ্য অবদান। Christi বলেন, "Arabic script, the sole contribution to Islamic art is a universal mark of Muslim dominance or influence wherever it spread."[২] বিমূর্ত শিল্পকলার উৎকর্ষে ইসলাম যে অবদান রেখেছে তা বিস্ময়কর : জ্যামিতিক, লতাপাতা ছাড়াও আরবী লিপিকলা বায়জানটাইন সাম্রাজ্যেরও Iconoclastic যুগে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এমনকি সম্রাট জাস্টিনিয়ন এবং তাঁর পরবর্তী কয়েকজন উত্তরাধিকারী মুদ্রায় যীশুখ্রীস্টের প্রতিকৃতি মুদ্রণ থেকে বিরত ছিলেন। এমনকি কনস্টানটিনোপলের সেন্ট সোফিয়া গির্জার অলঙ্করণে ইসলামী প্রতিকৃতিবিহীন নক্‌শা প্রাধান্য লাভ করে।[৩] আলঙ্কারিক রীতিতে কুফী স্টাইলের আরবী লিখনপদ্ধতি বায়জানটাইন বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প, স্থাপত্য, অলঙ্করণে এমনকি পাণ্ডুলিপি চিত্রায়ণে প্রভাব বিস্তার করে। কুফীর সঙ্গে জ্যামিতিক নক্‌শার সমন্বয়ে যে মোটিভ সৃষ্টি হয় তা দশম শতাব্দীর একটি পাথরখণ্ডে উৎকীর্ণ রয়েছে ; বর্তমানে যা ১২৫০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এথেন্সের গির্জায় (Little Metropole) প্রোথিত আছে। কুফীরীতিতে আরবী লিপিকলা বার্লিন জাদুঘরে রক্ষিত একাদশ শতাব্দীতে একটি বায়জানটাইন পাত্রে এবং Homilies of John Chrysostrom নামে এক বিচিত্র পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাবে। স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে খ্রীস্টান কারিগর-কারুশিল্পী এবং স্থপতি মুসলিম বা মুরিশ স্থাপত্যের সংস্পর্শে আসে এবং প্রভাবান্বিত হয়।[৪] অষ্টম শতাব্দীতে মার্সিয়ার রাজা অফফা তাঁর একটি স্বর্ণমুদ্রায় 'কালিমা' অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদ রসূলুল্লাহ" মুদ্রিত করেন, অবশ্য তাঁর পক্ষে অর্থ বোঝা সম্ভবপর ছিল না ব্রিটিশ জাদুঘরে রক্ষিত একটি আইরিশ ব্রোঞ্জের ক্রসেও কুফীরীতিতে কালিমা খোদিত ছিল।

ব্রিগস আরবী শিলালিপিব ব্যাপকতার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়, "The carved inscriptions used decoratively in late Gothic work were anticipated in the ninth century at Ibn Tulun`s Mosque at Cairo, but inscriptions in Kufic characters penetrated far into France during the Muslim occupation of her southern provinces and, rare examples of

---

১। Jairazbhoy, p, 27.

২। Christie, A. H., Islamic minor Arts and their influence upon European work, Legacy of Islam, p. 113.

৩। Rice, D. T. The Appreciation of Byzantine Art, pp. 66-67.

৪। Rice, D.T., Byzantine Art, pp, 101-2

ornament even in England are believed to show Arabic influence."[১] কালিমা কুফীরীতিতে এরূপ একটি আকর্ষণীয় আলঙ্কারিক মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করে যে এটি রোমের সেন্ট পিটার গির্জার দরজায় স্থান পায়। সেভিলের আল-কাযার (চিত্র ৫৯) প্রাসাদের (১৩৫০-৬৯ খ্রীঃ) সম্মুখভাগে গথিক শিলালিপিটি কুফী রীতিতে উৎকীর্ণ। ইবনে তুলুনের মসজিদে যে ধরনের কুফী শিলালিপি খোদিত আছে তার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে স্থাপিত দ্বিতীয় রিচার্ডের সমাধির অলঙ্কৃত গ্রীক শিলালিপির। এ ছাড়া আর যে সমস্ত স্থাপত্যরীতিতে কুফীর অলঙ্করণ দেখা যাবে তা হচ্ছে ইংল্যান্ডের উইনচেস্টার ক্যাথেড্রেল, ইয়র্কশায়ারের ফিজলেকের সমাধি, নরফোকের South Acre Church (ষোড়শ শতাব্দী) এবং ফ্রান্সের Auvergne-র Le-puy গির্জার ফটকে।

খোদিত শিলালিপি ব্যতীত আরও বিভিন্ন ধরনের অলঙ্করণরীতি ও মোটিভ মুসলিম স্থাপত্যের ঐশ্বর্যকে প্রমাণিত করেছে। প্রফেসর লীথাবী মনে করেন যে, প্রাচ্য দেশ থেকে রঞ্জিত ও নক্‌শাসম্বলিত কাচ (Stained glass) পশ্চিমে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবের অসংখ্য চিত্রসম্বলিত জানালার কাচে মুসলিম প্রভাব রয়েছে। অনুরূপভাবে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, টলেডো গির্জায় ব্যবহৃত ৭৫০টি রঞ্চিত কাচ মুসলিম স্থাপত্যিক অলঙ্করণের অনুকরণে সম্পন্ন হয়েছে। মুসলিম অলঙ্করণের অপর একটি অবদান মিনাকরা টালি। মেসোপটেমিয়া থেকে সুদূর কায়রোয়ানে মিনাকরা টালির ব্যবহার হয়েছে এবং সেখান থেকে মাগরেব ও স্পেনে এই রীতি প্রবর্তিত হয়েছে (চিত্র ৬১)। তুরস্কেও রঞ্জিত মৃৎপাত্রের ঝাড়বাতির ব্যবহার রয়েছে। (চিত্র ৬০) আল-হামরার অনুকরণে উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য টালি স্প্যানীশ খ্রীস্টান শিল্পকলায় ব্যবহৃত হয়। সারাগোসায় নির্মিত Cathedral of El-Pilarটি (শুরু ১৬৭৭, সংস্কার ১৭৫৩-৬৬ খ্রীঃ) বিভিন্ন ধরনের নক্‌শাসম্বলিত রঙিন টালি দ্বারা সুশোভিত ছিল।[২] জায়রাজবয় বলেন, "Exteriors too began to be covered with ceramics, as at the Cathedrals of Saragossa. They are contained in silent brick compartment, and only the Gothic windows betray the fact that this is a church."[৩]

মুরিশ স্থাপত্য ও অলঙ্করণ ব্যতীত স্পেনে মুসলিম প্রভাবে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির শিল্পরীতির উদ্ভব হয় :

ক) মোজারাব : অর্থাৎ আরব প্রভাবাধীন খ্রীস্টান এবং

খ) মুদিজার অর্থাৎ খ্রীস্টান শাসনাধীনে স্প্যানীশ মুসলমান।

মোজারাবগণ কর্ডোভা থেকে টলেডোয় গিয়ে মুসলিম ও খ্রীস্টান উপাদানের সংমিশ্রণে যে স্থাপত্যরীতির উদ্ভাবন করেন, তাকেই মোজারাব বলা হয়। অষ্টম থেকে

১। Briggs, P. 178.

২। Hoar, p. 611.

৩। Jairazbhoy, p. 27.

দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই রীতি প্রচলিত ছিল। মোজারাবদের নির্মিত গির্জা বা ইমারতে মুসলিম প্রভাব লক্ষ করা যায়, যেমন– অশ্বনালাকৃতি খিলান, শিরাবিশিষ্ট ভল্ট, খিলান, অ্যারাবেস্ক নক্‌শা। ৯১৩ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত মোজারাব গির্জা San Miguel de Escalada একটি উদাহরণ। ফ্লেচার বলেন, "Moorish Influence made itself felt in such features as the horseshoe arch and pierced stone tracery and notably in rich surface patterns for which Muslim art is remarkable as in the Synagoga del Transito, Toledo (1360-61), while the early Spanish Churches seem to have been the work of Moorsih craftsmen."[১] মোজারার স্থাপত্যরীতি লক্ষ করা যাবে টলেডো, লিরিডা, বারসেলোনা প্রভৃতি গির্জায়।

মোজারাব অপেক্ষা মুদিজার স্টাইলে ইউরোপীয় স্থাপত্যে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। আরাগন ও কাস্টাইলে খ্রীস্টান রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম শিল্পীগণ যে রীতি উদ্ভাবন করেন, তাকেই মুদিজার বলা হয়। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই স্টাইল প্রচলিত থাকে। স্প্যানীশ ইনকুইজিশনের (১৪৭৭ খ্রীঃ) ফলে পাগড়ী পরিহিত মুসলিম স্থপতি ও কারুশিল্পীগণ গির্জা নির্মাণে বাধ্য হন। টলেডো, ক্যাস্টাইল, সারাগোসা, টারগোনা, গুয়াদালাজারা (চিত্র ৬২), সেভিল (চিত্র ৫৮) প্রভৃতি স্থানে নির্মিত অসংখ্য ইমারতে মুদিজার শিল্পরীতি দেখা যাবে, বিশেষ করে ইটের বিন্যাস, অশ্বখুরাকৃতি খিলান ও অলঙ্করণে। কর্ডোভার পতনের পর মুদিজার স্টাইলে জা'মি মসজিদসংলগ্ন San Fernando নামে একটি চ্যাপেল নির্মিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অষ্টম আল-ফোনসো বার্গোসের নিকট Monastery of Las Huelgas মুরিশ স্টাইলে নির্মাণ করেন। ১৩৬৪ খ্রীস্টাব্দে রাজা পেড্রো আল-হামরার অনুকরণে সেভিলের আল-কাযার প্রাসাদ নির্মাণের জন্য মুসলিম স্থপতি ও কারুশিল্পী নিযুক্ত করেন।

একাদশ শতাব্দীতে টলেডোর ইহুদী সমাধি এবং ধর্মমন্দিরে, El-Transito এবং Santa Maria la Blanca, মুদিজার কারিগর অলঙ্করণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম স্থাপত্যিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অসংখ্য মিনার নির্মিত হয়েছে আরাগনের গির্জায়। ইবনে তুলুন ও সামাররায় অসংলগ্ন মিনার নির্মিত হয়েছে। চতুষ্কোণাকার এবং অষ্টভুজাকৃতি বুরুজ নির্মাণেও মুরিশ কারুশিল্পের নজির পাওয়া যায় এবং এই সমস্ত বুরুজ স্থাপিত হয় কাটালুড ও সারাগোসা অঞ্চলে। টলেডোর বিখ্যাত ফটক Puarta dal খ্রীস্টান পৃষ্ঠপোষকের জন্য নির্মাণ করেন মুসলিম স্থপতিগণ। রেনেসাঁ যুগে স্পেনে যে আলঙ্কারিক স্থাপত্যের উদ্ভব হয় তা Plateresque অর্থাৎ রূপার সূক্ষ্ম কারুকার্য নামে পরিচিত। এই রীতিতে নির্মিত গোয়াদালাজারা প্রাসাদ (১৯৩৬ সালে ধ্বংসপ্রাপ্ত) মুদিজার কারুশিল্পীর অসামান্য কীর্তি (চিত্র ৬১)। Plateresque গথিক রেনেসাঁ এবং মুরিশ উপাদানের সংমিশ্রণ। ফ্রান্সে মুসলিম স্থাপত্যে প্রভাব অনুপ্রবেশ করে মুদিজার স্থপতি ও কারিগরদের মাধ্যমে। ফ্লেচার

১। HA, p. 640.

বলেন, "the pointed arch early used in the south of France, has been held to be due to contact with the Muslims, who overran this part of the country from 716 to 732."[১] ফরাসী লেখকগণ উল্লেখ করেন যে, প্যারিসের নটরডাম গির্জা নির্মাণে (১১৬৩-১২৫০ খ্রীঃ) মুসলিম স্থপতি নিয়োগ করা হয়। প্যারিসের তিনগম্বুজ-বিশিষ্ট নেপোলিয়ানের সমাধি Invalides (১১৮৩-৯১ খ্রীঃ) Chateau de Blois (১৫০৮-১৬৪০) অ্যারাবেস্ক, Soutrerrarine Church-এর জানালা কৌণিক, খিলান নির্মাণে মুসলিম প্রভাব অনস্বীকার্য।

৯০১ খ্রীস্টাব্দে আগলাভিদ সুলতানদের আমলে সিসিলি বিজিত হলে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপে মুসলিম সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করে। নরমান রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বায়জানটাইন রোমানেস্ক নরমান এবং মুসলিম উপাদানের সংমিশ্রণে সিসিলিতে এক নতুন নির্মাণ-কৌশলের উদ্ভব হয়। সিসিলিতে খ্রীস্টান এবং মুসলিম স্থপতিদের যৌথ প্রচেষ্টায় বহু গির্জা নির্মিত হয়। বায়জানটাইন শিল্পী মোজাইকের প্রচলন করেন, অপর দিকে stilted খিলান এবং ভল্টের ব্যবহারে মুসলিম প্রভাব স্পষ্ট। সিসিলিতে নরমান আরব স্থাপত্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল আমালফি। এখানে ১১০৩ খ্রীস্টাব্দে Giulio di Stefano কর্তৃক cloister এবং ১০৩৬ খ্রীস্টাব্দে রাভেল্লোর Cathedral-এ এই রীতির প্রতিফলন দেখা যায়। কাউন্ট প্রথম রজার সিসিলির স্থাপত্যকীর্তিতে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁর নির্দেশে অসংখ্য মুসলিম কারিগর নিযুক্ত করা হয় এবং তাদের প্রভাব গির্জানির্মাণেও সমুজ্জ্বল ছিল। প্যালোর্মায় নির্মিত St. John of the Hermits গির্জায় বহুগম্বুজ এবং খিলান-জানালা এবং কৌণিক খিলান মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ওপরে একটি নির্দশন হচ্ছে Church of La Martorana (১১৪৩ খ্রীঃ)। Chastel-এর ভাষায়, "the exotic profile is also found in S. Giovanni degli Eremiti (1132) of an extreme geometric rigour, with a Latin cross, incorporating the remains of an Arab Mosque[২]... ...

দ্বিতীয় রজারকে 'baptised Sultan of Sicilia' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি যে শিরোভূষণ পরতেন তার পাড়ে কুফীরীতিতে নক্‌শা ছিল। তাঁর তৈরি রাজকীয় চ্যাপেল সম্বন্ধে Chastel বলেন, "the quintessence of the decorative repertory of the Christian and Saracenic East is here expressed with a wealth of foliage motifs and spirals."[৩] রাইস বলেন যে, প্যালাটনা চ্যাপেল ১৩৫৪ সালে ফাতেমীয় কারিগরেরা অলঙ্কৃত করেন।[৪] সিসিলির অপরাপর যে সমস্ত গির্জায় মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাব পড়েছিল সেগুলো হচ্ছে প্যালোর্মার La-Zisa গির্জা, Monreale ক্যাথেড্রল ইত্যাদি।

১। HA, IC, 346

২। Chastel A., Italian Art. by Peter and Lindn Murray, London, 1963, p. 78.

৩। Chastel p 79

৪। Rice, Islamic Art. p 84.

শুধুমাত্র ইউরোপীয় স্থাপত্য মুসলিম চারু ও কারুশিল্পের নিকট ঋণী নয় বরং অসংখ্য স্থাপত্যিক সংজ্ঞা ইউরোপীয় স্থাপত্যকলাকে সমৃদ্ধ করেছে। তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, ইংরেজি এবং স্প্যানিশ ভাষায় বহু আরবী শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

আরবী	স্প্যানিশ	ইংরেজি
আল-খিজানা	আলাসিনা	cup board
আল-কুব্বাত (গম্বুজ)	আল-কোবা (alcoba)	Alcove
মাসজিদ	মাযকুইটা (mejquita)	masjid (Mosque)
মা'যানা		মিনার (minar)
আরব		আরাবেস্ক (arabesque)

মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাব আধুনিক যুগে অব্যাহত রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন আমেরিকায়, বিশেষ করে মেক্সিকোর ইমারতে, যেমন– Ecala Palace, Queretaro (১৭৮৬ খ্রীঃ), Casa del Alfenique, Puebla (১৭৮০ খ্রীঃ) প্রভৃতি মুরিশ স্প্যানীশ স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষ করা যাবে। উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকান স্থপতিদের দৃষ্টি মুরিশ নক্শার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ১৮৬২-৫ খ্রীস্টাব্দে নিউইয়র্কের National Academy of Design নির্মাণে খিলান, প্যারাপেট এবং রঙিন মার্বেলের ব্যবহারে মুসলিম প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাবে। ষোড়শ শতাব্দীতে কার্ডিফে নির্মিত দুর্গের একটি কক্ষের নামকরণ করা হয় "আরব কক্ষ" (চিত্র ৬৩)। এর প্রধান কারণ অলঙ্করণকীর্তির প্রতিটি উপাদান মুসলিম-মুরিশ স্থাপত্যিক অলঙ্করণ থেকে গৃহীত। এই সমস্ত আকর্ষণীয় উপাদানের মধ্যে গিল্টিকরা অভ্যন্তরীণ ছাদ (ceiling), স্টালাকটাইট, জটিল মার্বেলের নক্শা ইত্যাদি। এমনকি প্রখ্যাত ব্রিটিশ স্থপতি জন নাশ ব্রাইটনে রাজকীয় প্যাভেলিয়ন দিল্লীর মুঘল মসজিদের (জা'মি মসজিদ) অনুকরণে নির্মাণ করেন। উপসংহারে স্কটের ভাষায় বলা যায়, "every individual of Muslim faith may well be proud of the civilization which surpassed the splendours of imperial Rome and whose arts modern science has found it impossible to successfully imitate."

আলোকচিত্র